কত জনপদ
কত ইতিহাস

কত জনপদ
কত ইতিহাস

কত জনপদ
কত ইতিহাস

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন (অব.)

পালক পাবলিশার্স

www.pathagar.com

প্রকাশক
ফোরকান আহমদ *বিএ অনার্স, এমএ*
স্বত্বাধিকারী - পালক পাবলিশার্স
১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, জিপিও বক্স ৪১৫, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৩৪৫৮১৬, ০১৭২০৩০৮৮৬১
ই-মেইল : palokpublishers2011@gmail.com
palokpublishers@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ ২০১০
তৃতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ
এম. সাফাক হোসেন

প্রচ্ছদের ছবি পরিচিতি
১৮৫৭ সালে সিপাহী যুদ্ধের চিত্র প্রচ্ছদের উপরাংশে, নিচে দিল্লীর লাল কেল্লা, পেছনের অংশে আমেরের মানসিংহ কেল্লা।

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ
১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা - ১০০০

মূল্য ঃ তিনশত আশি টাকা

KOTO JANOPATH KOTO ETIHAS By Brigadier General M. Sakhawat Hussain ndc, psc (retd.). Published by Forkan Ahmad. Proprietor, Palok Publishers, 179/3, Fakirerpool, GPO Box No 415, Dhaka-1000, Bangladesh. Cover designed by M. Shafaq Hussain. 3rd edition in February 2012. Price Tk. 380.00 / US$ 15

ISBN 978 984 445 055 4

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার সহধর্মিণী ডা. রেহানা খানম
কায়সার-পুত্র, পৃথা-পুত্রবধূ
সাফাক-পুত্র

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ড. এ টি এম শামছুল হুদা বইটি সম্পর্কে যা বলেন—

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন-
শকহুনদল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সময় ও কালের পরিমাপে ভারতভূমিতে যত জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠী এবং তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বহু জাতি-গোষ্ঠীর পদচারণায় মুখর হয়েছে ভারতের অগণিত জনপদ। প্রকৃতির নিয়মে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন হয়েছে– ইতিহাসে এসব ঘটনা বিধৃত আছে। তবে ভারতে মুসলিম শাসন আমল ছবির মত আজও ভাস্বর ও সূর্যের মত দেদীপ্যমান এদের রেখে যাওয়া পুরাকীর্তির জন্য। এ সমস্ত পুরাকীর্তি কতিপয় প্রাণহীন স্থাপনা নয় মোটেই–এদের প্রতিষ্ঠার পেছনে আছে নানা দুঃখ, শোক, হিংসা, বঞ্চনা, প্রেম আর ভালবাসার কাহিনী।

ইতিহাসের ঘটনাবলীকে রূঢ় বাস্তবতার আলোকে চিত্রিত ও বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করাটাই সাধারণ রীতি। তবে ঐসব ঘটনার পেছনে মানবিক যে সমস্ত চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতি সক্রিয় ছিল তা তুলে ধরতে পারলে অতীত অনেক বেশি সহজ ও সাবলীল রূপ পেতে পারে। বিষয় যখন উপ-মহাদেশের ইতিহাস, তখন এই প্রেক্ষাপট আরও প্রগাঢ়তা লাভ করে।

দিল্লী-আগ্রা-রাজস্থানের জনপদ নিয়ে ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও রোমান্টিক কাহিনী লেখা হয়েছে অসংখ্য, তবুও এই ধারার লেখার কোন বিরতি নেই। কারণটা বোধ করি ভারতের অতীত মুসলিম ইতিহাসের প্রতি আমাদের দুর্বলতা আর বিভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব আঙ্গিকে তুলে ধরা এই সমস্ত অতীত কাহিনীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা। সেই আলোকে এম. সাখাওয়াত হোসেন রচিত ভ্রমণ বৃত্তান্তটি পুরানো বিষয়ের উপর লেখা হলেও এর একটি সার্বজনীন আবেদন আছে। লেখক অত্যন্ত সহমর্মিতা আর যত্নের সাথে দিল্লী-আগ্রা-রাজস্থানের বিভিন্ন চরিত্রের সুখ-দুঃখের কাহিনী সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এটিকে আমি কোন ইতিহাসভিত্তিক ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলব না। কারণ এখানে অনেক বিষয় বর্ণিত আছে যা নিয়ে ইতিহাসে যথেষ্ট বিতর্ক

www.pathagar.com

রয়েছে। লেখক তা নিজেও স্বীকার করেছেন এবং তা থেকে মনে হয় তিনি এসব বিতর্কে না জড়িয়ে তার কাছে যেটি উপস্থাপনের যোগ্য মনে হয়েছে পাঠকদের নির্মল আনন্দের জন্য তিনি সেটিই তুলে ধরেছেন। লেখক তাঁর এই প্রয়াসে যথেষ্ট সফল হয়েছেন বলেই আমি মনে করি।

ড. এ টি এম শামছুল হুদা
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

www.pathagar.com

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বইটি সম্পর্কে যা বলেন—

লেখকের দুটো সমাপ্তি বক্তব্য দিয়ে শুরু করি। 'ইতিহাস অত্যন্ত নির্মম কিন্তু সত্য। এগুলোই ইতিহাসের সত্য। পছন্দ হোক বা নাই হোক ইতিহাসের সত্য বিকৃত করা সম্ভব নয়।' আর দিল্লি 'এমন একটা শহর যেখানে ইতিহাস আর বর্তমান অবস্থান করে।'

লেখক পেশায় ইতিহাস চর্চার ধারে-কাছের কেউ নন; তিনি অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, ঘটনাক্রমে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অন্যতম কমিশনার, অবশ্য লেখালেখির জগতে তার বিচরণের বয়স বেশ দীর্ঘ। রাজনীতি আর নিরাপত্তা বিষয়ক তার রচনাসমূহ সংশ্লিষ্ট পাঠকের নজরকাড়া।

তিনি এখন ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে হাজির। বলা সঙ্গত যে, লেখকের লেখালেখির দিগন্তে এই রচনা নতুন সংযোজন। তবে গতানুগতিক ভ্রমণ কাহিনী নয়, দেখা হয়েছে যা কিছু, তার অন্তরালের সব ঘটনা ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত হয়ে অতীত-বর্তমানের মিথস্ক্রিয়া হিসেবে পাঠকের সামনে হাজির হয়েছে। অর্থাৎ লেখক বর্তমানে যা দেখছেন, উপভোগ করছেন তার অতীত পাটাতন তিনি উদ্ধার করছেন। ফলে তিনি লিখেছেন ইতিহাসনির্ভর ভ্রমণ কাহিনী। পাঠক ভ্রমণের কাহিনী আর ইতিহাসের সত্য দুই মলাটের ভেতর আস্বাদন করবেন। অবশ্য ভ্রমণের কাহিনীতে গতানুগতিকতা থাকলেও ইতিহাস যুক্ত হয়েছে যথেষ্ট গভীরতায়; এবং যা লেখকের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু সমৃদ্ধ মননের দিক নির্দেশক। উল্লেখ করতে হয় রোমক কিংবদন্তির দেবতা জেনাসের কথা। তার সামনে পেছনে চারটি চোখ ছিল। ফলে সে সামনে পেছনে দেখতে পেত। লেখক তার সামনের চোখ দিয়ে যা দেখার তা দেখেছেন; মনের চোখ দিয়ে অতীত রোমন্থন করে বর্তমানকে আলোকিত করেছেন। কাজেই পর্যটকের খেয়ালী আপাতঃদর্শন নয়, বরং ঐকান্তিক দর্শকের অন্তর্ভেদী অবলোকন এই ভ্রমণ কাহিনী। সুতরাং শিরোনাম *'কত জনপদ কত ইতিহাস'* যথার্থ।

লেখক ভারতের নির্বাচন প্রত্যক্ষ করতে আমন্ত্রিত হবার সুবাদে সংক্ষিপ্ত এক সফরে দিল্লি গিয়েছিলেন। তিনি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন, দিল্লিও দেখেছেন। এই দ্বিমাত্রিক দর্শনের ফসল হাজির করা হয়েছে অকাতরে বইটিতে। ভারতের শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে লেখক কুণ্ঠাহীনভাবে সপ্রশংস। নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী হবার দীর্ঘ ও তথ্যবহুল বিবরণ আছে। মনে হয় বিবরণটির মাধ্যমে লেখক বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন প্রাসঙ্গিক একটি শাণিত বার্তা দেবার উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু বার্তাটি কি সঠিক স্থানে পৌঁছুবে? লেখক যখন বলেন, 'ভারতে নির্বাচনের ফলাফলের জন্য কখনই কোন দল নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করেনি।' তখন

www.pathagar.com

অতিরিক্ত বার্তাও পাওয়া যায়। প্রার্থীর যোগ্যতা ও নির্বাচনী প্রচারণার ধরন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও যে বাংলাদেশের অনুকরণীয়–অনুসরণীয়, আছে তা বলতে লেখক যথেষ্ট নির্দ্বিধ, যার যুক্তিসঙ্গত কারণ স্বীকার্য।

ইতিহাসংলগ্ন কোন পেশাজীবী না হয়েও লেখক যে ইতিহাসের চেতনা–দ্যোতনা ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন তার প্রমাণ শুরুতে উদ্ধৃত তার দুটো বাক্যে আছে। তিনি ইতিহাসকে নির্মম সত্যের ধারক-বাহক হিসেবে দেখেন; ইতিহাস তা-ই। উইলিয়াম ফন ব্যাংকে তো উনিশ শতকেই বলেছিলেন, ইতিহাসের উপজীব্য নগ্ন সত্য। ইতিহাস দল, গোষ্ঠী বা শাসকের তোয়াক্কা না করেই সত্য ধারণা ও উচ্চারণ করে। বর্তমানে অতীত নিবিষ্ট; অতীত বর্তমানে প্রবিষ্ট–এটাও লেখকের ইতিহাসলগ্ন চেতনা উৎসারিত উপলব্ধ সত্য। আর সে জন্যই দিল্লি অবলোকন করতে গিয়ে ১৮৫৭'র সিপাহী বিদ্রোহের দিল্লি ফ্ল্যাশব্যাকের মতো মূর্ত হয়ে উঠেছে তার কলমে। মূর্ত হয়েছে ইতিহাসের অনেক অধ্যায়ই।

লেখক শ্রমে-সৃজনে ঐকান্তিক, ভাবনায় গভীর, বক্তব্যে অকপট–যার সমন্বিত বহিঃপ্রকাশ *'কত জনপদ কত ইতিহাস'*। বইটির পাঠকপ্রিয়তা কাম্য।

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বইটি সম্পর্কে যা বলেন—

ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম. সাখাওয়াত হোসেন (অব.)-কে আমার বরাবরই সুবক্তা মনে হয়েছে। যা ভাবেন, খুব স্পষ্ট করে বলেন; মাঝে মাঝে হাল্কা কৌতুকরস দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কিছু লেখা পড়ে ধারণা হয়েছে, তিনি বেশ গুছিয়ে লিখতে পারেন। কিন্তু *কত জনপদ কত ইতিহাস* পড়ে মনে হয়েছে, আসলেই তিনি সুলেখক। ভাষার ওপর একটা ভাল দখল থাকা একজন সুলেখকের পরিচয়। সেটি তাঁর আছে। তাঁর আরও ক্ষমতা রয়েছে বিষয়ের গভীরে পাঠককে টেনে নেয়ার, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাকে মনোযোগী সঙ্গী করার।

এম. সাখাওয়াত হোসেন বাংলাদেশের একজন নির্বাচন কমিশনার। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত করার জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জনগণের প্রশংসা পেয়েছে। জনাব সাখাওয়াত হোসেনের নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা এই সুষ্ঠু নির্বাচনের পেছনে শক্তি যুগিয়েছে। তাঁর কর্মব্যস্ততা প্রচুর। কিন্তু এই ব্যস্ততার ফাঁকেই তিনি বইটি লিখেছেন। অথচ ইতিহাসের নানা বিষয় ও সমকালীন অনেক ঘটনাবলীর তথ্যনিষ্ঠ উপস্থাপনার জন্য নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার প্রয়োজন। এই গবেষণা যে জনাব সাখাওয়াত হোসেন করেনি, তা নয়; কিন্তু তা করেছেন দীর্ঘদিন ধরে, নিজস্ব পড়াশোনার মাধ্যমে। তাঁকে ইতিহাস ও সমকালীন রাজনীতির একজন মনোযোগী পাঠক মনে হয়েছে বইটি জুড়ে। বলা যায় বইটির বিষয় সম্পর্কে তাঁর আগাম প্রস্তুতি ছিল, মানসিক নৈকট্য ছিল। আর ভ্রমণ কাহিনীর ছাঁচে ফেলে বইটি লেখায় এর গবেষণার অংশটি অনেক বেশি উপভোগ্য হয়েছে। গবেষণা যে লেখক করেছেন, তা উদ্ধৃত বইপত্র এবং অন্যান্য সূত্রের সমাহার থেকেই বোঝা যায়।

ভারতের পনেরোতম লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত সফরে গিয়েছিলেন জনাব সাখাওয়াত হোসেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী ডাঃ রেহানা খানম এবং আরেক নিবার্চন কমিশনার জনাব মুহাম্মদ ছহুল হুসাইন। ২০০৯ এর ৪ মে থেকে ১৪ মে– মাত্র ১০ দিনের এই সফরে দিল্লী-আগ্রা-আজমীর-জয়পুর ঘুরে দেখেছেন। এই প্রথমবার এসব শহরে যাওয়ার সুযোগ তাঁর হলো। কিন্তু এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তিনি এই শহরগুলোর ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো পরিদর্শন করলেন। তিনি নিজে এই সফরকে 'হিন্দুস্থানের বিশাল ইতিহাসের মাত্র কয়েকটি পাতার সফর' হিসেবে দেখেছেন; কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর প্রতিটি পরিচিতিকে তিনি তাঁর পঠন-পাঠন ও পূর্বজ্ঞানের আলোকে অন্তরঙ্গ করে তুলেছেন। যেমন দিল্লীতে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার দেখতে গিয়ে তিনি একদিকে যেমন, দালান দেখেছেন, খাবার দোকান দেখেছেন, মোয়াল্লেম হওয়ার ইচ্ছা

www.pathagar.com

নিয়ে আসা লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি নিজামউদ্দিন আউলিয়া, তাঁর শিষ্য আমীর খসরু, মির্জা গালিব প্রমুখের পূর্বাপর একটি ইতিহাসকেও দেখেছেন এবং মনোগ্রাহী ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন। সমকাল থেকে ইতিহাসে, ইতিহাসের রাজপথ থেকে গলিপথে তিনি সচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন। ইতিহাস বর্ণনার যে পদ্ধতিটি জনাব সাখাওয়াত হোসেন ব্যবহার করেছেন তা যেমন বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যসমৃদ্ধ; তেমনি অন্তরঙ্গ এবং ব্যক্তিগত নানা অভিজ্ঞান ঋদ্ধ। ফলে তাঁর বর্ণনায় ঝাঁসীর রাণী লক্ষী বাঈ হোন, শাহজাদী জাহানারা হোন, অথবা শাহজাহান-হুমায়ুন-শিবাজীই হোন, প্রত্যেকেই যেন কিছুক্ষণের জন্য জীবন্ত হয়ে দেখা দেন। মজার বিষয় হলো ইতিহাসের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নির্বাচন, নির্বাচনের ইতিহাস, নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা—সেসবও একই রকম সাবলীলতা দিয়ে বর্ণনা করেছেন জনাব সাখাওয়াত হোসেন। একই সঙ্গে ভ্রমণের খুঁটিনাটিও আছে বইটি জুড়ে, যেমন 'করিমস' রেস্তোরাঁয়ও আহার গ্রহণ, বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ, রাস্তাঘাটের নানা অভিজ্ঞতা। অথচ বর্ণনার একটি রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় উঠতে মোটেও বেগ পেতে হয় না পাঠকদের। এ বইয়ের ভাষাটি গতিশীল, পাঠককে তা সহজেই ঘটনা ও বর্ণনার সমান্তরাল টেনে নেয়। বর্ণনাতেও বাহুল্য বা অকারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের কোনো প্রয়াস নেই। ফলে বইটি প্রকৃত অর্থে সুখপাঠ্য।

কত জনপদ কত ইতিহাস কে তাই শেষ বিচারে শুধু ভ্রমণ কাহিনী বলা যাবে না। অথবা হয়তো বলাও যায়; তবে একটু যোগ করে বলা যায় ভূগোল ও ইতিহাসে ভ্রমণ। একটি নির্দিষ্ট ভূগোলে লেখক দশদিন ঘুরেছেন, কিন্তু ইতিহাসে ভ্রমণটি তার দীর্ঘতর। একই সঙ্গে, এই ভ্রমণ সমকালেও। পাণ্ডুলিপিটি আমিও একবারেই পড়েছি, এবং মনে হয়েছে, এটি নিশ্চিতভাবেই পাঠকপ্রিয়তা পাবে।

জনাব সাখাওয়াত হোসেন তাঁর পাণ্ডুলিপিটি ছাপার আগে আমাকে পড়তে দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। তবে তার থেকে বেশি ধন্যবাদ বইটি লেখার জন্য। আমি আশা করি, তিনি আরো লিখবেন, সম্ভব হলে বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোনো কোনো অংশ নিয়ে। তাঁর লেখার হাতটি শক্তিশালী, আমরা চাইব এর নিয়মিত পরিচর্যা তিনি করবেন।

ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

আমার কথা

উত্তর ভারতের যে অঞ্চল ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত সে অঞ্চলে এটাই আমার প্রথম সফর ছিল। ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করলেও শুধুমাত্র একবার কয়েক দিনের জন্য কলকাতা ছাড়া ভারতে আমার আর সফর করা হয়নি। এরই আঙ্গিকে বলা যায় এবারই প্রথম সফরে এসেছিলাম ভারতের পনেরতম লোকসভার নির্বাচন পর্যবেক্ষণ উপলক্ষে। সাথে কয়েক দিন ছুটি নিয়েছিলাম স্বল্প সময়ের মধ্যে দিল্লী-আগ্রা-জয়পুর-আজমীর সফর করবার জন্যে। এ স্বল্প সময়ে ভারতের তথা মধ্যযুগের হিন্দুস্থানের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে আমার এ ক্ষুদ্র একটি ভ্রমণ কাহিনী লিখবার প্রয়াস।

আমার এ ভ্রমণ কাহিনীর নাম *'কত জনপদ কত ইতিহাস'* রাখবার যৌক্তিকতা রয়েছে ঐতিহাসিক বর্ণনায়। বিশ্বে খুব কম ইতিহাসই আছে যেখানে একই ভূখণ্ডে এত সাম্রাজ্য, এত অভিযান, রক্তপাত আর বৈচিত্র্য রয়েছে। কমই ইতিহাস রয়েছে যেখানে একের অধিক ধর্মের বিশ্বাসীদের বসবাস, বিভিন্ন ধর্মের, গোত্রের, সাম্রাজ্যের অবস্থানন্তর হয়েছে। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে উপমহাদেশে। আজও এসব 'জনপদ' এর নিদর্শন মনে করিয়ে দেয় এক সময়ের বিচিত্র ইতিহাসের উজ্জ্বলতম হতে মসিময় অধ্যায়গুলো। এরই প্রেক্ষিতে আমার এ প্রয়াসের নামকরণ।

আমার এ ভ্রমণ কাহিনীর অনেকাংশ জুড়ে উপমহাদেশের অন্যতম বিখ্যাত সূফী সাধক, দিল্লীর বাদশাহ বলে খ্যাত, হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া (রঃ)-এর উল্লেখ রয়েছে। হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া নিজেও ছিলেন দিল্লী সালতানাত-এর কয়েকটির উত্থান-পতনের সাক্ষী। কোন কোন সময় তিনিও অনিচ্ছায় জড়িয়ে পড়েছিলেন কয়েকটি শাসক বংশের ইতিহাসের সাথে। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার (রঃ)-এর মাজারে ফাতেহা পাঠ করবার। তাঁর একটি ভবিষ্যদ্বাণী 'হনুজ দিল্লী দূর আস্ত' এখনও উপমহাদেশের মানুষের রাজনৈতিক অথবা বিভিন্ন অঙ্গনে অন্যতম উপমা।

আমার এ সফরকে আমি হিন্দুস্থানের বিশাল ইতিহাসের মাত্র কয়েকটি পাতার সফর হিসেবে উল্লেখ করতে চাই। হিন্দুস্থানের ইতিহাসের বৃহত্তর অংশ এ অঞ্চলকে

www.pathagar.com

ঘিরেই, বিশেষ করে দিল্লী এবং আগ্রা কেন্দ্রিক ছিল প্রায় সাতশ' বছর। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের অঞ্চল, বাংলার ইতিহাসও রচিত।

আমার শৈশবের ইতিহাস পাঠে যে সব ঘটনা আর অধ্যায় আমাকে শিহরিত করেছিল তার সবটাই এ অঞ্চলকে ঘিরে। আমি দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর এবং আজমীরে যে কতদিন বা যে কত ঘন্টা কাটিয়েছি, আমি শুধু ইতিহাসেই ভ্রমণ করেছি। দিল্লীর ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখবার বাসনা ছিল বহু বছরের। প্রথমবারের মত হলেও মনে হয়েছে এখানকার ইতিহাসের সাথে আমি কিঞ্চিত পরিচিত। আমি উদ্বেলিত প্রথমবারের মত তাজমহল, কুতুবমিনার, আগ্রার দুর্গ আর দিল্লীর লালকেল্লা দেখে। এ সব জায়গার অলিতে-গলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে উপমহাদেশের ইতিহাস। এ অঞ্চলের প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে যতদূর সম্ভব ইতিহাসের পাতায় থেকেছি। বিশেষ করে দিল্লীর কয়েকটা দিন আমি অতীত নিয়েই ছিলাম।

নতুন হোক অথবা পুরাতন দিল্লী হোক—শহরটি দেখেছি সাম্রাজ্য আর সম্রাটদের উত্থান-পতনের জনপদ হিসেবে। আর এ উত্থান-পতনের সাথে জড়িয়ে ছিল উপমহাদেশের ভাগ্য।

স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লী যত আধুনিক শহরেই রূপান্তরিত হোকনা কেন, এ আধুনিকতার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ধ্বংসস্তূপ। রয়েছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গোত্রের আর বংশের শাসকের উত্থান আর পতন।

পুরাতন সাতটি শহর, অনেকের মতে দশটি হতে বারটি শহর, সমাধিস্থল আর শ্মশানঘাট মনে করিয়ে দেবে উপমহাদেশের হাজার বছরের ইতিহাস। দিল্লী, আগ্রা অথবা জয়পুরে এসব ধ্বংসস্তূপ দেখলে মনে হবে বিশাল সাম্রাজের বৃহৎ সমাধিক্ষেত্র। এ ইতিহাস কারও পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আমি মনে করি, এখানে এলে অজান্তেই ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে পড়তে হয় প্রত্যেক আগন্তুককে। নাটক, নভেল আর ভ্রমণ কাহিনীর উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে এ অঞ্চলের বৃহৎ উদ্যান, রাজপথ, অলিগলি অথবা পুরনো শহর জুড়ে। সে অনুভূতি থেকেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

আমি চেষ্টা করছি উপমহাদেশের ইতিহাসের কিছু ব্যক্তিত্ব আর বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ইতিহাসের অতিপরিচিত এবং স্বল্প পরিচিত কিছু কিছু ঘটনা এবং বর্ণনা একটি নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরতে। এসব ঘটনার কিছু কিছু আমার গবেষণালব্ধ তবে বেশির ভাগ ইতিহাসে বর্ণিত পাতা থেকেই একটু ভিন্ন মেজাজে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। যেখানে সম্ভব হয়েছে সূত্র উল্লেখ করেছি। তবে বর্ণনা করতে গিয়ে কোথাও কোথাও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে আমি আমার মন্তব্য দিয়েছি, আবার কোথাও কোথাও ঐতিহাসিক বিষয়কে নিজের মত করে চিত্রায়ন করতে চেষ্টা করেছি। ইতিহাসের কিছু কিছু জটিল অংশ

www.pathagar.com

সহজ সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছি। কতখানি সার্থক হতে পেরেছি তার বিচার পাঠকদের উপরই ছেড়ে দিলাম।

আমার বর্ণনায় উপমহাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে আমি প্রাক-মুসলিম শাসনের সময়কে ভারত, কোথাও কোথাও প্রাচীন ভারত, মুসলিম সময়কালকে হিন্দুস্থান, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর ব্রিটিশ শাসনের সময়কে ব্রিটিশ ভারত এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়কে স্বাধীন ভারত বলে উল্লেখ করেছি। আশা করছি সময়কালগুলো পাঠকদের বুঝতে সুবিধা হবে। আমার লেখায় বেশ কিছু নাম হয়ত সঠিকভাবে উল্লেখিত নাও হয়ে থাকতে পারে, সে জন্যে আমি দুঃখিত।

আমার এ সফরে যারা সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে দিল্লীস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের কয়েকজন কর্মকর্তার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার অতি স্নেহের মাশফি বিনতে সামস ওরফে শম্পা, তার স্বামী মিনহাজ আর পরম শ্রদ্ধেয় দোহা সাহেবের। এরা ভালবাসা আর স্নেহ দিয়ে ভারতে আমাদের কয়েকটি দিনকে স্মরণীয় করেছেন। সাহায্য করেছেন দিল্লীর বেশ কিছু জায়গা ভ্রমণের। পরম আতিথেয়তায় আমাদের সিক্ত করেছেন।

আমি বিশেষভাবে আমার সহধর্মিণী ডাঃ রেহানা খানমের কাছে ঋণী যে, তিনি অত্যন্ত প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও আমাকে সঙ্গ দিয়েছেন, ঐতিহাসিক স্থানগুলো ভ্রমণ আর দেখবার সময়ে উৎসাহিত করেছেন এবং এ প্রয়াসকে বাস্তব রূপ দিতে।

এ পর্যায়ে আমি অতি আন্তরিকতার সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামছুল হুদাকে যিনি অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও অনেক মূল্যবান সময় আমার পাণ্ডুলিপি পড়তে ব্যয় করেছেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সময় হতে এতটা সময় দেয়াতে আমি কৃতজ্ঞ। ড. শামছুল হুদা শুধু পাণ্ডুলিপিই পড়েননি, তিনি নিজে ভাষা ও বানান শুদ্ধ করে আমার প্রয়াসকে উন্নত করেছেন। এক কথায় তাঁর সর্বতো সহযোগিতার এবং পাণ্ডুলিপি পড়ে তাঁর মন্তব্যের জন্যে সশ্রদ্ধ চিত্তে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি বিশেষভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এবং প্রফেসর ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম-এর কাছে ঋণী। এ দু'জন অতি শ্রদ্ধেয় এবং দেশখ্যাত ব্যক্তিদ্বয়, তাঁদের শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমার এ ভ্রমণ কাহিনী ধৈর্য সহকারে পড়ে তাদের মন্তব্য দিয়েছেন। সে জন্য তাঁদের দুজনকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ধন্যবাদ জানাই মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস সরকারকে যিনি প্রাথমিক পর্যায়ে আমার পাণ্ডুলিপি পড়ে সংশোধনীতে সহায়তা করেছেন।

সর্বশেষে আমি ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার প্রকাশক পালক

www.pathagar.com

পাবলিশার্সের কর্ণধার, গবেষক ও সাহিত্যিক ফোরকান আহমেদকে যিনি সততার সাথে সুন্দরভাবে এ পুস্তক প্রকাশ করেছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার কনিষ্ঠপুত্র সাফাক হোসেনকে প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অংকন করার জন্যে।

পরিশেষে, আমি আশা করব যে, আমার অগণিত সম্মানিত পাঠক অতীতের মত এ পুস্তকটিও উপভোগ করবেন। আমি আমার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চেষ্টা করেছি এ পুস্তককে সহজ এবং সুখপাঠ্য করতে। এ ভ্রমণ কাহিনিটি পাঠকদের সামান্যতম আনন্দ দিলেও আমার এ প্রয়াসকে সার্থক মনে করব। পাঠকদের আগ্রহ ও উৎসাহ আমার আগামী দিনের পাথেয় হয়ে থাকবে। ধন্যবাদ।

ঢাকা
১৫ জানুয়ারি ২০১০

এম. সাখাওয়াত হোসেন

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ইতিহাসের সহ-অবস্থান	১৭
'হনুজ দিল্লী দূর আস্ত'	৩৪
সাহিবাতুজ্জামানী	৪৮
'সত্যামেভা জায়তে'–ভারতীয় নির্বাচন কমিশন	৬৫
ভারতের নির্বাচন-২০০৯	৯০
লোকসভা নির্বাচন—রাজস্থান	১১০
খাজা গরিব নেওয়াজ	১২৪
দিল্লীর পথে	১৪০
আগ্রার পথে	১৪৭
তাজমহল-এর শহর	১৫৩
যমুনার তীরে	১৬০
পুত্রের হাতে পিতা যেখানে বন্দি	১৬৯
মোগল-ই-আজম ঃ আকবর দি গ্রেট	১৮৪
সাম্রাজ্যের উত্থান আর পতনের শহর দিল্লী	১৯৩
হুমায়ুন-এর সমাধিতে	২১০
পুরানা কেল্লা	২২৬
শাহজাহানাবাদ-চাঁদনী চক	২৪১
কত জনপদ কত ইতিহাস	২৭৩
তথ্যপঞ্জি	২৮৩

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

১। বাংলাদেশ ঃ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১
২। অস্থির বিশ্ব ও আমাদের রাজনীতি
৩। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইতিকথা ঃ আফগানিস্তান হতে আমেরিকা
৪। তেল-গ্যাস ঃ নব্য উপনিবেশবাদ
৫। দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা
৬। মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত ঃ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ
৭। জনগণের রাজকুমারি ডায়ানা
৮। Terrorism in South Asia : Bangladesh Perspective
৯। South Asian Tangle
১০। Matter Military
১১। Regional Conflicts: Impact on Global Peace

www.pathagar.com

এক

ইতিহাসের সহ-অবস্থান

মে ৪, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ। আমি সস্ত্রীক এবং আমার সহকর্মী নির্বাচন কমিশনার জবাব মুহাম্মদ হুহুল হুসাইন যখন দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছলাম তখন সময় বেলা ১১:৩০ মিনিট। আমরা (আমি আর আমার সহকর্মী) ভারতের নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণে ৭ মে, ২০০৯-এ ১৫তম লোকসভা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে দিল্লী এসেছি। আমাদের গন্তব্য রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর। ৬ এবং ৭ মে ওই রাজ্যের নির্বাচন প্রত্যক্ষ করবার কথা। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম ভারতীয় নির্বাচন কমিশন আমাদের দেশের নির্বাচন কমিশনকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানালো। আমাদের এ সফরের আয়োজন করেছিল এশিয়া ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। আমাদের সরকারি সফরের শুরু হবে দিল্লীর নির্বাচন সদনে একটি সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং-এর মাধ্যমে।

আমি দিল্লীর এ সফরে যথেষ্ট রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। বাল্যকাল থেকেই ইতিহাসের প্রতি আমার যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। তবে ইতিহাস চর্চা উচ্চশিক্ষার বিষয় ছিল না বলে মধ্যম স্তরে থাকলেও স্ব-উদ্যোগে বেশ উৎসাহ নিয়েই আমাদের অতীত সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করেছি। ইতিহাস আমাকে সব সময় টেনেছে। জানতে আগ্রহী হয়েছি পরিবর্তনের বিষয়গুলো, কেন ঘটনা ঘটল এবং কোন প্রেক্ষিতে ঘটেছিল। জানতে আগ্রহী ছিলাম রাজ্য, রাজার পতন, কলহ-বিগ্রহ অথবা উন্নয়ন বা পরিবর্তন যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমরা বর্তমানে এসেছি। ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমাদের মত সাধারণ মানুষের জানবার মত দিব্যদৃষ্টি নেই, তাই আমরা ইতিহাস চর্চা করি ভবিষ্যত সম্বন্ধে সচেতন হতে। এগুলো সবই ফিলোসফিক্যাল কথা। এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে যেতে চাই না।

আমি দিল্লী সফরের কথা বলছিলাম। আমার বাল্যকাল থেকেই দিল্লীর প্রতি ঐতিহাসিক দুর্বলতা ছিল। ভেবেছিলাম কখনও হয়ত মানব সভ্যতার বিকাশ, বিশেষ করে এ উপমহাদেশ তথা বিশ্বের বৃহৎ দেশগুলোর অন্যতম, ভারতবর্ষের অতীত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কয়েক হাজার বছর ধরে দিল্লী অঞ্চলের অবস্থান সচক্ষে দেখবার এবং উপলব্ধি করবার সুযোগ পাব। সে সুযোগ পেয়ে গেলাম বলে আমার এত

www.pathagar.com

উত্তেজনা। দিল্লী, যার ইতিহাসের সাথে আমরা জড়িত ছিলাম। এখনও রয়েছি। বহু শতক ধরে দিল্লীর মসনদ বাংলার ভাগ্য-বিধাতা হয়ে ছিল। দিল্লীর ইতিহাস উপমহাদেশের উত্থান-পতনের ইতিহাস আর ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশ্বের অর্ধেক ইতিহাস। এ ইতিহাসের সিংহভাগ দিল্লীসহ উত্তর ভারত কেন্দ্রিক। কাজেই আমার চোখে এ অঞ্চলই উপমহাদেশের ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্র।

ছেলেবেলাতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে পরিচয় পেয়েছি সেখানে দিল্লী এবং আশপাশের উল্লেখই রয়েছে। প্রস্তর যুগ হতে লৌহ এবং তাম্র যুগ সবসময়ই উপমহাদেশের ইতিহাস দিল্লী অঞ্চল কেন্দ্রিক ছিল। প্রায় তিনশ' বছরের মোগলদের ইতিহাস, তারও আগে মুসলমান সুলতানদের ইতিহাস, তারও আগে হিন্দু, বৌদ্ধ রাজনীতির এবং সর্বশেষে ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস সবই এখানকার। বিশ্ববিখ্যাত যুগ যুগান্তরের ঐতিহাসিক নিদর্শন এ অঞ্চলেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

আমাদের সংক্ষিপ্ত আধা সরকারি সফরসূচি ছিল দিল্লী-জয়পুরের আর আমার বর্ধিত সফরসূচিতে ছিল আজমির, আগ্রা আর দিল্লী।

দিল্লী বিমানবন্দর সুবিশাল। আরও বড় হচ্ছে ২০১০ খ্রিস্টাব্দের কমনওয়েলথ গেমস্‌কে সামনে রেখে।

দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী বিমান বন্দর– যার অতীত নাম ছিল পালাম✦ বিমান বন্দর। ভারতের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর নামে নতুনভাবে নামকরণ করা হয়েছে দিল্লীর বিমান বন্দরের। ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরুর তনয়া, কংগ্রেস নেতা ফিরোজ গান্ধীর সহধর্মিণী, নেহেরু পরিবারের দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানে চতুর্থ প্রজন্মও গান্ধী নামে অধিক পরিচিত। নেহেরু গান্ধী পরিবার স্বাধীন ভারতের জাতির পিতা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীর ঐতিহ্য ছাপিয়ে গেছে সন্দেহ নেই। নেহরুর দুই প্রজন্মের প্রধানমন্ত্রী তনয়া ও পৌত্র রাজিব গান্ধী দু'জনই নিহত হয়েছেন আততায়ীর হাতে। অপর পৌত্র সঞ্জয় গান্ধী মৃত্যুবরণ করেছেন বিমান দুর্ঘটনায়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হবে এ ধরনের আততায়ীর আক্রমণ এবং দুর্ঘটনা দিল্লী তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নতুন নয় বরং একটি ধারাবাহিকতায় যুগে যুগে ঘটেছে। দিল্লীর মসনদ নিয়ে পারিবারিক কলহ, যুদ্ধ আর রক্তক্ষরণ অতীতেও হয়েছে বর্তমানেও চলছে। মসনদ নিয়ে পারিবারিক কোন্দল অতীতেও ছিল, আজও রয়েছে। বরুণ গান্ধী আর রাহুল গান্ধীর মধ্যে প্রতিযোগিতা সে সাক্ষ্য বহন করে। অনেক সময় দিল্লীর মসনদের অন্তরাল থেকে

✦ *'পালাম, বিমানবন্দর স্থানটি একটি ঐতিহাসিক গ্রাম 'পালাম, এর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে এর নামকরণ করা হয়েছিল।*

www.pathagar.com

শাসন কার্য পরিচালিত হয়েছে, আজও হচ্ছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে মসনদ দখল অতীতেও হয়েছে আজও হচ্ছে। শুধুমাত্র আঙ্গিক বদলেছে। তাই বর্তমান কোনভাবেই ইতিহাস হতে বিচ্ছিন্ন নয়।

দিল্লীর বিমান বন্দর হতে মধ্যশহর প্রায় ৩০ কিঃ মিঃ দূরে, অবশ্য যদি 'শাহজাহানবাদ' বা 'চাঁদনী চক' নামে সাধারণের নিকট পরিচিত পুরাতন দিল্লীকে মধ্যদিল্লী হিসেবে ধরা হয়। 'চাদনী চক', দিল্লী-৬, মোগলদের অন্যতম শাসক শাহজাহানের সময় পত্তন হলেও এর বিকাশে যার নাম যুক্ত তিনি শাহজাহান তনয়া-জাহানারা বেগম সাহেবা। মূলত ওই সময়কার বনেদী মানুষদের বাসস্থান আর সমৃদ্ধ বাজার নিয়ে গড়ে উঠা অসংখ্য গলি আর বাজারের সমষ্টিগত স্থান এই পুরাতন দিল্লী অথবা 'শাহজাহানাবাদ' এবং 'চাঁদনী চক'। মোগল শাসকদের কর্মকর্তা-কর্মচারী আর সমগ্র হিন্দুস্থান এবং হিন্দুস্থানের বাইরের ব্যবসায়ীদের আনাগোনায় মুখরিত হয়ে উঠতো 'শাহজাহানাবাদ' আর 'চাঁদনী চক'। আলোকচ্ছটা আর কলকাকলীতে ভরে উঠত 'নওরোজ' (পারসী বছরের প্রথম দিন) এর সন্ধ্যা। নারী-পুরুষের কলকাকলী, নূপুরের মূর্ছনা আর তরুণীদের লাজুক ভঙ্গি, সুললায়িত চলাফেরা আর রোমান্টিক পরিবেশে আচ্ছন্ন ছিল এ জনপদ। আজ সেই গৌরবময় অতীতের জীর্ণ সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকলেও এখনও পুরাতন দিল্লীর এ অঞ্চলের ব্যবসায়িক গুরুত্ব স্বাধীন ভারতে সর্বত্র স্বীকৃত। আজও দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ী আর পর্যটকদের আবশ্যিক সফরের অংশ হিসেবে পুরাতন ঐতিহ্য নিয়ে দিল্লীর হৃদয় হয়ে রয়েছে এই পুরাতন দিল্লী এবং 'চাঁদনী চক'। বিশ্বখ্যাত লাল কেল্লার সন্নিকটে এবং জামে মসজিদের দক্ষিণে 'চাঁদনী চক'। এরই এক গলিতে বিখ্যাত রেস্তোরাঁ করিমস্ (Karim's)। মোগল আমলের খাবার পরিবেশনের পরম্পরার ঐতিহ্য নিয়ে চলছে রেস্তোরাঁটি। হালে একটি শাখা খোলা হয়েছে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার (রঃ) মাজার সংলগ্ন এলাকায়, পশ্চিম নিজামউদ্দিনে।

'চাঁদনী চক' চাঁদের আলোতে উদ্ভাসিত হতো এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কৃত্রিম খাল যা আজ আর নেই। লাল কেল্লাসহ পুরো শহরটিই ছিল দেয়াল দ্বারা ঘেরা দিল্লীর প্রাণকেন্দ্র। এর ব্যাপ্তি ছিল লাহোরী গেট হতে লাল কেল্লা এবং ফতেহপুরী মসজিদ যা আজও মুসল্লীরা ব্যবহার করছে। কৃত্রিম খালটি 'চাঁদনীচক'কে তিনভাগে ভাগ করেছিল। এক ভাগ ছিল লাহোরী দরওয়াজা থেকে কতোয়ালী পর্যন্ত, যেখানে এখন শিস্‌গঞ্জ-এ শিখ সম্প্রদায়ের গুরুদ্বায়ারা রয়েছে। দ্বিতীয় ভাগ ছিল 'চক কতোয়ালী' থেকে 'চাঁদনী চক' এবং তৃতীয় ভাগ ছিল 'চাঁদনী চক' হতে ফতেহপুর মসজিদ পর্যন্ত। এ অংশের নাম ফতেহপুর বাজার।

প্রথমভাগে ছিল সৈনিকদের বাসস্থান যার নাম 'উর্দু বাজার'। হিন্দাভ হতে

www.pathagar.com

উর্দুভাষার জন্ম এখান থেকে হয়েছিল বলেই এর নাম উর্দুবাজার। উর্দুর বিখ্যাত কবি মির্জা গালীব লিখেছিলেন যে, একদার প্রাণবন্ত উর্দু বাজার, সৈনিকদের আস্তানা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, সময় বিধ্বস্ত হয়েছিল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ উপমহাদেশের ইতিহাসের অন্যতম বড় ঘটনা। দু'বছর ব্যাপী এ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকদের বিদ্রোহ-যাদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে মুক্ত করে তৎকালীন মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতে।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ, প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল তৎকালীন বাংলার বেহরামপুর হতে মার্চ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। এ যুদ্ধ চলেছিল একটানা দু'বছর ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। পতন হয়েছিল সিপাহীদের শেষ ঘাঁটি 'ওউদ' এবং 'গেয়ালিয়র' দখলের পর। এ যুদ্ধের সূত্রপাত হয় যখন ভারতীয় সিপাহীরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যক্রমে ভারতের ধর্মীয় এবং সংস্কৃতির সু-পরিকল্পিত বিকৃতি প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করেন। এ বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান সমানভাবে যোগ দিয়েছিলেন। এর একদিকে নেতৃত্বে ছিলেন ঝাঁসীর (মধ্য প্রদেশ) রাণী বলে ইতিহাস খ্যাত লক্ষ্মী বাঈ সহ অনেকে অপরদিকে ছিল গোরা পল্টনসহ কোম্পানির অনুগত ভারতীয় সিপাহীরা।

মধ্যপ্রদেশের বড় শহর ঝাঁসী। বর্তমানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া বাহিনীর বৃহত্তম সেনানিবাস। উনবিংশ শতাব্দীর ঝাঁসীর এবং হালের ইতিহাসেও যার নামটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে তিনি এ উপমহাদেশের অন্যতম বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মী বাঈ, জনপ্রিয় নাম ঝাঁসীর রাণী। উনবিংশ শতাব্দীতে একজন নারীর সাহসিকতা, বীরত্ব, স্বাধীনতার জন্যে আত্মাহুতি এবং নেতৃত্বের যে বিরল উদাহরণ তিনি রেখে গেছেন, তাতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে বর্তমান যুগের নারীরাও। ঝাঁসীর রাণীর নাম ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ব্রিটিশ বিরোধী সিপাহী বিদ্রোহের (প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ) সাথে জড়িত।

জন্ম নাম মানিকারনিকা। জাতিতে মহারাষ্ট্রীয়ান মারাঠা। জন্ম হয়েছিল তৎকালীন গোলাতে (বর্তমান ভারানাসি) নভেম্বর ১৯, ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বারহাত ব্রাহ্মণ পরিবারে। পিতা সারোপন্ত আম্বে ছিলেন তৎকালীন ঝাঁসীর মহারাজা গন্ধাধর রাওয়ের দরবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। বয়স যখন চার বছর তখন মানিকারনিকা মাতৃহারা হন। পিতার আদরে বেড়ে উঠেন ভবিষ্যতের ঝাঁসীর রাণী। বাড়ীতেই তার শিক্ষা জীবন এবং একই সাথে বাল্যকাল থেকেই যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। রাজদরবারে বাস করতে করতে দরবারের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হন সুন্দরী তরুণী মানকারনিকা। পরে চৌদ্দ বছর বয়সে মহারাজা গন্ধাধর রাওয়ের সাথে বিয়ের পর মানকারনিকার নাম পরিবর্তিত

www.pathagar.com

হয়ে হয় লক্ষ্মী বাঈ। বিয়ের বছর দুয়েক পর এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন, তবে জন্মের দু'বছরের মাথায় একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হলে মহারাজা গঙ্গাধর রাও পুত্রশোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। মহারাজা শোকাহত হয়ে যখন মারা যান, তখন রাণীর বয়স আঠারো। মহারাজা গঙ্গাধর রাওয়ের জীবদ্দশাতেই ঝাঁসীর রাণী আনন্দ রাও নামক এক নাবালককে দত্তক নিয়েছিলেন। আনন্দ রাও ছিলেন গঙ্গাধর রাওয়ের বংশেরই সন্তান। স্বামীর মৃত্যুর পর রাণী লক্ষ্মী বাঈ ঝাঁসীর শাসনভার গ্রহণ করলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি✦ ঝাঁসীকে কোম্পানির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে এক মতলব আটেন।

গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর পরই তার উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসকরা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছলেবলে কৌশলে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজা-মহারাজার কর্তৃত্ব খর্ব করে নিজেদের দখলদারিত্ব বাড়াতে বিভিন্ন রাজ্যে নানা কৌশল অবলম্বন করছিল। তখন দিল্লীর মোগল শাসক বাহাদুর শাহ জাফর নামেমাত্র সম্রাট এবং তাঁর রাজত্ব লালকেল্লার আশে পাশেই সীমাবদ্ধ ছিল। অপরদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা মহারাজদের হয় অনুগত থাকতে বাধ্য করা অথবা সরাসরি দখলদারিত্বের নীতি বাস্তবায়নে কূট কৌশলসহ সরাসরি হস্তক্ষেপও করছিল।

ডালহৌসি কোম্পানির সরাসরি কর্তৃত্ব বাড়াতে 'ডকট্রিন অব লেপস' (Doctrine of Lapse) নামক এক আইন বানিয়ে ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে কোম্পানির দখলে আনতে শুরু করেন। ব্রিটিশ কোম্পানির এই অদ্ভুত আইন মতে কোন রাজ্যের শাসক যদি রাজকার্যে অক্ষম হন অথবা সরাসরি উত্তরাধিকারী না থাকে– সে ক্ষেত্রে ওই রাজ্য সরাসরি কোম্পানি দ্বারা শাসিত হবে। এটাই ছিল উপনিবেশবাদের অন্যতম উলঙ্গ নিদর্শন।

ডালহৌসির নজর পড়ে ঝাঁসীর উপর। রাণীর কর্তৃত্ব সরাসরি নাকচ করে রাণীকে ঝাঁসীর দুর্গ আর প্রাসাদ ত্যাগ করবার হুকুম জারি করলে বহু ধরনা দিয়ে যখন সুবিধা করতে পারলেন না, তখন লক্ষ্মী বাঈ ব্রিটিশ আইনজীবীর মাধ্যমে মামলা রুজু করেন। মামলায় তিনি যৎসামান্য অনুকম্পা পান। তাকে মাসোহারা বরাদ্দ করে দুর্গ আর প্রাসাদে থাকতে দেয়া হয়। কিছুটা কর্তৃত্বও দেয়া হয়। উপায়ান্তর না পেয়ে লক্ষ্মী বাঈ বাহ্যত এ অপমানজনক পরিস্থিতি মেনে নিলেও ভেতরে ভেতরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতি বেশ ক্ষুব্ধ ছিলেন। তবে তিনি কোম্পানির আনুগত্য প্রদর্শনের সুবাদে ক্রমেই প্যালেস গার্ড হিসেবে তার বাহিনীতে মহিলা-যোদ্ধাসহ সেনা সংখ্যা প্রায় ২০,০০০-এ উন্নীত করেন।

✦ *ডালহৌসি (Dalhousie) ১৮৫৬ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল ছিলেন। অনেকে মনে করেন তার অদূরদর্শিতার কারণে ভারতে ইতিহাসের সর্ব বৃহৎ বিদ্রোহের জন্ম হয়েছিল।*

www.pathagar.com

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন ব্রিটিশ সেনা ছাউনীতে বিদ্রোহের সূত্রপাত হলেও ঝাঁসী ছিল বিদ্রোহের বাইরে এবং রাণী লক্ষ্মী বাঈ তার এলাকাতে শান্তি বজায় রাখেন। অন্যান্য জায়গায় বিদ্রোহী সিপাহীরা পরিকল্পিত যুদ্ধ শুরু করলে গোঁড়া পল্টনের সৈনিক এবং কোম্পানির অন্যান্য ব্রিটিশ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবার ঝাঁসীতে রেখে গোড়া পল্টনকে বিভিন্ন জায়গার যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি বৃদ্ধির জন্য পাঠানো হলে ঝাঁসীর প্রতিরক্ষার ভার পরে রাণীর উপর। এমতাবস্থায় কয়েক মাস রাণী কোম্পানির সাথে তাল মিলিয়ে চলেন। এ অবস্থানের পরিবর্তন হয় যখন সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক রামচন্দ্র পেনডুরাং তোপে ওরফে 'তানতিয়া তোপে' ঝাঁসী অবরোধ করেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা হত্যা করে রাণীর হেফাজতে থাকা ব্রিটিশ পরিবারদের। এ ঘটনার পর দোদুল্যমান অবস্থায় থাকা লক্ষ্মী বাঈ তার সৈনিকদের নিয়ে তানতিয়া তোপের সাথে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেন। কয়েক দিন যুদ্ধের পর ব্রিটিশ বাহিনী রাণীকে পরাজিত করে দুর্গের মধ্যেই বন্দি করবার প্রয়াস নিলে রাণী তার দেহরক্ষীদের নিয়ে পালিয়ে গোয়ালিয়রে পৌঁছেন।

রাণী লক্ষ্মী বাঈ তানতিয়া তোপের সহযোগী হয়ে কয়েকটি বড় ধরনের যুদ্ধে নিজেই সিপাহীদের নেতৃত্ব দেন। সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁসীর রাণীকে প্রায়শই অংশগ্রহণে দেখে সিপাহীরা উৎসাহ পেতেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে রাণী লক্ষ্মী বাঈ আহত হন এবং ওই জখম নিয়ে তিনি জুন ১৭, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলেও সিপাহীদের কাছে সে খবর গোপন করা হয়। গোয়ালিয়রে ঝাঁসীর রাণীর নামে তানতিয়া তোপে আর তার সঙ্গী আফজাল খান যুদ্ধ চালিয়ে যান। ব্রিটিশ জেনারেল স্যার হিউজ রোল রাণীর মৃতদেহ উদ্ধার করতে না পারায় রাণীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে সিপাহীদের মনোবল ভাঙতে পারেননি বলে গোয়ালিয়রের যুদ্ধ বেশ সময় ধরে চলে। গোয়ালিয়র দখলের পর এবং বিদ্রোহের (স্বাধীনতা যুদ্ধ) অবসান হলে লক্ষ্মী বাঈয়ের পিতা সরোপন্ত আম্বেকে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেবার অভিযোগে ফাঁসি দেয়া হয়।

লক্ষ্মী বাঈয়ের পালক পুত্র আনন্দ রাওকে পরে (দামোদর রাও) ব্রিটিশ রাজ ঝাঁসীর মহারাজের উত্তরাধিকারীর স্বীকৃতি না দিলেও ভরণ-পোষণের জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা করেছিল।

ঝাঁসীর রাণীর মৃত্যুর পরও প্রায় বহু সময় ধরে তানতিয়া তোপে গেরিলা যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করতে থাকেন। কোম্পানি তানতিয়া তোপের মাথার দাম ধার্য করে তাকে জীবিত অথবা মৃত গ্রেফতারের ঘোষণা দেয়। ঘোষণার কিছু দিনের মধ্যেই তানতিয়া তোপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মান সিং তানতিয়ার অবস্থান ব্রিটিশ বাহিনীকে জানালে 'পারো' জঙ্গল (মধ্যপ্রদেশ) থেকে এপ্রিল ৭, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল রিচার্ড জনমিড ঘুমন্ত অবস্থায় তানতিয়া তোপেকে গ্রেফতার করেন।

www.pathagar.com

গেরিলা নেতা তানতিয়া তোপে মারাঠা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের দত্তক পুত্র নানা ধন্দুপান্তে-এর প্রধান সেনাপতিতে উন্নীত হয়েছিলেন। বাজী রাও ছিলেন মারাঠা কনফেডারেশনের শেষ পেশোয়া। নানা ধন্দুপান্তে দত্তক পুত্র হওয়াতে তাকে বাজী রাও-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকার করেননি লর্ড ডালহৌসি। এই ধন্দুপান্তই ইতিহাসে 'নানা সাহেব' নামে পরিচিত। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজী রাও এর দত্তক পুত্র নানা ধন্দুপান্ত ওরফে নানা সাহেব এবং তানতিয়া তোপেকে এপ্রিল ১৮, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়াতে শিবপুরে (মধ্যপ্রদেশে) ফাঁসি দেয়া হয়। স্বাধীন হবার পর তোপের প্রমাণ সাইজ ব্রোঞ্জের একটি মূর্তি ভারত সরকার শিবপুরের কালেক্টরেটের সামনে স্থাপন করেছে।

ঝাঁসীর রাণীর আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখতে ঝাঁসী এবং গোয়ালিয়র উভয় স্থানে অশ্বারোহী যোদ্ধা লক্ষ্মী বাঈয়ের ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। ঝাঁসীর রাণীর সম্মানেই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস তাঁর মহিলা রেজিমেন্টের নামকরণ করেছিলেন। ভারতে বহু ছায়াছবি তৈরি হয়েছে রাণীর জীবন নিয়ে। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী বাঈ আর তানতিয়া তোপের বীরত্বের কথা বহু ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরাও শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করেছেন।

ঝাঁসীর রাণীর কথিত প্রতীকী প্রেম কাহিনী নিয়ে ইংলিশ সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত এবং অত্যন্ত পরিচিত লেফটেনেন্ট কর্নেল জন মাস্টারস্ রচনা করেছিলেন তাঁর বহু জনপ্রিয় উপন্যাসগুলোর অন্যতম "নাইট রানারস্ অব বেঙ্গল [Night Runners of Bengal (১৯৫১)]। অবশ্য এই উপন্যাসের জন্য ভারতীয়দের সমালোচনার মুখে পড়েন। জন মাস্টারস্ প্রায় ২৬টি ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস রচনা করেন। যার মধ্যে রয়েছে 'ভাওয়ানী জংশন' 'দি লোটাস এন্ড দি উইন্ড' এবং 'বিউগল এন্ড এ টাইগার"। ভাওয়ানী জংশন নামক উপন্যাসে তিনি বর্ণনা করেন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত বিভাজনের সময়ের সামাজিক অবস্থা এবং ওই সময়ের ব্রিটিশ ভারতে এঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের অবস্থান। হলিউড এবং পাইনউডে এ ছবি নির্মিত হয়েছিল। তবে ছবিটির চিত্র ধারণ হয় পাকিস্তানের লাহোরে। তৎকালীন ভারত সরকার ভারতে এ ছবি চিত্রায়িত করতে অনুমতি দেয়নি। ছবিতে স্টুয়ার্ড গ্রেনজারের সাথে আভা গার্ডনার অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। এ ছবির জন্য আভা গার্ডনার অস্কার নমিনেশনও পেয়েছিলেন। আমি বহুবার এ ক্লাসিক ছবিটি দেখেছি। জন মাস্টারস্-এর অসাধারণ বর্ণনা ছবিটির মাধ্যমে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

১৮৫৭-এর স্বাধীনতা যুদ্ধ হঠাৎ করে শুরু হয়নি। এর প্রস্তুতি চলে বহু বছর ধরে। এর অগ্রভাগে ছিল সে সময়ের বেঙ্গল আর্মি। কোম্পানির অধীনে ভারতে যে বিশাল বাহিনী গড়ে উঠেছিল সেটি ছিল তিনভাগে বিভক্ত। বেঙ্গল আর্মি, মাদ্রাজ নেটিভ এবং বোম্বে নেটিভ

www.pathagar.com

আর্মি। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে গোড়াপল্টন বা ইউরোপিয়ান ব্যাটালিয়ন-এর মোট সদস্য ছিল ২১,১৯৭। অপরদিকে নেটিভ বলে পরিচিত তিনটি আর্মির স্থানীয় সদস্য ছিল ২,৭৭,০০০ এর অধিক এর বাইরে ছিল আধা সামরিক বাহিনীর স্থানীয় সদস্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলের তথাকথিত কয়েকটি স্বশাসিত রাজ্যের স্থানীয় বাহিনী। তথাপি সিপাহীদের সংখ্যা বেশি থাকা সত্ত্বেও এ যুদ্ধে কেন পরাজয় ঘটে? ইংরেজ শাসন কীভাবে আরও নব্বই বছর দীর্ঘায়িত হল! তা নিয়ে আজও গবেষণা চলছে। তবে এ পরাজয়ের প্রধান এবং মূল কারণ হিসেবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে পাঞ্জাব এবং আরও কয়েকটি অঞ্চলের নির্লিপ্ততা। তৎকালীন পাঞ্জাবের এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সিপাহীরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে যেভাবে সাহায্য করেছিল, তার পুরস্কার হিসেবে পরবর্তীতে পাঞ্জাবী এবং পাঠানরা বেসামরিক এবং সামরিক বাহিনীতে প্রাধান্য বজায় রেখেছিল এবং এ প্রাধান্যের ধারাবাহিকতা চলে এসেছিল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পরেও দু'টি স্বাধীন দেশ, ভারত এবং পাকিস্তানেও। ভারত সে প্রভাব কাটিয়ে উঠলেও পাকিস্তান রয়ে গেছে পাঞ্জাবী প্রভাবে যার অন্যতম ফসল ছিল বাঙালীদের অবমাননা, সূত্রপাত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধ, যা ব্রিটিশ ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত, ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মতে নেটিভ সিপাহীদের বেশ কিছু পুঞ্জিভূত ক্ষোভ থেকে সংঘটিত হয়েছিল। এর বিবরণ দিয়েছিলেন ওই সময়ের ব্রিটিশ ভারতীয় সর্বাধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল লর্ড রবার্টস্। বিদ্রোহ সূচনা করেছিল বেঙ্গল হর্স আর্টিলারি। রবার্টস-এর মতে নিম্নোক্ত কারণগুলোর জন্য এ সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়।

প্রথমত, হিন্দু সদস্যরা মনে করেছিল তাদের ধর্মের অবমাননা হচ্ছে। কারণ, বহু নিম্নবর্ণের, এমনকি উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা ক্রমেই ধর্মান্তরিত হয়ে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল। এ সন্দেহ ক্রমেই মুসলমান সদস্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ তত্ত্ব ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মকে ধ্বংস করবার প্রয়াস বলে স্থানীয়দের সন্দেহ ক্রমেই দানা বেঁধে উঠেছিল। এর রেশ আজও রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'ওউদ'-এর স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করে কোম্পানি রাজের অন্তর্ভুক্ত করাকে ভারতীয়রা ভাল চোখে দেখেনি।

তৃতীয়ত, এনফিল্ড রাইফেলের জন্য দমদম-এ প্রস্তুত করা নতুন ধরনের কার্তুজ। গুজব ছড়ালো যে ভারতীয়দের ধর্মে আঘাত দিতে ওই কার্তুজের মধ্যে একদিকে শূকরের, যা মুসলমানদের জন্য হারাম, অপরদিকে গরুর, (হিন্দুরা গরুকে দেবতা মনে করে) চর্বি মেশানো ছিল। ওই কার্তুজগুলো রাইফেলে লোড করতে দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে হতো। গুজব নয় এটি ছিল সত্য তথ্য।

চতুর্থত, বেঙ্গল আর্মি ছিল শ্রেষ্ঠ ব্যাটালিয়নগুলোর সমন্বয়ে গঠিত সে কারণে

www.pathagar.com

নেতৃত্বের অভাববোধ করে নি।

পঞ্চমত, গোড়া পল্টন আর স্থানীয় সেনা সদস্যদের মধ্যে সংখ্যার এবং অন্যান্য বিষয়ের বিস্তর ফারাক।

ষষ্ঠত, বিভিন্ন কারণে, বিশেষ করে বেতন-ভাতার বৈষম্য এবং এর সাথে যোগ হয়েছিল ভারতের বাইরে, কোম্পানির অন্যান্য কলোনিগুলোতে চাকরি করবার বাধ্য-বাধকতা। তৎকালীন কুলীন হিন্দুদের কাছে সাগর পাড়ি দেয়া ছিল অশুভ কর্ম।

সপ্তম, লর্ড রবার্টস্ মনে করেন ওই সময়ের বেঙ্গল নেটিভ আর্মিতে ব্রিটিশ অফিসারদের স্বেচ্ছাচারিতা এ বিদ্রোহে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এক সিপাহী সীতারাম তার ডাইরিতে নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এ সিপাহী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির, পরবর্তীতে ব্রিটিশ ভারত রাজের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সিপাহী হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছিলেন। সীতারাম-এর ডাইরি পড়ে অনুবাদ করেছিলেন ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে তারই কমান্ডিং অফিসার ১২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অধিনায়ক লেঃ কর্নেল জেমস্ টমাস নরটোন। যিনি ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। তার অনুবাদের নাম 'সিপাহী টু সুবেদার'।

'সিপাহী টু সুবেদার' পুস্তকে সিপাহী সীতারাম যা লিখেছিলেন, তা বোধকরি ব্রিটিশ জেনারেলরা আগে পাঠোদ্ধার করতে পারেননি। তিনি লিখেছিলেন যে, ওই সময়ে কোম্পানির বাহিনীতে মুসলমানরা যোগ দিত হৃত গৌরব ছিনিয়ে আনতে আর হিন্দুরা যোগ দিত ইংরেজদের হাত হতে ভারতের অতীত হিন্দু রাম রাজ্যে ফিরিয়ে নিতে। উভয় সম্প্রদায় ভারত হতে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন।[১]

এ যুদ্ধের শেষে দিল্লীর লাল কেল্লা হতে বাহাদুর শাহ জাফরকে বন্দি করে বার্মাতে দেশান্তরিত করা হয়। বাহাদুর শাহ জাফরের কবর রেঙ্গুনের অদূরে আজও উপমহাদেশের সফরকারীদের মধ্যে অন্যতম দর্শনীয় স্থান বলে বিবেচিত। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে এ যুদ্ধের একশ' বছর পূর্তি উপলক্ষে বাহাদুর শাহ জাফরের কবর ভারতে স্থানান্তরিত করবার দাবি উঠেছিল। এ দাবি উপমহাদেশের আর দু'টি দেশ করেনি যাদের উত্তরসূরিরা এ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন। ঢাকায় একটি জরাজীর্ণ পার্ক রয়েছে যার নাম 'বাহাদুর শাহ পার্ক'।

বাহাদুর শাহ জাফর নিজে দুঃখ করে বলেছিলেন "এমনই বদনসিব জাফর নিজ দেশে দুই গজ ভূমি পাওয়া যায়নি দাফনের জন্য"। বাহাদুর শাহ জাফরের যে নির্বাসনের মাধ্যমে সর্বভারতে ব্রিটিশ রাজ পোক্ত হয়েছিল, যার গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন থেকে।

১। *Sita Ram" Sepay to Subedar" (Trans) Vikas Publications (1970)*

www.pathagar.com

১৮৫৭-এর ইতিহাসে মঙ্গল পান্ডেকে বড় করে দেখানো হলেও বেঙ্গল নেটিভ আর্মি আর্টিলারি থেকে যে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল তা ছড়িয়ে পড়ে সর্বভারতে। মিরাট আর আগ্রা হয়ে উঠে পরবর্তীতে এর প্রাণকেন্দ্র।

গবেষকদের কাছে আজও বড় প্রশ্ন কিভাবে মুষ্টিমেয় ভাগ্যাহত ব্রিটিশ বণিকরা ভারতের মত এতবড় দেশ ও পরাশক্তিকে পরাস্ত করে দু'শ' বছর রাজত্ব করেছিল? ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে এমনই প্রশ্নের মুখোমুখি আমিও হয়েছিলাম যখন জার্মানিতে ব্রিটিশ ৪র্থ কোর কমান্ডার আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন। আমি কখনও এর বিশ্লেষণ করিনি আমার সীমিত জ্ঞানের কারণে। এর সহজ উত্তর হতে পারে 'ডিভাইড এন্ড রুল'। এটাই প্রধান কারণ হলেও আমরাই এর জন্য দায়ী। বিদেশী তোয়াজের কারণেই স্বাধীনতা হারাতে হয়েছিল। আজও এমনটা পরিলক্ষিত হয়। হিন্দুস্থানে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ অনুপ্রবেশ ঘটেছিল রাজা জেমস-কর্তৃক সম্রাট জাহাঙ্গীর এর দরবারে প্রেরিত প্রথম দূত স্যার টমাস রো এর মাধ্যমে। মদ্যপানের সঙ্গী হয়ে স্যার টমাস রো সম্রাট জাহাঙ্গীরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজনে পরিণত হন। বিদেশী দূতদের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের প্রথম উদাহরণ স্যার টমাস রো যিনি জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন ১৬১৫-১৮ খ্রিস্টাব্দে। একই ধারা আজও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয়ে।

স্যার টমাস রো-এর পদচারণা সম্রাট জাহাঙ্গীরের আগ্রার 'দেওয়ান-ই-আম' হতে 'দেওয়ান-ই-খাস' পর্যন্তই থেমে থাকেননি। তিনি সুরাটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কারখানার জন্য মোগলদের নিরাপত্তা চেয়েছিলেন। এক পর্যায়ে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য রক্ষী নিয়োগের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজের বীজ বপন করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা হিন্দুস্থানে মোগলদের মাহাত্ম্য এবং আরও পরে অক্ষমতার কারণে একচেটিয়া বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল।

আমি হিন্দুস্থানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সিপাহীদের দ্বারা সংঘটিত প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের যৎসামান্য এখানে তুলে ধরেছি। কারণ, আমার সফরের এই বর্ণনার বহু জায়গায় হিন্দুস্থানের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনায় বার বার এ প্রসঙ্গ উঠে আসবেই। কারণ, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর হতেই হিন্দুস্থানের সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে দ্রুত পরিবর্তন আসছিল। মে ১০, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে, পলাশীর প্রান্তরে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের ঠিক একশ' বছর পর, স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের যে প্রচেষ্টা হয়েছিল তা শেষ হয় সিপাহী বাহিনীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। জুন ২০, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক দিল্লীর লালকেল্লা দখলের পরই সিপাহীদের মনোবল ভেঙে যায়। পুরো হিন্দুস্থান ইংরেজ শাসনে থাকে আরও নব্বই বছর। ঔপনিবেশিক শাসনের কুফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিফলন হয় ভারত বিভক্তির মধ্য দিয়ে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতার এই যুদ্ধে আরও অনেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তবে তাদের মধ্যে তিনটি নাম উল্লেখ না করলেই নয়। এদের মধ্যে দু'জন ঝাঁসীর রাণীর মত রমণী রয়েছেন। এই তিনজন হলেন বখত খান, বেগম হযরত মহল এবং রামগড়ের রাণী অভন্তী বাঈলোধী।

বখত খান ছিলেন পশতু ভাষাভাষী ইসুফজাই গোত্রের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনা সদস্য। তিনি বেঙ্গল আর্টিলারিতে যোগ দিয়েছিলেন পরে সুবেদার পদ পর্যন্ত উন্নীত হন। বখত খান বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মিরাটে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদানের ঘোষণা করেন। তিনি সিপাহীদের নিয়ে দিল্লী পর্যন্ত এসেছিলেন। ততদিনে সিপাহীরা দিল্লীতে বাহাদুর শাহ জাফরকে হিন্দুস্থানের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাহাদুর শাহ জাফর বখতখানকে দিল্লী অঞ্চলের কমান্ডার নিযুক্ত করে 'সাহিবে আলম বাহাদুরের' খেতাব দিয়েছিলেন। বখত খান শেষ সময় পর্যন্ত বাহদুর শাহ জাফরের সাথে ছিলেন। সেপ্টেম্বর ২০, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর শাহ জাফর মেজর হাডসনের কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিলে বখত খান ঘোর আপত্তি জানালেও বাহাদুর শাহ তার অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি বা করেননি। বাহাদুর শাহর আত্মসমর্পণের পর বখতখান হুমায়ূন সমাধি থেকে পালিয়ে লক্ষ্মৌতে সিপাহীদের সাথে যোগ দিয়ে এক যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হন। তিনি ওই আঘাতেই নেপালের নিকটবর্তী তারাই-এর জঙ্গলে মৃত্যুবরণ করেন।

বখতখান ছাড়াও আর দু'ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দু'জন রমণী। ঝাঁসীর রাণীর মত ততটা চর্চিত না হলেও ইতিহাস এ রমণীদের স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

তাঁদের একজন ছিলেন 'ওউদ' এর শেষ নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ-এর পত্নী বেগম হযরত মহল। নবাবের ঘরে বেগম হযরত মহলের ঔরসে এক পুত্র সন্তান বিরিজ কাদরা জন্মগ্রহণ করবার কয়েক বছর পর এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে 'ওউদ' দখল করবার পূর্বে ওয়াজেদ আলী শাহ পত্নী হযরত মহলকে তালাক দিয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 'ওউদ' দখল করবার পর নবাবকে বাংলায় নির্বাসনে পাঠালে বেগম হযরত মহল লক্ষ্মৌতেই সিপাহী বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে পুত্রকে 'ওউদ'-এর নবাব হিসেবে ঘোষণা দিলে সিপাহীদের সমর্থন পান। তিনি ওই সময়ে যুদ্ধরত অন্যান্য নেতা, 'নানা সাহেব' এবং তানতিয়া তোপের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করেন। ব্রিটিশ জেনারেলরা বেগম হযরত মহলকে বহু ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বললেও তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। এমনকি বছরে ১২ লাখ রুপির অবসর ভাতার প্রস্তাব দিলেও তিনি প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধ চালিয়ে যান। অবশেষে ইংরেজ বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে পিছু হটে নেপালে আশ্রয় চাইলে প্রথমে অসম্মতি

www.pathagar.com

জানালেও পরে নেপালের প্রধানমন্ত্রী রানা জং বাহাদুর বেগম হযরত মহলকে আশ্রয় দিতে সম্মত হন। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সবার অগোচরে নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অনাড়ম্বর কবর কাঠমুন্ডুর জামে মসজিদ চত্বরে এখনও রক্ষিত আছে। আমি দু'বার নেপালে গিয়েছিলাম। কিন্তু সময়ের অভাবে এই মহিয়সী নারীর কবরে ফাতেহা পাঠ করতে পারিনি।

এই মহিয়সী নারীকে সম্মানীত করতে উত্তর প্রদেশ সরকার আগস্ট ১৫, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন 'ওউদের', বর্তমানে উত্তর প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্মৌতে ব্রিটিশদের স্থাপিত ভিক্টোরিয়া পার্কের নাম পরিবর্তন করে "বেগম হযরত মহলবাগ" নামে নামকরণ করে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বেগম হযরত মহলের স্মরণে মে ১০, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্মরণিকা ডাক টিকেট বাজারে ছেড়েছিল। অনেক পাঠকের হয়ত মনে থাকবে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় 'ওউদ'-এর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ-এর শেষ দিনগুলোর উপর ভিত্তি করে বিখ্যাত ছায়াছবি "সতরঞ্জ কি খিলাড়ী" বানিয়েছিলেন।

অপর রমণী নেত্রী রাণী অভন্তী বাঈলোধী ছিলেন তৎকালীন রামগড় এস্টেটের (বর্তমান ঝাড়খন্ড) শাসক রাজা বিক্রমাদিত্য সিং-এর বিধবা পত্নী। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর তাঁর দুই নাবালক পুত্র আমান সিং এবং শের সিংকে কোম্পানির রাজ উত্তরাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করলে রাণী নিজেই শাসনভার গ্রহণ করেন। ঘোর ইংরেজ রাজ বিরোধী রাণী নিজে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিপাহীদের নেতৃত্ব দেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কোম্পানির সেনারা তার দুই পুত্রকে হত্যা করলেও রাণীকে বশে আনতে পারেনি। প্রথমে কোম্পানি বাহিনীর পরাজয় হলেও পরবর্তীতে কোম্পানি বাহিনী অধিক শক্তি সহকারে পাল্টা আক্রমণ করলে ক্রমেই অভন্তীর সিপাহীরা পিছু হটতে থাকে। এক পর্যায়ে পরাজয় এড়াতে রাণী অভন্তী বাঈ তার সৈনিকদের নিয়ে দেভারিগড়ের জঙ্গলে আশ্রয় নেন। এক পর্যায়ে কোম্পানি বাহিনী দিভারিগড় অবরোধ করে রাণীকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানালে স্বাধীনতার এ বীর রমণী সেনানী আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে নিজের আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে নিজের তরবারী দ্বারা আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর সময় তিনি বলেন যে, জীবন থাকতে তিনি শত্রুর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে চাননি। রাণী অভন্তী বাঈ স্বাধীনতায় আত্মাহুতি দেয়া অন্যান্য রমণী নেত্রীদের কাতারে থেকে ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। ভারত সরকার বেগম হযরত মহলের মত রাণী অভন্তী বাঈ-এর স্মরণে ১৯৮৮ এবং ২০০১ খ্রিস্টাব্দে স্মারক ডাক টিকেট অবমুক্ত করেছে।

আমি যে কয়েকজনের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম এরা ছাড়াও জাতি-

www.pathagar.com

ধর্ম নির্বিশেষে বহু নেতৃস্থানীয় হিন্দুস্থানী ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অনেকেরই নাম ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে যেমন রয়েছে মঙ্গলপান্ডের মত অনেকে।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহীদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাকে সাড়া দিয়েছিল সাতটি স্বশাসিত রাজ্য আর তৎসময়ের বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। কিন্তু সিপাহীদের পরাজয় আর ব্রিটিশ বাহিনীর দিল্লী দখলের পরে তৎকালীন ব্রিটিশ সম্রাজ্যের কলুষিত চেহারা উন্মোচিত হয়। সমগ্র হিন্দুস্থানে হাজার হাজার সৈনিক, শত শত সাধারণ নাগরিক এবং বনেদী পরিবারের সদস্যদের ফায়ারিং স্কোয়াড, ফাঁসি, বেয়োনেট চার্জ এবং কামানের মুখে বেঁধে মারা হয়। বিশেষ করে মোগল বংশের এবং রক্তের সাথে সম্পর্ক ছিল এমনদের বের করে হত্যা করা হয়। এদের বেশির ভাগের সৎকারও করা হয়নি বরং বধ্যভূমিতে ফেলে রাখাতে মরদেহ শকুনে, চিলে আর শৃগাল খেয়েছে। হিন্দুস্থানের বিভিন্ন শহরে, বিশেষ করে রাজধানী দিল্লীতে, বহু ইমারত গুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। গুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল আগ্রা আর দিল্লীর লাল কেল্লাসহ বহু দুর্গের দর্শনীয় বহু নিদর্শন। গুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল নবাব আর মোগল ওমরাহদের মহল। মোগল আর নবাব পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে পথের ভিখারী বানানো হয়েছিল তাঁদের পরিবার এবং উত্তরাধিকারীদের। বহু যুবতীকে পতিতালয়ে বিক্রি করা হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকদের প্রয়োজনাতিরিক্ত আক্রোশ ছিল মুসলমানদের উপর। দিল্লীর বহু মসজিদ তখন গুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। মসজিদসহ বহু মোগল সমাধির মূল্যবান সম্পদ লুট করে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের কাছে। এমনকি দিল্লীর জামে মসজিদ গুড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করা হলেও এর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাবের কথা চিন্তা করে অক্ষত রাখলেও প্রায় দু'বছর ঘোড়ার আঁস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। দিল্লী জয়ের কথিত নায়ক মেজর হাডসনের বর্বরতার কাহিনী ইতিহাসে ব্রিটিশ রাজের কলঙ্কের অধ্যায় হয়ে রয়েছে। অথচ ওই সময়ে তার বর্বরতাকে সমর্থন করে জেনারেল মন্টোগমারীর মত উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ অফিসার হাডসনকে লিখেছিলেন "মোগলদের শেষ সম্রাটকে ইঁদুরের মত গর্ত থেকে বের করবার এবং তার বংশকে ধ্বংস করবার জন্যে আমি আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে আপনি এ ধরনের আরও মহৎ কাজ করবেন।" এই ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ রাজের তথা ইউরোপীয় সভ্যতার বীভৎস রূপ।

আমি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন অনুগত সুবেদারের সিপাহী পুত্রকে তারই উপস্থিতিতে ফায়ারিং স্কোয়াডে কিভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার বিবরণ পড়েছিলাম। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে অনূদিত "সিপাহী টু-সুবেদার" এর মূল ডাইরি লেখক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওই সময়কার '৬৯ বেঙ্গল নেটিভ ইনফেনট্রির' সুবেদার সীতারামের

www.pathagar.com

নিজের একমাত্র পুত্র অনন্তি রামের ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি তুলে ধরছি। সীতারাম লিখেছেন "আমি বহু অনুনয় বিনয় করেও আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা করতে না পেরে ফায়ারিং স্কোয়াডের ডিউটি হতে অব্যাহতি চেয়ে প্রথমে হতাশ ও পরে মেজর সাহেবের কৃপায় অব্যাহতি পেয়েছি। আমি কিভাবে আমার পুত্রের হন্তা হতে পারি এ কথা বুঝাতে পারাতে এবং কোম্পানির প্রতি আমার আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ মেজর সাহেব আমাকে দয়া করে ফায়ারিং স্কোয়াডের ডিউটি থেকে অব্যাহতি দিলেন। পরের দিন ভোরে আমার পুত্রসহ অনেক সিপাহীকে শুধুমাত্র সন্দেহের বশে ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাওয়া হয়। এদের কোন বিচারও হয়নি। আমি ব্রাহ্মণ। সকালে আমার তাঁবুতে মাথা গুঁজে মন্ত্র জপ করছিলাম। শুনলাম গুলির ঝাঁকের শব্দ। অনেকের সাথে আমার পুত্র তখন মৃত। আমাকে দয়া করে সাহেবরা আমার চল্লিশ বছরের চাকুরির প্রতিদান হিসেবে পুত্রের মৃতদেহ সৎকারের সুযোগ দিয়েছিল। অন্যদের ভাগ্য তেমন সুপ্রসন্ন হয়নি। তাদের মৃতদেহ সৎকার হয়নি। ফেলে রাখা হয়েছিল চিল, শকুন, আর শৃগালের খাবার হিসেবে। আমার মেজর সাহেব পরে খুব অল্প সময়ে জেনারেল হয়েছিলেন।" তিনি হলেন তৎকালীন মেজর জেনারেল জেমস থমাস নরগেট, সীতারামের ডাইরির অনুবাদক, ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। সীতারাম কোম্পানি বাহাদুরের সিপাহী হতে সুবেদার হিসেবে আটচল্লিশ বছর চাকুরির পর ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে অবসরে যান। সীতারাম, কোম্পানির একনিষ্ঠ সৈনিক, বৃদ্ধ বয়সে দুঃখ করে বলেছিলেন যে, তিনি কোম্পানি বাহাদুরের নৃশংসতার এমন নগ্নরূপ কখনও দেখেননি।[২]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের হিন্দুস্থানকে ব্রিটিশ দখলদারিত্ব মুক্ত করতে সিপাহীরা যে প্রচেষ্টা নিয়েছিল তাতে হিন্দু-মুসলমানদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছিল। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে ঘোষণা দিয়েছিল। ছোটখাটো বিরোধ থাকলেও সিপাহীদের একটি পরিচয় ছিল যে তারা হিন্দুস্থানী। এ যুদ্ধে একদিকে যেমন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ঝাঁসীর রাণী, নানা সাহেব, মংগল পান্ডে, তানতিয়া তোপে, অপরদিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মীর্জা মোগল, আফজাল খান, বখত খান এবং বেগম হযরত মহলের মত দেশপ্রেমী ব্যক্তিরা। এই একতার বিষয়টি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভবিষ্যতে এই দুই ধর্ম যাতে একতাবদ্ধ হতে না পারে সে লক্ষ্যেই ধর্মের আর গোত্রের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা হয়েছিল। তবে ঔপনিবেশিক শক্তির, প্রথমে কোম্পানির পরে বৃটিশ রাজ্যের খড়্গ পড়েছিল মুসলমানদের উপরে বেশি। যার প্রেক্ষিতে বাহাদুর শাহ জাফরের দেশান্তরিত হওয়া এবং দৃশ্যপট হতে মোগল শক্তির অপসারণ করা হয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের

২। *Sita Ram "Sepoy to Subedar" (Translated): PP 168-169: Vikas Publications (1970) New Delhi.*

www.pathagar.com

পরবর্তী দু'বছর মুসলমানদের জন্য দিল্লী অবরুদ্ধ থাকে। মুসলমানদের সাথে ব্রিটিশ রাজের বিমাতাসুলভ আচরণের কারণেই মূলত ব্রিটিশ ভারতে ধর্মীয় বিভাজন তৈরি হয়, যার পরিণতি হয়েছিল ভারত বিভাজন।

দিল্লী বিমান বন্দরে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হয়েছিল বাংলাদেশ দূতাবাসের কয়েকজন কর্মকর্তা। ইন্দিরা গান্ধী বিমান বন্দর বেশ বড় সুপরিসর। চকচকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও গোছানো। বিমান বন্দরের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত চমৎকার। প্রথমে আমাদেরকে স্বাস্থ্য কর্মীদের মুখোমুখি হতে হল। কারণ, সে সময় সোয়াইন ফ্লু-এর আতঙ্ক সমগ্র বিশ্বে। কিছুক্ষণ জেরার পর একটি হেলথ কার্ড পূরণ করে ওই কর্মকর্তার হাতে ফেরত দিতে হল। আমার সাথে আমার সহধর্মিণীও ছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আজমীরে হযরত মঈনউদ্দিন চিশতীর দরগাহ জিয়ারত করা। আমরা আগেই পরিকল্পনা করেছিলাম যে দিল্লীতে প্রথমে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার জিয়ারত করব দুপুরের দিকে এবং ওখানকার করিমস্ রেস্টুরেন্টে দুপুরের আহারটাও সেরে নেব।

প্রায় আধা ঘণ্টা পর বিমান বন্দরের করণীয় সেরে আমরা 'বসন্ত বিহার' নামক দিল্লীর অভিজাত এলাকায় অবস্থিত হোটেল জয়পী ইন্টারকন্টিনেন্টালের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আমাদের সাথে ছিলেন বাংলাদেশ মিশনের রাজনৈতিক কাউন্সিলর মাশফি বিনতে সামস্। মাশফি সম্পর্কে আমার সহধর্মিণীর আপন বোনের মত। অপরদিকে মাশফির বাবা মি: সামসুদ্দোহা, আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি তিনি– বাংলাদেশের রেলওয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রথম জেনারেল ম্যানেজার। আমার বিবাহে তিনি উকিল ছিলেন। আমি লাহোর থেকেই এ পরিবারের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম, এশিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সরকারি সফরের সময়ের পর, আমি ও আমার সহধর্মিণী দিল্লীতে কয়েক দিন এ পরিবারের সাথে কাটাবো। মাশফি ওই সময়ে সর্বতোভাবে আমাদের সহযোগী হয়েছিল। আমরা ঘরোয়া পরিবেশে দেশের বাইরে কয়েকদিন থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছিলাম।

আমরা যখন হোটেলে পৌঁছলাম সেখানে অভ্যর্থনার জন্য এশিয়া ফাউন্ডেশন দিল্লীর প্রতিনিধি হাজির থেকে পরের দিনের কর্মসূচি এবং জয়পুরে যাত্রার সময় জানিয়ে দিয়ে জয়পুর-রাজস্থানের কর্মসূচি হাতে দিলেন। একই সাথে জয়পুরে নির্বাচনের পরের দিন, অর্থাৎ ৮ মে, ২০০৯ এ, জয়পুর হতে আজমীর যাবার ও রাতে থাকার ব্যবস্থাসহ দিল্লী ফেরবার কর্মসূচিও জানিয়ে দিলেন। আমার সফরসঙ্গী ছহুল হুসাইন আমার সাথে আগ্রা যাবারও ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। দিল্লী-জয়পুর আসব অথচ আগ্রায় ইতিহাসের অধ্যায়ের নিদর্শন দেখব না এমন হতে পারে না। বিশেষ করে বিশ্বের অন্যতম আশ্চর্য 'তাজমহল' দেখা না হলে দিল্লী পর্যন্ত আসা অন্তঃসার শূন্য হবে। কাজেই আগেই নির্ধারণ করেছিলাম আমি আগ্রায় একদিনে যতদূর সম্ভব 'তাজসহ' অন্যান্য স্থানগুলোও

www.pathagar.com

দেখতে চাইব। দিল্লীর বিষয়টি তো রয়েছেই। ওই ক'টা দিন আমি যত সংক্ষেপেই হোক ইতিহাস নিয়ে থাকতে চাইব।

আমরা প্রথম দিন দিল্লীতে যেখানে ছিলাম, 'বসন্ত বিহার', নতুন দিল্লীর অত্যন্ত হালের আবাসিক অঞ্চল। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে অতি সন্নিকটে। এ স্থানটি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে উঠে। আগে জায়গাটি কৃষি অঞ্চল 'মনিরকা' এবং 'বসন্ত' গ্রাম হিসেবে অধিক পরিচিত ছিল। এখন তা দেখে তা বুঝবার উপায় নেই। বিখ্যাত জওহর লাল বিশ্ববিদ্যালয়ও (জেএনইউ)-এর অতি সন্নিকটে। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত উচ্চ মধ্যবিত্তের আবাসিক এলাকা আর কে পুরাম-এর কাছাকাছি। 'আর কে পুরাম' ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বেশির ভাগ কর্মকর্তার বাসস্থান। বসন্ত বিহারের দু'দিক দিয়ে গিয়েছে দিল্লীর আউটার রিং রোড। তিনটি প্রধান সড়ক বসন্ত বিহারকে তিনটি সেক্টরে ভাগ করেছে। এ তিনটি সড়ক হল 'পূরবী মার্গ' 'পশ্চিমী মার্গ এবং মুনিরকা মার্গ'। দিল্লী পাবলিক স্কুল জুনিয়র সেকশন এখানে অবস্থিত।

আমরা বসন্ত বিহারের যে হোটেলে এক রাত থেকে পরের দিন জয়পুরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলাম সে হোটেলটি বিমানবন্দর হতে মাত্র ৮ কিঃ মিঃ এবং দিল্লী রেলওয়ে স্টেশন হতে ১৪ কিঃ মিঃ দূরত্বে অবস্থিত।

হোটেল কক্ষে গিয়ে কাপড় পরিবর্তন করে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক দুপুরের খাবার বিখ্যাত করিমস্ রেস্তোরাঁয় খেতে এবং আহার পূর্বে যোহরের নামাজ এবং হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগায় জিয়ারত করতে হাইকমিশনের জনাব সানাউল্লাহকে গাইড হিসেবে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বের হতেই দেখা হল পূর্ব পরিচিত নেপালের দুই নির্বাচন কমিশনার যারা পর্যবেক্ষক দলে যোগ দেবার জন্যে কাঠমুন্ডু থেকে পৌঁছেছিল মাত্র।

দু'জনই কুশল বিনিময়ের পর জানালো যে তারা ২০০৮-এর ডিসেম্বরে আমাদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে ঢাকায় এসেছিলেন। শুধু তারাই নয় এসেছিলেন নেপালের প্রধান নির্বাচন কমিশনারও। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে নেপালের নির্বাচনে আমি ও ছহুল হুসাইন চার সদস্যের দল নিয়ে কাঠমন্ডুতে গিয়েছিলাম নেপালের নির্বাচন প্রত্যক্ষ করতে। নির্বাচনটি অত্যন্ত ভাল এবং নির্ভেজাল হয়েছিল। অনেকেরই আশঙ্কা ছিল যে নেপালে মাওবাদী আন্দোলন শেষ হলেও দশ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসানের অল্প কিছু দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ব্যাপক গোলযোগ হতে পারে কিন্তু তেমনটি হয়নি। ওই নির্বাচনে মাওবাদীরা জয়ী হয়ে পুষ্পকুমার দাহাল ওরফে প্রচন্ডর নেতৃত্বে সরকারও গঠিত হয়েছিল। অবসান হয়েছিল নেপালে আড়াই শ' বছরের রাজতন্ত্রের। কিন্তু পুষ্প কুমার দাহালের সরকার বেশি দিন টেকেনি নেপালের সেনাপ্রধান জেনারেল কাটওয়ালের সাথে প্রধানমন্ত্রীর মতানৈক্যের কারণে। এমন যে হবে তা আমি আঁচ

www.pathagar.com

করতে পেরেছিলাম এবং দৈনিক 'প্রথম আলোতে' এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধও লিখেছিলাম। মতানৈক্য ছিল মাওবাদী ক্যাডারদের নেপালের সেনাবাহিনীতে আত্মীকরণ নিয়ে। সেনাপ্রধান যোগ্যতার প্রশ্নে বেশির ভাগ সদস্যকে নিতে অস্বীকার করেন। মাওবাদী নেতা এ অস্বীকারকে শান্তি চুক্তির বরখেলাপ বলে অভিহিত করে সেনাপ্রধানকে বরখাস্ত করবার জন্য মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবে সে সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতি নাকচ করার প্রতিবাদে প্রচণ্ড পদত্যাগ করেন। তিনি এর পেছনে ভারতের ষড়যন্ত্র ছিল বলে মন্তব্যও করেছিলেন।

নেপালের দু'জন কমিশনারই বিষয়টিকে দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছিলেন। দু'জন কমিশনারই বাংলাদেশের নির্বাচনকে তৃতীয় বিশ্বের মডেল নির্বাচন বলে আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাদের সাথে কুশল বিনিময় করে আমরা নিজামউদ্দিনের দরগার দিকে রওয়ানা হলাম। দিনটি ছিল সোমবার।

www.pathagar.com

দুই

'হনুজ দিল্লী দূর আস্ত'

আমরা তিনজন জনাব সানাউল্লাহর সাথে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগার (মাজার) উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। দরগাটি দিল্লীর অন্যতম দর্শনীয় স্থান এবং পর্যটকদের জন্য অবশ্য দর্শনীয়। মোগল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনকারী সম্রাট বাবরের পুত্র হুমায়ুনের সমাধির সন্নিকটে নিজামউদ্দিন দরগা। হুমায়ুনের সমাধি দিল্লীর পূর্বপ্রান্ত এলাকায়। মাত্র কয়েক বছর পূর্বেও হুমায়ুনের সমাধিটি অযত্নে রক্ষিত ছিল। সে অবস্থা এখন আর নেই। সমাধিটি 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে এবং সমাধি চত্বর উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য আগা খান ফাউন্ডেশন ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য দিয়েছে।

নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগা শুধু ভারতেই নয় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার সকল সম্প্রদায়ের পবিত্র স্থান হিসেবে খ্যাত। উপমহাদেশের মুসলমানরা পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে এ সূফী আউলিয়ার দরগা জিয়ারত করে থাকেন। তিনি চিশতিয়া 'ফিরকার' একজন বড় মানের সূফী সাধক। মাজারটি উত্তর দিল্লীতে। এই সাধকের নামে সন্নিকটেই রয়েছে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া রেলওয়ে স্টেশন।

হযরত খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া উত্তর প্রদেশের বাদায়ুন-এ স্থানটি এখন পূর্বদিল্লীতে, ১২৩৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তখন এ অঞ্চল ছিল গহীন জঙ্গল। নিজামউদ্দিন আউলিয়া পরিণত বয়সে যখন সাধক হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেন, তখন দিল্লীর সালতানাতে খিলজি বংশের পতন আর মোগলদের উত্থানের সময়।

খিলজিদের পরেই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য খিলজিদের দাস বলে পরিচিত তুঘলক শাসন কায়েম হয়েছিল। এ বংশের শাসনের গোড়াপত্তন করেন গিয়াসউদ্দিন মোহাম্মদ তুঘলক। যিনি দিল্লীর মেহেরুনী হতে রাজধানী সরিয়ে বর্তমানে দিল্লীর অদূরে তুঘলকাবাদ-এ স্থাপনা করেন। বিশাল এ পাহাড়ি এলাকায় পাথর দিয়ে তৈরি করা হয় বিরাট দুর্গ যা এখন প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। অযত্নে অবহেলায় রয়েছে তুঘলকাবাদ। বিশাল দুর্গের একপ্রান্তে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সমাধি। খুব বেশি পর্যটকের আনাগোনা রয়েছে বলে মনে হয় না। সাধারণ পর্যটকদের আকর্ষণ না করলেও ইতিহাসের ছাত্র এবং গবেষকদের নিশ্চয়ই আকৃষ্ট করে তুঘলকাবাদ। আমি

www.pathagar.com

দেখতে গিয়েছিলাম ইতিহাস খ্যাত তুঘলকাবাদ। তুঘলকি কারবার বলে বাংলাতে যে উক্তি ব্যবহার হয়ে থাকে, তার উৎপত্তিও গিয়াসউদ্দিনের পুত্র মুহাম্মদ বিন তুঘলকের খামখেয়ালিপনা থেকে। কয়েকবার রাজধানী দিল্লী এবং তুঘলকাবাদ এর মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে। কয়েক দফা হয়েছে সুলতানের মুদ্রার পরিবর্তনও। এ সবই হয়েছে আকস্মিক। শাসকের খামখেয়ালিতে। যা স্বৈরতন্ত্রের উদাহরণ। কথিত আছে আফগান আর পাঠানদের আক্রমণে তুঘলকরা তটস্থ হয়ে থাকত। তুঘলক শাহী এ সব আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে গড়ে তুলেছিল এ বিশাল প্রাচীরের শহর। খিলজিরাও সর্ব সময় আতঙ্কিত থাকত আফগান আর পাঠানদের আক্রমণের আশঙ্কায়। তুঘলকাবাদ নিয়ে ইতিহাসে উপাখ্যান রয়েছে। খিলজি বংশের প্রায় শেষের দিকে দিল্লীর সুলতান ছিলেন মোবারক খিলজি। একদা তিনি তার নফর (ক্রীতদাস) গাজী মালিককে নিয়ে দিল্লীর অদূরে জঙ্গলে ঘেরা পাহাড় অঞ্চলে শিকারে বের হন। পাহাড়টি ছিল শক্ত পাথরের। গাজী মালিক তার মনিব মোবারক খিলজিকে পরামর্শ দিলেন যে, আফগান এবং মোঙ্গলদের আক্রমণ ঠেকাতে এ পাহাড় অঞ্চলে বিশাল দুর্গ গড়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার। সুলতান তার নফরের কথা শুনে কিছুটা তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিলেন যে, তিনি কোনভাবেই এ ধরনের খেয়ালীপনার সাথে সায় দিতে পারেন না। তবে তার নফর যদি কোনদিন দিল্লীর তখতে তাউসে বসে, সে ইচ্ছা করলে এখানে নতুন জনপদ গড়ে দুর্গ গড়ে তুলতে পারে। সে দিন হয়ত মোবারক খিলজি জানতেন না যে, কয়েক বছরের মাথায় তারই নফর তার মৃত্যুর পর দিল্লীর সুলতান হতে যাচ্ছে এবং গোড়াপত্তন হবে ইতিহাসে পরিচিত তুঘলকাবাদের। খিলজি বংশের শেষ সুলতানের মৃত্যুর পরপরই ১৩২১ খ্রিস্টাব্দে গাজী মালিক গিয়াসউদ্দিন মোহাম্মদ তুঘলক নাম ধারণ করে তুঘলক বংশের গোড়াপত্তন করেন। তুঘলক সুলতানদের শাসনকাল ছিল ১৩২১-১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এর মধ্যে বহু অভাবনীয় ঐতিহাসিক ঘটনার জন্ম হয়েছিল।

একদা মোবারক খিলজি তার নফরকে তাচ্ছিল্য করে যা বলেছিলেন গিয়াসউদ্দিন সে কথা মনে রেখেছিলেন। দিল্লীর সুলতান হবার সাথে সাথে প্রথম যে কাজটি গিয়াসউদ্দিন করেছিলেন, সেটি ছিল রাজধানীর পরিবর্তন এবং ওই পাহাড়েই তিনি চার বছর নির্মাণের পর গড়ে তোলেন তুঘলকাবাদ দুর্গ। এ দুর্গ তৈরি হয়েছিল ১৩২১-২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। প্রায় ১০ মিঃ পুরু পাথরের দেয়ালে ঘেরা এ দুর্গ শহর যার উচ্চতা ১৫২০ মিঃ। বিশাল পাথরের সমাহারে নির্মিত এ দুর্গের বাসিন্দারা বেশি দিন তাদের রাজত্ব ধরে রাখতে পারেনি। অহরহ মোকাবেলা করতে হয়েছে পাঠান আর আফগানদের দিল্লী দখলের অভিযান। একই সাথে মোকাবেলা করতে হয়েছে মোগলদের আক্রমণ আর প্রশমিত করতে হয়েছে প্রান্তের বিদ্রোহ। মোগলদের আক্রমণ যে নৃশংসতার সাথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক মোকাবেলা করতেন তার বর্ণনা

www.pathagar.com

লোমহর্ষক। কথিত আছে যে, শত্রু ছাউনিতে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য তিনি শত্রু পক্ষের সৈনিকদের মস্তক ধর হতে বিচ্ছিন্ন করে পিরামিড আকারের স্তূপ তৈরি করে রাখতেন। হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করে মারার ভয়াবহ চিত্র আজও বহু পুস্তক-পুস্তিকায় সন্নিবেশিত রয়েছে।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সমাধি তুঘলকাবাদের সন্নিকটে বর্তমানে একটি মহাসড়ক দ্বারা বিভক্ত।

আমি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার প্রসঙ্গে খিলজি এবং তুঘলকাবাদের বিষয়টি নিয়ে এসেছিলাম। কারণ, তুঘলকাবাদ দেখবার ইচ্ছা অনেকেই করেন না যদিও এখানে ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস এবং কিছুটা অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হিসেবে প্রায় ৭ শত বছরের পুরাতন দুর্গ দাঁড়িয়ে আছে। তুঘলকাবাদকে ঘিরে এবং এর সাথে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার যে বিবাদ কথিত রয়েছে তার কিছুটা পাঠকদের কাছে তুলে ধরব বলেই তুঘলকাবাদের কাহিনী তুলে ধরলাম।

তুঘলকাবাদ-এর পত্তন যে বছর শেষ হয়, ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে, ওই বছরের এপ্রিল ৩, ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দেই নিজামউদ্দিন আউলিয়া মৃত্যুবরণ করেন। হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সাথে তুঘলকদের কিছুটা বিবাদ ছিল বলে কথিত রয়েছে। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার অনুসারীরা বিশ্বাস করেন যে, তুঘলকদের পতন কোন বাইরের শক্তির কারণে হয়নি বরং এ পতনের কারণ হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া সূফী সাধকের মনঃকষ্ট এবং এক ধরনের অভিশাপ।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক-এর সাথে এই সূফী সাধকের মতানৈক্য ক্রমেই বাড়ছিল। সূফী সাধক গিয়াসউদ্দিনের নৃশংসতা এবং ক্ষমতার উন্মাদনাকে মেনে নিতে পারেননি। অপরদিকে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার ধর্ম-বর্ণ-উঁচু-নিচু নির্বিশেষে গগনচুম্বী জনপ্রিয়তা সুলতানকে ঈর্ষান্বিত করে তুলছিল। এমনকি গিয়াসউদ্দিন তার লোকদের নিজামউদ্দিন আউলিয়ার পুকুর খুঁড়তেও বাধা প্রদান করেছিলেন। সুলতানের কড়া নির্দেশে তার প্রজাদের অনেকেই আউলিয়ার কাজে যোগ দিতে সাহস করতো না। অপরদিকে সুলতান তখন তুঘলকাবাদের দুর্গ তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন। কাজেই তার কাজ বাদ দিয়ে নিজামউদ্দিনের কাজকে প্রাধান্য দেয়া সুলতান পছন্দ করেননি। এক পর্যায়ে সুলতান আউলিয়াকে হত্যা করবার মনবাঞ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আউলিয়ার অনুসারীরা এ কথা সাধককে জানালে তিনি আমলে না নিয়ে একটি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। এদিকে সুলতান বিদ্রোহ ঠেকাতে রাজ্যের পর রাজ্যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সুলতান যখন সুবে বাংলার বিদ্রোহ দমন করে দিল্লীর পথে রওয়ানা হয়েছিলেন ওই সময় সুলতানকে উদ্দেশ্য করে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেছিলেন "হনুজ দিল্লী দূর আস্ত" (দিল্লী এখনও বহু দূরে)। সুলতানের ক্ষমতার দম্ভের

www.pathagar.com

কারণে ক্ষুব্ধ আউলিয়া তুঘলকাবাদ সম্বন্ধে বলেছিলেন, "ইয়া রহে উ-জাড় ইয়া বাছে গুজার" (হয় এ-এলাকা পরিত্যক্ত থাকবে অথবা এখানে বাস করবে গুজার।) হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার এ দুটি ভবিষ্যত বাণীই ফলেছিল। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দিল্লী ফেরত আসতে পারেননি। তিনি দিল্লীর অদূরে অভ্যর্থনার জন্যে তৈরি একটি মঞ্চে উঠতে গিয়ে মঞ্চ ভেঙে মারা যান। সন্দেহ করা হয় তার পুত্র মুহাম্মদ-বিন-তুঘলক ক্ষমতা দখল করবার জন্য এ হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছিলেন তার পুত্র। এরপর মুহাম্মদ বিন তুঘলক তুঘলকাবাদ ছেড়ে রাজধানী নিয়ে যান দক্ষিণাত্যের দৌলতাবাদ-এ। তুঘলকাবাদ পরিত্যক্ত হয়। এ পরিত্যক্ত তুঘলকাবাদ গুজর সম্প্রদায়ের পশু চরানোর ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

নিজামউদ্দিন আউলিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও বড় মাপের আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ভবিষ্যত বাণীর কারণ ছিল তুঘলকদের ক্ষমতার গর্ব। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দিল্লীর সুলতান হয়েছিলেন অত্যন্ত সাধারণ একজন ভৃত্য থেকে। কিন্তু তিনি তাঁর অতীত ভুলে গিয়ে যেভাবে ক্ষমতার গর্বে মেতে উঠেছিলেন তার প্রমাণ ছিল একজন সর্বধর্মীয় শ্রদ্ধার পাত্র সাধকের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া।

ক্ষমতার গর্ব বহু জনপদ আর সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছে। ধ্বংস করেছে বংশের পর বংশ। ইতিহাস ঘাটলে তার নজির পাওয়া যাবে। আজও আমরা এ বিষয়টি লক্ষ্য করছি এবং উপলব্ধি করছি। এখন হয়ত সুলতান আর সম্রাটদের যুগ নেই, কিন্তু রয়েছে নব্য আধুনিক আঙ্গিকের সুলতানরা। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারগুলোকে ক্ষমতার দাপট দেখাতে দেখা গিয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্য সর্বপ্রকার ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে থাকে নব্য তুঘলক অথবা নব্য রোমানরা। একবারও ভেবে দেখবার সময় হয় না যে, ভবিষ্যত অতীতের ঘটনাগুলোকে ভিন্নরূপে সামনে নিয়ে আসতে পারে। জনগণ ক্ষমতাবানদের দেখতে চায় অন্যরূপে, অমায়িক এবং ন্যায়পরায়ণ হিসেবে।

যাই হোক হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার এ ভবিষ্যদ্বাণী এবং এর ফলাফল আজও ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে উদাহরণ হয়ে রয়েছে। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় লোকসভায় প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর তৎকালীন বিরোধী দলীয় বিজেপির একজন সংসদ সদস্যের হিন্দুত্ব নিয়ে সগর্ব উক্তির জবাব দিতে গিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ লোকসভায় বিতর্ক হয়। ওই দিন পাঞ্জাবের এক সংসদ সদস্য মিঃ জগমিথা সিং বিজেপির মিঃ ধুমাল এর সর্গব বক্তব্যের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে ভারতের ইতিহাসে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার উক্তিগুলোর এবং তুঘলকদের পরিণতি লিপিবদ্ধ রয়েছে সেখান থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। বিজেপি যেভাবে হিন্দুত্বের ক্ষমতায় মত্ত হয়ে বাবরী মসজিদ ভেঙেছে সে ধরনের অজুহাত দেখিয়ে আগামীতে স্বর্ণ মন্দির,

www.pathagar.com

জামে মসজিদ এমনকি লাল কেল্লাও ভেঙে ফেলতে পারে। তারা এ সব করে ক্ষমতায়ও যেতে পারে তবে তাদের জন্যও ওই সূফী সাধকের উক্তি সত্য হতে পারে। বিজেপির জন্যও প্রযোজ্য "হুনুজ দিল্লী দূর আস্ত"। "আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেই না" এ কথা বলে বক্তব্য শেষ করেছিলেন জগমিথা সিং। বিজেপি এবারও ক্ষমতায় আসতে পারেনি। শোচনীয় পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছে।

আলোচনা হচ্ছিল তুঘলকদের নিয়ে। আমি বলেছিলাম 'তুঘলকি কারবার' বলে বচন এর কথা। এর পেছনে মুহাম্মদ বিন তুঘলকের খামখেয়ালীপনা ও অবিবেচক কর্মকাণ্ডই প্রধান। মুহাম্মদ বিন তুঘলক হঠাৎ করেই রাজধানী পরিবর্তন করে দক্ষিণে দেওগির ও বর্তমানে দৌলতাবাদ-এ নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হুকুম দিয়ে তুঘলকাবাদ-এর বাসিন্দাদের স্থানান্তর করেন। দু'বছর পর আবার রাজধানী দিল্লীতে ফিরিয়ে আনবার পথে শত শত বেসামরিক নাগরিককে প্রাণসহ সর্বস্ব বিসর্জন দিতে হয়। সাধারণ জনগণের কাছে এটা ছিল এক ধরনের পাগলামি। মোহাম্মদ বিন তুঘলক ঘন ঘন মুদ্রার পরিবর্তন করতেন। মুদ্রা পরিবর্তন তার বাতিক ছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন জনগণের ভোগান্তি তেমনি মুদ্রা জাল করবার ব্যাপক সুযোগও সৃষ্টি হয়েছিল। জাল মুদ্রার ছড়াছড়িতে অর্থনীতি ভঙ্গুর হয়ে যায়। এসব খামখেয়ালীপনা সত্ত্বেও মুহাম্মদ বিন তুঘলক যথেষ্ট মেধাবী ছিলেন।

তবুও গিয়াস উদ্দিনের পুত্র সুলতান মোহাম্মদ-বিন- তুঘলক একজন স্বৈরাচার হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত। মোহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালেই গজনী এবং কাবুল হয়ে, মুসলিম বিশ্বের, তথা বিশ্বভ্রমণের ইতিহাসের কিংবদন্তী, মরক্কোর অধিবাসী আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে বতুতা, যাকে মোহাম্মদ তুঘলক উপাধি দিয়েছিলেন সামস্উদ্দিন, দিল্লীতে পৌঁছেন। তিনি দিল্লীতে বেগমগঞ্জের 'জাহাপনায়' সুলতানের দরবারে পৌঁছলে সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলকে তার পরিচয়ে এবং জ্ঞান গরিমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তাঁর দরবারে কাজীর মর্যাদায় নিয়োগ দেন। তিনি (বতুতা) প্রায় চার বছর হিন্দুস্থানে কাটান। পরে সুলতান তাঁকে চীনের সম্রাটের দরবারে বহু উপঢৌকনসহ দূত হিসেবে পাঠান। ইবনে বতুতা চীনে পৌঁছাবার আগেই সুলতান চীন আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। ইবনে বতুতা ওই সময়ে বর্তমানে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে সোনারগাঁও এবং সিলেট সফর করেন। সিলেটে ইবনে বতুতার সাথে হযরত শাহজালালের (রঃ) কয়েকবার সাক্ষাৎও হয়।

দিল্লীতে সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলকের খামখেয়ালীপনা, তুঘলকি কারবার এবং ওই সময়কালের বর্ণনা পাওয়া যায় ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনী এবং তার রোজনামচা থেকে। ইবনে বতুতা তার লেখাতে তুলে ধরেছেন মোহাম্মদ বিন তুঘলকের দরবারের চিত্র– কিভাবে সুলতান প্রকাশ্যে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করে অভিযুক্তদের

www.pathagar.com

মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতেন। ইবনে বতুতার মতে মোহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি। তিনি বিশদ বিবরণ দেন কিভাবে সমগ্র নগরী এবং প্রদেশগুলোতে সুলতানের চরেরা প্রতিটি নাগরিকের উপর নজরদারী করত। বতুতা লিখেছেন, ওই সময়কার হিন্দুস্থানের কথা। তুঘলকের আমলে হিন্দুস্থানের ঐশ্বর্যের কথা। তিনি বিবরণ দিয়েছিলেন সুলতানদের দরবার ও প্রাসাদের জৌলুস আর সম্পদের। তাঁর মতে হিন্দুস্থান ছিল বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ। তৎকালীন দিল্লী সম্পর্কে বতুতা লিখেছিলেন, "দিল্লী একটি অপূর্ব শহর। সৌন্দর্য আর শক্তির পরিচয় এই শহর। এই দেয়াল ঘেরা শহরের তুলনা হয়না। দিল্লী শুধু হিন্দুস্থানেরই নয়, মুসলিম বিশ্বের (ওই সময়কার) সবচাইতে বড় শহর"।[১] এর পরেই তাঁর লেখায় মোহাম্মদ বিন তুঘলক-এর তুঘলকি কারবারে তাঁর অসন্তুষ্টি ফুটে উঠে।

ইবেন বতুতা মরক্কো থেকে বিশ্ব ভ্রমণে বের হন ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রায় ত্রিশ বছর বিশ্ব ভ্রমণের পর ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে যখন মরক্কোতে ফিরে যান, তখন ফেজ - এ (Fez) শাসক ছিলেন সুলতান আবু ইনান। ইবনে বতুতা প্রায় ৭৫,০০০ মাইল ভ্রমণ করেন। তিনি তাঁর সময়ের প্রায় সব মুসলিম শাসকের দেশ ভ্রমণ করেন।

তুঘলক শাসনের পুরোধা গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সমাধি আজও সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে তুঘলকাবাদের বাইরের দেয়ালের সন্নিকটে। এ সমাধি গিয়াসউদ্দিন নিজে তৈরি করেছিলেন তাঁর জীবদ্দশায়। তুঘলকদের পূর্বে এবং পরে মোগল সাম্রাজ্যের পত্তন পর্যন্ত ১১৯১ হতে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সালতানাত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তুঘলকাবাদ দিল্লীর চতুর্থ শহর।

আমরা হুমায়ুনের সমাধিকে ডানে রেখে প্রধান সড়ক মথুরা রোডের উপরে গাড়ি রেখে যখন হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারে যাবার জন্যে একটি চিকন গলিতে ঢুকলাম তখন যোহরের নামাজের ওয়াক্ত প্রায় শেষ। গলির একপাশে বেশ কিছু রেস্তোরাঁ, অপর পাশে একটি মসজিদ যেখানে বিভিন্ন দেশ হতে আগত মুসল্লিদের দেখা গেল। খাবারের দোকানগুলোতে বেশ ভিড়, বেশির ভাগই মাজারের দর্শনার্থী। সম্পূর্ণ এলাকাটা মুসলিম অধ্যুষিত। কিছু পরিচিত দৃশ্যও দেখা গেল। মসজিদের পাশে লাইন দিয়ে ভিক্ষুক বসা। বেশ কিছু বাঙালী ভিক্ষুকও দেখলাম। ভাবভঙ্গি আর ভিক্ষা করবার কায়দায় বুঝা গেল এদের বেশির ভাগই মুসলমান।

নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার বেশ খানিকটা ভেতরে। এগুতেই খাবারের দোকানগুলো থেকে ডাকাডাকি শুরু হয় গরীবদের খাবারের জন্য নিজামউদ্দিনের নামে

১। *ইবনে বতুতার প্রথম রচিত ভ্রমণকাহিনী বহু ভাষায় অনূদিত হয়। ইংরেজী অনূদিত বইয়ের নাম "Ibn Battuta Travels in Asia & Africa -1325-1345" তার পরবর্তী ভ্রমন কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায় "Voyage Ibn Battuta"-তে।*

www.pathagar.com

দান অনুদানের জন্য। বেশ কিছু টুপি পরা লোক এগিয়ে আসল আমাদের মোয়াল্লেম হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রত্যেকেই প্রধান খাদেমের কর্মকর্তা বলে দাবি করলেও আমাদের কাছে তেমন মনে হয়নি। তাছাড়া আমরা কাউকে নিতেও চাইনি। এখানে প্রতারিত হবার ব্যাপক আশঙ্কা থাকে। মাজার জিয়ারতকে কেন্দ্র করে কিছু সংখ্যক তথাকথিত খাদেমদের কর্মচারীরা ভাবাবেগে আপ্লুত জিয়ারতকারীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। মাজারের উদ্দেশে রওয়ানা হবার পূর্বেই আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম।

প্রধান গলি দিয়ে আরও কিছু দূর এগুতেই উন্মুক্ত আকাশের নিচে সামান্য একটু জায়গা ঘেরা দেয়া মার্বেলে বাঁধানো একটি কবর চোখে পড়ল। অযত্নে রাখা কবর চত্বরের পূর্বদিকে ছোট একটি ঘরের সামনে একটি সাইনবোর্ড লেখা 'মির্জা গালীব লাইব্রেরি'। অযত্নে অবহেলিত কবরটি ছিল উর্দু ভাষার অন্যতম এবং উপমহাদেশ খ্যাত কবি মির্জা আসাদুল্লাহ বেগ খান, যিনি মির্জা গালীব ছদ্মনামে অধিক পরিচিত। মীর্জা গালীব ডিসেম্বর ২৭, ১৭৯৫তে যখন আগ্রার তুর্কী বংশোদ্ভূত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হিন্দুস্থানে কিছু স্থানে তাদের রাজত্ব কায়েম করার প্রচেষ্টায়রত ছিল। গালীব যে অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন বর্তমান উত্তর প্রদেশ তখনও ওই অঞ্চল ছিল স্বাধীন, মোগলদের শাসনে। তিনি ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৮৬৯তে প্রায় ৭৪ বছর বয়সে যখন মারা যান তখন তিনি দিল্লীতে। গালীব ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছেন– দেখেছেন সিপাহী বিদ্রোহ, দেখেছেন অসহায় বাহাদুর শাহ জাফরকে। দেখেছেন হিন্দুস্থানে কোম্পানি রাজ হতে হাত বদলে ব্রিটিশ রাজ-এ পরিণত হতে। দেখেছেন ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী বাঈকে। প্রত্যক্ষ করেছেন, কত নির্মমতার সাথে দেশী সিপাহীদের প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলাতে।

১৮৫৭ তে চাঁদনীচক, উর্দুবাজার আর শাহজাহানাবাদ কোম্পানির বাহিনী যেভাবে ধ্বংস করেছিল তা গালীব অসহায়ের মত দেখেছিলেন। তিনি দুঃখ করে লিখেছিলেন, "হে আমার প্রিয় শ্রোতাগণ, উর্দুবাজারই যদি না থাকে তাহলে কোথায় যাবে উর্দু ? হে আল্লাহ্ দিল্লী শহরের অস্তিত্ব আর নেই। নেই সে শহরের দুর্গ, নেই সেই রমরমা, বাজার নেই সেই শহর যা আছে তা সেনা ছাউনী আর উদ্ধত সৈনিকের জুতার আওয়াজ।"

শুধু ধ্বংস আর বিগ্রহের অভিজ্ঞতাই নয় গালীব নিজে ছিলেন অত্যন্ত রোমান্টিক এবং আবেগপ্রবণ কবি। নিজের আর্থিক অবস্থা কখনই সচ্ছল ছিল না। আর তা নিয়ে ছিলেন বেপরোয়া। মদ আর নারীতে প্রবল আসক্তির কারণে তার আর্থিক অবস্থার কখনই উন্নতি হয়নি। মদ্যপানের সাথে জুয়া খেলারও বাতিক ছিল গালীবের। গালীবের চরিত্রের এ রূপ লুকানো ছিল না। এতসবের পরেও ওই সময়ে গালীব ছিলেন সবার

www.pathagar.com

প্রিয় সজ্জন ব্যক্তি; একজন বড় মাপের দার্শনিক কবি। কথিত আছে গালীবের মদ্যপ্রীতি এতই ছিল যে কোন এক মাহফিলে গালীব তার উপস্থিতি এবং কবিতা পাঠের বিনিময়ে বেশ কিছু অর্থ পেয়েছিলেন। ওই সবটুকুই তিনি মদ কিনতে খরচ করলেন এবং যখন বাড়িতে ফিরলেন তখন তার বেগম জানতে চাইলেন প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তিনি শুধু মদই কিনলেন, খাবেন কি? উত্তরে গালীব- বললেন, "আল্লাহতায়ালা রিজিক দেবার অঙ্গীকার করেছেন, মদের অঙ্গীকার করেননি তাই রিজিকের বিষয়টি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে মদ কিনেছি।"

মির্জা গালীব-এর শিক্ষা সম্বন্ধে তেমন কোন তথ্য নেই। তবে ওই সময় দিল্লীর বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম ছিলেন গালীব। বিয়ে করেছিলেন তৎকালীন নওয়াব পরিবারে অল্প বয়সে। তার বেগম সাত সন্তানের জন্ম দিলেও কেউই বেঁচে ছিল না। জুয়া খেলার অভিযোগে বহুবার কতোওয়ালীতে যেতে হয়েছে মির্জা গালীবকে। যেতে হয়েছে এক মহিলাকে উত্যক্ত করার অভিযোগেও। আজও দিল্লীর কতোওয়ালী পুলিশ স্টেশনে গালীবের এফআইআর (FIR) রক্ষিত রয়েছে। তিনি খুব একটা ধর্মপ্রাণ ছিলেন না। একবার এক অভিযোগে তাকে আদালতে হাজির করলে ইংরেজ বিচারক তাকে তার ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে গালীব বলেছিলেন, তিনি অর্ধেক মুসলমান। কারণ, তিনি একদিকে যেমন মদ্যপান করেন আবার নামাজও পড়েন। এমনই ছিলেন গালীব। মোগল বংশের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে নিয়ে তিনি অনেক কবিতা লিখেছিলেন। দোষে- গুণে ছিলেন গালীব এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। অবহেলায় জীবন কাটালেও তিনি ছিলেন উর্দু ভাষার অন্যতম কবি। তাঁর লেখনি দিয়ে উর্দু ভাষাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। আজ গালীবের কবিতা প্রকাশ যারা করছেন তারা হয়েছেন বিত্তশালী, কিন্তু গালীবের সমাধি রয়ে গেছে অবহেলিত। বহু মানুষকে গালীবের কবর পাশ দিয়ে হেঁটে মাজারের দিকে যেতে দেখলাম। কিন্তু তেমন কাউকে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে এ ক্ষণজন্মা কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেখলাম না। দিনটি ছিল সোমবার, তাই গালীবের লাইব্রেরিটিও ছিল বন্ধ। লাইব্রেরিতে যেতে ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারিনি।

গালীবের জীবন আর তার প্রণয়িনী বিখ্যাত গায়িকা ও নর্তকী চৌধভীকে নিয়ে উপমহাদেশে, বিশেষ করে পাকিস্তান এবং ভারতে, বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছিল। অতি সম্প্রতি ভারতের দূরদর্শনে গালীবের জীবনীভিত্তিক সিরিয়াল নির্মাণ করেছিলেন বিখ্যাত কবি, নাট্যকার ও গীতিকার গুলজার। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব নাসিরুদ্দিন শাহ্। ভারতে প্রথম ছবিতে প্রয়াত ভারত ভূষণ নাম ভূমিকায় ছিলেন আর চৌধভীর ভূমিকায় ছিলেন বিখ্যাত গায়িকা নায়িকা সুরাইয়া। তৎকালীন পাকিস্তানেও নির্মিত হয়েছিল গালীবকে নিয়ে চলচ্চিত্র।

গালীবের মত অনেক গুণী ব্যক্তি এখনও রয়েছেন যাদের জীবদ্দশায় আমরা

www.pathagar.com

সম্মান অথবা তাদের প্রাপ্য দিতে পারিনি অথচ মরণের পর তারা হয়ে যান অমর। তাদের স্মৃতিকে পুঁজি করে চলে দেদার ব্যবসা। গালীব আমাদের দেশে খুব চর্চিত নয়, তবুও তিনি বিশ্বের সাহিত্য জগতে কবিতা আর গজলের মাধ্যমে চিরস্থায়ী স্থান করে নিয়েছেন।

গালীবের সমাধির পাশ দিয়ে সরু একটি গলিতে ঢুকতে হয় মাজার চত্বরে যাবার জন্য। গলিটি সরু হলেও দু'পাশে প্রচুর দোকান। বেশির ভাগ দোকানেই মাজারে অর্ঘ দানের জন্য রাখা হয়েছে তাজা ফুল, বিশেষ করে গোলাপ আর বেলী। বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির দোকান। তজবি, তাবিজ, জায়নামাজ আর প্রচুর ক্যাসেটের দোকান, যেখানে পাওয়া যায় মাজার চত্বরে গাওয়া কাওয়ালী আর আমির খসরু এবং গালীবের গজল। পথে পথে দোকানীদের হাঁকডাক– ফুল, তাবারক আর মাজারে চাদর চড়াবার উপকরণ কিনতে। হাঁকডাক রীতিমত প্রতিযোগিতায় পরিণত হলেও টানাহেচড়ার পর্যায়ে যায় না। ওই গলির উত্তর দিকে ঘন বসতিপূর্ণ বসতবাড়ি। দৃশ্যত মনে হয় যথেষ্ট পুরাতন।

মাজার চত্বরে ঢুকতে হাতের দু'পাশে রয়েছে বহু বিখ্যাত ব্যক্তির কবর। প্রায় সব কবরই সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি, সুন্দর করে বাঁধানো। তবে মাজারের খাদেম ছাড়া এসব কবরের পরিচিতি পাওয়া দুষ্কর। দু'একটি বিখ্যাত ব্যক্তির কবর সম্বন্ধে পরে আসছি।

মাজার চত্বরে ঢুকতেই জুতা রাখতে গিয়ে পরিচিত হলাম দু'জন বাংলাদেশীর সাথে। এরা বহু বছর ধরে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারে জুতার তদারকি করে বিনিময়ে যতটুকু টাকা বা পয়সা দেয়া হয় তাই গ্রহণ করেন। আগেই বলেছি আমাদের সাথে হাইকমিশনের মিঃ সানাউল্লাহ ছিলেন। তিনি আমাদের আগমনের বার্তা আগেই দিয়ে রাখাতে একজন খাদেম আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে উত্তর দিকে নিয়ে আসলেন। তিনি জানালেন যে, তিনি বাংলাদেশের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের আমন্ত্রণে ঢাকা এসেছেন, আগামীতেও যাবেন। তিনি এ দরগাতে বাংলাদেশ থেকে যারাই আসেন তাদের দেখাশোনা করেন।

মাজার চত্বরের মুখেই আরেকটি মাজার চোখে পড়বে সেটি হযরত আমীর খসরুর। আমীর খসরু বাল্যকাল থেকেই নিজামউদ্দিন আউলিয়ার প্রধান শিষ্যে পরিণত হয়েছিলেন। আমীর খসরু শুধু সাধক হিসেবেই নয়, উপমহাদেশে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন একজন সুরকার, বিশেষ করে কাওয়ালীর জনক হিসেবে। তিনি নিজে কাওয়ালীর জন্যে কবিতা, কাসিদা, আর গজল লিখতেন। তিনি উপমহাদেশের বহু বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কারও করেছিলেন। আমীর খসরু ক্রমেই একজন সূফী সাধক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে উঠেন। তিনি সূফী সঙ্গীতের জন্য বিখ্যাত হন। তিনি লিখেছেন গজল, মাসনাভী, কথা, রুবাই দোবেটি এবং তারকিবান্দ। তিনি মূলত ফার্সিতে লিখতেন যা

www.pathagar.com

পরবর্তীতে তৎকালীন হিন্দভি ও আরও পরে উর্দুতে ভাষান্তরিত করা হয়।

আমীর খসরু ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে বাদায়ুনে, (বর্তমানে উত্তর প্রদেশ), জন্মগ্রহণ করেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, তিনিও হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার জন্মস্থানেই জন্মগ্রহণ করেন। আমীর খসরু যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন নিজামউদ্দিন আউলিয়া ২৫ বছরের যুবক। কথিত আছে যে, ৮ বছর বয়স হতেই আমীর খসরু নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে তাঁর গুরু এবং পীর হিসেবে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। ওই সময়টি ছিল বলবনদের শেষ সময়। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, আমীর খসরু ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলা সফর করেন।

আমীর খসরু প্রথমে বলবনদের দরবারে চাকরি করতেন। আলাউদ্দিন খিলজি ক্ষমতা দখল করলে তিনি ওই সময়ে সুলতানের সাথে কয়েকটি অভিযানেও গিয়েছিলেন। ১৩১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার শরণে নিবেদিত করেন। ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে যখন সুলতান মোহাম্মদ বিন তুঘলক তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন, সে বছরই হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া মৃত্যুবরণ করেন। নিজামউদ্দিনের মৃত্যুর ছয় মাস পরে আমীর খসরু মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কবর নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারে প্রবেশের পথেই রয়েছে। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় ওই চত্বরে কাওয়ালী পরিবেশিত হয়– বৃহস্পতিবারে বিশেষ আয়োজনও হয়ে থাকে।

আমীর খসরু ছিলেন মূলত দিল্লী সুলতানদের দরবারের কর্মকর্তা। তিনি প্রায় ৭ জন সুলতানের দরবারে তাঁর গজল এবং কাওয়ালী রচনা এবং পরিবেশন করেছিলেন। ইতিহাসে উদ্ধৃত আছে যে, আমীর খসরু সেতার এবং তবলার জনক। অনেকের মতে তিনি সেতার তৈরির প্রেরণা পান ধুনকরদের ধুনী থেকে (আমাদের দেশে এখনও ধুনকররা ধুনী দিয়ে তুলা ধুনে)। তবে সেতার আবিষ্কার করা নিয়ে ইতিহাসে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। অনেক গবেষক মনে করেন, এই আমীর খসরু সেই আমীর খসরু নন। ১৮ শতাব্দীতে একজন ফকির আমীর খসরু সেতার আবিষ্কার করেন। এই আমীর খসরু সম্রাট আকবরের দরবারের অন্যতম নবরত্ন ইতিহাসখ্যাত সঙ্গীত সাধক মিয়া তানসেনের মেয়ে জামাই উস্তাদ নহবত খানের বংশধর। বিষয়টি বিতর্কিত সন্দেহ নেই তবে তবলা আবিষ্কার নিয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আগেই বলেছি হযরত নিজামউদ্দিন-এর সাথে আমীর খসরুর সম্পর্ক ছিল আধ্যাত্মিক গুরু এবং শিষ্যের। এ দু'জনের হৃদ্যতা এবং আধ্যাত্মিক আলোচনা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে প্রচুর কিংবদন্তী রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, আমীর খসরু তাঁর মায়ের চাপে পড়ে ৮ বছর বয়সে প্রথমে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার 'খানকায়' (সাধনার স্থানে) আসেন। তিনি বাইরের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে এই সাধককে পরখ করতে চেয়েছিলেন। আমীর খসরু দাঁড়িয়ে গজলের কয়েক লাইনে কথা বলে সাধকের

www.pathagar.com

কাছে খবর পাঠান। খসরু বলেছিলেন "আপনি কার প্রাসাদের দরজার শাহেনশাহ– যেখানে একটি কবুতর বাজপাখিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়– একজন অত্যন্ত সাধারণ মুসাফির আপনার দরজায় এসেছে ভেতরে প্রবেশ করবে কি করবে না?" কথিত আছে যে নিজামউদ্দিন আউলিয়া এ কথাগুলো শুনার সাথে সাথে একজন খেদমতগারকে দিয়ে নিতান্ত এক বালকের কথার উত্তর দেন। তিনি বলে পাঠান "তুমি একজন বাস্তববাদী মানুষ ভেতরে আস– তুমি অল্প সময়ের জন্য আমার প্রিয়ভাজন হতে পার– যদি এ ব্যক্তি বুদ্ধিহীন হয় তবে যে যেভাবে এসেছে সেভাবেই ফেরত যেতে পারে।" এর পর হতেই আমীর খসরু হযরত নিজামউদ্দিনকে ছেড়ে যাননি।

একবার নিজামউদ্দিন আউলিয়া আর আমীর খসরু সন্ধ্যায় 'খানকায়' উপস্থিত ছিলেন। ওই সময়ে সূফী সঙ্গীত পরিবেশিত হচ্ছিল। সঙ্গীতের তালে তালে আমীর খসরু নেচে উঠলে নিজামউদ্দিন তাকে এভাবে নাচতে বারণ করে বললেন যে, নাচতেই যদি হয় তবে দু'হাত উঠিয়ে আল্লাহর বন্দনা করতে এবং একই সাথে পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে যার মানে হবে 'পৃথিবীর মায়া মোহকে পরিত্যাগ করা'।

যেমনটা আগেই বলেছি– আমীর খসরু হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। কথিত আছে একদিন এক ভিক্ষুক হযরত নিজামউদ্দিনের দরবারে সাহায্যের জন্য আসলে আউলিয়া জানালেন যে, তাকে দেবার মত দরবারে কিছুই নেই– শুধুমাত্র তাঁর কাছে নিজের এক জোড়া ছেঁড়া স্যান্ডেল রয়েছে। তিনি সেটাই ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন। ভিক্ষুক কিছুদূর এগুতে দেখতে পেল আমীর খসরু এক দূরপ্রান্ত থেকে বেশ কিছু মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে আসছেন। ভিক্ষুকের কাছে আসতেই তিনি বলে উঠলেন "ওহে ভিক্ষুক তোমার কাছ থেকে আমার পীরের গন্ধ পাই।" ভিক্ষুক খসরুকে সব খুলে বলল আমীর খসরু সমস্ত উপঢৌকনের বিনিময়ে স্যান্ডেল ফেরত নিলেন। তিনি নিজামউদ্দিনকে যখন এ কাহিনী বলে সেন্ডেল ফেরত দিলেন তখন নিজামউদ্দিন আউলিয়া বললেন "খসরু তুমি অতি সস্তায় এ স্যান্ডেল ফেরত নিয়েছ।"[২]

হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া ক্ষমতাবান লোকদের থেকে, বিশেষ করে দিল্লীর সুলতানদের কাছ থেকে, দূরত্ব বজায় রাখতেন। এক সময় দিল্লীর সুলতান জালালউদ্দিন খিলজি আমীর খসরুকে ডেকে হযরত নিজামউদ্দিনের সাথে দেখা করবার অভিপ্রায়ে দিনক্ষণ নিজেই নির্ধারণ করে তাঁকে এ সংবাদটি নিজামউদ্দিনকে জানাতে নিষেধ করলেও তিনি (খসরু) নিজামউদ্দিনকে জানিয়ে দিলেন। আউলিয়া ওই দিন ভিন্ন জায়গায় চলে গেলেন যাতে সুলতান তার সাথে দেখা করতে না পারেন। পরে জালালউদ্দিন খিলজি আমীর খসরুকে ওয়াদা ভঙ্গের কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমীর

২। *আমীর খসরু ওয়েব সাইট*

www.pathagar.com

খসরু সুলতানকে বললেন, "সুলতানের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করাতে শাস্তি স্বরূপ আমার জীবন সংহার হতে পারে– তবে আমার পীরের সাথে ধোঁকাবাজি করার মানে হবে আমার ঈমানের হানি হওয়া এবং পরকালে এর জবাবদিহি করা। নিজামউদ্দিন আমার আধ্যাত্মিক সুলতান।"এমনই ছিল এ দু'জনের সম্পর্ক। একজন ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ; অপরজন জাগতিক জীবনের হলেও ভিন্ন ধরনের সাধকে পরিণত হন। বয়সের তফাত থাকলেও দু'জনের মধ্যে ছিল এমনই হৃদ্যতা।

আমরা আমীর খসরুর মাজারের পাশ দিয়ে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারের মূল অঙ্গনে ঢুকবার পথে হাতের ডানে বেশ কিছু কবর দেখতে গেলাম। তেমনি হাতের বাঁ পাশেও উন্মুক্ত কিন্তু মার্বেল পাথরে ঘেরা দেয়া আরও দু'একটি দৃশ্যমান কবর চোখে পড়ল। এগুলো মোগল আমলের তৈরি। এ সব সমাধিতে মাজার জিয়ারতের পরে ফাতেহা পড়ব বলে আমরা দরগার দিকে রওয়ানা হলাম। মাজারের সামনে সম্পূর্ণ পাকা একটি আঙ্গিনার মত। এখানে কাওয়ালী হয়ে থাকে আর অন্যান্য সময়ে ভক্তরা বসেন। হযরত নিজামউদ্দিনের মাজারে ফাতেহা পাঠের জন্য প্রবেশ করবার আগেই পশ্চিম প্রান্তে সুদৃশ্য লাল বালুপাথরের (Red sand stone) মসজিদে গিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করবার পর উপমহাদেশের অন্যতম সূফী সাধক হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করবার সৌভাগ্য হল। অনেক দিনের বাসনা ছিল ইতিহাসখ্যাত এ সূফী সাধকের, যিনি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মন জয় করতে পেরেছিলেন, মাজার জিয়ারত করবার। তিনি সব ধর্মের মানুষকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন এর প্রমাণ পেলাম তাঁর মাজার চত্বরে উপস্থিত অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের উপস্থিতি দেখে। অনেক মনোবাসনা নিয়ে হয়ত দরবারে এসে থাকেন এসব ভক্ত। এখানে ভক্তরা আসেন দাঁড়িয়ে সৃষ্টিকর্তার কাছে মনের বাসনাগুলো তুলে ধরতে আবার অনেকে বিভিন্ন কারণে মানতও করতে। উঁচু নিচু সবাই আসেন এই দরবারে।

এ জায়গাটিই নিজামউদ্দিন বস্তি বলে পরিচিত। যদিও ইতিহাস বলে এই সাধকের বাসস্থান অন্যত্র গিয়াসপুর গ্রামে ছিল। কিন্তু তিনি এখানে জনগণের পানির কষ্ট লাঘব করতে উত্তরদিকে চরিদিকে বাঁধানো সিঁড়িসহ একটি পুকুর খুঁড়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর এখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। সবচাইতে আশ্চর্য বিষয় হল হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সাথে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের বিরোধ থাকলেও সাধকের মাজার তৈরি করেন গিয়াসউদ্দিন পুত্র মোহাম্মদ বিন তুঘলক। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন এ মাজার তৈরির পেছনে যে বিষয়টি কাজ করেছিল তা ছিল হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার ভক্ত অন্যান্য সূফী সাধকদের সুলতানের পক্ষে টানা। তিনি তার সালতানাতকে ধর্মীয় স্বীকৃতি দেবার জন্য ওই সময়কার বহু ওলামা ও সূফীদের

www.pathagar.com

শরণাপন্ন হলেও হযরত নিজামউদ্দিনের ধারাবাহিকতায় তাঁর অনুসারীরা এবং ওলামারা সুলতানের সাথে সম্পৃক্ত হতে চাননি। সুলতান সাধকদের পেছনে বহু অর্থ ব্যয় করলেও স্বীয় উদ্যোগে কোন সাধক অথবা ওলামা সুলতানকে সমর্থন দেয়নি। পরে মোহাম্মদ তুঘলক তার শাসনকে ধর্মীয় আবরণ দিতে তৎকালীন কায়রোর খলিফা মনসুরের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। খলিফা তার পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন তুঘলকের রাজধানীতে।

হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার বহু পরিবর্তন পরিবর্ধনের মধ্যে দিয়ে ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। এ মাজারে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলেই নিরবচ্ছিন্নভাবে বিগত প্রায় সাত শত বছর ধরে জিয়ারত ও ফাতেহা পাঠ করে চলেছে।

উপমহাদেশে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মত বহু সাধক সব ধর্ম বর্ণ ও গোত্রকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন বলে আজ তাদের নাম ভক্তি শ্রদ্ধাভরে এতদাঞ্চলের সাধারণ মানুষ মনে করে থাকেন। এসব সূফী সাধকরা নিজেদের মতবাদ অন্যের উপরে চাপাতে চেষ্টা করেননি। সৃষ্টিকর্তার প্রেম এবং তার সৃষ্টি মানুষের প্রতি ভালবাসার বাণীই শুনিয়েছেন। কখনই নিজের ধর্মকে অন্য ধর্মের উপর চাপাননি। সূফী 'ইজম' এর মূল মন্ত্রই ছিল আত্মাকে শুদ্ধিকরণের মধ্যদিয়ে পবিত্র করে সর্বক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার দিকে মনোনিবেশ করা। মানুষকে কষ্ট না দেয়া এবং মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি না করা। একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ছাড়া জাগতিক কোন শক্তির কাছে মাথা নত না করা। সবচাইতে বড় মূলমন্ত্র ধৈর্য আর সৃষ্টিকর্তার ধ্যান।

বর্তমানে 'সূফী ইজম'-এর কিছুটা চর্চা থাকলেও বর্তমান সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বিপরীতে চলে গেছে। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা আর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সমাজকে অস্থির করে তুলেছে; ধর্মের নামে কট্টরপন্থীদের উত্থান-সূফীবাদকে বিসর্জন দিয়ে সমাজে অস্থিরতা আর হানাহানির আগ্রাসন ঘটিয়েছে। আজ ধর্মের নামে হানাহানি সাধারণ মানুষকে হত্যা, উগ্র পথে যাত্রা, ধর্মের নামে মসজিদ, মন্দির গীর্জা ভাঙ্গা হাজার বছরের উপমহাদেশের তথা মুসলিম বিশ্বের ঐতিহ্যকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া, হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি, হযরত শাহজালাল এবং অন্যান্য হাজার হাজার নির্লোভ নির্ভীক সূফী সাধকদের প্রচণ্ড প্রয়োজনীয়তা অনুভব হচ্ছে। এঁরা কখনই নিজেদেরকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়াতে দেননি। এমনকি ক্ষমতাবানও হতে চাননি। এসব সূফী সাধকের জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে তাঁরা কখনই ক্ষমতাধরদের সন্নিকটেও যেতে চাননি। এড়িয়ে চলেছেন তাদের সম্পৃক্ততা। এ সব কারণেই ভক্তি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে ভক্তরা ভিড় করেন সূফীদের মাজারগুলোতে। অপরদিকে শুধুমাত্র দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে হাতে গোনা ক্ষমতাধর সম্রাট আর রাজা

www.pathagar.com

বাদশাহ্‌দের সুদৃশ্য সমাধি ।

নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারের উত্তরে মহিলাদের মসজিদ পার হয়ে রয়েছে সেই ঐতিহাসিক পুকুর– যাকে কেন্দ্র করেই নিজামউদ্দিন আউলিয়া গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের উদ্দেশে বলেছিলেন "হুনুজ দিল্লী দূর আস্ত"।

হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারের স্থানটি তাঁর জীবদ্দশায় দরবার শরিফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। তাঁর দরবার শরিফের কোন স্থান এখনও অবশিষ্ট আছে কিনা তা আমি জানতে পারিনি। তবে বলা হয়ে থাকে তিনি সম্রাট হুমায়ুনের সমাধির পেছনে বাস করে থাকতে পারেন।

নিজামউদ্দিন আউলিয়া দিল্লীতে এসেছিলেন তাঁর মা এবং বোনের সাথে একজন বিচারক বা কাজী হবার বাসনা নিয়ে। কিন্তু তিনি তো হতে পারেননি। ক্রমেই তিনি ওই সময়কার সূফীবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন, বিশেষ করে 'চিশতিয়া' তরিকায়। তিনি তৎকালীন সূফী আধ্যাত্মিক সাধক বাবা ফরিদগঞ্জ-ই-সাকার দরবারে (পাকিস্তানে) উপস্থিত হন। কিছু বছর বাবা ফরিদ-এর শিষ্যত্বে থাকলে তাকে দিল্লীতে বাবা ফরিদের দূত হিসেবে পাঠানো হয়। দিল্লীতে তিনি যমুনা নদীর তীরে আস্তানা গাড়েন। তাঁর আস্তানার খোঁজ আমি সময়ের অভাবে করতে পারিনি। তবে কথিত আছে আস্তানাটি দীঘির উত্তরে নিজামউদ্দিন প্রান্ত হতে চৌদ্দ মাইল দূরে গিয়াসপুর গ্রামে ছিল।

নিজামউদ্দিন-এর মূল মাজার থেকে বের হয়ে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য বাইরে দস্তরখান-ই-করিম-এর রেস্তোরাঁতে যেতে চাইলে জানতে পারলাম যে, ওইদিন সোমবার হওয়ায় দরগা এরিয়ার ঐ বিশেষ রেস্তোরাঁটি বন্ধ রয়েছে। আমরা করিমস্ খাবার নিয়ত করেছিলাম তাই অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানলাম জামে মসজিদের রেস্তোরাঁটি খোলা রয়েছে। দিল্লীর জামে মসজিদের উত্তর গেটের সংলগ্ন 'চাঁদনী চক'-এর এক প্রান্তে রয়েছে মোগল ঐতিহ্যবাহী খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশনাকারী করিমস্ এর মূল রেস্তোরাঁ। মনস্থ করলাম সেখানে গিয়েই মধ্যাহ্নের খাবার খাব। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার চত্বর হতে বের হবার পথে মোগলদের নির্মিত কয়েকটি কবরে ফাতেহা পাঠ করতে গিয়ে প্রথমে যে কবরটির সামনে দাঁড়ালাম সেটি ছিল সম্রাট শাহজাহান দুহিতা, সুন্দরী বিদূষী ও আজীবন কুমারী অন্যতম মোগল রাজকুমারী জাহানারার। পরের কবরটি জাহানারার উত্তরসূরি বংশধর সম্রাট মোহাম্মাদ শাহআলম রঙ্গীলার। তাঁর সময়েই মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে যার সুযোগে পারস্য সম্রাট নাদের শাহ্ দিল্লী লুণ্ঠন করেন। কুমারি জাহানারার কবরের পাশে আরেক মোগল সম্রাট মোহাম্মদ শাহ-এর কবর রয়েছে।

www.pathagar.com

তিন

সাহিবাতুজ্জামানী

'আমার কবর সবুজ' ছাড়া আর কিছু দিয়ে ঢেকো না'।

হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া এবং হযরত আমীর খসরুর মাজারের মধ্যবর্তী স্থানে অন্যতম একজন ভুবন বিখ্যাত নারীর কবরের সামনে আমরা দাঁড়ানো। সাদা মার্বেলে আবৃত কবর, তিন পাশ সাদা মার্বেলের জালী (জাফরি) দিয়ে ঘেরা। উপরে খোলা যেখানে বেশ সবুজ ঘাস রয়েছে। কিছুটা অবহেলায় রক্ষিত মনে হল। সাদা মার্বেলের সমাধি সৌধটি কালের বিবর্তনে অনেকটা মরিচা রং হয়ে আছে। কবরের উত্তরে একটি ফলকে ফার্সী ভাষায় একটা ছোট কবিতা খোদাই করা। যা লেখা রয়েছে তার ভাবান্তর নিম্নরূপ :

'তিনি (আল্লাহ) জীবিত এবং অবিনশ্বর
আমার কবর সবুজ ছাড়া আর কিছু দিয়ে ঢেকোনা
এ ঘাসই বলবে এ কবরটি একজন দরিদ্রের
এখানে শায়িত দরিদ্র এ মহিলা জাহানারা
চিশতি তরিকার একজন অনুরাগী
শাহজাহান যোদ্ধার তনয়া।'

কবরটি আর কারও নয়, মোগল সম্রাট শাহজাহান এবং মমতাজ মহলের কন্যা ও জ্যৈষ্ঠ সন্তান শাহজাদীদের শাহজাদী বলে খ্যাত লাস্যময়ী শাহজাদী জাহানারার। উপমহাদেশের ইতিহাসে যে ক'জন নেত্রী শাসন কাজে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তাদের মধ্যে জাহানারা অন্যতম। তাছাড়া ইতিহাসে বহু নারীর উল্লেখ রয়েছে যারা সরাসরি না হলেও রাজকার্যে অন্তরাল থেকে প্রভাব রেখেছেন। মোগল সাম্রাজ্যে যে কয়কজন নারীর চর্চা সবচাইতে বেশি হয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের এক সহধর্মিণী সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, শাহজাহানের সহধর্মিণী মমতাজ মহল এবং পরে শাহজাদীদ্বয় জাহানারা ও বোন রওশন আরা। যদিও অন্তরালে সম্রাজ্ঞীদের প্রভাব রাখবার বিষয়টি অনেকটা বিতর্কিত, তবুও ইতিহাস থেকে জানা যায় বিভিন্ন সময়ে মোগল সম্রাজ্ঞীরা সম্রাটদের বহুভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তাছাড়া মোগল নারীদের অবস্থান অন্তপুরীতেই ছিল। এমনকি মোগল রাজকুমারীদের বিয়ে করবার

www.pathagar.com

স্বাধীনতাও সম্রাট আকবর রহিত করেছিলেন। এটা করা হয়েছিল শুধুমাত্র রাজকুমার বংশোদ্ভূতদের উত্তরাধিকার সূত্র কায়েম করতে।

ওই সময় নারীদের অবস্থান যাই থাকুক না কেন মোগল নারীদের মধ্যে বহুবিধ কারণে ব্যাপক চর্চিত হচ্ছেন দু'জন রাজকুমারী। একজন জাহানারা অপরজন তারই ছোট বোন রওশন আরা। এ দু'জন শাহজাহানের শেষ সময়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। জাহানারা শাহজাহানের হয়ে রাজকার্যও পরিচালনা করেন তার মাতা মমতাজ মহলের মৃত্যুর পর হতে। অপরদিকে রওশন আরা বহুবিধ কারণে চর্চিত ছিলেন এবং এখনও হচ্ছেন। দু'বোন ছিলেন বিপরীতধর্মী চরিত্রের। এ বিষয়ে পরে বিশদ আলোচনা করব।

আমি ওই সময়ের সমাজে নারীদের অবস্থান নিয়ে যৎসামান্য কথা বললাম। তবে দিল্লীর সিংহাসনে প্রথম যে নারী সরাসরি শাসন করেছিলেন তিনি ছিলেন একমাত্র মুসলমান নারী সুলতানা রাজিয়া। যদিও সুলতানা রাজিয়ার শাসনকাল ছিল মাত্র চার বছরের (১২৩৬-৪০) তথাপি উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা। ইলতুৎমিশ-এর কন্যা সুলতানা রাজিয়ার পর স্বাধীন ভারতে দিল্লীতে ক্ষমতায় ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী।

আলোচনা শুরু করেছিলাম শাহজাহানের অত্যন্ত আদরের কন্যা জাহানারার সমাধিতে ফাতেহা পাঠের বিষয়টি নিয়ে। শাহজাদী জাহানারা জন্মগ্রহণ করেন এপ্রিল ২, ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর, যখন তাঁর মাতা মমতাজ মহল ১৪তম সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে (১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে) মারা যান। মমতাজ মহল বলে অধিক পরিচিত সম্রাট শাহজাহানের বেগম অনেক সন্তানের জন্ম দিলেও প্রায় অর্ধেক সন্তান জন্মের সময়ে অথবা ছোটবেলাতেই মারা যায়। শাহজাহান তার অত্যন্ত ভালবাসার এবং পছন্দের বেগমের মৃত্যুতে সম্পূর্ণ মুষড়ে পড়েন। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, শাহজাহান রাজকার্যে সর্বদা মমতাজ মহলের পরামর্শ নিয়ে চলতেন বলেই তিনি বেগমের অন্তর্ধানে অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। শাহজাহানের আরও কয়েকজন বেগম থাকলেও মমতাজ মহল ছিলেন সবচাইতে বেশি আদরণীয়।

মায়ের মৃত্যুর পর পিতার দেখাশোনার ভার গ্রহণ করেন তরুণী জাহানারা। ইতিহাসে বিশেষ সম্মানের সাথে তার নামটি লেখা রয়েছে 'শাহজাদী জাহানারা বেগম সাহেবা'। যদিও ওই সময়ে সম্রাট শাহজাহানের আরও দুই বেগম জীবিত ছিলেন তথাপি শাহজাহান তার কন্যাকে মোগল দরবারে 'ফার্স্ট লেডি' হিসেবে নিযুক্ত করেন। জাহানারা পিতাকে তার মাতার মৃত্যু শোক থেকে বের করে আনেন এবং একই সাথে তাঁর ছোট ভাই ও বোনদের দেখাশোনার ভার নেন। জাহানারার ভাই 'দারাশিকোর' বিয়ে মায়ের মৃত্যুর কারণে স্থগিত হলেও জাহানারার হস্তক্ষেপে সে বিয়েও যথা সময়ে

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হয়। শুধু দারাশিকোই নয় জাহানারা সব ভাই-বোনদের দেখাশোনা করতেন। তবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারি হিসেবে দারাশিকোর দিকে ঝুঁকে ছিলেন যা তাঁরই তৃতীয় ছোট ভাই আওরঙ্গজেব পছন্দ করতেন না। এ কারণেই আওরঙ্গজেব বড় বোনের কাছ হতে দূরে সরে থাকতেন। জাহানারার মতে আওরঙ্গজেব একজন কট্টরপন্থী মুসলমান ছিলেন। আওরঙ্গজেব জীবদ্দশায় অমুসলিমদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের মধ্যে জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। যার জন্য জাহানারাও আওরঙ্গজেবকে কোন সময়েই ক্ষমা করেন নি। জাহানারা ছিলেন অত্যন্ত হৃদয়বান ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। রাজ্যের সব ধর্মের মানুষের সাথে ছিল তার যথেষ্ট হৃদ্যতা। শাহজাহান তার এই কন্যাকে বহু উপাধিতে ভূষিত করেন- এমনকি কন্যার জন্যে আগ্রার দূর্গের (কেল্লা) বাইরে নিজস্ব প্রাসাদও তৈরি করে দেন। রাজকার্যে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মেয়ের প্রতি বাপের এতখানি ভালবাসা বোধকরি ইতিহাসে বিরল ঘটনা হয়ে থাকবে।

এপ্রিল ৪, ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদী জাহানারা অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। ঘটনাটি ঘটেছিল শাহজাদীর নিজ শয়ন কক্ষে মোমের বাতি উল্টে গায়ের কাপড়ে আগুন লাগলে। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে জাহানারার দু'জন সাহায্যকারী মারা যান। এমনি ছিল আগুনের ভয়াবহতা। জাহানারার এ অসুস্থতার সময় প্রায় আট মাস শাহজাহান নিজে তাঁর কন্যার পরিচর্যা করেন। জাহানারা সে দফা মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসেছিলেন। সুস্থ হবার পর শাহজাহান কন্যার আরোগ্য লাভ করায় ব্যাপক জাঁকজমক সহকারে জলসার আয়োজন করেন। পরে জাহানারাকে 'সুরাট' বন্দরের খাজনা আদায়ের দায়িত্বও দেয়া হয়েছিল। শাহজাহান আর তাঁর অন্যতম কন্যা জাহানারার মধ্যে পিতা আর কন্যার যে ভালবাসা ছিল, তার নজির পাওয়া কঠিন। পিতার প্রতি ভালবাসার কারণেই আওরঙ্গজেব যখন তাঁর পিতা শাহজাহানকে আগ্রার দুর্গে অন্তরীণ করেন– তখন জাহানারা স্বেচ্ছায় পিতার সাথে প্রায় ৮ বছর বন্দি জীবন-যাপন করেন।

জাহানারার সাথে তাঁর তিন বছরের ছোট বোন রওশন আরা বেগমের সম্পর্ক ছিল শীতল। রওশন আরা ছোট হলেও বড় বোনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়াকে সহজভাবে নেয়নি। যখন শাহজাহানের উত্তরসূরির প্রসঙ্গ উঠে শাহজাহান জাহানারার মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এ প্রশ্নে ভাই-বোনের সম্পর্ক শীতল থেকেছে শীতলতর হতে থাকে। আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা দখল পর্যন্ত দারাশিকোকেই শাহজাহান জাহানারার সম্মতিতে তার উত্তরসূরি মনোনীত করেছিলেন। জাহানারার এ আচরণ আওরঙ্গজেবকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। কিন্তু জাহানারা আর আওরঙ্গজেবের সম্পর্ক শীতল থাকলেও শাহজাহানের মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেবের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হয়।

www.pathagar.com

পাঠকমাত্রই জানেন যে, শাহজাহানের জীবদ্দশাতেই আওরঙ্গজেব ভাইদের হত্যা এবং দেশান্তরী করে মসনদ দখল করেন। ইতিহাসে আওরঙ্গজেব একজন গোঁড়া মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত রয়েছেন।

জাহানারা আর তাঁর বোন রওশন আরার মধ্যে চারিত্রিকি বৈপরীত্য ছিল চোখে পড়ার মত। শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দিনগুলোতে ছিল পুত্র দারাশিকো, মুরাদ, আওরঙ্গজেব আর সুজার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। ভাইদের মধ্যে চরম টানাপোড়েন ছিল শাহজাহানের উত্তরসূরি নির্বাচনের প্রশ্নে। ক্রমেই এ টানাপোড়েন প্রকট হয় দু'জনার মধ্যে, দারাশিকো আর আওরঙ্গজেব। দু'বোন দু'মুখী হয়ে জড়িয়ে পড়েন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে। যেমনটা আগেই বলেছি যে, জাহানারার মতামত শাহজাহান মমতাজ মহলের মৃত্যুর পর গুরুত্ব দিতেন সবচাইতে বেশি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় জাহানারা আওরঙ্গজেবের অতি কট্টরপন্থী ধর্মীয় ভাবধারাতে সায় দিতে পারেননি। জাহানারার মত ছিল শাহজাহানের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে দারাশিকোই সবদিক থেকে উপযুক্ত। দারাশিকো ছিলেন উদারপন্থী এবং হিন্দুস্থানের অমুসলমান জনগোষ্ঠীর নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য।

শাহজাদী ফাতেমা জাহানারা রাজকার্য পরিচালনায় বাবার প্রেরণাদাতা ছিলেন। দারাশিকো আর জাহানারা দু'জনেই ছিলেন সূফীবাদের অনুসারী। কাজেই তাঁরা হিন্দুস্থানে পূর্বসূরি মোগলদের মতই সব ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু থাকার পথেই ছিলেন। দু'জনেই সূফী সাধক লাহোরের (বর্তমানে পাকিস্তানে) মিয়া মীর-এর অনুসারী ছিলেন। যদিও মিয়া মীর কাদেরিয়া ঘরানার সাধক ছিলেন। অপরদিকে জাহানারা ছিলেন চিশতিয়া সূফীবাদের অনুসারী তবুও এ সাধকের প্রতি জাহানারার ছিল অগাধ ভক্তি। তিনি নিজে ছিলেন হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া এবং আজমীরের হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতির ভক্ত। কথিত আছে যে, জাহানারা অগ্নিদগ্ধ হবার পর সুস্থ হয়ে উঠবার পরপরই হযরত মঈনউদ্দিন চিশতির মাজার জিয়ারত করতে আজমীরে হাজির হয়েছিলেন।

জাহানারা ছিলেন অত্যন্ত শিল্প-সাহিত্যমনা বিদূষী। তিনি 'সূফীইজম' বিশেষ করে কাদেরিয়া ঘরানা নিয়ে গবেষণা করলেও চিশতিয়া সূফীবাদ নিয়ে বেশ কিছু বই রচনা করেন। তিনি খাজা মঈনউদ্দিনের মাজার চত্বরে মার্বেলের তৈরি (যার বর্তমান নাম বেগমী দালান) যে আরামগাহ্ (বিশ্রাম ঘর) স্থাপন করেন তা আজও আজমীরের মাজারে মহিলাদের বিশ্রামের স্থান হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। বেগমী দালান নামটি দেয়া হয়েছিল জাহানারার সম্মানসূচক 'বেগম সাহেবা' উপাধি থেকে। এ উপাধি তাঁর পিতা শাহজাহান দিয়েছিলেন। পুরাতন দিল্লীর, যার ঐতিহাসিক নাম শাহজাহানাবাদ, 'চাঁদনী চক'-এর স্থপতি হিসেবে আজও 'চাঁদনী চক' বাসিন্দারা জাহানারাকে স্মরণ

www.pathagar.com

করেন। ওই সময়ে 'চাঁদনী চক' ছিল বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আধুনিক বাজার। সেখানে বর্তমানের টাউন হল এলাকায় তৈরি হয়েছিল জাহানারা 'সরাই' (মেহমান খানা) বা কারওয়া সরাই।

জাহানারা বেগম সাহেবা শুধু শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ কন্যা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে একজন অত্যন্ত সফল কবি এবং সূফীবাদের সমর্থক ও সৌন্দর্য পিপাসু। তাঁর তাত্ত্বিক গুরু মোল্লা শাহ বাদকসীর সান্নিধ্যে তিনি সূফীবাদের চর্চা যেমন করেছিলেন, তেমনি শিল্প-সাহিত্যে ক্ষেত্রে সগর্বে পদচারণা করেন। ওই সময়ে একজন অবিবাহিত শাহজাদীর পক্ষে জীবনের বিপরীতমুখী দু'টি দিক সমানভাবে সামলানো খুবই দুষ্কর কাজ ছিল। সুন্দরী, কুমারী শাহজাদী ছিলেন রোমান্টিক ধাঁচের। এমন নয় যে তার প্রণয় নিয়ে তিনি আলোচিত হননি। কিন্তু সূফীবাদের উদারতায় তাঁর রোমান্টিক জীবন নিয়ে ততটা মুখর ছিলেন না শাহজাহানবাদের বাসিন্দারা, যতখানি ছিলেন অপর বোন রওশন আরার বেলায়। তবুও এই সুন্দরী শাহজাদীর জীবনে প্রেম এসেছিল।

'শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ সন্তান জাহানারা বেগম সাহেবা ছিলেন তার সময়কার একজন বহুল আলোচিত ভাবাবেগের রোমান্টিক কবি। তিনি শুধুমাত্র রোমান্টিক কবি হিসেবেই সে সময়কার শাহজাহানাবাদের উচ্চবিত্ত সমাজ এবং আঁতেল, কবি এবং সাহিত্যিকদের মাঝে পরিচিত ছিলেন না, তিনি পরিচিত ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক, ভাবুক ও সার্থক অনুবাদক হিসেবে। তিনি স্বরচিত কবিতা আর আধ্যাত্মিক দর্শন নিজে ফার্সী ভাষায় অনুবাদও করেছেন।

শাহজাহানাবাদের কারওয়ান সরাই বা জাহানারা সরাইতে বসত কবি ও সাহিত্যিকদের আসর—যার মধ্যমণি হয়ে থাকতেন সুন্দরী ও বিদূষী জাহানারা 'বেগম সাহেবা'। জাহানারার পূর্বে মোগল রাজকুমারীদের অন্য কেউই তার মত শিল্প সাহিত্যের অঙ্গনে এমনভাবে সাড়া জাগাতে পরেননি। আজও উর্দু আর ফারসী হিন্দুস্থানী কবিদের মধ্যে জাহানারার নাম অনেক উঁচুস্থানে রয়েছে।

অত্যন্ত মুক্তমনা জাহানারার জনপ্রিয়তা অনেক সময় বিড়ম্বনার কারণও হয়ে দাঁড়ায়। তাকে জড়িয়ে প্রচার হয় প্রণয় সংক্রান্ত বহু গুঞ্জন। একাধিক কবি-সাহিত্যিকের সাথে জাহানারার প্রণয়ের কাহিনী নিয়ে বহু কবিতা আর নভেল লেখা হয়, সেগুলো আজও জনপ্রিয়। আগেই বলেছি মুক্তমনা মোগল শাহজাদীকে নিয়ে আজও বহু গ্রন্থ রচিত হচ্ছে। অতি সম্প্রতি ক্যাথরিন লাস্‌কি লিখেছেন "রয়েল ডাইরিজ' জাহানারা প্রিন্সেস অব প্রিন্সেসেস অব ইন্ডিয়া, ১৬২৭ নামক গ্রন্থ যেটি বহুল আলোচিত হয়েছে। বেস্ট সেলার লিস্টেও উঠেছিল এ বইটি। একাধিক ছায়াছবি তৈরি হয়েছে উপমহাদেশে। ওই ছায়াছবিতে জাহানারা রচিত কবিতাও সংযোজন করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

জাহানারা সপ্তদশ শতাব্দীর এক মুক্তমনা সংস্কৃতি সাধক মোগল রাজকুমারীর নাম। যে নাম দিল্লীর শাহজাহানাবাদের ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাব জড়িত। জাহানারাই 'চাঁদনী চক' নক্সা ও পরিকল্পনা করেছিলেন-আজকের বাজারের প্রধান সড়ক, সড়কদ্বীপ, কৃত্রিম খাল আর মাঝখানের হ্রদ, যেগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। 'চাঁদনী চক' নামের ব্যস্ত ধুলো আর বালিতে ভরা অত্যন্ত জনবহুল যে রাস্তাটি রয়েছে তা দেখে বুঝবার উপায় নেই যে একসময় এই 'চাঁদনী চক'-এর চর্চা ছিল বিশ্বজুড়ে। আজ যা দৃশ্যমান তা একটি ক্ষয়িষ্ণু শহরের অব্যবস্থাপনায় ভরা সড়ক। নেই কারওয়ান সরাই, নেই মাঝের তালাব (পুকুর)। 'চাঁদনী' রাতে দেখা যায় না ওই দৃশ্য যা দেখে মুগ্ধ হতেন কবি আর সাহিত্যিকরা; নেই সেই জৌলুসময় ঈদের আগের রাতের। তবুও চাঁদনী রাতে এখন উৎসব করে এখানকার বাসিন্দারা।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে জাহানারার প্রেমের জীবন নিয়ে ভারতে বিখ্যাত ছবি 'জাহানারা' তৈরি হয়। জাহানারা একজন ফার্সী কবি মির্জা ইউসুফ চেঙ্গেজীর প্রেমে পড়েছিলেন, কিন্তু সে প্রেম সফল হয়নি। 'আকবরের' জারিকৃত আইন আর অসুস্থ মাতা মমতাজ মহলের জাহানারার প্রতি অনুরোধের কারণে। মমতাজ মহল তার মৃত্যুসজ্জায় জাহানারাকে সর্বদা তাঁর পিতার পাশে থাকতে অনুরোধ করে যান। জাহানারা কথা রেখেছিলেন। ইউসুফ চেঙ্গেজী বিফল প্রেমিক হিসেবে সমগ্র হিন্দুস্থান ঘুরে বেড়ান। পরে আগ্রার দুর্গের সামনেই থাকতেন সবচাইতে বেশি সময়। ওই ছায়াছবিতে জাহানারা আর তাঁর প্রেমিকের মধ্যে চিঠি চালাচালিতে কবুতরের ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছিল। ছবিটি ছিল বিয়োগান্তক। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। ভারতভূষণ আর মালা সিনহা অভিনীত ছবিটিতে কয়েকটি গজল জাহানারার কবিতা থেকে নেয়া হয়েছিল।

জাহানারার অসামান্য কিন্তু তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত সাধারণ কবরের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম একজন অসাধারণ মহিলার জন্ম এমন সময় হয়েছিল যখন আজকের মত মহিলারা এতখানি স্বাধীনতা ভোগ করেনি; তবুও অগণিত মোগল মহিলার মধ্যে জাহানারা কিংবদন্তী হয়ে রয়েছেন। পিতার প্রতি এমন আনুগত্য আর ভালবাসার নিদর্শন ইতিহাসে বিরল। শাহজাহান তার পুত্র আওরঙ্গজেবের হাতে বন্দি হয়ে আগ্রার দুর্গে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে অন্তরীণ হলে জাহানারা নিঃশব্দে তার পিতার সঙ্গী হন। শাহজাহানকে বন্দি রাখা হয় মুয়াসাম্মান বুরুজ-এ।✦ *(ফুটনোটটি দেখুন পরের পৃষ্ঠায়)*

আট বছর বন্দি থাকার মধ্যেই বৃদ্ধ, শাহেনশাহ-এ-হিন্দ, শাহজাহান ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মারা যাবার পর প্রায় ১৬ বছর জাহানারা জীবিত ছিলেন। এ ১৬ বছর তিনি মুক্ত জীবন কাটিয়েছিলেন তার ভাই আওরঙ্গজেবের রাজত্বে। কিন্তু তিনি কিছুতেই তার ভাইয়ের রাজনীতিকে সমর্থন করতে পারেননি। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে জাহানারা ৬৭ বছর

www.pathagar.com

বয়সে মারা গেলে দিল্লীর হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার চত্বরে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম তার সামনেই জাহানারার আরেক বংশধর সম্রাট মোহাম্মদ শাহ্ রঙ্গীলার সমাধি আর তার অদূরে আরেক সম্রাট মোহাম্মদ শাহ-এর কবর।

যারাই কখনও দিল্লীতে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার জিয়ারতে যাবেন আমি অনুরোধ করব যেন ইতিহাসে অমর হয়ে থাকা এ মোগল বিদূষী নারীর সমাধিতে কয়েক মিনিটের জন্য হলেও থামতে ভুলবেন না। তিনিই একমাত্র মোগল সাম্রাজ্যের পরিচিত মহিলা যার সমাধি হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মত সূফী সাধকের মাজার চত্বরে স্থান পেয়েছে।

আমি কতক্ষণ নীরবে শাহজাদী ফাতেমা জাহানারা বেগম সাহেবা, রিসালা-ই-সাহিবার-সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে গিয়েছিলাম জানি না। সম্বিত ফিরে পেলাম যখন আমার সফর সঙ্গীরা আমাকে মনে করালেন যে বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় চারটার কাছাকাছি। আমরা তখনও দুপুরের খাবার খাইনি।

হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার ছেড়ে জনাকীর্ণ পথে দিল্লীর জামে মসজিদের দক্ষিণ পাশের 'চাঁদনী চক'-এর এক প্রান্তের গলিতে প্রবেশের পর বহু আলোচিত 'করিমস্' রেস্তোরাঁতে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল চারটার উপরে। অল্পক্ষণ পরেই আছরের নামাজের ওয়াক্ত হবে। ধ্বনিত হবে জামে মসজিদ হতে আজানের সুর। জামে মসজিদ 'কননাট প্যালেস' হতে ৪ কিঃ মিঃ উত্তরে লাল কেল্লার দক্ষিণ-পশ্চিমে।

আমরা দিল্লীর অন্যতম প্রসিদ্ধ এবং বিশ্বখ্যাত লাল পাথরের তৈরি মসজিদ জামে মসজিদের দক্ষিণ গেটে যখন পৌঁছলাম তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল। কিছুক্ষণ পরেই হয়ত আছরের আজান হবে। মে ৪, ২০০৯, সেদিন দিল্লীর তাপমাত্রা ৪২° সেলসিয়াস, আর্দ্রতা বলতে প্রায় শূন্য।

জনাব সানাউল্লাহ গাড়িটি দাঁড় করাতে করাতে আমি জামে মসজিদের দক্ষিণ

✦ *মুয়াসাম্মান বুরুজ এর অপর দুটি নাম ছামান বুরজ অথবা শাহবুরজ (Octogonal) মহল যা দিওয়ানে খাসের বাদিকে। এটি তৈরি করা হয়েছিল সাদা মার্বেল পাথরের সমন্বয়ে অতিদামী কাচ এবং বিভিন্ন রংয়ের দামী পাথর দিয়ে। এখানেই প্রথমে আকবর তৈরি করেছিলেন তাঁর শোবার ঘর যা পরে জাহাঙ্গীর ভেঙ্গে নতুন করে তৈরি করেছিলেন। পরে শাহজাহান তার পত্নী নূরজাহানের জন্য নতুনভাবে সম্পূর্ণ মার্বেল দিয়ে অপূর্ব সুন্দর শয়ন কক্ষ তৈরি করেন। উপরে মার্বেলের গম্বুজ তিন পাশে বারান্দা। ঘরের মাঝে পানির ফোয়ারা আর যমুনা নদী সাদৃশ্য পানি নিষ্কাশনের জন্য তৈরি করা ড্রেন। পূর্ব পাশে একটি ছোট মসজিদ মহিলাদের নামাজের জন্য। মাঝে ছোট একটি মার্বেলের আঙ্গিনা যার মধ্যে পাশা খেলার ছক বানানো। মনে হয় অন্তপুরের মহিলাদের চিত্ত বিনোদনের স্থান। এখান হতে যমুনা পাড়ে তাজমহল পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। শয়ন কক্ষ এমনভাবে বানানো যার মধ্য থেকে বাহিরের দৃশ্য দেখা গেলেও বাহির থেকে ভেতরে সহজে দেখা সম্ভব নয়।*

www.pathagar.com

গেটের ছবি তুলে নিলাম। আমাদের জামে মসজিদ দর্শনের কথা না থাকলেও আমি অপরাহ্নের আহারের পর জামে মসজিদের ভেতরে দেখতে গিয়েছিলাম। সে বিবরণে পরে আসছি।

আমরা এতদূর এসেছি করিমস্ রেস্তোরাঁতে খেতে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেটি ছিল 'চাঁদনী চক'-এর অপরপ্রান্ত। অত্যন্ত ব্যস্ত এক গলি। শত শত রিক্সা, ঠেলাগাড়ি আর মাঝে মধ্যে দু'একটা ছোট ট্রাকের মত মালটানা গাড়ি চলছে। দু'পাশে বেশ কিছু হরেক রকমের খাবারের দোকান। প্রায় একই ধরনের রঞ্জন-ব্যাসন- তবুও আমরা করিমস্ খুঁজছিলাম। আমি এর যতখানি ইতিহাস খুঁজে পেয়েছিলাম আর বিশ্বের তাবৎ খবরের কাগজ এবং বিখ্যাত 'টাইম' (Time) ম্যাগাজিনে এশিয়ায় সবচাইতে প্রসিদ্ধ রেস্তোরাঁর একটি করিমস্ সম্পর্কে পড়ে ভেবেছিলাম দিল্লীর ঐতিহাসিক মনুমেন্টগুলোর মতই বড়ভাবে তৈরি প্রধান সড়কের উপরে অত্যন্ত দামী অভিজাত রেস্টুরেন্টে চড়া দামে খাবার খেতে আসা গ্রাহকদের গাড়ির বাহার দেখতে পাব। কিন্তু তেমন কিছুই দেখলাম না। তবুও করিমস্ ইতিহাস খ্যাত।

জনাব সানাউল্লাহও ভুলে গেলেন কোন গলিতে এই বিখ্যাত খাবারের দোকানটি। আমি তো অন্তত: ভেবেছিলাম গুলশান এ্যাভিনিউ, ঢাকায় ভারতের সেফ সঞ্জিব কাপুরের খানা-খাজানা রেস্তোরাঁর মত গগণচুম্বী দামী খাবারের জন্য আলোচিত হবে করিমস্। তেমনটা নয়। খানা খাজানার অস্বাভাবিক আর অহেতুক মূল্যের তুলনায় বিশ্বখ্যাত করিমস্ রেস্তোরাঁর খাবারের মূল্য অতি সামান্য।

আমাদের ওই সময়কার গাইড জনাব সানাউল্লাহ সামনের এক রেস্তোরাঁতে গিয়ে জিজ্ঞেস করাতে ওই রেস্তোরাঁর কর্মচারী অঙ্গুলি দিয়ে বিপরীত দিকে দু'টি খাবারের দোকানের মাঝে একটি গলি দেখালো। আমি কিছুটা অবাক হলাম এ কারণে যে, দিল্লীর দর্শনীয় স্থানের মত যে কোন রিক্সা, ট্যাক্সিওয়ালাকে শুধু নাম বললেই কোন প্রশ্ন না করে নিয়ে আসবে যে নামী রেস্তোরাঁতে তা এত সাধারণ এবং ভেতরের গলিতে অদৃশ্যমান হবে তা ভাবাও যায়না।

করিমস্-এর প্রবেশ পথ এমনই সরু যে দু'জনের বেশি পাশাপাশি হাঁটার জায়গাও নেই। যাই হোক, ওই গলি দিয়ে কিছু দূর এগুতেই চোখে পড়ল একটি ছোট পরিসরের উঠোনের মতো। সেখানে তিনটি ছোট ছোট রেস্তোরাঁ, প্রতিটির সামনে লেখা করিমস। এগুলোকে সাধারণত হিন্দুস্থানী ভাষায় 'ধাবা'ই বলা হয়ে থাকে। তবুও করিমস্ বিংশ শতাব্দী হতেই বিখ্যাত।

করিমস্ রেস্তোরাঁর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম হাফেজ করিমউদ্দিনদের বংশধরেরা সম্রাট আকবরের দরবারের দস্তরখানের প্রধান পাচক ছিলেন। সেই থেকে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে মোগল দরবারের খাবার তৈরির কাজ। হাফেজ করিমের প্রপিতামহের

www.pathagar.com

পূর্বসূরিরা দিল্লীর লাল কেল্লাতে থাকতেন। তবে শাহজাহানাবাদের পত্তন হবার পর 'চাঁদনী চক' অঞ্চলে বাস করতে থাকেন। বালক অবস্থাতে হাফেজ করিম মোগলদের এবং দিল্লীর শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের এক সময়ের প্রধান পাচক ছিলেন। তিনিও ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর বাহাদুর শাহ জাফরের সাথে দেশান্তরী হয়ে রেঙ্গুনেই থেকে যান। এই পরিবারের ওই সময়কার প্রধান হাজী হাফেজ করিমউদ্দিন ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর এই স্থানে মোগল ঐতিহ্যের খাবারের দোকান খোলেন। বর্তমানের মালিক হাজী জহিরুদ্দিনের পিতা হাজী নুরুদ্দিন, হাফেজ করিমের পুত্র, মারা যান ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে।

বংশ পরম্পরায় মোগল দরবারের পাচন প্রক্রিয়া চলে আসছে আজ পর্যন্ত। রন্ধন প্রক্রিয়া বংশ পরম্পরায় হাত বদল হলেও রয়ে গেছে গোপন। স্বভাবতই 'করিমস্' এর প্রস্তুত খাবার অন্য যে কোন রেস্টুরেন্ট হতে আলাদা হবেই। তেমনি প্রমাণ আমরাও পেয়েছি। করিমস্ পরিবেশনা করে মোগল দরবারের নির্ভেজাল খাবার। এ কারণেই বিশ্বের নানা দেশের পর্যটকদের কাছে 'করিমস'-এর রয়েছে অন্যধরনের আবেদন। ঐতিহাসিক মনুমেন্ট না হয়েও সামান্য খাবারের দোকান করিমস্-এর রেস্তোরাঁ শুধু সব ধরনের ভোজন প্রিয়দের নাগালের মধ্যের রেস্তোরাঁই নয়, দিল্লীর অবশ্য দর্শনীয় স্থান বলে বিশ্ব পর্যটকদের কাছে পরিচিত।

করিমস্-এ আমরা চারজন দুপুরের খাবার খেয়েছিলাম। আমাদের খাদ্য তালিকায় 'করিমস্' এর বিখ্যাত মটন কাবাব, লাচ্ছি এবং আরও দু'টি আইটেমসহ যথেষ্ট খাবার নিয়েছিলাম। খাবার খেয়ে যে বিল দিলাম তাতে হতবাকই হলাম। খাদ্য তালিকায় যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা অত্যন্ত সহনীয়। যে কোন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের আওতার মধ্যেই। অথচ করিমস-এর যে খ্যাতি এবং নাম তাতে এর বেশি মূল্য রাখলেও অবাক হবার কিছু ছিল না। ভারতের ভোক্তা আইন এ ক্ষেত্রে ভোক্তাদের স্বার্থ-রক্ষার কাজটি যথাযথভাবেই পালন করে।

আমি ভোক্তা আইনের বিষয়টি অবতারণা করলাম এ জন্য যে ঢাকা শহরের প্রত্যেকটি রেস্তোরাঁতে বিশেষ করে একটু পরিচিতগুলো, কিভাবে মূল্য নির্ধারণ করে তা নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করবার নেই। আমি একজন বিদেশী তাকে বলতে শুনেছি, যে বাংলাদেশে খাবারের দোকানে খাদ্য তালিকায় মূল্য নির্ধারণের কোন মাপকাঠি নেই। দাম ধরে দিলে যদি গ্রাহকের কমতি না হয় তাহলেই হল। এখানে সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কতদিন আমাদের দেশে এ ধরনের 'তুঘলকি' কারবার চলবে তা সৃষ্টিকর্তাই ভাল জানেন। ভারত এ দিক থেকে অনেক এগিয়ে।

আমরা করিমস্-এ খাবার খেয়ে যখন জামে মসজিদের দক্ষিণ গেটের সামনে, তখন উপমহাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম তথা ভারতের বৃহত্তম লালপাথরের তৈরি জামে

www.pathagar.com

মসজিদের মাইক হতে আছরের আজানের ধ্বনি শুনতে পেলাম। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখছি যে, বর্তমানে উপমহাদেশের সবচাইতে বড় মসজিদ ইসলামাবাদে, পাকিস্তানের ফয়সল মসজিদ-এর পরেই রয়েছে দিল্লীর জামে মসজিদ সদৃশ্য লাহোরের বাদশাহী মসজিদ। ওই মসজিদটি দিল্লী এবং আগ্রার দুর্গের আদলে তৈরি দুটোর অন্যতম মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৈরি লাহোর দুর্গের সম্মুখ প্রান্তে।

লাহোরের (পাকিস্তান) বাদশাহী মসজিদটি তৈরি করেন সম্রাট আওরঙ্গজেব হুবহু দিল্লীর জামে মসজিদের আদলে। ওই মসজিদটিতে রয়েছে চারকোণায় চারটি মিনার। মসজিদের অভ্যন্তরে ১০,০০০ এবং চত্বরে প্রায় ১ লাখ মুসল্লি একই সময় নামাজ পড়তে পারেন। বাদশাহী মসজিদের চত্বর বিশ্বের মসজিদগুলোর মধ্যে সবচাইতে বড় চত্বর। আওরঙ্গজেব তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে দিল্লীর অনুরূপ লাহোরে এ মসজিদের নির্মাণ শুরু করেছিলেন ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে। মাত্র দু'বছর সময়ে ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে এ মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। কথিত আছে আওরঙ্গজেব মসজিদটি তার পিতার তৈরি দিল্লীর জামে মসজিদ হতে অবশ্যই বড় বানাতে চেয়েছিলেন। আরও কথিত আছে যে, এ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে আওরঙ্গজেব চেয়েছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি জীবনে তাহাজ্জুতের নামাজ ক্বাজা করেননি। খোদ সম্রাটকে ছাড়া আর কাউকে এমন ধর্মপ্রাণ পাওয়া যায়নি বলে আওরঙ্গজেব নিজেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তবে দিল্লীর সাথে লাহোরের মসজিদের আরও পার্থক্যের অন্যতম হল বাদশাহী মসজিদে দিল্লীর জামে মসজিদের মত তিনটি প্রবেশ দ্বার নেই। লাহোরের বাদশাহী মসজিদে একটাই প্রবেশ দ্বার মাত্র।

আমরা দিল্লীর জামে মসজিদের দক্ষিণ গেটে আসতেই আমাদের চোখে পড়ল কয়েকটি মাইক্রোবাসে কংগ্রেস নেতা কপিল সিবালের নির্বাচনী কাফেলা। পাশে জোড় পুলিশি তৎপরতা। মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথের দক্ষিণে সবুজ চত্বরে ঘেরা দিয়ে ছোট একটি মঞ্চ বানানো। মনে হল কোন নির্বাচনী সমাবেশের প্রস্তুতির মত। আমার অনুমান সঠিক ছিল। মে ৭, ২০০৯-এ লোকসভার দিল্লীর ৭টি আসনে নির্বাচন। সে নির্বাচনে কপিল সিবাল তার নির্বাচনী এলাকা মুসলিম অধ্যুষিত 'চাঁদনী চক'-এবং শাহজাহানাবাদে প্রার্থী হয়েছেন। আইন মোতাবেক নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ হয়ে যাবার কথা পরের দিন অর্থাৎ মে ৫, ২০০৯-এর দুপুর ১২টার পর হতে। কাজেই কংগ্রেসের নীতি-নির্ধারণ পর্যায়ের এ নেতা ১৪ লক্ষ ভোটারকে ন্যূনতম পক্ষে তার আবেদন পৌঁছাতে এ সময়টুকু কাজে লাগাতে এখানে সভার আয়োজন করেন।

মাত্র দু'দিন পর ভারতে ১৫তম লোকসভার নির্বাচন অথচ এ পর্যন্ত দিল্লী শহরে কোন ধরনের মিছিল, যত্রতত্র মিটিং অথবা কোন পোস্টারের ব্যবহার দেখিনি। যা দৃশ্যমান তা ছিল নির্দিষ্ট স্থানে অথবা বাসস্ট্যান্ডের উপরে বিভিন্ন প্রার্থীর ডিজিটাল

www.pathagar.com

ব্যানার। শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নির্বাচন উপলক্ষে কোন উত্তাপ প্রতিফলিত হয়নি। এমনটা আমরা জয়পুর, রাজস্থানেও দেখেছি। মে ৪, ২০০৯ বিকেলে দিল্লী শহর দেখে মনে হয়নি আর মাত্র দু'দিন পর ভারতে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন।

আলোচনা করছিলাম 'চাঁদনী চক' সংসদীয় আসন এবং কংগ্রেস প্রার্থী কপিল সিবালের। তিনি হার্ভাড ল কলেজ, যুক্তরাষ্ট্র, থেকে এলএলএম পাস করেন। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে তার বিপক্ষে প্রার্থী ছিলেন বিজেপির শ্রীমতী জুবিন ইরানী, বিখ্যাত টেলিভিশন নাটক শিল্পী। তিনি 'স ভি কভি বহু থী' নামক হিন্দী সিরিয়ালে 'তুলশি' নামে বাংলাদেশে অধিক পরিচিত।

কপিল সিবাল অত্যন্ত সৎ, গুণী ও কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী এবং একজন সফল মন্ত্রী হিসেবে 'চাঁদনী চক' অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। উল্লেখযোগ্য যে চাঁদনী চক এর রেডফোর্ট বা লাল কেল্লা এবং জামে মসজিদের এলাকা মুসলমান অধ্যুষিত। এক কথায় পুরনো দিল্লীতেই অধিক সংখ্যক মুসলমানদের বাস। কপিল সিবাল মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় এবং ইতোপূর্বে ২০০৪-এর নির্বাচনেও তিনি জয়ী হয়েছিলেন। এবারও, ২০০৯-এর নির্বাচনে, প্রায় ২ লাখ ভোটের ব্যবধানে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি-র মিঃ ভিজেন্দ্র গুপ্তাকে পরাজিত করেন।

'চাঁদনী চক' সংসদীয় এলাকা সবচাইতে পুরাতন এলাকা যার ভোটার সংখ্যা ২০০৯-এর নির্বাচনের জন্য দাঁড়িয়েছে ১৪,১৩,৫৩৫ জনে। এখানে প্রার্থী ছিলেন মোট ৪১ জন। এর মধ্যে দু'জন ছাড়া জামানত হারিয়েছেন ৩৯ জন। এ সংসদীয় এলাকায় নির্বাচনের জন্য কেন্দ্র ছিল ১৪৯২টি। উল্লেখ্য যে, লোকসভায় মোট ৫৪৩টি আসন শহর ও গ্রামভিত্তিক এবং জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এ ছাড়াও ভারতের সংবিধান বলে রাষ্ট্রপতি ২ জন এঙ্গলো ইন্ডিয়ান মূলের ব্যক্তিদের লোকসভার সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন। তাছাড়াও ভারতীয় রাষ্ট্রপতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ১২ (বার) জন রাজ্যসভার সদস্য নিয়োগও দিতে পারেন। এ নিয়ে আরও পরে বিশদ আলোচনা করব।

যাই হোক, আমি আলোচনা করছিলাম দিল্লীর জামে মসজিদ নিয়ে যার প্রেক্ষিতে লাহোরের বাদশাহী মসজিদের বিষয়টিও আলোচিত হল।

আমি আমার সফরসঙ্গীদের মসজিদে গিয়ে আছরের নামাজ পড়তে আহ্বান জানালাম। বললাম এক কাজে দু'কাজই হবে। নামাজ শেষে এই ঐতিহাসিক মসজিদটি দেখা হবে। আমার সহধর্মিণী, অপর সহকর্মী ও সানাউল্লাহ গাড়ির শীতাতপে বসে থাকতেই আগ্রহ দেখালেন বেশি এবং ওখানে বসেই কছর নামাজ শেষ করেছিলেন। সেদিন দিল্লীতে ছিল প্রচণ্ড গরম। পড়ন্ত বেলাতেও উত্তাপ ছিল অসহনীয়, তার উপরে ভ্রমণের ক্লান্তি। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম একাই যাব। এরপরে যখন দিল্লীতে

www.pathagar.com

ফিরে আসব তখন হয়ত এদিকে নাও আসা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে হয়ত মসজিদটি দেখা হবে না।

আমি দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথে এগিয়ে চৌহদ্দির ভেতরে সামনে বসানো নিরাপত্তা দরজা, 'ম্যাগনেটিক আর্চ',-এর মধ্য দিয়ে এগুলে কর্তব্যরত পুলিশ দেহ তল্লাশির পর যেতে দিলেন। মসজিদের প্রতিটি প্রবেশ পথের সীমানায় বসানো আছে 'ম্যাগনেটিক আর্চ' নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আর্চের মধ্য দিয়ে গেলেও প্রত্যেকের দেহ তল্লাশি করা হয়। এর কারণ, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে জামে মসজিদে সন্ত্রাসী বোমা হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবার ঘটনা। ওই হামলার পর হতেই এত নিরাপত্তা ব্যক্তি মোতায়েন করা হয়। ওই হামলায় ১৩ জন নিরীহ মানুষ মারাত্মকভাবে আহত হন। এদের বেশির ভাগই ছিলেন মুসুল্লি। দিনটি ছিল শুক্রবার, আছরের সময়। শুধু জামে মসজিদেই নয়, দিল্লী, আগ্রা, আজমীর এবং জয়পুর যেখানেই গিয়েছি প্রতিটি ঐতিহাসিক স্থাপনা ও নিদর্শনগুলোতে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ভারতে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী নানা কারণে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে প্রয়াস নিয়েছে। এর মধ্যে তথাকথিত জিহাদীদের আক্রমণই হয়েছে বেশি। যদিও ভারত এতদিন পাকিস্তান এবং কখনও কখনও বাংলাদেশকেই এসব তথাকথিত জিহাদী আক্রমণের জন্য দায়ী করে আসছিল। কিন্তু ক্রমেই ভারত সরকার স্বীকার করতে শুরু করেছে যে খোদ ভারতেই সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাথে বিমাতাসুলভ আচরণের কারণেই ওই দেশের কিছু সংখ্যক মুসলমানও 'জিহাদী' তৎপরতায় জড়িয়ে পড়ছেন। তথাকথিত জিহাদের নামে সম্প্রীতি নষ্ট করবার অভিযোগ উঠছে ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধেও।

আমি জামে মসজিদের দক্ষিণের প্রবেশ দরজার উদ্দেশ্যে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। অত্যন্ত প্রশস্ত লাল পাথরে বড় আকারের সিঁড়ির ধাপ। মসজিদের তিনটি প্রবেশপথে উঠতে উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব গেটে বহু ধাপ পার হতে হয়। তবে এ ধাপগুলো সমান সংখ্যক নয়। দক্ষিণ প্রবেশ দ্বারে পৌঁছতে ৩৩টি, উত্তর প্রবেশ পথে উঠতে ৩৯ এবং পূর্ব প্রবেশপথ দিয়ে উঠতে ৩৫টি ধাপ পার হতে হয়। পূর্বের প্রবেশ পথটিই ব্যবহার করা হত রাজদরবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য।

দিল্লীর জামে মসজিদ নির্মাণ করেন সম্রাট শাহজাহান এবং এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে। শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্যপিপাসু রুচিবান সম্রাট। তার সময়েই মোগল স্থাপত্যের ব্যাপক বিকাশ হয়। আওরঙ্গজেবকে কট্টরবাদী মুসলিম শাসক বলা হলেও শাহজাহানের সময়েই হিন্দুস্থানে বহু সুদৃশ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছে। আজমীর, আগ্রা এবং দিল্লীতে শাহজাহানের নির্দেশে নির্মিত বহু মসজিদ এখনও আবাদ রয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল– এ সব মসজিদের নক্সা ও নির্মাণশৈলী প্রায় একই রকম।

www.pathagar.com

আমি ৩৩টি ধাপ পেরিয়ে সুবিশাল মোগল শৈলীর ধারাবাহিকতায় নির্মিত প্রবেশ পথ দিয়ে মসজিদের বিশাল চত্বরে পৌঁছলাম। অপূর্ব সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্য। হাজার হাজার জংলী কবুতর– আমরা জালালী কবুতর বলি– চত্বরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। বহু দর্শনার্থী আর মুসুল্লিরা কবুতরকে খাওয়াতে ব্যস্ত। বহু পুরুষ মহিলা, বেশির ভাগই স্থানীয়, মসজিদের চত্বরে ছবি তুলছে। এদের মধ্যে অনেকেই নামাজের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। চত্বরের চারদিকে দেয়াল সংলগ্ন ছোট ছোট খোলা প্রকোষ্ঠ। মাঝখানে বড় একটি চৌবাচ্চা তার মাঝে সুদৃশ্য ফোয়ারা। এখানেই মুসুল্লিরা নামাজের আগে অজু করেন। বেশ কিছু বিদেশী পর্যটককেও দেখা গেল মসজিদ চত্বরে। এ চত্বর এবং মসজিদের প্রধান দালানে প্রায় ২৫ হাজার মুসুল্লি একসাথে নামাজ পড়তে পারেন। তবে সব সময়ে এত মানুষকে একসাথে পাওয়া যায় না শুধুমাত্র দুটি ঈদের নামাজ ছাড়া। উত্তর গেট সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর কিছু ব্যবহার্য বস্তু, একটি চুল মোবারক এবং বহু প্রাচীন কোরআন শরিফ (যা হরিণের চামড়ার উপরে রচিত) হেফাজতে রাখা আছে। এসব দ্রব্য আমাদের রসূল (সাঃ) এর বলে দাবি করা হয়। তবে এগুলো সর্বসময়ে উন্মুক্ত থাকে না। সোমবার হওয়াতে সে দিন খোলা ছিল না।

মসজিদটি পূর্ব-পশ্চিমে ৮০ মিঃ, উত্তর দক্ষিণে ২৭ মিঃ। তিনটি বড় গম্বুজ আর দু'টি ৪১ মিঃ উঁচু মিনার রয়েছে। মিনারের উপরে উঠার সিঁড়ি থাকলেও প্রায়শই বন্ধ রাখা হয়। মসজিদের দালানের পূর্বদিকে রয়েছে এগারোটি আর্চ। ভেতরে রয়েছে সুদৃশ্য মিম্বর। সমস্ত ফরাসটি সাদা মার্বেল দ্বারা নির্মিত এবং বর্ডারে ব্যবহৃত হয়েছে কালো পাথর। মসজিদের ভেতরে প্রত্যেক মুসুল্লির জন্য কালো মার্বেল দিয়ে প্রতি কাতারে জায়গা নির্দিষ্ট করা। ৮৯৯টি এমন জায়গা চিহ্নিত করা রয়েছে। সহজভাবে বলা যায় যে, ৮৯৯ জন মুসুল্লির জন্য মসজিদের দালান তৈরি করা হয়েছিল। কথিত আছে দিল্লীর জামে মসজিদ ছোটখাট একটি পাথরের পাহাড়ের উপর তৈরি করা হয়েছিল যে কারণে সিঁড়ির ধাপের এ তারতম্য।

আমি মসজিদের মূল দালানে আছরের ওয়াক্তের ওয়াক্তিয়া জামাত শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে কছর নামাজ শেষ করে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর প্রবেশ পথ দিয়ে বের হয়ে আসবার পূর্বে পূর্বদিকের প্রবেশ পথের বাইরে দিল্লী শহরের সবচাইতে আকর্ষণীয় এলাকা দেখলাম। এলাকাটি একটি অত্যন্ত বৃহৎ বস্তি। অদূরে লাল কেল্লা। তার কিছু দূরেই মৃতপ্রায় যমুনা নদী। বস্তি আরও বড় ছিল। এ বস্তির প্রায় নব্বই ভাগেই দিল্লীর সংখ্যালঘু মুসলমানদের বাস। এক সময়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র সঞ্জয় গান্ধী দিল্লীর এ অঞ্চল থেকে বস্তি উচ্ছেদ করবার উদ্যোগ নিয়ে জামে মসজিদের বাইরের সম্পত্তির কিছু অংশ উদ্ধার করলেও সমস্ত বস্তি উদ্ধার করা তার পক্ষেও সম্ভব

www.pathagar.com

হয়নি। এ মসজিদের দক্ষিণ প্রান্তের শাহজাহানবাদের ঘনবসতির কোন এক নাম না জানা গলি তুর্কমান গেটের নিকট সম্পূর্ণ অবহেলায় খোলা আকাশের নিচে পড়ে রয়েছে দিল্লী সালতানাতের একমাত্র মহিলা সুলতান ইলতুতমিসের কন্যা জালালউদ্দিন রাজিয়া (১২০৫-১২৪০) বা রাজিয়া সুলতানা সময়ের অভাবে ওই দিন রাজিয়া সুলতানার কবরে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

ভবিষ্যতে 'চাঁদনী চক' দেখতে এলে আরেকবার চেষ্টা করব মুসলিম শাসন কালের একমাত্র মুসলিম নারী শাসকের কবর 'জিয়ারতে' যতটুকু শুনেছি যে, ওই জায়গা এতই ঘনবসতি পূর্ণ যে সহজে যাওয়া যায় না। শুনেছি ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ওই জায়গা উদ্ধারের চেষ্টা করছে। তবে এখন সেখানে মাঝে মধ্যে বাতি জ্বালিয়ে কাওয়ালী হয়।

সুলতানা রাজিয়াকে যেখানে এক কৃষক হত্যা করে মাটি চাপা দিয়েছিল সেখানেই পরে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। এ জায়গাটাই সে জায়গা ছিল কিনা তা জানবার একমাত্র উপায় ভারতের আর্কাইভে যদি কোন তথ্য থেকে থাকে- সেখান হতে উদ্ধার করা।

এতক্ষণে পাঠক হয়ত অধৈর্য হয়ে পড়েছেন এ কারণে যে আমি রাজিয়া সুলতানার প্রসঙ্গের মূলে না গিয়ে আগেভাগে এ কথাগুলো তুললাম কেন? কারণ, সুলতানা রাজিয়ার ক্ষমতারোহণ ছিল যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি তার ক্ষমতা হারানো এবং দুঃখজনক মৃত্যুও ছিল হৃদয়বিদারক।

সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিস যখন মারা যান তখন তিনি চার পুত্র- রোকনউদ্দিন, মইজউদ্দিন, নাসির উদ্দিন ও কুতুবউদ্দিন এবং দুই কন্যা রাজিয়া ও সাজিয়াকে রেখে যান। আর কুতুবউদ্দিন, মইজউদ্দিন এবং সাজিয়া ছিলেন এক মায়ের এবং অপর দু'জন ছিলেন বৈমাত্রেয়।

ইলতুতমিস-এর মৃত্যুর পর রোকনউদ্দিন সুলতান হবার পর পরই তিনি নৃশংসতার পরিচয় দেন। প্রথমে তিনি বৈমাত্রেয় আরেক ভ্রাতাকে হত্যা করেন। রাজিয়া মহিলা ছিলেন বলে প্রাণে বেঁচে গেলেও সৎ ভাইয়ের অমানুষিক যন্ত্রণার শিকার হন। এক পর্যায়ে রাজিয়া তার জীবনের প্রতি হুমকি অনুভব করে শংকিত হয়ে পড়েন। আশংকা ক্রমেই বাড়তে থাকলে কোন এক শুক্রবার রাজিয়া অভিযোগকারীর পরিধেয় সহকারে রাজ প্রাসাদের দেয়াল সংলগ্ন প্রধান মসজিদের মাঝের দেয়ালের উপর অভিযোগকারীর নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে উপস্থিত মুসুল্লি এবং প্রধান কাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি অভিযোগ করে বলেন "আমার ভাই রোকনউদ্দিন তার ভাইকে হত্যা করেছে তা সকলেই জানেন। তিনি এখন আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আমি আমার বাবার দোহাই দিয়ে আপনাদের কাছে বিচার প্রার্থী।"

www.pathagar.com

রাজিয়া তার বাবার কথা এবং রোকনউদ্দিনের নৃশংসতার কথা বলে যা করেছিলেন সেটি ছিল গণঅভ্যুত্থান। ক্ষিপ্ত জনগণ ওই সময়ে মসজিদে উপস্থিত সুলতান রোকনউদ্দিনকে রাজিয়ার সামনে নিয়ে আসলে জনতার উদ্দেশে রাজিয়া বললেন "হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যু।"এ কথার পর রোকনউদ্দিনকে হত্যা করা হয়। রাজিয়ার অন্যান্য ভাইয়েরা নাবালক থাকবার কারণে জনগণ রাজিয়াকেই দিল্লীর সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করে।

রাজিয়া ভাইদের মধ্য থেকে যুদ্ধবিদ্যা আর অশ্বরোহে পারঙ্গম হতে গিয়ে নারী সুলভ আচরণ প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। অশ্বারোহ আর অসিবিদ্যা শিখতে গিয়ে হাবশি দাস মালিক জামালউদ্দিন ইয়াকুতের সাথে অন্তরঙ্গতা বাড়ে এবং প্রণয় পর্যায়ে পৌঁছে। হেরেমের বাইরে ইয়াকুত ছিলেন একমাত্র পুরুষ যিনি রাজিয়াকে ঘোড়ার পিঠে চড়াতে আর নামাতে শরীর স্পর্শ করতেন। তাছাড়া রাজিয়া সুলতান হবার পর হতে পর্দা ছেড়ে উন্মুক্ত মুখমণ্ডলে অশ্বারোহী হয়ে যুদ্ধে নেতৃত্বও দিতেন। এসব 'বে-আবরু' কর্মকাণ্ড তৎকালীন রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ এবং ওলেমাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে মালিক ইয়াকুতের সাথে সুলতানা রাজিয়ার প্রেমের চর্চা দিল্লী সালতানাতে গুঞ্জন শুরু কবলে ওলেমারা তাকে বিয়ের জন্যে রাজি করাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সুলতানার অসম্মতির কারণে কোন প্রচেষ্টাই কার্যকর হয়নি।

যদিও রাজিয়া সুলতানা দিল্লীর সুলতান হয়েছিলেন, কিন্তু সেটা তার অন্যান্য ভাইদের পছন্দ হয়নি। রাজিয়া সুলতানা যখন বাটিন্ডায় এক বিদ্রোহ দমনে ইয়াকুতকে নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত তখন খবর পেলেন তার অবর্তমানে ভাই মইজউদ্দিন✦ বাহরামকে সুলতান হিসেবে মনোনীত করেছে দরবারের আমীর ওমরাহ ও ওলেমারা। ওই বিদ্রোহে রাজিয়ার বিপক্ষে যোগ দিয়েছিল বাটিন্ডার গভর্ণর রাজিয়ার বাল্যকালের বন্ধু, মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন আলতুনিয়া। ওই যুদ্ধে রাজিয়ার বহুদিনের সাথী কথিত প্রেমিক মালিক ইয়াকুতের মৃত্যু হয়। সুলতানা রাজিয়া আলতুনিয়ার হাতে বন্দি হলেন। আলতুনিয়া রাজিয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে অবশেষে রাজিয়া সুলতানা আলতুনিয়াকে বিয়ে করে মইজউদ্দিন বাহরামের হাত হতে দিল্লীর সালতানাত ফিরিয়ে নিতে আলতুনিয়ার শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করেন। সে যুদ্ধে পরাজিত হয় রাজিয়া ও আলতুনিয়ার বাহিনী। আলতুনিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রেই মারা যান। রাজিয়া পুরুষের বেশ ধরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান।

সুলতানা রাজিয়া কয়েক দিন বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে পুনরায় শক্তি যোগাড়

✦ *ইবনে বতুতা ইলতুতমিস-এর আরেক পুত্র মইজউদ্দিনের হত্যার কথা উল্লেখ করলেও পরের ঐতিহাসিকরা ইবনে বতুতার ভুল শুধরিয়ে কুতুবউদ্দিনের হত্যার কথা উল্লেখ করেন। কারণ, রাজিয়া সুলতানাকে হটিয়ে তার ভাই মইজউদ্দিন ক্ষমতা দখল করে ১২৪০-৪২ পর্যন্ত দিল্লীর সুলতান ছিলেন।*

www.pathagar.com

করতে না পেরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে মাঠে কর্মরত এক কৃষকের কাছে কিছু খাবার নিয়ে খেয়ে ক্লান্তিতে সেখানেই শুয়ে পড়েন। কৃষক ঘুমন্ত রাজিয়ার ভেতরের কাপড়ের একাংশ দেখে বুঝতে পারেন যে, তিনি একজন সাধারণ সিপাহী নন, মহিলা এবং গায়ে অত্যন্ত দামী রত্ন খচিত পোশাক রয়েছে। দিনটি ছিল অক্টোবর ১৪, ১২৪০। ওই কৃষক রাজিয়াকে হত্যা করে সেখানেই মাটি চাপা দিয়ে শরীরের কাপড় এবং দামী রত্নসহ বাজারে বিক্রির সময় ধরা পড়লে সুলতানা রাজিয়ার লাশ ওই গর্ত হতে তুলে মুসলিম রীতিনীতি অনুযায়ী সেখানেই পুনরায় দাফন করা হয়।[১]

রাজিয়া সুলতানা, উপমহাদেশের প্রথম মহিলা শাসক হিসেবে ইতিহাসে সু-শাসক চিহ্নিত হলেও তৎসময়ের রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ তাঁকে তেমনভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। বিশেষ করে মালিক ইয়াকুত-এর সাথে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক বহুল আলোচিত হওয়ার কারণে আমীর ওমরাহগণ তাঁর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন। ইয়াকুত ছিলেন হাবসি আর তৎসময়ের দরবারিরা ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত বনেদী সমাজের ব্যক্তিবর্গ।

যাই হোক বর্তমানে রাজিয়ার কবর শাহজাহানাবাদ-এর তুর্কমান গেটে যে জায়গায় সে জায়গাটির নাম বুলবুল-ই-খানা। বর্তমানে অযত্নে থাকলেও পাশের ছোট মসজিদে (কালান মসজিদ) ওয়াক্তিয়া নামাজ হয়। ওই জায়গাটি শাহজাহানাবাদ পত্তনের পূর্বে গহীন জংগল ছিল।

বর্তমানে রাজিয়ার কবরের পাশে আরেকটি কবর রয়েছে। অনেকে মনে করেন এটা তার বোন সাজিয়ার কবর হতে পারে। তবে কিভাবে ওই কবরটি এখানে হয়েছে তার বৃত্তান্ত আমি পাইনি। অনেক ঐতিহাসিক আরও মনে করেন যে রাজিয়ার মৃত্যু হয়েছিল বর্তমানের হরিয়ানার কাইতালি যুদ্ধ ক্ষেত্রে এবং সেখানেই তার সমাধি রয়েছে। তবে তুর্কমান গেট-এ 'কালান মসজিদ' সংলগ্ন অরক্ষিত কবরটি রাজিয়ার বলেই চিহ্নিত। রাজিয়া সুলতানার শাসনকাল যে ভাবেই আলোচিত হোক বাস্তবতা হল তিনিই প্রথম মহিলা যিনি উপমহাদেশ তথা মুসলিম জগতের প্রথম স্বাধীন শাসক ছিলেন। তবে ওই সময়ে পুরুষ সমাজ তার শাসনকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি।

রাজিয়া আর ইয়াকুত-এর প্রেম কাহিনী নিয়ে ভারতের মরহুম চলচ্চিত্রকার কামাল আমরোহী হেমা মালিনী ও ধর্মেন্দ্র অভিনিত 'রাজিয়া' নামের ছায়াছবি তৈরি করেছিলেন। হেমা মালিনী নাম ভূমিকায় এবং ধর্মেন্দ্র মালিক ইয়াকুত-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

১। *The Travels of Battuta Vol, Opcil,-P 632.*

www.pathagar.com

ফিরে আসছি উপমহাদেশ খ্যাত দিল্লীর জামে মসজিদের আলোচনায়। জামে মসজিদের স্থপতি (architect) ছিলেন উস্তাদ খলিল। বর্তমানে এ মসজিদ পরিচালনা করবার জন্য একটি বোর্ড রয়েছে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ মসজিদ কমিটির দায়িত্বে। আমার কাছে মনে হল এ মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ভালভাবে হচ্ছে না। মসজিদের চত্বর অপরিষ্কার। ভেতরে সাদা মার্বেলের ফরাস খুব পরিষ্কার মনে হলো না এবং পরিষ্কার করবার প্রয়াসও তেমন নেয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যেহেতু মসজিদের দায়-দায়িত্ব মুসলিম সদস্য দ্বারা গঠিত কমিটির হাতে তাই হয়ত রক্ষণাবেক্ষণ তেমনভাবে হয় না। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েক বছর পূর্বে সৌদি সরকার সরাসরি মসজিদ কমিটিকে ১০০ মিলিয়ন ডলার দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ভারত সরকার এ প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সৌদি সরকার পুনরায় ভারত সরকারের মাধ্যমে মসজিদের জন্য এ বিশাল অংকের প্রস্তাবনা দিয়েছেন। কিন্তু ভারত সরকার এখন পর্যন্ত সে প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি। সাড়া না দেবার কারণ যদিও প্রকাশিত হয়নি তবে অন্য কোথাও, হয়তবা সরকার ভারতে সূফী ইসলামের চর্চাকে ওয়াহিবীতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হতে দিতে চাইবে না। এমন নয় যে, ভারত ঐতিহাসিক নিদর্শনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাইরের সাহায্য নেয়নি— মোগল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আগা খান ফাউন্ডেশন প্রচুর অর্থ জোগান দিয়েছে। আগা খান ফাউন্ডেশন শুধু সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিই নয়, আরও অনেক নিদর্শন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুদান দিয়েছে।

আমরা জামে মসজিদ ছেড়ে হোটেলের উদ্দেশে রওনা হলাম। হোটেলে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। দিল্লীর গরমভাব তখনও কমেনি। রাতে আমাদের খাবারের দাওয়াত ছিল বাংলাদেশ হাইকমিশনের পলিটিক্যাল কাউন্সিলর মিস্ মাশফি বিন সামস-এর বাসায়। দাওয়াতের পর আমরা মাশফির বাসা হতে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন রাত প্রায় এগারোটা। পরের দিন সকাল এগারোটায় দিল্লীর 'নির্বাচন সদন'-এ পর্যবেক্ষক দলের ব্রিফিং আছে। ওই ব্রিফিং-এ সম্যক ধারণা দেয়া হবে ভারতের ১৫তম লোকসভার এক মাসব্যাপী, পর্যায়ক্রমে পাঁচ ধাপে, নির্বাচনের এ বিশাল আয়োজনের উপরে। আমি হোটেলের রিসিপশন থেকে জেনে নিলাম প্রাতঃভ্রমণের জন্য কাছেই কোন উদ্যান আছে কিনা। কর্তব্যরত রিসিপশনিস্ট জানাল, পাশের ছোট বিপণী কেন্দ্রের পেছনেই 'বসন্ত বিহার' এলাকার উদ্যান (Park)। আমি প্রাতঃভ্রমণে বের হব বলে মনঃস্থির করে আমার রুমের দিকে রওনা হলাম।

www.pathagar.com

চার

'সত্যামেভা জায়তে'
ভারতীয় নির্বাচন কমিশন

দিল্লী, মে ৫, ২০০৯ সকাল পাঁচটা। হোটেলের রুম থেকে পেছনের জানালার পর্দা সরিয়ে কথিত পার্কের একাংশ দেখে নামাজ পড়ে হাঁটার প্রস্তুতি নিয়ে ওই পার্কের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। ছোট একটি আধুনিক শপিং মল, 'প্রিয়া' পার হতেই পার্কের দেখা পেয়ে ভেতরে ঢুকতেই প্রচুর লোককে হাঁটতে দেখলাম। বেশ বড় পার্ক। হাঁটার জন্য একটা ট্র্যাক করা আছে। দৈর্ঘ্য হবে প্রায় এক কিলোমিটারের উপর। এমনটাই আমি চেয়েছিলাম। এক চক্কর শেষ করবার পর দেখলাম অনেক নারী, পুরুষ মাঝে এক চিলতে ঘাসের লনে বসে 'ইয়োগা' ব্যায়াম করছেন। বহু লোক, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের এবং ভাষার, এক সাথে হেঁটে চলেছেন।

ভারত একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর এবং বিচিত্র দেশ। শুধু ধর্মের দিক থেকেই নয় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার এমন মিলন বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিরল। ভারতে বহু ভাষা রয়েছে। যদিও হিন্দি রাষ্ট্রভাষা তবে ইংরেজি এক প্রকার অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। ভারতীয় সংবিধানে ২২টি প্রধান আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে সরকারি দলিলাদি প্রণয়ন করার অনুমতি আছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু বলেছিলেন, প্রতি ৫০ মাইল অন্তর ভারতের স্থানীয় ভাষার পরিবর্তন হয়। এ পার্কে প্রবেশ করে এমন বৈশিষ্ট্যই আমার চোখে পড়ল।

পার্কে প্রাতঃভ্রমণ আমার এক প্রকার নেশার মত হয়ে উঠেছে যে কারণে সদা সর্বদা আমি প্রাতঃভ্রমণের কাপড় সাথে নিয়েই দেশে-বিদেশে সফর করি। ভারত সফরেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। যে পার্কটির আলোচনা করছি সেটি বেশ পুরাতন, 'বসন্ত বিহার পার্ক' নামে পরিচিত। পার্কটি বিশেষ পরিচর্যার অভাবে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। মনে হয় এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্বে কেউ নেই। পার্কের মধ্যভাগে সুলতানদের আমলের একটি পুরাকীর্তি রয়েছে। দেখে মনে হয় শহর রক্ষার জন্য সৈনিকদের আউটপোস্ট হবে। কোথাও তেমন কিছু তথ্য নেই— শুধুমাত্র একটি সাইনবোর্ডে ভারতের পুরাকীর্তি বিভাগের নোটিশ অঙ্কিত।

'বসন্ত বিহার পার্কে' ভ্রমণরত বেশির ভাগ লোকের হাতে লাঠি দেখে প্রথমে

www.pathagar.com

আমি ভেবেছিলাম হয়ত কোন ধরনের ফ্যাশন হতে পারে। কারণ, ঢাকার পার্কগুলোতে বহু প্রাতঃভ্রমণকারীদের হাতে এমন লাঠি দেখেছি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে দিল্লীর এ পার্কে এত লাঠির সমাবেশের কারণ বুঝতে পারলাম। পার্কে মানুষের পাশাপাশি কয়েকশ' লা-ওয়ারিশ কুকুরের সমাবেশ দেখলাম। শুধু কুকুরই নয়, কিছু দূর এগুতেই কয়েক গণ্ডা জংলী শূকর পরিবারকে ঘোও ঘোও শব্দ করে এক প্রান্ত হতে আরেক প্রান্তে ছুটাছুটি করতে দেখে কিছুটা শঙ্কিত হলাম। কারণ তখন চলছে বিশ্বব্যাপী 'সোয়াইন ফ্লু' এর আতঙ্ক আর সোয়াইনগুলোই আমার সামনে। বুঝতে বাকি রইল না কুকুর এবং শূকর হতে আত্মরক্ষার্থেই প্রায় সকলেই হাতে লাঠি নিয়েই বের হন। এ দু' জাতের প্রাণী ছাড়াও কয়েক ডজন ষাঁড়-এরও অবাধ বিচরণ দেখলাম। এগুলো সবই 'ছাড়া গরু' বা ধর্ম গরু। ভারতে গো-নিধন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং এক পরিসংখ্যানের পর্যালোচনায় জানা যায়, ভারতে বিশ্বের সবচাইতে বেশি সংখ্যক গরুর বাস। দিল্লীর মত শহরের রাস্তাগুলোতে গরুগুলো অবলীলায় হেঁটে বেড়ায়। কুকুরের সংখ্যাও কম নয়। ভারতে প্রাণীদের রক্ষার্থে সঞ্জয় গান্ধীর বিধবা পত্নী মানেকা গান্ধী অত্যন্ত সোচ্চার। পৌরসভা রাস্তার কুকুর কমাবার কোন প্রচেষ্টা নিতে পারে না। অথচ বহু পাগলা কুকুরের কামড়ে প্রতিনিয়ত বহুলোকের প্রাণহানি হচ্ছে। এ সবের মধ্যেই প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে হোটেলে ফিরলাম।

সকাল দশটায় আমরা 'অশোক রোড'-এ অবস্থিত 'নির্বাচন সদন' দিকে রওনা হলাম। 'অশোকা রোড' সম্রাট অশোকের নামে দিল্লীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। আমার ধারণা ছিল ভারতের ইতিহাসে মৌর্য বংশের সবচাইতে শক্তি ও প্রতিভাধর এ সম্রাটের নামে ভারতের রাজধানীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এরিয়ার রাস্তার নামকরণ দেখতে পাব; কিন্তু তেমনটা দেখিনি। আমার এ ধরনের ধারণার কারণ, ভারতের পতাকায় যে চক্রটি রয়েছে তা সম্রাট অশোকের সময়ে অশোক স্তম্ভের গায়ে অংকিত 'ধর্ম চক্র' এবং ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রতীক অশোকের 'সামাথ সিংহ'।

তবে রাজধানীতে বৃহৎ সড়কের নাম না হলেও ভারতে সম্রাট অশোকের নামে রাষ্ট্রীয় স্থাপনা ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার হতে একাধিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনের ব্যাঙ্কেয়েট হলের নাম অশোকা হল এবং 'অশোক চক্র' নামক পদক সামরিক বাহিনীর সদস্যদের শান্তিকালীন সময়ে অত্যধিক সাহসী কর্মকাণ্ডের জন্য প্রদান করা হয়। এ পদক যুদ্ধকালীন সময়ে প্রদেয় সর্বোচ্চ পদক 'পরম বীর চক্র'-এর সমমর্যাদা সম্পন্ন।

আমি ইতিপূর্বে 'সামাথ সিংহ'-এর কথা উল্লেখ করেছিলাম। সামাথ সিংহ, যাকে ভারতীয় সিংহও বলা হয়, বর্তমানে উত্তর প্রদেশের সামাথ (Samath) নামক স্থানে অশোক স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান চারদিকে চারটি সিংহের মূর্তি। তবে ছবিতে তিনটি দেখা যায়। ছবির তিনটি সিংহ একটি উবু করা পদ্মতুলি সদৃশ্য স্থাপনার উপর

www.pathagar.com

দণ্ডায়মান। এরই পাদদেশে রয়েছে 'অশোক চক্র' যা ভারতীয় পতাকার মাঝে অংকিত। 'অশোক চক্র'-এর একপাশে হাতি আর অপর পাশে ধাবমান অশ্বের প্রতিচ্ছবি খচিত। 'অশোক চক্র' অনেক জায়গায় 'ধর্মচক্র' হিসেবেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। ২৫০ খ্রিস্টপূর্বের নির্মিত অংশ ছাড়া, যা আলাদাভাবে রক্ষিত, স্তম্ভটির বাকি অংশ এবং তিন সামাথা সিংহের অংশ উত্তর প্রদেশের সারমাথ যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তিন সিংহের নিচে এটা কি 'দেবনাতারী' ভাষায় 'মুনডাকা' (Mundaka) উপনিষদ বেদ-এর শেষাংশ "সত্যামেভা জায়তে" (একমাত্র সত্যেরই জয় হবে খোদাই করা আছে)।[১] ভারত সরকার জাতীয় প্রতীক (National Emblem) হিসেবে সম্রাট অশোকের স্তম্ভের এই তিন সিংহের মূর্তি জানুয়ারি ২৬, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবসে নির্ণয় করে।

জাতীয় প্রতীক এবং পতাকার মধ্যখানে ধর্ম চক্র-এর নির্বাচন নিয়ে কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন যে স্বাধীন ভারতের জাতির পিতা মিঃ মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীর অনুসারীরা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের জন্য গান্ধীর 'চরকা'কে নির্বাচন করেছিলেন; এই চরকাই ভারতের পতাকাতেও ব্যবহার করবার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট অশোকের প্রতীকগুলোকে বেছে নেয়া হয়। অশোক চক্রকে 'ধর্ম চক্র' হিসেবে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে। ধর্ম চক্র বৌদ্ধ ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। আমার মনে হয়েছে সম্রাট অশোক স্বাধীন ভারতের জাতীয় প্রতীক এবং পতাকার কারণে ইতিহাস হতে বর্তমানে এসেছেন। তৎকালীন ভারতে অনেক সম্রাট, রাজা-বাদশাহ রাষ্ট্র পরিচালনা করলেও সম্রাট অশোকের মত বিশাল অখণ্ড ভারত শাসন করতে পারেনি। এ কারণেই একজন প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক হারবার্ট জর্জ ওয়েলস (HG Wells) ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন "বিশ্ব ইতিহাসে হাজার হাজার রাজা, বাদশাহ এর উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে অনেকেই দেয়ার হাইনেস (Their Highness) অথবা দেয়ার ম্যাজেস্টি (Their Mejesty) অথবা দেয়ার এক্সজলটেট ম্যাজেস্টি (Their Exalted Mejesty) ইত্যাদিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কখনই অত উঁচুতে উঠতে পারেননি যতটা পেরেছিলেন অশোক দি গ্রেট (৩০৪ খৃঃ পূর্ব ২৩২ খ্রিস্টপূর্ব)। অশোক তার সময় হতে অদ্যাবধি (১৯২২) যে উচ্চতায় ছিলেন সে উচ্চতাতেই রয়েছেন।"

সম্রাট অশোক সম্বন্ধে ইতিহাসের ছাত্ররা বিস্তারিতভাবে পড়েছেন নিশ্চয়ই। তবুও সামান্য চর্চার লোভ সামলাতে পারলাম না। অশোক ছিলেন মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নাতী। অশোকের পিতা ছিলেন বিন্দুসার, দ্বিতীয় মৌর্য সম্রাট। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল পাটালিপুত্র, বর্তমান বিহারের রাজধানী পাটনায়। ওই সময়ে ভারত ছিল ছোট ছোট রাজ্যে খণ্ডিত। চন্দ্রগুপ্তের শাসনের কয়েক বছর পূর্বে, ৩২৭

১. *The State Emblem of India (Prohibition of Improper use) act 2005.*

www.pathagar.com

খ্রিস্টপূর্বে, 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট' ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে সহজে জয় করে নিয়েছিলেন। তিনি পাঞ্জাব পর্যন্ত এসে ফিরে যান। আলেকজান্ডারের পরে তাঁর উত্তরসূরিদের তৎকালীন মগধ দখলের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন চন্দ্রগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্তের মতে আলেকজান্ডার এবং তাঁর উত্তরসূরিরা ভারতের রাজাদের মধ্যে একতাহীনতার সুযোগ নিয়েই এই সব অঞ্চল দখল করতে পেরেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে চন্দ্রগুপ্ত সকলকে একত্রিত করে এক শক্তিশালী বিশাল ভারতের স্থাপনা করেছিলেন। যা পরবর্তীতে অশোক আরও বিস্তৃত করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত শেষ জীবনে জৈন ধর্মের অনুসারী হন। জৈন ধর্ম ভারতের বাইরে প্রসার পায়নি। অপরদিকে মৌর্য বংশের সবচাইতে শক্তিশালী সম্রাট হিসেবে অশোক প্রথম জীবনে ছিলেন দারুণ নৃশংস। তিনিও মধ্যবর্তী জীবনে ধর্মান্তরিত হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন ব্যাপক রক্তক্ষয়ী কলিঙ্গ-এর যুদ্ধের পর। অশোক কলিঙ্গ জয় করলেন ঠিকই। কিন্তু ওই জয়ের পরেই পরিবর্তিত হলেন অন্য অশোকে।

অশোকের পিতা বিন্দুসারও কলিঙ্গ (বর্তমান উড়িষ্যা) জয় করতে বহু চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি। বিন্দুসারের পর রাজত্বের ৮ বছরের মাথায় অশোক কলিঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ যুদ্ধ ছিল ভারতের পুরাতন যুগ হতে মধ্যযুগের ইতিহাসের সবচাইতে রক্তাক্ত যুদ্ধ। কোন কোন ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে যে ওই যুদ্ধে কলিঙ্গ-এর ১,০০,০০০ বেসামরিক জনগণ এবং অশোকের নিজস্ব বাহিনীর ১০,০০০ সদস্য মারা যায়। কলিঙ্গ-এর নদী দয়া দরিয়ার (বর্তমানে ভুবেনশ্বর, উড়িষ্যার ৮ মাইল দূরে) পানি মানুষের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। বহুদিন ধরে মৃত দেহগুলো বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের খোরাকে পরিণত হয়েছিল। কলিঙ্গ-এর যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম অশোকের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। অশোক গৌতম বুদ্ধের অহিংসার বাণীতে দীক্ষিত হয়ে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে বুদ্ধের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কলিঙ্গ-এর যুদ্ধের পর অশোক তার রাজত্বের সীমানা বাড়াবার চেষ্টা না করে পরের ৪০ বছর শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করেন।[২] এ সময়ে অশোক ভারতের বাইরে বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারে সার্থক হন। বিশ্বে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার বহুলাংশে অশোকের কারণেই হয়েছে। তার নির্দেশে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত দূতেরা মধ্য এশিয়া, মিশর, লিবিয়া, ম্যাসিডোনিয়া আর পূর্বে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ধর্ম প্রচার করেন। অশোক ২৩২ খ্রিস্টপূর্বে মৃত্যুবরণ করেন। মৌর্য সাম্রাজ্য এর পর আরও ৫০ বছর টিকে ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম উপমহাদেশে উৎপত্তি হলেও উপমহাদেশের বাইরেই প্রসার হয় বেশি। বৌদ্ধ ধর্ম বর্তমানে বিশ্বের পঞ্চম✦ বৃহত্তম ধর্ম।

---

২. Radha Kumud Mookerji : Chandra Gupta Maurya and his times -Motilal Benaraidas Publicalion.

✦ *বিশ্বের ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা অনুযায়ী, প্রথম খৃষ্টান ২.১ বিলিয়ন, ইসলাম ১.৫ বিলিয়ন; হিন্দু ৯০০ মিলিয়ন, কুনফুসিয়ানিজম (চায়না) ৩৯৪ মিলিয়ন; বৌদ্ধ ৩৭৬ মিলিয়ন*

www.pathagar.com

আমার মনে হয় পরিবর্তিত অশোক নয়–রাজত্বের প্রথম ৮ বছরের অশোককেই স্বাধীন ভারত প্রতীকী হিসেবে গ্রহণ করেছে। ওই সময় ভারতের সীমানা ছিল পশ্চিমে হিন্দুকুশ হতে পূর্বে মায়েনমার (বার্মা) পর্যন্ত।

আমরা যথাসময়ে অশোকা রোডের নির্বাচন সদনে পৌছলাম। আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে ব্রিফিং রুমে নিয়ে আসলেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের একজন যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। সদনে এসে জানতে পারলাম আমাদের সাথে কমিশন সদস্য এমনকি প্রধান নির্বাচন কমিশনার মিঃ নবীন চাওলার সাথে দেখা হচ্ছে না কারণ সমগ্র কমিশন ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সফরে রয়েছেন। আগেই বলেছি– দিল্লীতে আমাদের সাথে যে ক'জন বাইরের নির্বাচন কমিশনার ও কর্মকর্তা যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে দু'জন নেপালী নির্বাচন কমিশনার মিঃ নীলকণ্ঠ উপ্রীতী এবং ড. আয়োধী প্রাসাদ যাদবও ছিলেন। এ দু'জনের সাথে আমাদের প্রথম পরিচয় নেপালে ২০০৮ সালের নির্বাচনের সময়ে। আরও পরে ২০০৮ ডিসেম্বরে এ দু'জন বাংলাদেশে এসেছিলেন নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে সে কথা আগেই বলেছি। নেপালী দুই কমিশনার বাংলাদেশের ডিসেম্বর ২৯, ২০০৮-এর নির্বাচন নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন।

আমাদের সাথে শুধু নেপালী নয়, দলে ছিল ফিলিপাইনের প্রথম একজন মুসলমান নির্বাচন কমিশনার জনাব ইলিয়াস রিচোয় ইউসুফ এবং একজন কর্মকর্তা। শ্রীলঙ্কার কমিশনের একজন কর্মকর্তা ছিলেন পর্যবেক্ষণ দলে। আমাদের সকলকে ছোট্ট একটি গ্যালারি কায়দায় তৈরি ব্রিফিং হলে অভ্যর্থনা জানালো অন্যতম সচিব, মিঃ আর বালাকৃষ্ণনান। সাথে ছিলেন নির্বাচন কমিশনের আইন উপদেষ্টা মিঃ এস কে ম্যানডিরাত্তা। এ দু'জনই মূলত আমাদেরকে ব্রিফিং দেন। ওই সময়েই আমরা জানতে পারলাম যে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার মিঃ নবীন চাওলা অপর দুই সহকর্মী কমিশনার মিঃ এস ওয়াই কোরেশী এবং প্রাক্তন বিদ্যুৎ (Power) সচিব মিঃ ভি এস সম্পাদ দক্ষিণ ভারতে নির্বাচনের আয়োজন সরজমিনে দেখতে বের হয়েছেন বলে এ ব্রিফিং-এ উপস্থিত থাকতে পারছে না। মিঃ বালাকৃষ্ণনান সকাল ১১-৪৫ মিঃ ব্রিফিং শুরু করে প্রায় দু'ঘণ্টার মধ্যে শেষ করলেন।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়ের জনবল মাত্র ৩১০। ভোটার সংখ্যা (২০০৯ খ্রিস্টাব্দে) ছিল ৭১৪ মিলিয়ন এবং জনসংখ্যা ১.২ বিলিয়ন। নির্বাচন কমিশনের গোড়াপত্তন হয় জানুয়ারি ২৫, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে । প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন অত্যন্ত সুপরিচিত বাঙালি পরিবারের সরকারি কর্মকর্তা, একজন আমলা মিঃ সুকুমার সেন। মিঃ সুকুমার সেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পান মার্চ ২১, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে । প্রায় ৮ বছর সুকুমার সেন এ পদে ছিলেন। তিনি

www.pathagar.com

সিইসি (CEC) পদ ছাড়েন ডিসেম্বর ১৯, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে । লক্ষণীয় বিষয় হল মিঃ সুকুমার সেন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত হবার পূর্বে ভারতের সিভিল সার্ভিসের (ICS) অন্যতম জ্যেষ্ঠ পদ পশ্চিম বাংলার মুখ্যসচিব ছিলেন এবং চাকরিতে থাকা অবস্থাতেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে প্রেষণে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সুকুমার সেনের সামনে বিশাল এক চ্যালেঞ্জ ছিল তৎসময়ের ২৬টি রাজ্যের ২১ বছর বয়সি প্রায় ১৮ কোটি নাগরিককে ভোটার লিস্টে তালিকাভুক্ত করা ভারতের তৎকালীন অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সত্বর নির্বাচনের জন্য তাগাদা দিলেও মিঃ সুকুমার সেন সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই নির্বাচনের মাঠে নেমেছিলেন। তাকে সহযোগিতা করতে দু'জন রাজ্য নির্বাচনী অফিসারকে এবং প্রত্যেক রাজ্যে একজন করে প্রধান ইলেকশন কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে তাদের সহযোগিতায় মিঃ সুকুমার সেন ভারতের প্রথম অবাধ নির্বাচন করতে সক্ষম হন।

ভারতে প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে। নির্বাচনের পর ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচন সংক্রান্ত প্রধান আইন আরপিএ (RPA-1952 : Representation of Peoples Act 1952)। সংসদ কর্তৃক পাস করা হয়। ওই নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হয় এবং মিঃ জওহরলাল নেহেরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। এখন ভাবতে অবাক হতে হয় যে কিভাবে মিঃ সুকুমার সেন ওই সময়ে এ বিশাল নির্বাচন অনুষ্ঠান করেছিলেন। কারণ, তাঁকেই প্রথমবারের মত ভারতের গণতান্ত্রিক নির্বাচনের উপাদানগুলোকে এককভাবে সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

মিঃ নেহেরু সুকুমার সেনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে শক্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দিয়েছিলেন। মিঃ সুকুমার সেন ইলেকশন কমিশনকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়েছিলেন বলেই আজ পর্যন্ত ভারতে নির্বাচন কমিশন ঠিক তেমনি শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমরাও বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে শক্ত ভীতের উপর দাঁড় করবার প্রয়াসে লিপ্ত ছিলাম প্রায় তিন বছর। আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে গত তিন বছরের আমাদের অর্জন একেবারেই কম নয়।

মিঃ সুকুমার সেনকে ভারতের গণতন্ত্রকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোর জন্য ইতিহাস তেমনভাবে স্বীকৃতি না দিলেও নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠায় সুকুমার সেনের অবদান খাটো করে দেখবার কোন সুযোগ নেই। মিঃ সুকুমার সেন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন শেষ করবার পর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের, যেটি যাত্রা শুরু করেছিল জুন ১৫, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে, প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিযুক্ত হন। মিঃ সুকুমার সেন হতে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে নিযুক্ত মিঃ নবীন চাওলা পর্যন্ত প্রায় ৬০ বছরে ১৬ জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১০তম প্রধান নির্বাচন কমিশনার, টিএন সেসান বিভিন্ন কারণে ছিলেন অধিক আলোচিত। অনেকে মনে

www.pathagar.com

করেন, মিঃ সেসান ভারতীয় নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করেছিলেন। আমাদের দেশেও বিভিন্ন কারণে মিঃ টিএন সেসনের নামই সবচাইতে বেশি উচ্চারিত হয়ে থাকে।

ভারতের নির্বাচন কমিশন আমাদের দেশের মতই একটি সাংবিধানিক আধা-বিচারিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের সংবিধানের মতই ভারতের সংবিধানে যে চারটি স্তম্ভ রয়েছে তার মধ্যে নির্বাচন কমিশন অন্যতম। বাকি তিনটি হল সুপ্রীমকোর্ট অব ইন্ডিয়া, কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল। নির্বাচন কমিশনের গঠন এবং কার্যক্রম ভারতের সংবিধানের ধারা ৩২৪ আওতায় নির্ধারিত। ভারতে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন রাষ্ট্রপতি।

অক্টোবর ১৯৮৯ পর্যন্ত শুধুমাত্র একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিয়োজিত হতেন। আরও দু'জন কমিশনার নিযুক্ত হলেও ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে দু'টি পদ তুলে নেয়া হয়েছিল। এ দু'জন কমিশনারের স্থায়িত্ব এবং অপসারণ নির্ভর করত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের উপর। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে এর পরিবর্তন হয়। ১৯৯১-এ সংসদ নতুন আইন, (যা পরে আবার সংশোধিত হয়), অনুমোদন করে। ওই আইনের প্রেক্ষিতেই পরিশেষে ১৯৯৩ হতে দু'জন নির্বাচন কমিশনার সাংবিধানিকভাবে নিয়োজিত হন। তবে দু'জন নির্বাচন কমিশনার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সুপারিশে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অপসারিত হতে পারেন। আর প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুপ্রীমকোর্ট বিচারকদের অপসারণের পদ্ধতির অনুরূপে পদ হতে অপসারিত হতে পারেন। ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের সাথে আমাদের দেশের নির্বাচন কমিশনের এখানেই উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ তারতম্য। ভারতের নির্বাচন কমিশনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এককভাবে সকল ক্ষমতার অধিকারী। তার অনুকূলে না থাকলে অন্যান্য কমিশনারদের অপসারণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে পুরো কমিশনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ইচ্ছার উপর চলতে হয়। তবে যেহেতু ভারতের গণতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি যথেষ্ট উন্নত, সে কারণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে না। তবুও আমি মনে করি, ভারতীয় নির্বাচন কমিশন এখানেই দুর্বল।

আমার বিবেচনায় আমাদের দেশের সংবিধান রচয়িতারা নির্বাচন কমিশনকে শক্ত ভিতে দাঁড় করাবার জন্যই একাধিক নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করতে হলে একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে একই পদ্ধতিতে বাকি কমিশনারদের নিয়োগ দেয়ার বিধান রেখেছিলেন। যাতে অপর কমিশনাররা স্বাধীনভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। আমাদের সংবিধান ১৯৭২-যারা রচনা করেন তাঁরা এ ব্যবস্থা রেখেছেন হয়ত ভারতের নির্বাচন কমিশনের এই দুর্বলতাকে সামনে রেখে। ভারতে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ হতে শুরু করে অন্যান্য বিষয়, বিশেষ করে গত দু'বছরের

www.pathagar.com

(২০০৭-২০০৮) সংস্কারগুলো যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

ভারতের বর্তমান কমিশনের তিনজন সদস্যই আইএএস (IAS) ক্যাডারভুক্ত প্রশাসনিক আমলা। এদের মধ্যে একজন, মুসলমান কমিশনার, মিঃ এস ওয়াই কোরেশী, চাকরিরত সচিব। কমিশনারের পদায়ন হবার পূর্বে তিনি কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। নির্বাচন কমিশন সদস্যগণ পাঁচ বছরের জন্য নিয়োজিত হলেও বয়স ৬৫ বছর পার হলে অবসরগ্রহণ করেন। হালে পূর্বতন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্বেই বয়সসীমা অতিক্রম করার কারণেই অবসর গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের দেশের নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের বয়সের কোন সময়সীমা নির্ধারিত নেই। তবে এ বয়স সময়সীমা বেধে দেয়া প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি।

ভারতের নির্বাচন কমিশন পাঁচ বছরের জন্য নিয়োজিত হলেও বয়সজনিত শর্তে মেয়াদপূর্ণ হবার পূর্বেই কমিশনারগণ এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবসর গ্রহণ করেন। এ বাধ্যবাধকতার কারণে কমিশনের কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাধারণত নিয়োজিত কমিশনারদের একজনকে পরবর্তী প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে।

আমি আগেই বলেছি যে, ভারতে উন্নত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির কারণে নির্বাচন কমিশন নিয়ে রাজনীতিবিদরা খুব বেশি সোচ্চার হয় না। অথচ আমাদের দেশে দুর্বল সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে নির্বাচনের পরাজয়কে সহজে গ্রহণ করতে না পারার কারণে প্রথমেই পরাজয়ের জন্য কমিশনকে দায়ী করে এমন সব অজুহাত দাঁড় করনো হয় যেন একজন প্রার্থীকে জোর করে হারাতে তৎপর সম্পূর্ণ নির্বাচন ব্যবস্থাপনা। একবারও কোন প্রার্থী মনে করেন না যে, তিনি জনগণের সমর্থন পাননি বলে হেরেছেন।

ভারতের বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার নবীন চাওলাকে নিয়ে তার কমিশনার নিয়োজিত হবার পর হতেই বিরোধী দল বিজেপি এবং পরবর্তীতে এনডিএ সরকারের যথেষ্ট অভিযোগ ছিল। অভিযোগটি ছিল গুরুতর। তার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বিশেষ করে নবীন চাওলার গান্ধী পরিবারের সাথে নৈকট্যের কারণে।[৩] এনডিএ-এর অভিযোগ ছিল যে নবীন চাওলা এবং তার স্ত্রী রূপীকা জয়পুরে একটি ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে কংগ্রেসের অনেক সংসদ সদস্যের কাছ থেকে মোটা অংকের অনুদান নিয়েছেন।[৪] এদের মধ্যে ছিলেন অম্বিকা সোনী, করণ সিংসহ আরও অনেকে। তাছাড়া তিনি ট্রাস্টের জমি পেয়েছিলেন রাজস্থানের কংগ্রেস পার্টির মুখ্যমন্ত্রী অশোক ঘেলটের নিকট হতে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালাম এসব অভিযোগের ভিত্তিতে কোন ব্যবস্থা নেননি। মিঃ চাওলাকে সঞ্জয় গান্ধীর অত্যন্ত নিকটজন বলে

৩। *The Tribune, Chandigarh, Friday, March 17, 2006*
৪। ঐ

www.pathagar.com

চিহ্নিত করেছিল শাহ কমিশন। শাহ কমিশন ১৯৭৫-৭৭-এ ভারতের জরুরি অবস্থার সময়কার কর্মকাণ্ডের উপর তদন্ত করবার জন্য গঠিত হয়েছিল। ওই সময়ে তিনি (চাওলা) দিল্লীর লেফট্যানেন্ট গভর্নরের সচিব ছিলেন।[৫] এ সব অভিযোগ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে একটি দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে বিজেপির উপনেতা, ওই সময় রাজ্যসভায় বিরোধী দলীয় নেতা মিঃ জসওয়ান্ত সিং, সুপ্রীমকোর্টে মিঃ নবীন চাওলাকে অপসারণের জন্য মামলাও করেছিলেন। পরে তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার একটি হলফনামার মাধ্যমে কোর্টকে জানান যে, ভারতের সংবিধানের ধারা ৩২৫(৫) এর দ্বিতীয় শর্ত অনুযায়ী যেহেতু তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট কমিশনারদের এসব কারণে অপসারণের জন্য আবেদন করতে পারেন সেহেতু তিনিই এ ব্যবস্থা নেবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের এ হলফনামার উপর ভিত্তি করে বিজেপি মামলাটি ফেরৎ নেয়। অতঃপর জানুয়ারি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে নবীন চাওলার পক্ষপাতিত্বের বিষয়ে জানিয়ে তার (চাওলার) প্রধান নির্বাচন কমিশনার হবার যোগ্যতা নেই বলে মতামত দিয়ে মিঃ চাওলার অপসারণের জন্য লিখেছিলেন।[৬] তারপরেও নবীন চাওলাকে নিয়োগ দেয়া হয়। ২০০৯-এর ১৫তম লোকসভা নির্বাচন তাঁরই (নবীন চাওলা) নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় এবং কংগ্রেস অবিশ্বাস্য রকমের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।

আমি নবীন চাওলার নিয়োগের উপর ভারতের মুখ্য রাজনৈতিক দলের এবং অন্যদের মতামত এবং নবীন চাওলার অতীত নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ বিশেষভাবে টানলাম বিশেষ কারণে। নবীন চাওলাকে নিয়ে খোদ নির্বাচন কমিশনের মধ্যে টানাপোড়েন আর বিজেপি-এর মামলার ইতিহাস এবং তার গান্ধী পরিবার তথা কংগ্রেসের প্রতি কথিত দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরই তত্ত্বাবধানে ২০০৯-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে বিজেপির অবিশ্বাস্য ভরাডুবি হয়। এ ফলাফলের পরও বিজেপি নবীন চাওলার পক্ষপাতিত্বের তথা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করেনি; বরং সরকারিভাবে ফলাফল প্রকাশের আগেই পরাজয় মেনে নিয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ অনুষ্ঠান বর্জন করতে দেখিনি। পাঠকগণ আমাদের দেশে এমনটি হলে কেমন হতো একবার ভেবে দেখবেন। ডিসেম্বর ২৯, ২০০৮ এর বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন সমগ্র বিশ্বে নিরপেক্ষ এবং তৃতীয় বিশ্বের মডেল নির্বাচন হিসেবে বিবেচিত হলেও পরাজিত দল অথবা প্রার্থীরা এ পরাজয়কে জনগণের ম্যানডেট হিসেবে মেনে নিয়েছেন কি? আজও নির্বাচন কমিশনের আইন অবজ্ঞা করবার প্রবণতা অনেকের রয়েছে এবং অনেকেই উৎসাহও জুগিয়েছেন। একদিকে আমাদের রাজনীতিবিদরা শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন কামনা করেন,

৫। *The Hindu August 8, 2007.*

৬। *ABC Live February 5, 2009.*

www.pathagar.com

অপরদিকে কিছু কিছু সদস্য আইনের প্রয়োগকে দেখেন পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ অথবা রাজনীতিবিদদের হয়রানির প্রক্রিয়া হিসেবে।

আমাদের বোদ্ধাগণ এবং রাজনীতিবিদরা কথায় কথায় ভারতের নির্বাচন কমিশনের উদাহরণ দেন কিন্তু ভারতীয় কমিশনে বাংলাদেশের ২০০৮-এর নির্বাচন এবং কমিশনের সংস্কার ও কার্যকারিতার অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে এমন কি কিছু কিছু বিষয় অনুকরণ (Adoption) এর চিন্তাভাবনা করছে। এ বিষয় একটু পরেই আমি আলোচনা করব।

আগেও বলেছি যে ভারতের নির্বাচন কমিশন গঠনের পর হতেই এটিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনসত্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে ভারতের রাজনীতিবিদ ও সংবিধান প্রণেতারা, বিশেষ করে প্রথম প্রধানমন্ত্রী মিঃ জওহর লাল নেহেরু। সংবিধানের ধারা ৩২৪ মোতাবেক নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন সুপারিশ এবং মতামত রাষ্ট্রপতির জন্য অবশ্য গ্রহণীয়। প্রশাসন হতে সম্পূর্ণ আওতামুক্ত নির্বাচন কমিশনের বাজেট বরাদ্দ হয় চাহিদা মোতাবেক থোক বরাদ্দের মাধ্যমে। বাজেট তৈরি হয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে।

আমাদের দেশের সংবিধানেও রাষ্ট্রপতির উপর এ ধরনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০০৯ তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন জারি হবার পর আমাদের নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর দফতর হতে আলাদা করা হয়েছে। কাজেই বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের আদল ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের অনুরূপ। ভারতের একাধিক প্রধান নির্বাচন কমিশনার আমাদের বলেছেন যে ভারতে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছে দুটি বিশেষ কারণে। প্রথমত; উচ্চ আদালতের সমর্থন এবং রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা। আমরা আশা করি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনও অনুরূপ সহযোগিতার মাধ্যমেই আরও শক্ত ভিতে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

আমরা নির্বাচন সদন-এর ব্রিফিং রুমে একত্রিত হলে মিঃ বালাকৃষ্ণনান এবং মিঃ ম্যানডিরাত্তা আমাদের কমিশনের কাঠামো এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং দেন।

মাত্র দু'দিন পরেই ৮টি রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। প্রসঙ্গত ভারতে ২৮টি রাজ্য এবং ৭টি ইউনিয়ন টেরিটরি রয়েছে। সমগ্র ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে কয়েকটি ধাপে (Phase)। ১৫তম লোকসভা নির্বাচনে এর কোন ব্যাতিক্রম হয়নি।

মিঃ আর বালাকৃষ্ণনান এবং ম্যানডিরাত্তা যৌথভাবে ব্রিফিং দিলেন। প্রথমেই

www.pathagar.com

দু'জনেই বাংলাদেশের নবম সংসদ নির্বাচন ২০০৮-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন যে, তাঁরা বাংলাদেশে নির্বাচনের বেশ কিছুদিন পূর্ব হতেই পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁদের চোখে বাংলাদেশে এ নির্বাচন ছিল অভূতপূর্ব এবং এ পর্যন্ত অসাধারণ। এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা তাঁরা আশা করেননি। মিঃ বালাকৃষ্ণনান বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন, শতভাগ ছবিসহ ভোটার তালিকা এগারো মাসে সম্পন্ন করার বিষয়টি ছিল তাদের কাছে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তিনি বললেন যে, ভারতের নির্বাচন কমিশন গত তিন বছরের উপর সময়ে মাত্র ৮০% ভোটার তালিকায় ছবি সংযুক্ত করতে পেরেছে এবং কয়েকটি রাজ্যে এখনও এ প্রক্রিয়া শুরুই হয়নি।

ভারতে যেভাবে এ তালিকা তৈরি করা হচ্ছিল সে বিষয়ে বাংলাদেশে কাজে হাত দেবার পূর্বেই আমরা সবিস্তারে জানতে চেয়েছিলাম। বিস্তারিতভাবে জানবার পর আমরা ওই পদ্ধতিকে খুব নিখুঁত বলে মনে করিনি। ভারতে ভোটার লিস্ট ছবিযুক্ত। ভোটারদের ছবি আলাদাভাবে তুলে তা স্ক্যান করে জুড়ে দেয়া হয়েছে। কাজেই ভোটারদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়েই ভোটারদের কাছ থেকে ছবি সংগ্রহ করে কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রে আমরা ইনটেগ্রেটেড পদ্ধতিতে লিস্ট তৈরি করেছি। প্রতিটি ভোটারকে কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে একই সাথে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে লিস্টে লিপিবদ্ধ হবার সাথে সাথে ছবি ডিজিটাল পদ্ধতিতে যুক্ত হয়েছে। কাজেই ভুলের সংখ্যা যেমন নগণ্য তেমনি ছবি বাদ যাওয়ার কোন অবকাশই ছিল না। আমাদের ডিজিটাল পদ্ধতির ভোটার লিস্ট তৈরি করতে সামরিক বাহিনীসহ সমগ্র জাতি উৎসাহের সাথে যুক্ত হয়েছিল। ভোটার লিস্টে লিপিবদ্ধ হবার পেছনে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির বিষয়টি যুক্ত করায় আগ্রহ ছিল আমাদের কল্পনার বাইরে। ভোটারগণ ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে ভোটার হয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি বাংলাদেশের এক বিশাল অর্জন। গর্ব করার কারণ রয়েছে। প্রথম দিকে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল যে, নির্বাচন কমিশন এ কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে কি না? সে সন্দেহের জবাব ছিল ২০০৮ সালের নির্বাচন। ইতোপূর্বে কোন নির্বাচন কমিশন এত বড় ঝুঁকি নিতে সাহসও করেনি।

মিঃ ম্যানাডিরাত্তা, নির্বাচন কমিশনের আইন বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশের নির্বাচনী আইন সংস্কারের যথেষ্ট প্রশংসা করে জানালেন যে, আমাদের আইনগুলো তারা খতিয়ে দেখছে এবং আমাদের আইনের কয়েকটি বিধান আগামীতে আরপিএ (RPA)তে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশের বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন। বিশেষ করে প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের জন্য ব্যাংকে আলাদা একাউন্ট খোলার বিষয় এবং কোর্টের আদেশে আট তথ্যের বিশদ বিবরণী। ভারতেও ভোটারদের জ্ঞাতার্থে প্রার্থীর পাঁচটি তথ্যকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ভারতের সুপ্রীমকোর্ট মার্চ ১৩, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে এক ঐতিহাসিক রায় দেয়। এ

www.pathagar.com

রায় দেয় ২০০২ খ্রিস্টাব্দে দায়েরকৃত তিনটি রীট পিটিশনের (রীট পিটিশন নং ৪৯০, ৫০৯ এবং ৫১৫ (২০০২)[৭] প্রেক্ষাপটে।

ভারতের আরপিএ ১৯৫২ (RPA-Representation of the People Act 1952) সুপ্রীমকোর্টের নির্দেশ সংযুক্ত করে তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করেছে। এ তথ্যগুলো হল ঃ

(১) প্রার্থী কোন ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত অথবা অব্যাহতি প্রাপ্ত অথবা খারিজকৃত কিনা?

(২) নমিনেশন দাখিলের ছয় মাস পূর্বে প্রার্থী কোন আদালতে অভিযুক্ত হয়ে এমন কোন ফৌজদারি মামলায় বিচারাধীন রয়েছে কিনা যার শাস্তি দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডের কম নয়। এ ধরনের প্রার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগে চার্জশীট দেয়া অথবা আদালত কর্তৃক অপরাধ আমলে নেয়া হয়েছিল কিনা ?

(৩) প্রার্থীর ও তার পরিবারসহ পোষ্যদের অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তির, ব্যাংক ব্যালেন্সসহ বিবরণ প্রদান।

(৪) প্রার্থীর দেনার দায়ের বিবরণ এবং কোন পাবলিক ফাইনেন্সিয়াল সংস্থার ঋণ গ্রহীতা এবং সরকারের সেবা খাতের ঋণ গ্রহীতা হলে, দায়দেনার বিশদ বিবরণ

(৫) প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা।

এসব তথ্য হলফনামায় দেবার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সুপ্রীমকোর্টের রায় মোতাবেক মনোনয়ন পত্রের সাথে হলফনামা আকারে এ সব তথ্য না দেয়া হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করবার বিধান সংযুক্ত হয়েছে RPA-তে।

উপরে আলোচিত ভারতীয় সুপ্রীমকোর্টের আদেশে পাঁচটি তথ্য আরপিএ ১৯৫২-এর সংযুক্তি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কোর্টের আদেশ গ্রহণ করতে চায়নি সরকার এবং সিংহভাগ রাজনৈতিক দলগুলো। পরে সুপ্রীমকোর্টের আদেশ বাধ্যতামূলক করা হলে এ আদেশ আইনে রূপান্তরিত করতে বাধ্য হয়েছে সরকার। এ বিষয়টি নিয়ে কোর্ট আর রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বেশ কিছুদিন রশি টানাটানি হয়েছিল। এর প্রেক্ষাপট সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরবার প্রয়োজন মনে করি। কারণ, এ পাঁচ তথ্যকে বাধ্যতামূলক করতে আদালত, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের মধ্যে সে টানাপোড়েন চলেছিল তা সুপ্রীমকোর্টের দৃঢ়তায় নিষ্পত্তি হয়েছিল।

সুপ্রীমকোর্টের এ রায়ের প্রেক্ষাপটে ছিল এসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফরমস (ADR) কর্তৃক ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী হাইকোর্টে ফাইল করা জনস্বার্থে মামলা। এ মামলায় আরজি করা হয় যে প্রার্থীগণকে মনোনয়ন পত্রের সাথে

৭। *মহারাষ্ট্র ইলেকশন ওয়াচ(কেরালা) রিপোর্ট-২০০৪*

www.pathagar.com

হলফনামায় তাদের অতীত এবং বর্তমান ভোটারদের সম্বন্ধে জানতে দিতে হবে। এরই প্রেক্ষাপটে দিল্লী হাইকোর্ট নভেম্বর ২,২০০১ খ্রিস্টাব্দে এডিআর এর (ADR) আরজি মঞ্জুর করে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয় যে, ভোটারদের জ্ঞাতার্থে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের কাছ থেকে এসব তথ্য হলফনামার মাধ্যমে সংগ্রহ করবে এবং প্রচার করবে। আদালত আরও নির্দেশ দেয় যে, প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন পুলিশ, গোয়েন্দা সংস্থা এবং সরকারের অন্যান্য সংস্থাকে ব্যবহার করে এসব তথ্য জোগাড় এবং সত্যতা যাচাই করবে।

দিল্লী হাইকোর্টের এ নির্দেশের বিরুদ্ধে জানুয়ারি ২০০১-এ তৎকালীন ভারত সরকার সুপ্রীমকোর্টে আপীল দাখিল করে। সরকারের পক্ষ নেয় বেশ কিছু রাজনৈতিক দল। তখন ইউপিএ (UPA) ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতাসীন ছিল। উভয় পক্ষের শুনানির পর মে ২, ২০০২-এ ভারতের সুপ্রীমকোর্ট ADR-এর সিভিল আপীলের, ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম ADR-Civil Appeal no 7178 of 2001, পক্ষে এক ঐতিহাসিক রায় দেয়। ওই রায়ে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৩২৪-এর আওতায় প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতঃ হলফনামার মাধ্যমে প্রত্যেক প্রার্থীর, যারা সংসদ অথবা রাজ্যপরিষদে নির্বাচন করতে চাইবে নিকট হতে অবশ্যই মনোনয়নপত্রের সাথে পাঁচটি তথ্য বাধ্যতামূলক সংগ্রহ করবে। (The election commission is directed to call for information on affidavit by issuing necessary orders in excercise of its power under Article 324 of the Constitution of India from each candidate, seeking election to the Parliament or state legislature as a necessary part of his nomination paper, furnishing theirin information on the (five) aspects in relation to his/her candidature..]

সুপ্রীমকোর্ট নির্বাচন কমিশনকে এ রায় কার্যকর করতে যথাযথ নির্দেশনা দিতে দু'মাসের সময় বেঁধে দিয়েছিল। সুপ্রীমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সরকারের নিকট নির্বাচনী আচরণ বিধিতে সংশোধনী আনতে অনুরোধ জানিয়েছিল। তৎকালীন ভারত সরকার উল্টো নির্বাচন কমিশনকে সুপ্রীমকোর্ট হতে আরও সময় নিতে অনুরোধ করেছিল। সরকারের এ ধরনের অনুরোধ উপেক্ষা করে নির্বাচন কমিশন আদালতের সময়সীমার মধ্যেই জুন ২৮, ২০০২-এ আদালতের রায়কে পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সর্বতোভাবে পরিপত্র জারি করে। যেহেতু আদালত সরকারকে পক্ষ করেনি সে কারণেই নির্বাচন কমিশনকে এ পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। আইনের বিধি তৈরির ক্ষমতাও সরকারের নিকটই ন্যস্ত ছিল বলে নির্বাচন কমিশনকে পরিপত্র জারি করতে হয়।

নির্বাচন কমিশনের পরিপত্রের প্রেক্ষিতে ভারতীয় রাজনীতিতে বিরল ধরনের ঘটনাই ঘটল। অভাবনীয়ভাবে ২১টি রাজনৈতিক দল একত্র হয়ে কোর্টের এ নির্দেশ

www.pathagar.com

মানতে অপারগতা প্রকাশ করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। এরই প্রেক্ষাপটে সরকার অতি ত্বরিতগতিতে আর পিএ তে (RPA) সংশোধনীর জন্য একটি খসড়া বিল প্রস্তুত করেছিল এবং ওই বিলে ৪টি নির্দেশনা রেখে প্রার্থীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ দেয়ার নির্দেশনা বাদ দিয়েছিল। কিন্তু বিলটি ২০০২ এ বর্ষার অধিবেশনে সংসদে উত্থাপন করা হয়নি। এর পরে পার্লামেন্টই বসেনি। কাজেই এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিলটিকে অধ্যাদেশ আকারে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য সরকার উত্থাপন করেছিল।

সরকারের এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে সংবিধান বিরোধী বলে অনুমোদন না দিতে অনুরোধ করার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি আগস্ট ২২, ২০০২-এ অধ্যাদেশটি অনুমোদন না দিয়ে সরকারের কাছে ফেরৎ পাঠালেন। এর পরের দিনই মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তে ওই বিলটি পুনরায় রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হল। অবশেষে আগস্ট ২৪, ২০০২-এ, দু'দিনের মাথায় রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশে অনুমোদন দেন।

রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের সাথে সাথে সুপ্রীমকোর্টে এ অধ্যাদেশ চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থে তিনটি মামলা দায়ের করে। এ মামলা তিনটির রায়ে মার্চ ১৩, ২০০২-এ সুপ্রীমকোর্ট ঘোষণা দিল যে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ অবৈধ।

আদালত সংশোধনী আইন (অধ্যাদেশ) অবৈধ এবং শূন্য বলে নির্দেশ দেয় (The Amendment Act is held to be illegal and void) এবং সুপ্রীমকোর্ট মে ২, ২০০২-এ প্রদত্ত নির্দেশ বহাল রেখে জানালো যে, এ রায়ের এখানেই নিষ্পত্তি হয়েছে (has attained finality) বলে মনে করতে হবে। সুপ্রীমকোর্টের এ নির্দেশের বলে এ বিষয়ে আর কারও কোন ওজর আপত্তি অথবা আদালতে যাবার সকল উদ্যোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এ রায় ভারতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে এক যুগান্তকারী রায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে সরকারের কোন অনুরোধই রাখেনি। সম্পূর্ণ স্বাধীন নির্বাচন কমিশন তার নিজস্ব গতিতে চলেছিল বলেই সরকার ও রাজনৈতিক দলের চাপ কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। ভারতের নির্বাচন কমিশনের যে ভিত মিঃ সুকুমার সেন রচনা করে গিয়েছিলেন সে ধারাবাহিকতাতেই নির্বাচন কমিশন বর্তমান অবস্থানে এসেছে। বলা হয়ে থাকে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন শক্ত ভিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পেছনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে উচ্চ আদালত, রাজনৈতিক দল এবং বহুলাংশে মিডিয়া। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর গণতন্ত্রের উপরে অগাধ আস্থা এবং গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশনগুলোকে শক্ত ভিতে দাঁড়াতে যেভাবে সহযোগিতা করেছিলেন সে কারণেই ভারতের সংবিধানের চার স্তম্ভ বর্তমান অবস্থানে পৌছাতে পেরেছে।

আমাদের দুঃখ যে, আমরা গণতন্ত্রের সহায়ক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সেভাবে দাঁড়াতে

www.pathagar.com

দেইনি। তবে হতাশার মধ্যেও কিছুটা আলোর ইঙ্গিত রয়েছে। বর্তমানে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের সুফল পেতে কিছুটা সময় লাগলেও আমরা আশাবাদী। নির্বাচন কমিশনে কিছুটা হলেও এসেছে গুণগত পরিবর্তন। স্বাধীন সচিবালয় আইন হওয়াতে এ পরিবর্তন আরও সার্থক হবে। তবে এ পর্যন্ত আমাদের অর্জন একেবারেই কম নয়।

আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছিলাম ভারতে প্রার্থীদের হলফনামায় বাধ্যতামূলক তথ্য প্রদানের বিষয়টি নিয়ে। আলোচনা করতে গিয়ে সে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের এবং নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার কথাও বলেছি এ কারণে যে অনেকটা ভারতের আদলেই আমাদের দেশেও সুপ্রীমকোর্ট (হাইকোর্ট ডিভিশন) একই ধরনের নির্দেশনা দিয়েছেন।

আমাদের দেশেও রীট মামলার রায়ে সুপ্রীমকোর্ট-এর হাইকোর্ট ডিভিশন ৮টি তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করেছিল যা আমাদের নির্বাচনী আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২ (RPO-1972 : Representation of People Order-1972 (ammendment) ২০০৭/৮-এর সংস্কারের প্রক্রিয়ায় নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে ধারা 12(3B)-পরে ২০০৯-এ নবম সংসদ কর্তৃক এ সংযুক্তিসহ অন্যান্য আইনি সংস্কার আইন হিসেবে অনুমোদিত হয়।

RPO-1972 (ammended in 2009)-এ যে ৮টি তথ্য প্রদান প্রত্যেক সংসদ সদস্য প্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে; এক ঃ সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘোষণা; দুই ঃ বর্তমানে কোন ফৌজদারি মামলার আসামী কিনা; তিন ঃ অতীতের ফৌজদারি আদালতের মামলা যদি থাকে তার রায়; চার ঃ চাকরি অথবা ব্যবসার বিবরণ; পাঁচ ঃ আয়ের উৎস, ছয় ঃ নিজের পরিবারের এবং পোষ্যদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এবং দেনার, যদি থাকে, বিবরণ; সাত ঃ ইতোপূর্বে সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে কি ধরনের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং তার কতখানি বাস্তবায়িত হয়েছে; আট ঃ প্রার্থীর পরিবারের অথবা পোষ্যদের ব্যক্তিগত অথবা যৌথ নামে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে অথবা কোন কোম্পানির চেয়ারম্যান, পরিচালক অথবা নির্বাহী পরিচালক হিসেবে ঋণ নেয়ে থাকলে তার বিবরণ।

যদিও এ তথ্য প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ভারতের উল্লেখিত ৫ তথ্যের আদলে, তবে বাংলাদেশের তথ্য প্রদানে বিস্তারিতভাবে হলফনামায় উল্লেখ করবার বিধান রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও দল তথ্য প্রদানের বিষয়ে ভারতীয় রাজনৈতিক দলের মত প্রতিক্রিয়া না দেখালেও কয়েকটি ধারার মামুলি বিরোধিতা করেছিল মাত্র।

বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের দু'টি ধারায় আপত্তি ছিল। তবে যেহেতু কোর্টের

www.pathagar.com

নির্দেশ সে কারণে আপত্তি ধোপে টিকেনি। প্রধান আপত্তি ছিল সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘোষণা সনদের সত্যায়িত কপি প্রদান প্রসঙ্গে। এর বিরোধিতা বেশি এসেছিল কয়েকটি দলের সদস্যদের পক্ষ থেকে। এসব সদস্য মনে করেন এ ধরনের বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে রাজনীতিবিদের ছোট করে দেখাবার জন্য। অল্পসংখ্যক রাজনীতিবিদ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলেও সিংহভাগ নেতা কোর্ট এবং আইন মেনে নিয়েছেন। আমি মনে করি, আমাদের রাজনীতিবিদরা আইন এবং আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেছেন।

অনেকটা ভারতের আদলেই আমাদের দেশেও উচ্চ আদালত এ রায়ে নির্বাচন কমিশনকে এ নির্দেশনা দেয়। হাইকোর্ট ড. কামাল হোসেন এবং অন্যদের দায়েরকৃত রীটের উপর মে ২৪, ২০০৫-এ এ রায় দিলে ওই সময়ে জোট সরকারের সুপ্রীমকোর্টে আপীলের প্রেক্ষিতে জনস্বার্থে দায়েরকৃত এ মামলা স্থগিত করা হয়েছিল। হাইকোর্টের ওই রায়টি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। ওই রায়ে বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৯ ধারায় কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্বের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে সেই আলোকে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও স্বচ্ছ করতে সকল ধরনের ক্ষমতার প্রয়োগের বিষয়টির ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের হাইকোর্ট রীটের রায়ে বলেছে, সংবিধানের ধারা ১১৯ অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে প্রতীয়মান যে নির্বাচন কমিশনকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে নির্বাচন পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ এবং ভোটার লিস্ট তৈরির ক্ষেত্রে, এছাড়াও নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা শুধুমাত্র ঐসব জায়গায় যা সংবিধানে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে। (From a close reading of Article 119 of the Constitution, it appears that the Election Commission has been given a plenary power of superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for elections and therefore whatever power is necessary for the purpose must be presumed to be there unless there is an ouster by express provisions)

২০০৫ খ্রিস্টাব্দে এ রায় দিলেও পরে স্থগিতাদেশের কারণে এর কার্যকর করা যায়নি। অবশেষে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়, ড. কামাল হোসেন এবং অন্যদের আপীলের প্রেক্ষিতে সুপ্রীমকোর্ট আপীল বিভাগ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে। ওই রায়ে শুধু তথ্য প্রদানই নয়, এ সব প্রাপ্ত তথ্য ভোটারদের জ্ঞাত করবার জন্য মিডিয়াসহ অন্যান্য মাধ্যম ব্যবহারের নির্দেশও দেয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এ রায়ের এবং আইনের বাস্তবায়নে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়বে। দেশের ভোটার তথা জনগণ প্রার্থীদের অতীতের খতিয়ান নিয়ে নিজস্ব বিবেচনার পরিধি বাড়াতে পারবেন। পারবেন সঠিক প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে। হয়ত কিছুটা সময় লাগলেও লাগতে পারে। তবুও বাংলাদেশের

www.pathagar.com

নির্বাচনী আইনে এ সংযোজন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

নির্বাচন সদন-এর ব্রিফিং রুমে মিঃ বালাকৃষ্ণনান এবং আইন উপদেষ্টা মিঃ ম্যানডিরাত্তার ব্রিফিংয়ে মুখ্যত ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাঠামো, নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপকতা এবং ১৫তম লোকসভার নির্বাচনে কিছু নতুন সংযোজনের বিষয়টি তুলে ধরা হলো। এ বিষয়ের ওপর জুন ১১, ২০০৯ 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকায় আমার একটি লেখাও ছাপা হয়েছিল।

১৫তম লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া ব্রিফিংয়ে আলোচনায় উঠে এসেছিল। এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল একমাস জুড়ে কয়েকটি ধাপে। পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন হয় ২৮টি রাজ্য ও ৭টি ইউনিয়ন টেরিটোরির নির্বাচন। এ ব্যবস্থা ভারতে নতুন নয়। তবে প্রায় এক মাসব্যাপী এ নির্বাচন অনুষ্ঠান বেশ কষ্টসাধ্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জটিল ব্যাপার। এতদিন এ ব্যবস্থা মেনে নিলেও হালে 'ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন" ব্যবহার হওয়ার প্রেক্ষিতে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের মত, একই দিনে গণনাসহ নির্বাচন অনুষ্ঠান করবার দাবি তুলেছে।

যাই হোক, ভারতে নির্বাচন এক মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত হলেও গণনা নির্ধারিত দিনেই সম্পন্ন হয়। ১৫তম লোকসভার নির্বাচন শুরু হয়েছিল ১৬ এপ্রিল ২০০৯-এ এবং গণনা হয় ১৬ মে, ২০০৯; ওই দিনই বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এ নির্বাচনে ভারতীয় কংগ্রেস আশাতীত ভোট পেয়ে একক বৃহত্তম দল হিসেবে সরকার গঠনের প্রক্রিয়ায় অন্যান্য শরিকদের নিয়ে পূর্বতন ধাঁচে ইউপিএ সরকার গঠন করে। দ্বিতীয়বারের মত ড. মনমোহন সিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিয়োজিত হন। তবে এবারের ইউপিএ-তে নেই বাম দলীয় মোর্চা।

১৫তম লোকসভার নির্বাচনে ভোটার ছিল ৭১ কোটি ৪০ লাখ। বিশ্বের কোন দেশে এত বিপুল ভোটার সংখ্যা দূরের কথা, গণচীন বাদ দিলে, এত বিপুল জনসংখ্যাও নেই। এক পরিসংখ্যান মোতাবেক ভারত ছাড়া ইউরোপের ৫০টি দেশ, আফ্রিকার ৫৪টি এবং কমনওয়েলথ দেশগুলোর যোগফলে এত ভোটার সংখ্যা হবে না। শুধুমাত্র ভোটার সংখ্যাতেই অনুমান করা যায় ভারতের নির্বাচন যজ্ঞের বিশালতা। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ হতে এবার ভোটারের সংখ্যাও বেড়েছে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ।

এবারই প্রথম সমগ্র ভারতে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা ব্যবহার হয়েছে। তবে প্রায় ২০% ভোটার তালিকা ছবিবিহীন রয়ে গেছে। তাছাড়া কয়েকটি রাজ্যে এ ব্যবস্থা এখনও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আসেনি। ভোটার তালিকায় যাদের ছবি ছিল না, ছিল শুধুমাত্র নাম ঠিকানা, তাদেরকে ছবিসহ বৈধ কোন পরিচয়পত্র সাথে আনতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইতোপূর্বে প্রদত্ত ইলেকট্রনিক ফটো আইডেন্টিটি কার্ড (EPIC), যা মাত্র ৮০%ই সমাপ্ত হয়েছিল, সেটাও কার্যকর রাখা হয়েছে। যেহেতু ভারতে ছবিসহ ভোটার

www.pathagar.com

তালিকা 'ইনটেগ্রেটে' পদ্ধতিতে করা হয়নি সে কারণে বহু ভোটারের ছবি যুক্ত হয়নি। এ পদ্ধতির বাইরে এখনও রয়েছে আসাম, নাগাল্যান্ড এবং জম্মু ও কাশ্মীর। আসাম-এ ভোটার লিস্টে কথিত বাংলাদেশী সমস্যা রয়েছে। অপরদিকে বাকি দু'টি রাজ্যে সন্ত্রাস এবং অতীব দুর্গম এলাকা বলে এ কাজ সম্পন্ন হয়নি।

ভারতের ছবিযুক্ত ভোটার তালিকায় কয়েকটি খুত রয়েছে। প্রথমত ঃ স্কেন পদ্ধতি অনুসরণ করায় ছবি নিয়ে বিভ্রাট; দ্বিতীয়ত ঃ ম্যাচিং সমস্যা এবং ভোটারগণের ছবি প্রদানে অনীহা। এ অনীহা কিছুটা সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে। বাংলাদেশে ভোটার তালিকা প্রস্তুতি সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে হওয়ায় ওই ধরনের কারিগরি সমস্যায় পড়তে হয়নি। আমাদের ভোটার তালিকার বিশুদ্ধতা নিয়ে কয়েকটি বিদেশী সংস্থা জরিপ চালিয়ে ০.০৫% মাত্র ভুল পেয়েছিল যা একেবারেই নগণ্য। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে ৩% ভুল সাধারণ প্রক্রিয়া বলেই গণ্য হয়।

এবারের ভারতীয় নির্বাচনে কেন্দ্র ছিল ৮২৪, ৮০৪টি। পোলিং অফিসার ছিল ৪৬,৯০,৫৭৫ জন, গত সাধারণ নির্বাচন হতে ২০% বেশি। সবচাইতে উচ্চতায় যে নির্বাচনী কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছিল সেটি ছিল উত্তর-পশ্চিমের হিমালয়ের পাদদেশের শহর লেহ্তে। উচ্চতা ছিল ১৫,০০০ ফুট। অপরদিকে গুজরাটে বানেদ গ্রামের একাংশে গির নামক জঙ্গলের মধ্যে স্থাপিত মন্দিরের একমাত্র পুরোহিত ভরতপদি বাপু-এর জন্য একটি ভোট কেন্দ্র খুলতে হয়েছিল। ওই কেন্দ্রে তিনিই ছিলেন একমাত্র ভোটদাতা। তবে তিনি শেষ পর্যন্ত ভোট দিয়েছিলেন কিনা তা জানা যায়নি।

প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের প্রতিটি বুথের জন্য একজন করে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োজিত হয়। একটি বুথে ভোটার সংখ্যা ৩০০-৫০০ এর মধ্যে রাখার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় প্রতি কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োজিত হয় আর বুথের দায়িত্ব দেয়া হয় সহকারি প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের।

ভারতে ২০০৯-এর নির্বাচনে এবারই প্রথম সর্বভারতীয় পর্যায়ে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM) ব্যবহার করা হয়েছে। এ সব মেশিন ভারতে তৈরি এবং নির্বাচন কমিশনের মতে অত্যন্ত নির্ভরশীল। মেশিনগুলো হালকা তাই সহজে বহনযোগ্য। মেশিন ব্যবহারে যেমন ভোট গ্রহণ ও গণনা কম সময়ের মধ্যেই হয়, তেমনি ভোট কেন্দ্র দখল এবং অল্প সময়ে জাল ভোট দেয়া দুরূহ বলে প্রমাণিত। কারণ, প্রতিটি ভোটিং মেশিনই একজন পোলিং কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে কন্ট্রোল ইউনিট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কন্ট্রোল ইউনিট হতে মেশিন সচল না করলে ভোট দেয়া সম্ভব হয় না। তবে সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল যে, নির্বাচন কমিশনকে প্রায় ৭২ কোটি ব্যালট পেপার ছাপাতে হয়নি। এত কিছুর পরেও কোথাও কোথাও কেন্দ্র দখল এবং ভোটিং মেশিন ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটেছিল। বুথ দখলের প্রচেষ্টাও হয়েছিল। অবশ্য

www.pathagar.com

কোন অবস্থাতেই বুথ দখল সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র থাকে।

ইদানিং ইভিএম (EVM) মেশিন নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হচ্ছে। এ আলোচনা হচ্ছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। যেহেতু মেশিনটি কম্পিউটার সফটওয়্যার ভিত্তিক সে কারণেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন সফটওয়্যারের বিষয়ে সচেতন না হলে একদিকে যেমন হেকিং হতে পারে, অপরদিকে সফটওয়্যার তৈরির সময়ে কারচুপির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে আরও বিশেষজ্ঞ মতামত প্রয়োজন। ২০০৯-এর নির্বাচনে ১৩,৬৮,৪৩০ মেশিন ব্যবহৃত হয়েছিল।

কমিশনের ব্রিফিং-এ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় সংসদীয় আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণ নিয়ে। প্রায় তিন দশক পরে ২০০২ খ্রিস্টাব্দে সীমানা পুনঃনির্ধারণের জন্য কমিশন গঠনের আইন উত্থাপন হয় সংসদে এবং তা ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর কমিশন নির্বাচন কমিশনের আইন মোতাবেক সীমানা পুনঃনির্ধারণের কাজ শুরু করে এবং ২০০৯-এর নির্বাচনের পূর্বেই শেষ করে। ভারতের মোট ৫৪৩টি লোকসভা আসনের ৪৯৯টিতে সর্বশেষ আদম শুমারির ভিত্তিতে আসন পুনঃবিন্যাস করা হয়। তবে কাশ্মীর ও ঝাড়খন্ড রাজ্য এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের গোলযোগপূর্ণ চারটি রাজ্য ছাড়া বাকিগুলোতে সীমানা পুনঃনির্ধারণ করে নির্বাচন করা হয়। এখানে বলে রাখা ভাল যে, রাজ্যের আসনগুলোকে ঠিক রেখেই শুধু আসনের সীমানা রদবদল হয়ে থাকে।

পাঠকদের হয়ত স্মরণে আছে যে আমাদের দেশের ২০০৮-এর নির্বাচনের পূর্বে আমরা প্রায় তিন দশক পরে সীমানা পুনঃনির্ধারণের কাজ হতে নিয়েছিলাম। আমাদের আইনে প্রতি আদমশুমারির পর সীমানা নির্ধারণের বাধ্য-বাধকতা থাকলেও রাজনৈতিক কারণে প্রায় তিন দশক এ কাজটি করা হয়নি। কাজেই আমাদের ভোটারসহ অনেকেরই এ বিষয়ে সম্যক ধারণা ছিল না। আমাদের সিদ্ধান্ত আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং এক পর্যায়ে নির্বাচনের তারিখ নিয়েও সমস্যায় পড়তে হয়। যাই হোক, প্রায় তিন মাসের অধিক সময় আদালতে মামলা চলবার পর সীমানা পুনঃনির্ধারণের পক্ষে রায় দেয়াতে বিষয়টি সুরাহা হয়। বাংলাদেশের ২০০৮-এর নির্বাচনে এটাও একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে।

এবারের নির্বাচনে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন প্রচারের সময় হতে গণনা পর্যন্ত নিযুক্ত করেছিল ৭৪,৭২৯ জন ভিডিও (VDO) এবং ৪০,৫১৯ জন ডিজিটাল ক্যামেরাম্যান। ভিডিও এবং ডিজিটাল ক্যামেরা নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রচারণা, ভোট কেন্দ্র ও গণনা কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়। এসব ক্যামেরা প্রচারণার সময় ব্যবহার করা হয়েছিল নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের এবং কেন্দ্রে গোলযোগের সম্ভাব্য চিত্র ধারণের জন্য। ভিডিও ব্যবহারের মাধ্যমেই মিঃ বরুন গান্ধীর নির্বাচনী আচরণ ভঙ্গের বিষয়টি

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশন নির্ণয় করেছিল। এ বিষয়ে আদালতের রায়ে বরুন গান্ধীকে কারাবরণ করতে হয় এবং পরে জামিন দেয়া হয়। মামলাটির এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। বরুন গান্ধী নির্বাচনী প্রচারে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দিয়েছিল মর্মে অভিযুক্ত।

আগেই বলেছি যে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব স্থায়ী জনবল মাত্র ৩১০। আইন মোতাবেক প্রতিটি রাজ্য ও ইউনিয়ন টেরিটরিতে একজন করে মুখ্য নির্বাচন কর্মকর্তা (CEO) নিয়োগ দেয়া হয়। এসব নিয়োগ হয় ভারতের প্রশাসনিক ক্যাডারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের মধ্যে হতে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়। এ কর্মকর্তার অধীনেই আয়োজিত হয় রাজ্যে লোকসভার নির্বাচন। নির্বাচনী তফসিলের পর নিয়োগ হয় জেলা নির্বাচন অফিসার (DEO)। ভারতে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে সাধারণত নিয়োগ পান ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট (DC&M), আমাদের দেশের জেলা প্রশাসক সমতুল্য। তবে ভোটার লিস্ট তৈরির জন্য আলাদাভাবে নিয়োজিত হন রেজিস্ট্রেশন অফিসার (RO)। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার অধীনে নিয়োগ হয় একাধিক রিটার্নিং অফিসার। সিইও (CEO) লোক সভা নির্বাচন ছাড়া আলাদাভাবে স্থানীয় নির্বাচনের জন্য দায়ী থাকেন রাজ্য সরকারের নির্বাচন মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

উল্লেখ্য যে, ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রধান দায়িত্ব এক ঃ ভোটার লিস্ট তৈরি, দুই ঃ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, তিন ঃ লোকসভা ও রাজ্যসভার নির্বাচন, চার ঃ উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, পাঁচ ঃ উপ-নির্বাচন এবং সংসদীয় আসনের পুনঃবিন্যাস। আগেই বলেছি স্থানীয় সরকার নির্বাচন রাজ্যের বিষয়। তবে প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন সহযোগিতা করে থাকে।

ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের আরেকটি প্রধান কাজ হল অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সরকারের কর্মকাণ্ডের উপর নজরদারী করা। ওই সময়ে রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের এমন বিষয়ের উপর কমিশনের সিদ্ধান্ত নেয়ার বাধ্য-বাধকতা রয়েছে যা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে। এ সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের নথি ক্ষেত্রমতে সিইও অথবা সরাসরি নির্বাচন কমিশনে উপস্থাপিত হয় চূড়ান্ত মতামতের জন্য। এ কারণেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কর্মকাণ্ড প্রশ্নবিদ্ধ হয় না। আমাদের নির্বাচনী আইনে এমন বাধ্য-বাধকতা নেই। এর সংযোজন করতে হলে প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত। অবশ্য যদি আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান বাদ দিতে চাই।

ভারতের নির্বাচন কমিশনের সবচাইতে বড় সহায়ক সংবিধানের ৩২৪ ধারা। যার ব্যাখ্যায় সুপ্রীমকোর্ট সাংবিধানিকভাবে কমিশনকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়ার বিষয়টি নির্ণয় করে রায় দিয়েছিল যে, যেখানে সংবিধান উহ্য এবং ধারা ৩২৯-এ যেভাবে কমিশনকে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে, ওই ধারা অনুযায়ী নির্বাচন তফসিল ঘোষণার পর হতে গণনা

www.pathagar.com

পর্যন্ত কমিশনের বিরুদ্ধে যে কোন মামলার শুনানী নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে না। এ কারণেই ওই সময় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। আমাদের সংবিধানের ধারা ১১৯ অনুরূপ হলেও আমরা ২০০৮-এর নির্বাচনের প্রাক্কালে উচ্চ আদালতের রায় কার্যকর করতে বেশ বেগ পেয়েছিলাম। এ বিষয়ে আমাদের উচিত হবে ভারতীয় সুপ্রীমকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট হতে অনুরূপ ব্যাখ্যা চাওয়া এবং প্রয়োজনে সংবিধানে নতুন ধারার সংযোজন।

নির্বাচন সদনে আমাদের ব্রিফিং যখন শেষ হল তখন দুপুর গড়িয়ে স্থানীয় সময় প্রায় ২টা। এরপরে দুপুরের খাবারের দাওয়াত রয়েছে। দাওয়াত সেরে পাঁচটায় হোটেল থেকে বিমানবন্দরে রওনা হতে হবে দিল্লী থেকে জয়পুর, রাজস্থানের উদ্দেশে। জয়পুরে আমাদের অবস্থান হবে ৬ এবং ৭ মে, ২০০৯-ভারতের নির্বাচনের চতুর্থ পর্বের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য।

ভারতে প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৫১ সালে। ওই সময় ভারতে ছিল ২৬টি রাজ্য আর লোকসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৮৯। বর্তমানে লোকসভার আসন সংখ্যা ৫৫২। কিন্তু সরাসরি নির্বাচন হয়েছে ৫৪৩টিতে যার মধ্যে ইউনিয়ন টেরিটরিও রয়েছে। ভারতের সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ভারতে বসবাসরত এঙ্গলো ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠী হতে দুইজন লোকসভা সদস্য মনোনীত করতে পারেন। এছাড়া রাষ্ট্রপতি রাজ্য সভায় ১২ জন সদস্য মনোনীত করতে পারেন। এ সদস্যপদ দেয়া হয় বিভিন্ন পেশার অতি পরিচিত ব্যক্তিবর্গ হতে।

ভারতে আধুনিক পদ্ধতির নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল দেড়শ' বছর পূর্বে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে যখন ভারতে ব্রিটিশ রাজের আনুষ্ঠানিক শাসন শুরু হয়। প্রথমে ১৮৬১ পরে ১৮৯২ তে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে আইন পাস করেছিল– তার মাধ্যমে স্থানীয় আইন প্রণয়নের জন্য স্থানীয় প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা রাখার মধ্য দিয়ে নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আরও পরে স্থানীয় রাজনীতিবিদদের দাবির প্রেক্ষিতে পুনরায় ১৯০৯-এ এবং পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ইন্ডিয়া এ্যাক্ট এর মাধ্যমে 'নির্বাচিত' পরিষদ-এর বিধান রাখা হয়েছিল। আইন প্রণয়ন ও নীতি-নির্ধারণ সম্পৃক্ত করা হয় ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন মত ও ধর্মের বিভাজনে বিভাজিত করে স্থানীয় প্রতিনিধিদের। অতি সীমিত নির্বাচকদের মাধ্যমে নির্বাচনের বিধান রাখা হয়েছিল ওই এ্যাক্টে। এর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতের জনশক্তির প্রয়োজনে এবং তৎকালীন নেতাদের চাপে অধিকতর অধিকার দিয়ে ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ১৯৩৫ এর আওতায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় তৎকালীন সংসদের উভয় কক্ষে। উল্লেখ্য যে, ভারতের বর্তমান পার্লামেন্ট ভবন ওই সময়কার তৈরি। যদিও ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ইন্ডিয়া এ্যাক্টে সরাসরি

www.pathagar.com

নির্বাচনের বিধান রাখা হয়েছিল। তবুও সাধারণ জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ধারাবাহিকতাতেই স্বাধীন ভারতে প্রথমে গণপরিষদ এবং পরে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায়ে নির্বাচিত সরকার গঠিত হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। এ ধারাবাহিকতা নিরবচ্ছিন্ন থাকাতে গণতান্ত্রিক বিশ্বে ভারত সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে পরিচিত। প্রথম নির্বাচনে ভোটারের ন্যূনতম বয়স ছিল ২১ বছর।

ভারতের সংবিধান মোতাবেক লোকসভার সর্বোচ্চ আসন সংখ্যা ৫৫২। এর মধ্যে সরাসরি নির্বাচনের জন্য রাজ্যগুলোতে ৫৩০ আসন ইউনিয়ন টেরিটরির জন্য ২০টি আসন নির্ধারিত রয়েছে। আগেই যেমন বলেছি যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন এঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের মধ্য হতে লোকসভায় যথেষ্ট সদস্য নেই মাত্র তখনই তিনি তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন।[৮]

রাজ্যের সদস্যপদ (আসন) জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়। বর্তমানে সর্বোচ্চ আসন সংখ্যা রয়েছে উত্তর প্রদেশে। উত্তর প্রদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে সবচাইতে বড় রাজ্য। উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৯ কোটি আর লোকসভার আসন রয়েছে ৮০টি। বলা হয়ে থাকে উত্তর প্রদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হলে সেটি হতো বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহৎ স্বাধীন রাষ্ট্র। এর পরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র, আসন সংখ্যা ৪৮। পশ্চিম বাংলা আর অন্ধ্রপ্রদেশ সমান ৪২টি করে আসন।

সদস্য সংখ্যার কারণেই উত্তর প্রদেশ সবসময়ই লোকসভা নির্বাচনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া নেহেরু গান্ধী পরিবারের ঐতিহাসিকভাবে সংসদীয় আসন হিসেবেও উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের নিকট গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক শহর আগ্রা আর রাজধানী লক্ষ্ণৌ ভারতের ইতিহাস, কৃষ্টি আর শিল্পকলার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে অধিক পরিচিত।

আমি ইতিপূর্বে বলেছিলাম যে, রাষ্ট্রপতি মোট ২ জন এঙ্গলো-ইন্ডিয়ান (Anglo-Indian) গোষ্ঠীর মধ্য থেকে লোক সভায় সদস্য হিসেবে সরাসরি নিয়োগ দিতে পারেন। কোন জনগোষ্ঠীকে এঙ্গলো-ইন্ডিয়ান হিসেবে ধরা হবে তা ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৩৬৬(২)তে ব্যাখ্যা দেয়া আছে। ওই ধারায় বলা হয় যে, ১৯৪৭-এর পরে যে সব ইউরোপিয়ান, এদের মধ্যে পর্তুগিজদেরকেও ধরা হয়, ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়েছে অথবা পিতার দিক হতে ইউরোপিয়ান, কিন্তু ভারতীয় মাতার গর্ভে জন্ম হয়েছে– এমন সব ভারতীয়দের এঙ্গলো-ইন্ডিয়ান হিসেবে গণ্য করা হবে। এঙ্গলো ইন্ডিয়ান গোষ্ঠী একমাত্র জনগোষ্ঠী যাদের জন্য একবিংশ শতাব্দীর ভারতেও আসন রিজার্ভ রয়েছে। সাংবিধানিক এ নিশ্চয়তা প্রদানের কারণ হিসেবে ঐতিহাসিক

৮. *http/www. Loksabha.nic.in*

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপট বিবেচিত হয়েছিল। এটা করা হয়েছিল এ কারণে যে সর্বভারতে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ এ জনগোষ্ঠীর জন্য কোন আলাদা রাজ্য গঠিত হয়নি। কাজেই এত বড় জনগোষ্ঠী যাতে লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত না হয়। সেকারণেই সংবিধানের নিশ্চয়তা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর লর্ড ওয়েলেসলি কোম্পানির ইউরোপিয় কর্মকর্তাদের স্থানীয় মহিলাদের পানি গ্রহণ ঠেকাতে ওই সময়কার এঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের উচ্চপদ অথবা নীতি নির্ধারণ পদে নিয়োগ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এ ব্যবস্থা কমবেশি-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিল। এই প্রেক্ষাপটেই ভারত স্বাধীন হবার পর ১৯৪৭ এ এঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের অধিকার আদায়ে যে ব্যক্তি প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনি হলেন ফ্র্যাংক এন্টোনি।

ফ্রাঙ্ক এন্টোনি (১৯০৮-৯৩) একজন আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদসহ বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি ভারত বিভাজনের ঘোর বিরোধী ছিলেন এ কারণে যে, বিভক্ত ভারতে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকার ক্ষুণ্ন হবে বিশেষ করে অবিভক্ত ভারতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এঙ্গলো-ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীর সদস্যদের বেলায়। এরই প্রেক্ষাপটে মহাত্মা গান্ধী, প্যাটেল এবং নেহেরু এ জনগোষ্ঠীকে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেন। ভারতে মিঃ ফ্রাঙ্ক এন্টোনির বহু অবদান রয়েছে। তিনি এঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের শিক্ষার প্রসারে বেশ কয়েকটি অত্যন্ত নামী পাবলিক স্কুলের স্থপতি। ভারতের বহু বড় বড় শহরে এ ধরনের আবাসিক স্কুল রয়েছে। তিনি ভারতের কনসটিটুয়েন্ট এসেম্বলীর সদস্যও ছিলেন। আজও সমগ্র ভারতের এঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের কাছে ফ্রাঙ্ক এন্টোনি একজন বড় মাপের নেতা।[৯] হিন্দুস্থানের এঙ্গলো-ইন্ডিয়ানদের কিছু অতীত পরবর্তী ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় আনব।

'নির্বাচন সদন' থেকে বের হয়ে সরাসরি দিল্লীর অন্যতম বিখ্যাত অশোক হোটেলে দুপুরের আহারের জন্য যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল প্রায় তিনটা। এ পাঁচতারা হোটেলটি দিল্লীর কূটনৈতিক পাড়া বলে খ্যাত চানক্যপুরীর সন্নিকটে। চনক্যপুরীতেই বহির্বিশ্বের দূতাবাসগুলোর ঠিকানা। সংসদ ভবন, প্রধানমন্ত্রীর দফতর, রাষ্ট্রপতি ভবন, ইন্ডিয়া গেটসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো চানক্যপুরীর কাছাকাছি অবস্থিত।

চানক্যের নাম বাংলাদেশের পাঠকদের নিকট মোটেই অজানা নয়। ইতিহাসের এবং অর্থশাস্ত্রের অনেকখানি জুড়ে চানক্যের নাম থাকলেও তৎকালীন ভারতের

৯। *এন্টোনি ফ্র্যাংক, "ব্রিটেনস বিট্রেয়াল অব ইন্ডিয়া। দি স্টৌরি অব দি এঙ্গলো-ইন্ডিয়ান কমিউনিটি,* সিমনথ্ ওয়ালেস বার্গ প্রেস।

www.pathagar.com

কূটনীতির প্রবক্তা হিসেবে চানক্যের নাম অধিক পরিচিত। চানক্য বলতেই আমরা অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝাই।

ভিসনু সরমা, কোটিল্য এবং ভিসনুগুপ্তা ছিল চানক্যের নাম। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৩৫০ খ্রিস্টপূর্বে এবং মৃত্যুবরণ করেন ২৯৩ খ্রিস্টপূর্বে। তিনি খ্যাতি অর্জন করেন মৌর্যবংশের প্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী ও পরামর্শক হবার পর হতে। এই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন সম্রাট অশোকের পিতামহ, সম্রাট বিন্দুসারা গুপ্তের পিতা। এই বিন্দুসারা গুপ্তের পুত্রই সম্রাট অশোক– যাকে ভারতের ইতিহাসে 'আশোকা দি গ্রেট' নামে অভিহিত করা হয়েছে। চানক্য সম্বন্ধে বহু কথিত গল্প রয়েছে যার কিছু কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকলেও সচরাচর আলোচিত হয় না।

শ্রুতিতে আছে যে চানক্য দাঁত সহকারেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে জন্ম দাঁত পরে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল এই বলে যে এ ধরনের চিহ্ন মানে দেশের শাসক হবার লক্ষণ। কুলীন ব্রাহ্মণরা দেশ শাসনকে নিম্ন জাতের কাজ বলে মনে করতেন। তাদের মতে ক্ষত্রিয়দের কাজ দেশ শাসন করা এবং যুদ্ধ করা। বলা হতো এটা ছিল রাজা হবার চিহ্ন কিন্তু চানক্য পরিবার ছিল ওই সময়কার কুলীন ব্রাহ্মণ। যেহেতু কুলীন ব্রাহ্মণরা নিম্নবর্ণের কাজ করে না সেহেতু চানক্যের রাজা হবার নিদর্শন জন্মদাত ভাঙ্গা হয়েছিল। চানক্যকে রাজা নন্দা তার সভা থেকে বের করে দিলে যুবক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাথে পরিচয় হয়। চন্দ্রগুপ্ত তখনও ভাগ্যের অন্বেষায়। সেই থেকে চানক্য চন্দ্রগুপ্তের সর্বসময়ের পরামর্শক হিসেবে আবির্ভূত হন। আরও কথিত আছে চানক্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের খাবারের সাথে বিষ মেশাতেন চন্দ্রগুপ্তের বিষ হজম করবার শক্তি বাড়াবার জন্য। চন্দ্রগুপ্ত এ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। একদা তিনি তার (চন্দ্রগুপ্ত) খাবার তার অন্তঃসত্ত্বা পত্নীকে খেতে দিলে রাণী বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর পথে ঢলে পড়লে চানক্য তার ভুল বুঝতে পেরে রাণীর পেট কেটে যে সন্তানকে বের করে এনেছিলেন– তারই নাম বিন্দুসার, অশোকের পিতা। তবে এ ধরনের কিংবদন্তীর সাক্ষ্য ইতিহাস দেয় না। ঐতিহাসিক নথিতে বিন্দুসারের জন্ম যখন হয়েছিল তখনও মৌর্য রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি।[১০] তবুও বহুবচনের কারণে ওই সময়কার ইতিহাসে এ ধরনের বহু রোমানটিক কিংবদন্তী জুড়ে দেয়া হয়। আসলে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিবরণ বহুবিধভাবে দেয়া হয়েছে। যেহেতু একসময় চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্মগ্রহণ করে বিন্দুসারকে সিংহাসনে বসিয়ে সন্ন্যাস জীবন বেছে নেন, সে কারণে জৈন সংস্করণ করা হয়েছে মৌর্যদের শাসনকালের বিবরণ। একই ধারাবাহিকতায় বিন্দুসার 'আজিভিকিজস্ট' (Ajivikism) ধর্মে দীক্ষিত

১০। *Tomas R. Trautmann 'Kautilya and Arthasastea'*

www.pathagar.com

হয়েছিলেন, যদিও ওই ধর্ম এখন নেই এবং অশোক 'অজিভিকিজম' হতে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার কারণে ইতিহাসের তিনটি সংস্করণ রয়েছে মৌর্যদের শাসনামলের। 'আজভাকা' বৌদ্ধধর্মের সমসাময়িক ছিল।[১১]

আশোকা হোটেলে দুপুরের খাবার খেতে খেতে প্রায় বিকেল ৫টা বেজে গেল। রুমে ফিরে এসে যখন জয়পুরের পথে আমরা হোটেল ছেড়ে বিমান বন্দরে পৌঁছলাম তখন বিকেল ৬টা। আমাদের বিমান সন্ধ্যা ৮.৩০ মিনিটে। হাতে অনেক সময়। বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে বসে আগামী দু'দিনের কর্মসূচি জেনে নিলাম।

বিমান বন্দরে বসেই জনাব ছহুল হুসাইনের সাথে আজমীর যাবার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা যখন করছিলাম, তখন জয়পুরের উদ্দেশে বিমানে আরোহণের ঘোষণা হল।

১১। *James Hastings 'Encyclopedia of Religion and Ethics.'*

www.pathagar.com

পাঁচ

ভারতের নির্বাচন-২০০৯

রাজস্থানের রাজা জয় সিং-এর পিতামহ মান সিং ছিলেন আকবরের অন্যতম সিপাহসালার। মান সিং-এর নাম মোগল যুগের বাংলার ইতিহাসে বহুল আলোচিত। ঈশা খাঁ-এর বিরুদ্ধে মান সিং-এর যুদ্ধকে আজও আমরা বাংলার স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে মনে করি। ঈশা খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হলেও বীরের মর্যাদা তিনি পেয়েছিলেন।

রাজা জয় সিং দশ বছর বয়সে আমের (Amer)-এর রাজা হন। একই সাথে তিনি 'কাচওয়াহা' রাজপুত উপগোষ্ঠীর প্রধানও হন। তার রাজত্বের সময় সম্রাট শাহজাহানের শাসন পূর্ণ হয়ে হিন্দুস্থানে আওরঙ্গজেবের রাজত্ব শুরু হয়েছিল। রাজা জয় সিং তখনও তরুণ। তিনি দিল্লীতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের দর্শনে হাজির হলে আওরঙ্গজেব রাজপুতদের বীরত্বের প্রশংসা করে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্যের কথা বলে বললেন, "আপনার বীরগাঁথা আমি শুনেছি। শুনেছি আপনার অশ্ব আর অসি চালনার কথা।" জয় সিং-এর দু'টি হাত নিজের হাতের মুঠোয় ধরে পুনরায় আওরঙ্গজেব বললেন, "এ দু'টি হাত আমার মুঠোর মধ্যে। এ মুহূর্তে এ দু'টি হাত আর বাহু কি কাজের?" জয় সিং উত্তরে বলেছিলেন "আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে কনের হাত বরের হাতে তুলে দেয়া হয়। এর মানে ওই সময় হতে বর কনের রক্ষকে পরিণত হয়। আমার হাত আপনার হাতে, নিশ্চয় আমি সম্রাটের শরণে আছি।"

সম্রাট আওরঙ্গজেব জয় সিং-এর বুদ্ধিতে খুশি হয়ে তাকে উপাধি দিলেন সাওয়ায়ী (Sawawi), মানে এক এবং এক চতুর্থাংশ। এর মানে জয় সিং অন্যদের তুলনায় এক এবং এক চতুর্থাংশ বুদ্ধিমান। সেই থেকে আমের-এর দুর্গে দু'টি পতাকা উড়তো। একটি এক এবং চতুর্থাংশ পতাকা জয় সিং-এর বংশধরদের পরিচয় অপরটি আমের রাজ্যের। ওই রাজপুত রাজা জয় সিং পরে সমগ্র রাজপুত জাতিকে একত্রিত করেছিলেন।[১] ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরের সন্নিকটে সমতল ভূমিতে তিনি তার রাজধানী স্থানান্তর করেন। যার নাম জয়পুর। মহারাজা জয় সিং-এর নামেই রাখা হয় এ শহরের নাম। বর্তমানে শুধু শহরই নয় রাজস্থানের এ জেলার নামও জয়পুর। জয়পুর, পিংক (গোলাপী) সিটি নামে সমগ্র উপমহাদেশ তথা বিশ্বের পর্যটকদের কাছে সুপরিচিত।

১। *স্থানীয় গাইড বই এবং গাইডদের ভাষ্য।*

www.pathagar.com

জয়পুর শহরের নক্সা তৈরি করেছিলেন একজন বাঙালী স্থপতি যার নাম ছিল বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। তিনি এই শহরের নক্সা প্রস্তুত করেন হিন্দু বাস্তু শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে । এরই দর্শনে দালান-কোঠার নক্সা তৈরি হয়েছিল। তবে জয়পুর 'পিংক সিটি' নাম ধারণ করে ব্রিটিশ শাসন রাজস্থানে বিস্তৃত হবার পর। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন ব্রিটিশ যুবরাজ, প্রিন্স অব ওয়েলস, এডওয়ার্ড জয়পুরে সফরে আসেন, পরে এডওয়ার্ড সপ্তম হিসেবে ব্রিটিশ রাজ-এর দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী হন। মহারাজা রাম সিং এডওয়ার্ডের আগমনে সমস্ত শহরকে, রাজস্থানের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায়, গোলাপী রংয়ে রং করতে হুকুম দেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত শহরের পুরাতন অংশ গোলাপী রং (Pink)-এ রাংগানো হয়। অবশ্য নতুন অংশে এমন বাধ্য-বাধকতা নেই। উল্লেখ্য যে রাজস্থানে গোলাপী রং অতিথেয়তার চিহ্ন। রাজা সাওয়ায়ী জয় সিং-এর বংশধররা আজও জয়পুরের সিটি প্যালেসের একাংশে বাস করেন। ব্রিটিশ রাজের সময়ের শেষ রাজা 'সাওয়ায়ী' দ্বিতীয় মান সিং-এর বিধবা স্ত্রী শ্রীমতি গায়ত্রী দেবী এ লেখা শেষ হবার কয়েক মাস পূর্বে ৯০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বর্তমানের উত্তরাধিকারী ভওয়ানী সিং।[২] তবে গায়ত্রী দেবীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসেবে একাধিক দাবি উত্থাপিত হচ্ছে।

দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর হতে আমরা, আমার সহধর্মিণী ডাঃ রেহানা হোসেন ও আমার সফরসঙ্গী জয়পুর বিমান বন্দরে 'কিং-ফিসার' (ব্যক্তি মালিকানাধীনে পরিচালিত), ফ্লাইটে যখন পৌঁছলাম, তখন সময়, রাত ৯-১৫। বিমান বন্দরে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলন রাজস্থানের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার (CEO) প্রতিনিধি। আমাদের সাথে মালপত্র বুঝে নিতে একজনকে নিয়োগ করা হল।

'কিং ফিসার' ফ্লাইটে সময় লাগল মাত্র আধা ঘণ্টা। কিন্তু আতিথেয়তার কমতি দেখিনি। চা হতে শুরু করে এ অল্প সময়ের মধ্যে রাতের খাবারও পরিবেশন করেছিল। ছোট বিমান তবে যাত্রীতে ভরা ছিল। পাঁচ জনের ক্র। দু'জন বিমানবালা তবে তাদের রাজস্থানী বলে মনে হলো না। বিমানবালাদ্বয় আকর্ষণীয় তবে শ্যামলা গায়ের রং। যাত্রীদের প্রতি ছিল যথেষ্ট মনোযোগী। বিমানটি ছোট হলেও দু'একবার বাম্প করা ছাড়া সম্পূর্ণ ভ্রমণ ভালই ছিল।

শুধু কিং ফিশারই নয় বর্তমানে ভারতে আরও বেশ কয়েকটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বিমান বহর রয়েছে। তবে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পথে জেট এয়ার এবং কিং ফিশারই অগ্রগামী। ইদানীং এ দুটি এয়ার লাইন্স-ই ঢাকা হতে ভারতের রাজধানীসহ কলকাতায় নিয়মিত যাতায়াত করছে।

১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে 'এয়ার কর্পোরেশন এক্ট ১৯৫৩' বাতিল করে 'উন্মুক্ত

২। *জয়পুর গাইড বই ডাটা এন্ড এ এক্সপো ইন্ডিয়া প্রাঃ লিমিটেড।*

www.pathagar.com

আকাশ' নীতি গ্রহণ করবার পর হতেই ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে উঠেছে অনেকগুলো এয়ার লাইন্স-এর বিশাল বিমান বহর। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে (২০০৯) ব্যক্তি মলিকানায় মোট ৪৪০টি বিমান চলাচল করছে। শুধু মাত্র কিং ফিশারই প্রত্যহ ৪০০ ফ্লাইট পরিচালনা করে। এ এয়ার লাইনটি মোট ৭৮টি অভ্যন্তরীণ তথা আন্তর্জাতিক গন্তব্যে যাত্রী বহন করে থাকে। অপর দিকে জেট এয়ার লাইন্স ভারতের ব্যক্তি মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ এয়ার লাইন্স অনুরূপ ৬৮ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পথে ৪০০ ফ্লাইট পরিচালনা করে। তবে জেট এয়ার-এর আন্তর্জাতিক রুট কিং ফিশার এয়ার লাইন্স হতে অধিক। ভারতের এ দুটি ব্যক্তি মালিকানাধীন এয়ার লাইন্স প্রায় ৪৭ শতাংশ যাত্রী বহন করে থাকে। আমি দুটোতেই ভ্রমণ করেছি এবং দুটি এয়ার লাইনের আথিতিয়তা যথেষ্ট উন্নতমানের।

যাই হোক, জয়পুর শহর বিমান বন্দর হতে প্রায় ১৩ কিঃমিঃ দূরে। বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থল হোটেল 'রামাদা' এর উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। যে সব রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম চারপাশের পরিবেশ আমাদের শহরগুলোর মতই মনে হল। তবে রাস্তাগুলো প্রশস্ত আর দু'পাশে বহু হোটেল আর মোটেলের অবস্থান। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় বছরের এ সময়ে অভ্যন্তরীণ অথবা বিদেশী পর্যটকদের ভিড় খুব একটা থাকে না। ওই সময়টাতে জয়পুরের গড় তাপমাত্রা থাকে প্রায় ৪২°। আমরা যেদিন, মে ৫, ২০০৯, জয়পুরে পৌঁছেছি ওই দিন বিকেলে ধুলিঝড়ের সাথে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হয়েছিল।

রাজস্থান সাধারণত মরুভূমির মত অঞ্চল। বড় বড় পাথুরে পাহাড়, বিস্তর খালি জায়গা। আয়তনের দিক থেকে ভারতের সর্ববৃহৎ রাজ্য। এরাজ্য মূল্যবান পাথর হতে শুরু করে মার্বেল পাথরের জন্য বিখ্যাত। এখানকার মার্বেলগুলো আনুপাতিক নরম। এ কারণেই রাজস্থানের রঙ্গিন মার্বেলের চিপস্ মোজাইকে ব্যবহার হয় এবং বাংলাদেশে এ মার্বেল এবং চিপস্-এর অনেক বড় বাজার রয়েছে। জয়পুরে পর্যটকদের বাজারে প্রবেশের অন্যতম আকর্ষণ মূল্যবান পাথর। তবে যারা মূল্যবান পাথর পরখ করতে পারেন না তাদের ঠকাবার জন্য দু'নম্বর পাথর বিক্রেতার অভাব নেই।

আমরা প্রায় ৯:৪৫ মিনিটের দিকে হোটেল রামাদাতে পৌঁছলাম। এতক্ষণ শহরের যতটুকু অংশ দিয়ে আসলাম ততটুকুতে মনে হয়েছে শহরটি তৃতীয় বিশ্বের একটি ঐতিহাসিক শহর। চিরচেনা রাস্তার পরিবেশ-তবে এতটুকু রাতে এ সময়ে তেমন লোকজন বাইরে দেখা যায়নি। দোকান-পাট যেহেতু সন্ধ্যা ৮টার সময় বন্ধ হয়ে যায় সে কারণে আশেপাশে তেমন ভিড়ও মনে হয়নি। হোটেলে ঢোকার মুখে দরজায় রাজস্থানী রাজদরবারের পোশাকের মত রঙ্গিন পোশাক পরা ছয় ফুটের অধিক লম্বা একজন গেটম্যান ভারতীয় কায়দায় অভিবাদন দিয়ে দরজা খুলে দিল। রাজস্থানী

www.pathagar.com

রাজপুতরা মুখে চাপা দাড়ি আর গোঁফের বাহারের জন্য খ্যাত। এক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম হলো না। ওই ভদ্রলোকের গোঁফটি ছিল একটু অস্বাভাবিক রকমের। মুখে চাপা দাড়ি নেই, তবে দু'পাশের গোঁফকে বেনী পাকিয়ে মেয়েদের চুলের বিড়ার মত দু'গালের সাথে লাগানো থাকায় একাধারে দাড়ি আর গোঁফ বলে মনে হয়েছিল। আমি বহু ধরনের গোঁফওয়ালা ব্যক্তি দেখেছি, তবে এই প্রথম এ ধরনের গোঁফ দেখলাম। পরের দিন বিকেলেও তাকে পেলাম। তার নাম 'জসমান সিং' বাড়ি রাজস্থানের পাকিস্তান সীমান্তের সন্নিকটের শহর জজ্বলমির। হোটেল থেকে বের হতে আর ভেতরে ঢুকতে দরওয়াজা খোলা আর বন্ধ করবার সাথে সাথে লম্বা চওড়া রাজস্থানীয় পাগড়ি পরা ব্যক্তিটি 'নমস্তে' বলে সম্বোধন করলে নিজেকে সাহেবজাদা গোছের কেউ মনে করা স্বাভাবিক মনে হবে।

লবিতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল হোটেলের রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া সারতে। ইতিমধ্যেই স্থানীয় কনডাকটিং অফিসার জানালো রাত ১০-৩০ পর্যন্ত হোটেলের বুফে রেস্তোরাঁ খোলা থাকবে–যারা ডিনার করতে চাইবেন খেয়ে নিতে পারবেন। বিমানে যৎসামান্য যা খেয়েছি সেটাই যথেষ্ট ছিল। তবে সবারই আগ্রহ ছিল কিছু রাজস্থানী ব্যাঞ্জন উপভোগ করতে। রুমে গিয়ে কিছুটা পরিচ্ছন্ন হয়ে নিচে লবিতে এসে কিছু খেয়ে কিছু সময় আড্ডা দিয়ে প্রায় রাত এগারোটার দিকে শুতে গেলাম। পরেরদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত নির্বাচনের পূর্বের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণসহ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা (DEO) এবং প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা (CEO) এর রাজস্থানের ৬ কোটি ৭০ লক্ষ লোকের জন্য লোকসভায় বরাদ্দ ২৫টি আসনের নির্বাচনের প্রক্রিয়ার উপর ব্রিফিং শুনব। একই সাথে জয়পুরের দু'টি আসন, জয়পুর আরবান (Urban) ০০৬ এবং জয়পুর রুরাল (Rural) ০০৭ এর প্রিজাইডিং অফিসারদের নিকট নির্বাচনের উপকরণ হস্তান্তর প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবার প্রোগ্রাম রয়েছে। এখানে মে ৭, ২০০৯-এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা।

পরের দিন মে ৬, ২০০৯। ভোর পাঁচটায় আমার অভ্যাসমত প্রাতঃভ্রমণের পোশাকে রিসিপসনে এসে জেনে নিলাম ধারে কাছে কোথাও পার্ক জাতীয় কিছু রয়েছে কিনা। অচেনা জায়গায় রাস্তার উপরে হাঁটাকে আমি নিরাপদ মনে করিনি তাই পার্কের খোঁজ। আর তাছাড়া আমার এ অল্প সময়ের অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। কারণ, রাস্তায় প্রচুর বেওয়ারিশ কুকুর, গরু এমনকি শূকরের ছড়াছড়ি। এছাড়াও রাজস্থানী গরু রাজপুতদের গরুর মতই যেগুলো বাংলাদেশে চোরাই পথে বিস্তর বাজারজাত করা হয়। ওগুলোকে আমাদের দেশে একজন বিখ্যাত বলিউডের লম্বা নায়কের নামে চিহ্নিত করে। আমাদের চোরাচালানীদের কাছে হরিয়ানা আর রাজস্থানের গরুই আকর্ষণীয়। গরু চোরাচালানীর একমাত্র স্বর্গরাজ্য যে ভারত এতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের

www.pathagar.com

দু'দিকের দু'টি দেশের গরুর মাংসের চাহিদা একত্র করলে বোধ হয় বিশ্বের সবচাইতে বড় বাজার বলে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশে ভারতীয় গরুর বাজার ছোট হলেও রাজস্থান সংলগ্ন পাকিস্তান গরু চোরাচালানীর বিশাল বাজার।

রিসিপশনিস্ট আমাকে পার্কের অবস্থান জানিয়ে বলল যে, হোটেলের সামনের পেট্রোল পাম্প পার হলেই একটি পার্ক রয়েছে যেখানে সকালে এলাকার স্বাস্থ্য সচেতন লোকের প্রচুর সমাগম হয়। রিসিপশনিস্টের কথা মতই হোটেল থেকে বের হয়ে পেট্রোল পাম্প পার হতেই ছোট গেট দিয়ে ছিমছাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি পার্কে প্রবেশ করলাম। আমার আগেই সেখানে প্রচুর লোক এসেছে প্রাতঃভ্রমণের উদ্দেশ্যে। এ পার্কটি দিল্লীতে বসন্ত বিহারের যে পার্কের বিবরণ আগে দিয়েছি তার থেকে বহুগুণ ভাল। সবুজ ঘাসের চত্বর। প্রচুর গাছ। মাঝখানে সবুজের সমারোহ। সুন্দর, রঙিন ফোয়ারা। হাঁটতে ভালই লাগল, তবে ওই সকালেও রাজস্থানের গরমের কিছুটা ছোঁয়া লাগছিল। তবে অসহনীয় নয়। দিল্লী-জয়পুর-আজমীর-আগ্রাতে যতক্ষণ প্রচণ্ড গরম এবং রৌদ্রের মধ্যে হেঁটেছি তাতে তেমন খারাপ লাগেনি। কারণ, শরীরে ঘাম খুব কম হয়। বাতাসের আর্দ্রতা অনেক কম হওয়াতে বিরক্তিকর ঘাম থেকে রেহাই পাওয়া যায়। প্রায় একঘণ্টা হাঁটার পর পার্কের মাঝে সুন্দর বেদীর চারপাশে বসবার বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। ঘাম শুকাতে চত্বরে যাওয়া। চত্বরের মাঝখানে কালো পাথরের তৈরি ইতিহাসখ্যাত স্বাধীনতা সেনানী শহীদ ভাগত সিং-এর তিনটি ভাস্কর্য। শিল্পীর কল্পনায় ভাগত সিং-এর ভিন্ন বয়সের সময়ের চেহারার ভাস্কর্য। মধ্যের স্ট্যাচুটি ইউরোপিয়ান ফেল্ট (হেট) পরা। পাশে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে বসা দেখে পরিচিত হলাম। ভদ্রলোকের নাম সুখবির সিং, জাতে রাজপুত, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক।

তার কাছ থেকে জানলাম যেহেতু পার্কটি একটি উচ্চমধ্যবিত্ত আবাসিক এলাকা সংলগ্ন–তাই এলাকাবাসীর স্বউদ্যোগে রক্ষণাবেক্ষণের কারণেই পার্কটি ছিমছাম রয়েছে। আরও জানালেন, যেহেতু প্রাক্তন মেয়র মহোদয়ের নিজস্ব বাড়ি পার্ক সংলগ্ন তাই তার সময়েই এ পার্কটি নতুনরূপ পায়। নতুনভাবে ভাগত সিং-এর মূর্তি উন্মোচন করে পার্কের নাম রাখা হয় 'শহীদ ভাগত সিং পার্ক'। আমি তাকে বললাম যে ভাগত সিং কখনও রাজস্থানে এসেছিলেন এমন তথ্য আমার জানা ছিল না। স্কুল শিক্ষক সুখবির সিং স্মিত হেসে বললেন, "আপনে ঠিক বোলা লেকিন মেয়র সাহেব উনকি জনম তিথি মানায়া আউর ইস পার্ককা নাম শহীদ ভাগত সিং পার্ক রাখদিয়া।" (আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু মেয়র সাহবে ওঁর ভাগত সিং জন্মদিনে পার্কটির নামকরণ করেন-শহীদ ভাগত সিং পার্ক)। অনেকক্ষণ আলাপচারিতার পর আমি হোটেলের পথে রওয়ানা দিলাম।

ভদ্রলোকের সাথে আলাপ করে ভালই লাগল। মনে হল যেহেতু জয়পুর দিল্লীর

www.pathagar.com

তুলনায় অত্যন্ত ছোট শহর সে কারণেই হয়ত মানুষগুলো মিশুক। আমরা যাকে মফস্বল শহর বলি ঢাকার তুলনায় ওই সব শহরের মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা থাকে বেশি। জয়পুর আর দিল্লীকে তুলনা করে আমার কাছে তেমনই মনে হল। এমন মনে করবার আরও কারণ ছিল। আমি দিল্লীর রাস্তা এবং পার্কে প্রাত:ভ্রমণ করেছি এবং ভ্রমণ কালে অনেকের সাথে দেখা হয়েছে বা মুখোমুখিও হয়েছি– কিন্তু একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখিনি। মনে হত সবার মধ্যে কেমন যেন কৃত্রিমতা অথচ জয়পুর ভাগত সিং পার্কে হাঁটবার সময় প্রত্যেককে প্রত্যেকের সাথে 'জয় সিয়ারাম' বলে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখেছি। এমনকি আমাকেও প্রায় সকলেই 'জয় সিয়ারাম' বলে শুভেচ্ছা জানালে স্মিথ হেসে মাথা নাড়িয়েছি মাত্র। উচ্চস্বরে কিছু বলতে হয় কিন্তু কি বলব; কাজেই একইভাবে আমিও প্রতি উত্তরে বলেছি 'জয় সিয়ারাম', বড় শহরের বাসিন্দা আর মফস্বল শহরের বাসিন্দাদের তফাৎ শুধু আমাদের দেশে বা উপমহাদেশে তেমন নয়, বিশ্বের সর্বত্রই এরকম।

পার্ক থেকে যখন ফিরছি তখন সূর্য বেশ উপরে। গরম হাওয়া প্রায় বইতে শুরু করেছে। রাস্তাঘাটে গাড়ি, বিশেষ করে দূরপাল্লার লরিগুলো, বেশ জোরে হাঁকিয়ে যাচ্ছিল। আমি হোটেলের সামনের গোবিন্দা মার্গ পার হয়ে লবিতে খাণিকক্ষণ বসলাম। পার্কের নামের কথা ভাবলাম, শহীদ ভাগত সিং।

শহীদ ভাগত সিং-এর সাথে আমার পরিচয় বহুদিনের পুরাতন ভারতীয় বক্স অফিস হিট ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত 'শহীদ' নামের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। তখনও ছবিটি দেখিনি; রিভিউ পড়ে ভাগত সিং-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী জেনেছিলাম। এর পরে আরও জেনেছি। ইদানিং আরও দু'টি চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে এ স্বাধীনতা সেনানীর উপর।

ভাগত সিং অনেকটা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের মত মহাত্মা গান্ধীর নন-ভায়োলেন্স-এর বিপরীতে ছিলেন। ভারতকে ইংরেজমুক্ত করতে তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র। গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও তরুণ ভাগত সিং আর তার সহযোগীরা গান্ধীর আদর্শের সাথে একমত হতে পারেনি। ভাগত সিং মনে করতেন রক্ত ঝরানো ছাড়া সহজে পাওয়া স্বাধীনতা কোন স্বাধীনতা নয়। তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথে অনেক রক্ত ঝরেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নবাব সিরাজউদ্দৌলা থেকে টিপু সুলতান, রাণী লক্ষ্মী বাঈ, বখত খান, হযরত মহল থেকে মঙ্গল পাণ্ডেসহ অনেক মানুষ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছিলেন।

এ রক্ত ঝরেছে প্রায় দু'শ' বছর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামীদের চাপে পড়তে থাকে। দেউলিয়া অবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেতে হয়েছে ব্রিটিশ বাহিনীকে। ওই সময়ে স্বশাসনের নিশ্চয়তা দিয়েই ভারতীয় সৈনিকদের ব্রিটিশ বাহিনী ব্যবহার করেছিল পশ্চিমে অক্ষ শক্তি আর

www.pathagar.com

পূর্বে ইমপেরিয়াল জাপানের বিরুদ্ধে। এ সিদ্ধান্ত ছিল হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই। ইংরেজদের বিশ্বাস করতে পারেনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস। তাই তিনি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করবার ব্রত নিয়েছিলেন। তিনি স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি।

শহীদ ভাগত সিং-এর জীবন অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। ১৯০৭ সালে পাঞ্জাবে শিখ পরিবারে জন্মেছিল এই ক্ষণজন্মা পুরুষ। তার পরিবারের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ভাগত সিং বেড়ে উঠেছিলেন। লাহোরে পড়াশুনা করেছেন বহু বছর। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এই শিখ যুবক এক পর্যায়ে নিজের চেহারা পাল্টাতে দাড়ি কামিয়ে চুল ছেটে ফেলে ছিলেন। কথিত আছে তাকে শিখ সম্প্রদায় হতে বহিষ্কার করাতে তিনি নিজেকে বিধর্মী হিসেবে প্রচার করতেন। ক্রমেই ভাগত সিং ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠন 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন' (HRA) এর শীর্ষপদে পদায়িত হন। পরে এই সংগঠন হিন্দুস্থান স্পেশালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশনে (HSRA) পরিবর্তিত হয়। ব্রিটিশ রাজ এ সংগঠনকে কমিউনিস্ট হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল।

ভাগত সিং-এর সক্রিয় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় সিমনস্ কমিশনের লাহোর আগমনকে কেন্দ্র করে। জনপ্রতিরোধ প্রতিহত করতে জমায়েত জনতার উপর পুলিশের আক্রমণের পর হতে। সিমনস্ কমিশনের বিরুদ্ধে গণজমায়েত ও মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পাঞ্জাবের অন্যতম রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী লালা লাজপত রায়। তিনি পুলিশ একশনে মারা যান যা ভাগত সিং-কে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। ওই মিছিলে নেতৃত্বদানকারী লালা লাজপত রায়কে যে কোন মূল্যে নিবৃত্ত করতে প্রয়োজনে লাঠিচার্জ করবার আদেশ ওই সময়কার ডেপুটি পুলিশ সুপার জে পি সান্দারস (JP Saundars) পালন করেছিলেন মাত্র। কিন্তু পুলিশ এ্যাকশনের হুকুম দেয় পুলিশ সুপার স্কট। তার নির্দেশে পুলিশ রাজপথে লালা লাজপত রায়কে লাঠিপেটা করে গুরুতরভাবে জখম করে। ওই জখমে লাজপত রায় নভেম্বর ১৭, ১৯২৮ মারা যান।[৩] লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু সমগ্র পাঞ্জাব তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী সহিংস আন্দোলন তীব্রতর করে। ভাগত সিং ওই দৃশ্য নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন আর সেই সময়েই প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।[৪] এবং পুলিশ সুপার স্কটকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়।

লাহোরের ওই ঘটনাই ইতিহাসের নায়কের জন্ম দেয়। ভাগত সিং প্রতিশোধ নিতে একত্র হন তার অন্যান্য সহযোগীদের সাথে। এদের মধ্যে ছিলেন সিভরাম রাজগুরু, জয় গোপাল এবং সুখদেব থাপার। এ কয়েকজন মিলে পরিকল্পনা করেন পুলিশ সুপার স্কটকে হত্যা করবার। জয়গোপালের দায়িত্ব ছিল স্কটকে শনাক্ত করবার।

৩। *রঘুনাথ রায় "হিস্টোরী" ভিকে পাবলিকেশন।*

৪। *Moher Ali "Requiem for a Freedom Fighter"*

www.pathagar.com

কিন্তু জয় গোপাল সান্দারসকে স্কট ভেবে শনাক্ত করলে ভাগত সিং সান্দারসকে ভুলবশত হত্যা করেন। ওই হত্যার পরই ভাগত সিং দাড়ি, চুল কামিয়ে চেহারা পরিবর্তন করে লাহোর থেকে সঙ্গীদের নিয়ে সরে পড়েন।

ভাগত সিং এবং তার সহযোগীরা সর্বভারতে পরিচিতি পায় যখন এপ্রিল ৮, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ভাগত সিং-এর নেতৃত্বে এসেম্বলি বিল্ডিং-এ বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ভাগত সিং-এর অন্যতম সহযোগী বটকেশ্বর দত্ত এসেম্বলির বারান্দায় বোমা বিস্ফোরণ করে জয়ধ্বনি তোলেন 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। এ জয়ধ্বনি পরে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জয়ধ্বনিতে পরিণত হয়। ওই বোমা মারার পর সমগ্র এসেম্বলিতে লিফলেট ছড়ানো হয় যার মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করতে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেয়া হয়। পরে ভাগত সিং সহ অন্যান্য সহযোগীরা আত্মসমর্পণ করেন। এ বোমাবাজির বিচার চলে বহুদিন। প্রমাণিত হয় বোমা কাউকে মারবার উদ্দেশ্য ছোঁড়া হয়নি এমনকি তৈরিও হয়নি। শুধুমাত্র আন্দোলনের গতি বাড়াতে এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে তাদের আন্দোলনের বিষয় জানিয়ে দিতে বোমার ব্যবহার হয়েছিল। এ মামলার প্রায় তিন মাস শুনানির পর জুন ১২, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ভাগত সিং এবং দত্তকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। এ ঘটনার বিচার শেষ হবার পরপরই ব্রিটিশ সরকার সান্দারস-এর হত্যার সাথে ভাগত সিং ও অন্যদের সম্পৃক্ততা উদঘাটন করে।

এবার বিচার শুরু হয় হত্যার। মুখ্য আসামী ভাগত সিং, রাজগুরু এবং সুখদেব। এ বিচারকার্য চলাকালীন এক কথায় ভাগত সিং তরুণদের আদর্শে পরিণত হন। অহিংসার রাজনীতির বিপক্ষে তথাকথিত সহিংস আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে গোটা পাঞ্জাবসহ উত্তর ভারতে। বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তিনজনকে। জেলে থেকে ভগত সিং আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠেন।

জেলে থেকেই ভাগত সিং এবং তার অন্যান্য সহযোগীরা একযোগে ৬৪ দিন ভুখহরতাল করেন এক দাবিতে; "ভারতীয় রাজবন্দিদের ইউরোপিয়ান রাজবন্দিদের মত সমান সুযোগ দিতে হবে।" জেলের মধ্যে ভাগত সিং এবং অন্যদের এ দাবির প্রতি সমর্থনে সোচ্চার হয়ে উঠে গোটা ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ হতে আপামর জনসাধারণ। অতঃপর চাপের মুখে পড়ে ব্রিটিশ রাজ ভাগত সিং-এর দাবি মেনে নেয়। ভাগত সিং হয়ে উঠেন এক কিংবদন্তী বিপ্লবী হিসেবে। অবশেষে ভাগত সিং ও তার দুই সহযোগী, রাজগুরু এবং সুখদেবকে লাহোর জেলে মার্চ ২৩,১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা আগে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়।[৫] খবরে প্রকাশ, সকাল ৮টায় ফাঁসি কার্যকর করবার বিধান থাকলেও ওই দিন শহরে দাঙ্গা এবং জেল হামলার

৫. *The Tribune India: out of Martyrdom of Shaheed Bhagat Singh.*

www.pathagar.com

আশঙ্কায় ফাঁসির সময় একঘণ্টা এগিয়ে আনা হয়। নির্ভীক এই তিন বিপ্লবী ভাইসরয়ের নিকট অনুকম্পার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি তুলতে তুলতে নিজেরাই নিজেদের গলায় ফাঁসির ফাঁস পরিয়ে দেন।

ভাগত সিংকে নিয়ে শুধু ছবিই নয়, বহু বই প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে কেএম কুনার এবং জি এস সিনধরা রচিত বইয়ে "Some Hidden Facts : Martyrdom of Shaheed Bhagat Sing-Secrets unfurled by an Intelligence Bureau Agent of Britsh India" এক চমকপ্রদ তথ্য তুলে ধরেন। ওই বইতে বলা হয়, ভাগত সিং এবং তার দুই সহযোগীকে আধামরা অবস্থায় ফাঁসি কাষ্ঠ থেকে বের করে আনা হয় যাতে জেপি সানদারস-এর পবিরার প্রতিশোধ নিতে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে। ওই বইটির লেখকদ্বয়ের মতে এমনই হয়েছিল এবং সে কারণেই একঘণ্টা আগেই ফাঁসিতে নিয়ে যাওয়া হয়। ভাগত সিং গংকে ফাঁসি দেবার কার্যক্রমের নাম দেয়া হয়েছিল 'অপারেশন ট্রোজান হর্স'। তবে গবেষকরা এ ধরনের দাবির ব্যাপারে সন্দিহান।[৬]

শহীদ ভাগত সিং-এর উপাখ্যানের ইতি টানব হালের এক বির্তকের কথার উল্লেখ করে। এ বিতর্ক উঠে ভাগত সিং-এর ফাঁসির সময় এবং মৃত্যুদণ্ডের হ্রাসের উপরে মহাত্মা গান্ধীর অবস্থান নিয়ে। আগেই বলেছি ভাগত সিং মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন না। যে কারণে তিনি গান্ধীর খুব পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন না। এ বিতর্ক শুরু হয় রাজকুমার সন্তোষী প্রযোজিত চলচ্চিত্র "লিজেন্ড অব ভাগত সিং" নির্মাণের পর। ওই ছবিতে দেখানো হয় যে, গান্ধী ভাগত সিং-এর উপর বিরক্ত ছিলেন এবং তিনি ভাগত সিং-এর ফাঁসির বিরোধিতা করেননি। ওই ছবিটিতে বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যাতে মনে হয়েছে গান্ধী ভাগত সিং-এর ফাঁসির পক্ষে কিছুটা ষড়যন্ত্রমূলক অবস্থায় জড়িয়ে পড়েছিলেন।[৭] গান্ধীবাদীরা এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, গান্ধী সব সময়েই শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী ছিলেন।[৮] অতি সম্প্রতি প্রথমবারের মত পাকিস্তানের পাঞ্জাবের গভর্নর, আমার পুরাতন বন্ধু খালেদ মকবুল ঘোষণা দিয়েছিলেন যে লাহোরে ভাগত সিং-এর জন্য মেমোরিয়াল তৈরি হবে এবং লাহোর (পাকিস্তান) যাদুঘরে ভাগত সিং-এর স্মৃতিচিহ্ন প্রদর্শিত হবে। তার মতে ভাগত সিং উপমহাদেশের প্রথম বিপ্লবী যার পথ ধরে ওই সময়ের বহু তরুণ ব্রিটিশ রাজবিরোধী বিপ্লবে যোগ দেয়।[৯] ভারতের সংসদ ভবনের সামনে শহীদ ভাগত সিং-এর দণ্ডায়মান বিশাল মূর্তি স্থাপিত রয়েছে।

বিপ্লবীদের বীর গাঁথা ভাগত সিং-এর মত কোন বিশেষ জাতি গোষ্ঠী বা দেশের

৬. *Sunday Times : Was Bhaghat Singh Shot dead?*
৭. *'Legend of Bhaghat Singh,' Film 2002*
৮. *Front line : 'Of Means and Ends': Parsh R. Vajoya,*
৯. *Daily Time of Pakistan:Bhaghat Sing Remem bered:*

www.pathagar.com

গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না বরং তাঁদের আত্মত্যাগ অনুপ্রেরণা যোগায় প্রজন্ম হতে প্রজন্মের মধ্যে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেও এমন বীর শহীদদের বীরগাঁথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। চে'গুয়েভারা শুধু লাতিন আমেরিকাতেই আলোচিত নন বরং আলোচিত সমগ্র বিশ্বে। এ ধরনের বিপ্লবী বীর সব জাতির গর্ব।

হোটেলের লবিতে বসে ভাগত সিংকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে গায়ে ঘাম শুকোলে রুমে চলে যাই তৈরি হয়ে আমাদের প্রথম দিনের নির্বাচনী পর্যবেক্ষণে সময় মত যোগ দিতে। সকাল ১০টায় আমরা স্থানীয় লিয়াজোঁ অফিসারের সাথে জয়পুর জেলার জেলা নির্বাচন অফিসারের অস্থায়ী কার্যালয়ের দিকে রওয়ানা হলাম। জয়পুরের কিছু অলিগলি রাস্তা ঘুরে এসে পৌঁছলাম 'ভবানী নিকেতন' কলেজের প্রাঙ্গণে। বেশ বড় মাঠ। বিশাল আকারের একতলা কলেজ ভবন, কিছুটা ইন্দো-ইউরোপিয়ান সংমিশ্রণের ভবন প্রায় শত বছর পুরনো। অনেকাংশে সংস্কারের কাজ চলছে। নতুন গেট তৈরি হচ্ছে যার নক্সা মূলভবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই করা হয়েছে। এ প্রথম আমার চোখে পড়ল উল্টোদিকের দেয়ালে সাটানো কয়েকটি পোস্টার। কিছুটা হোঁচট খেলাম। কারণ, দিল্লীর ব্রিফিংয়ে আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করে যে 'মডেল কোড অব কন্ডাক্ট' প্রস্তুত করা হয়েছিল তাতে পোস্টারের ব্যবহারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও মৌখিকভাবে পোস্টারের যত্রতত্র ব্যবহারের বিষয়টি সব দলই মেনে চলার আশ্বাস দিয়েছিল। তবে পরে জানতে পারলাম যে, হিন্দিতে ছাপানো পোস্টারগুলো বেশির ভাগ নির্দলীয় প্রার্থীদের।

আগেই বলেছি রাজস্থানের আসন সংখ্যা ছিল ২৫টি। রাজস্থানে মোট প্রশাসনিক জেলার সংখ্যা ৩৩টি আর বিভাগ রয়েছে ৭টি। বিধানসভার (রাজ্যের সংসদ) আসন ২০০টি। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি কিলোমিটারে ১৬৫ জন।

আমাদের বহনকারী গাড়িগুলো কলেজ ভবনের সামনে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নামতে অভ্যর্থনা জানালো জয়পুর 'আরবান' আসনের রিটার্নিং অফিসার যিনি এসিস্ট্যান্ট ডেপুটি কালেক্টর পদের। নামতেই চেখে পড়ল দু'পাশে আর পেছনে বিশাল তাঁবুর নিচে শত শত পোলিং কর্মকর্তা আর প্রিজাইডিং অফিসারদের নির্বাচনের উপকরণ, বিভিন্ন ধরনের ফরম বুঝে নেবার প্রক্রিয়া। দেখলাম প্রায় সকলেই ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন পরীক্ষা করে সিল করে নিচ্ছেন। এগুলো কেন্দ্রে স্থাপনের পর নির্বাচনী এজেন্টদের সামনে সিল খুলে পরীক্ষা করা হবে। যাকে বলা হয় 'ডামি ভোটার রান'। এখানে বলে রাখা ভাল যে, এ কাজের জন্য নির্বাচনী এজেন্টদেরকেও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কয়েকজন প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে জানতে চাইলাম কোন ধরনের অসুবিধা হচ্ছে কিনা। তারা জানালেন যে, ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন। বাইরে এতক্ষণে বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এমন গরম যে গায়ের চামড়া পোড়ার মত অবস্থা

www.pathagar.com

মনে হচ্ছিল। একমাত্র নিরাময় প্রচুর পানি পান করা। প্রচুর পানির বোতল গাড়িতে ছিল। কাজেই পথে পানি পানের সমস্যা হয়নি।

একজন তরুণী যার এটাই প্রথম নির্বাচনের দায়-দায়িত্ব আমাদেরকে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার অস্থায়ী অফিসে নিয়ে আসলেন। পরিচয় দিলেন তরুণ কর্মকর্তা। মিঃ কুলদিয়া রাংকা, আইএএস (IAS) অফিসার। একাধারে জয়পুরের ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর এবং ম্যাজিস্ট্রেট (DC&M) নির্বাচনে অতিরিক্ত দায়িত্ব, জেলা নির্বাচন অফিসার। যথারীতি পরিচয় আর অভ্যর্থনার পর তিনি (DC&M) আমাদেরকে প্রথমে জেলার নির্বাচনী কাঠামোসহ অন্যান্য বিষয়ে ব্রিফিং দিলেন।

রাজস্থানে ১৫তম লোকসভার নির্বাচনের জন্য মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ। এর মধ্যে এ রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি কাজে নিয়োজিতরাও রয়েছে। লোকাল ভোটার সংখ্যা ৩ কোটি ৬৯ লক্ষ তার মধ্যে এ মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ কোটি ৯৪ লক্ষ এবং মহিলা ভোটার ১ কোটি ৭৫ লক্ষ। মোট কেন্দ্র ৪২,৭০২ টি যার মধ্যে আরবান সংসদীয় আসনের কেন্দ্র ৮১৪৬ এবং রুরাল রাজস্থানের আসনের ৩৪,৫৫৬টি কেন্দ্র।

এ রাজ্যে ৮৮.৩৪ ভাগ ভোটারের তালিকায় ছবি রয়েছে। বাকি ভোটারদের নাম থাকলেও ছবি নেই। কারণ, এসব ভোটার ছবি সরবরাহ করেনি। কাজেই এদেরকে ভোট দিতে হলে পূর্বে ব্যবহৃত ছবিসহ ভোটার পরিচয়পত্র চেহারা শনাক্ত করবার জন্য দেখাতে হবে। এক্ষেত্রেও কিছুটা সমস্যা রয়েছে বলে জানালেন তরুণ চটপটে আইএএস (IAS) অফিসার। রাজ্যে মাত্র ৯১.৬৬ শতাংশ ভোটারের কাছে এ পরিচয়পত্র, ইলেকট্রনিক ফটো আইডেনটিটি কার্ড, (EPIC) আছে। কাজেই দুর্ভাগ্যবশত যে ভোটারের কাছে ভোটার পরিচয়পত্র অথবা লিস্টে ছবি নেই তার জন্য ভোট দেয়া এক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এমনই এক প্রশ্নের জবাবে আমাদেরকে মি. রাংকা জানালেন যে, সে ক্ষেত্রে ছবিসহ তেরটি বিভিন্ন ধরনের পরিচয়পত্রের যে কোন একটি দেখালে এবং শনাক্ত হলে কোন ব্যক্তির লিস্টে ছবি না থাকলেও নাম-ঠিকানা নিশ্চিত হলে ভোট দিতে পারবেন। তেরটি পরিচয়পত্র হল, ভোটার পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্যক্তিগত একাউন্ট নম্বর (PAN), ব্যাংকের পাসবই, অফিসিয়াল পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট, জন্ম সনদ, বোর্ডের সনদ, স্কুলের পরিচয়পত্র, জমির দলিলাদি, নোটারি পাবলিকের নিকট হতে সনদ এবং ছবিসহ রেশন কার্ড। নির্বাচনের দিন কয়েকটি কেন্দ্রে রেশন কার্ডের সাহায্যে পরিচয় নিশ্চিত করতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে দেখেছি ভোটারদের। যাক সে বিষয়ে পরে আসব।

রাজস্থানের ২৫টি আসনের জন্য বৈধ প্রার্থী ছিল মোট ৩৪৬, যার মধ্যে মহিলা প্রার্থী ছিলেন ৩০ জন। মোট ইভিএম (EVM) দেয়া হয়েছিল ৫৪২০০টি। জয়পুরের

www.pathagar.com

দু'টি আসনের একটি, জয়পুর রুরাল ১৫৫০টি পোলিং বুথ (Station বলে থাকে), ইভিএম ছিল ১৭৬০টি এবং পোলিং কর্মকর্তা কর্মচারী ছিল ৭৭৫০ জন। অপরদিকে আরেকটি আসন, জয়পুর আরবান-এ বুথ ছিল ১৫৭৬ এবং ইভিএম দেয়া হয়েছিল ১৮৫০টি। পোলিং কর্মকর্তা ছিলেন ৭৮৮০ জন।

নির্বাচনের কাঠামোগত বিষয়ে কর্মকর্তা জানালেন যে, প্রত্যেক রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ দেন প্রিজাইডিং অফিসার এবং অন্যান্য পোলিং কর্মকর্তাদের। প্রিজাইডিং অফিসাররা মূলত সরকারি কর্মকর্তা অথবা স্কুল-কলেজের শিক্ষক। প্রায় আমাদের মতই। তবে এখানে তফাত হল ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রতিটি বুথ বা কামরার জন্য একজন করে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়। আমাদের ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং অফিসার কেন্দ্রভিত্তিক নিয়োজিত হয় আরও থাকেন এসিস্ট্যান্ট প্রিজাইডিং অফিসার।

নির্বাচন সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রত্যেক রাজ্যের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা (CEO) প্রতি আসনের জন্য ন্যূনতম পক্ষে একজন করে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেন। এ পর্যবেক্ষকরা সব সময় যোগাযোগ রাখেন প্রধান নির্বাচন অফিসার অথবা জেলা নির্বাচন অফিসারের সাথে। প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের নিচে থাকে এক বা একাধিক মাইক্রো পর্যবেক্ষক বা অনুপর্যবেক্ষক। এদের নিয়োগ দেয়া হয় সরকারের কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে ন্যূনতম পক্ষে পঁচিশ (২৫) দিনের জন্য। এ সময়ের জন্য এদের চাকরি ন্যস্ত থাকে নির্বাচন কমিশনের উপরে। এ সব অবজারভাররা প্রার্থীর প্রচারণা হতে ভোট প্রদান পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। প্রচারণায় আইনের ব্যত্যয় অথবা ভোটের দিনে কেন্দ্রে কোন সমস্যা হলে তাৎক্ষণিকভাবে রিপোর্ট করা হয় সরাসরি প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার নিকটে। তবে ভোটের দিন অনু-পর্যবেক্ষকরা থাকেন মোবাইল এবং নিয়োজিত থাকেন পূর্বে ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত কেন্দ্রের সন্নিকটে।

ভারতের নির্বাচনে এ পর্যন্ত কোন দেশী বা বিদেশী পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয়া হয়নি। এবারই প্রথম সরকার আমাদের দলকেই অনুমতি দিয়েছেন, যদিও স্থানীয় বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতির জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট ধরণা দিয়ে আসছে। নির্বাচন কমিশনের মতে এ ধরনের পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে না। কারণ, ভারতে নির্বাচনের ফলাফলের জন্য কখনই কোন দল নির্বাচন কমিশনকে দোষারোপ করেনি। সে রকম হলে হয়ত অনেক দলই এবার প্রতিবাদ করতে পারত–নবীন চাওলার কথিত কংগ্রেস ঘেঁষা হবার অভিযোগে।

ফিরে আসছি ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার আলোচনায়। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত পর্যবেক্ষক ছাড়াও নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ও রাজ্যের এবং কেন্দ্রের রিজার্ভ ফোর্স ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেনাবাহিনী অথবা প্যারামিলিটারি ফোর্স সচরাচর

www.pathagar.com

ব্যবহার করা হয় না, শুধুমাত্র গোলযোগপূর্ণ রাজ্য জম্মু-কাশ্মীর অথবা উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে যেখানে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে এসব বাহিনী নিয়োজিত রয়েছে। কেবলমাত্র নিরাপত্তা কর্মীদের অপ্রতুলতার জন্যই ভারতে একদিনে নির্বাচন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

নিরাপত্তা কর্মী ছাড়া প্রতি বুথের জন্য রয়েছে বুথ লেভেল অফিসার (BLO)। এদের নিয়োগ দেয়া হয় ভোটার লিস্ট তৈরির সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে। বেশির ভাগ সময়েই তথ্য সংগ্রহকারীদের নিয়োজিত করা হয়। এদের অবস্থান থাকে বুথের বাইরে চৌহদ্দির মধ্যে। BLO রা ভোটারদের সাহায্য করে থাকেন শনাক্ত করণে অথবা ভোটার লিস্টের ছোটখাটো ত্রুটির নিরসনে। বৈধ ভোটারদের ভোট প্রদানে যাবতীয় বিষয় সাহায্য করার কাজটিও BLO রা করে থাকেন । যদিও আমাদের মত চৌহদ্দির বাইরে প্রার্থীর এজেন্টরা ভোটার শনাক্ত করবার কাজটি করে থাকেন। তদুপরি কোন ভোটার ওইসব ক্যাম্পে না যেতে চাইলে BLO রা তাদের শনাক্তকরণের সিরিয়াল নম্বরের স্লিপ প্রদান করেন।

ব্রিফিং-এ আরও জানলাম যে, জয়পুর 'রুরাল' আসনের জন্য বিজেপি, বিএসপি এবং কংগ্রেস ছাড়াও অন্যান্য পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মোট ২১ জন। পর্যবেক্ষক ছিল ৪ জন, অনুপর্যবেক্ষক ১৩২ জন। ভিডিও ক্যামেরা টিম ৬টি এবং ডিজিটাল ক্যামেরা ১১৭টি। অপরদিকে জয়পুর আরবান-এ তিনটি প্রধান দল ছাড়াও ১৯ জন নির্দলীয় প্রার্থীসহ অন্যান্য দল মিলিয়ে মোট প্রার্থী ছিল ২৫ জন। পর্যবেক্ষক ছিল ৪ জন অনু-পর্যবেক্ষক ছিল ১০১ জন। ভিডিও টিম ছিল ৩১টি আর ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়েছিল ৮১টি।

প্রায় দেড় ঘণ্টার মত আমরা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার ক্যাম্পে ব্রিফিং এবং আধা ঘণ্টা সরজমিনে আয়োজন দেখে রওয়ানা হলাম নিরওয়ান মার্গ হয়ে গোল্ডেন তুলিপের দিকে– যেখানে কালেক্টরেট ভবন এবং প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার অফিস। কালেক্টরেটের সামনের মূল সড়কের নাম 'সানসার চন্দ্র রোড'। মিঃ সানসার চন্দ্র, যার নামে এত বড় রাস্তাটির নামকরণ করা হয়েছে, তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রের অত্যন্ত খ্যাতিমান সাহিত্যিক- যার প্রায় ৫০টি মূল গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে, তার হালকা লেখনীর ধরণ পরবর্তীতে বহু লেখককে এ ধরনের লেখায় অনুপ্রাণিত করেছিল। এ সাহিত্যিকের সম্মানেই জয়পুরের অন্যতম প্রধান সড়কের নামকরণ।

আমরা যখন কালেক্টরেটে পৌঁছলাম তখন প্রায় দুপুর দুটোর উপরে। CEO আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আগামী দিনের, অর্থাৎ মে ৭-২০০৯-এ নির্বাচনী পর্যবেক্ষণের বিষয়ের উপর বক্তব্য রেখে বললেন, আমরা যে কোন জায়গায়, শুধুমাত্র মাত্র ভোট প্রদানে ব্যবহৃত গোপন কক্ষ ছাড়া, অবাধে যেতে পারব এবং প্রয়োজনে যে

www.pathagar.com

কোন কর্মকর্তার সাথে আলাপও করতে পারব। তবে বুথের ভেতরে ছবি না নিতে অনুরোধ জানালেন।

ওই কর্মকর্তা ২০০৮-এর বাংলাদেশের নবম সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে এসেছিলেন। তিনি এক কথায় জানালেন যে, তিনি বাংলাদেশের এমন শান্তিপূর্ণ এবং অত্যন্ত নিখুঁত একটি নির্বাচন দেখে অভিভূত হয়েছেন। বিশেষ করে শতভাগ ছবিসহ ভোটার তালিকা শেষ করা এবং ইনটেগ্রেটেড পদ্ধতিতে ভোটারদের নিবন্ধনের প্রক্রিয়াকে তিনি একটি অনুকরণীয় পদ্ধতি বলে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তার মতে, বাংলাদেশের নির্বাচন ছিল একটি মডেল নির্বাচন। CEO-এর ব্রিফিং তেমন তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। কারণ ইতোপূর্বে নির্বাচন কমিশন এবং DEO যে ব্রিফিং দিয়েছে তার বাইরে তাঁর বলার বা জানাবার তেমন কিছু ছিল না।

ব্রিফিং শেষে আমার এক প্রশ্নের জবাবে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সংক্ষেপে জানালেন যে, নির্বাচনের সময়ে রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, সেগুলোতে নির্বাচনকে প্রভাবিত করবার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলো তার কাছে পাঠানো হয়। প্রয়োজনে তিনি দিল্লীতে নির্বাচন কমিশনে যোগাযোগ করে মতামত দেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার অফিস থেকেই এসব বিষয় নিষ্পত্তি করা হয়। এ সময়ে রাজ্য সরকারের কার্যক্রমও সীমিত থাকে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাই যৎ সামান্য ব্যাখ্যা দিতে চাই।

আগেও যেমন বলেছিলাম রাজ্যের সিইও-এর নিয়োগ নির্বাচন কমিশনই দিয়ে থাকে। এরা প্রেষণে নিযুক্ত থাকেন এবং ওই সময়ের বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনই তৈরি করে। CEO রাজ্যের সব স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজন ও পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে রাজ্যের নির্বাচন মন্ত্রণালয় CEO কে সাহায্য করে থাকে। উল্লেখ্য, সংবিধান মোতাবেক স্থানীয় সরকার নির্বাচন রাজ্যের এখতিয়ারে।

জয়পুর কালেক্টরেট ছেড়ে আমরা যখন হোটেলে পৌঁছলাম তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল প্রায় চারটা। এরপরে জয়পুরের সন্নিকটে দর্শনীয় স্থান দেখার আয়োজন করা হয়েছিল। আমি যাবনা জানিয়ে আমার সহধর্মিণীকে নিয়ে নিজস্ব আয়োজনে জয়পুরের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীর ঘেরা পুরাতন শহরের, যার নাম 'পিংক সিটি', বিখ্যাত 'হাওয়া মহল' সংলগ্ন জোহারী বাজারের দিকে যাব মনস্থ করলাম। আমাকে ঢাকায় অবস্থানরত এক ভারতীয় বন্ধু জয়পুরে তার এক আত্মীয়কে আমার আগমনের ব্যাপারে আগেই বলে রেখেছিলেন। কাজেই কোন সমস্যা হবার কথা ছিল না।

কালেক্টরেট হতে ফিরবার পথে রাজস্থানের পোশাকের কিছু নমুনা দেখলাম

www.pathagar.com

মহিলা-পুরুষের পরিধানে। তবে শহরে ততটা ঐতিহ্যবাহী পোশাক দেখা যায় না তবুও যতটুকু দেখলাম তাতে আমার কাছে মনে হল এখানকার মহিলারা অত্যন্ত রঙ্গিন চুমকির কাজ করা শাড়ি অথবা সালোয়ার কামিজ এবং ঐতিহ্যবাহী ঘাঘড়া চোলী পরতে পছন্দ করেন। রাজস্থানী পোশাক, বিশেষ করে সাধারণ গ্রামের মানুষের ঐতিহ্যবাহী রঙিন পাগড়ি, আজকাল বাংলাদেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ছেলে-মেয়ের বিয়ের উৎসবে অপরিহার্য পরিধেয়তে পরিণত হয়েছে। যা এখানে সাধারণ তাই অতি অসাধারণ দামে ঢাকার অভিজাত বিপণীগুলোতে দেদার বিক্রি হয়।

রাস্তাগুলোর আশেপাশের দৃশ্য আমাদের দেশের শহরের মতই প্রায়। তবে তেমন যানজট নেই। যতটুকু সবুজ গাছপালা দেখা যায় তার বেশির ভাগই মরুভূমিতে অল্প পানিতে বেঁচে থাকার মত ক্ষমতা সম্পন্ন গাছপালা।

অনেকটা পথ পেরিয়ে বিকেল চারটার দিকে হোটেলে পৌঁছে জানতে পারলাম মিঃ হরি সিং সেখাওয়াত নামে একজন স্থানীয় ব্যক্তি আমার খোঁজ করেছিলেন। যোগাযোগ করে মিঃ সেখাওয়াতকে পেলাম। পরিচয় দেবার পর তিনি হিন্দি ইংরেজি মিশিয়ে আমাকে জানালেন ঢাকা থেকে মিঃ সাতেন্দ্রার ফোন পেয়ে তিনি আমার আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। কখন হোটেলে আসলে আমাকে সস্ত্রীক বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন তা জানতে তিনি যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন। আমার গন্তব্যস্থল জানতে চাইলেন। আমি তাকে বিকেল ৫-৩০ মিঃ আসতে বলে বাথরুমে গোসল সেরে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। বাইরে তখন প্রচণ্ড খরতাপ। আমার সহধর্মিণী সারাদিন রুমে কাটিয়েছেন কারণ তিনি গরমে কোথাও বের হতে চাননি। বিকেলে শহরে এবং আগামীকাল সকালে আমাদের সাথে কেন্দ্র দেখতে যাবেন। তার জন্যও একটি পর্যবেক্ষকের পাস নেয়া হয়েছিল। আমার নির্বাচন কমিশনে অন্তর্ভুক্তির পর হতে নির্বাচন বিষয়ে তার যথেষ্ট আগ্রহ বেড়েছে। বিশেষ করে বিষয়টি যখন রাজনীতির সাথে জড়িত। তিনি পেশায় চিকিৎসক, রাজনীতি না করলেও সমালোচনা বা পর্যালোচনা করতে দোষের কি? তিনি ইতোপূর্বেও মেয়র নির্বাচনের সময়েও আমার সাথে শ্রীপুরে গিয়েছিলেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বোধকরি বহু বছরে প্রথম ভোট দিয়েছিলেন। কারণ, কষ্ট করে ছবি তুলে ভোটার হতে ওই কেন্দ্রেই যেতে হয়েছিল বলে আমাদের নতুন প্রক্রিয়া তাকে ভোট দিতে উৎসাহিত করেছিল।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় রিসিপশন থেকে জানালো মিঃ হরি সিং সেখাওয়াত আমার অপেক্ষায় আছেন। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই তার সাথে দেখা করতে আসছি বলে রিসিপশনিস্টকে জানালাম। আমরা যথা সময়েই প্রস্তুত ছিলাম-কাজেই নিচে নামতে সময় লাগেনি।

লবিতে নামতেই হালকা পাতলা মধ্যম উচ্চতার শার্ট প্যান্ট পরা মধ্যবয়সের এক

www.pathagar.com

ভদ্রলোক পরিচয় দিলেন হরি সিং সেখাওয়াত, মিঃ সাতেন্দ্রার বন্ধু। পেশায় একজন জার্মান ভাষা জানা সর্বভারতীয় গাইড। বাড়ি রাজস্থানের সেখাওয়াতী নামক অঞ্চলে। সেখাওয়াত রাজস্থানের উচ্চবর্ণের রাজপুত গোত্র। স্মরণ থাকতে পারে যে, ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন ভৈর সিং সেখাওয়াত আর এপিজে আব্দুল কালাম ছিলেন রাষ্ট্রপতি। ভৈর সিং সেখাওয়াতের একটি বাড়ী জয়পুর শহরে রয়েছে। আমি মিঃ হরি সিংকে বললাম, "আমার নাম সেখাওয়াত নয় সাখাওয়াত।" উত্তরে হেসে বলল, "এখানে আপনাকে সেখাওয়াত ছাড়া আর কোনভাবে ডাকতে পারবে না।" ভাবলাম তাও ভাল। ইউরোপে আমার নামের উচ্চারণ নিয়ে বিভ্রাটে থাকে অনেকেই। বাংলাদেশেও অনেকে সহজতরভাবে শওকত বলে ফেলে। However what is in a name. আমি সতেন্দ্রাকে ধন্যবাদ জানাতে বললাম হরি সিং মহোদয়কে। বললাম, "আমরা প্রথমে জোহরী বাজারের দিকে যেতে চাইব।" রাস্তায় পড়বে জয়পুর শহরের প্রতীকী, হওয়া মহল।

বারটি বাজার রয়েছে পুরাতন জয়পুরের দেয়ালঘেরা শহরে। যার নাম পিংক সিটি এবং স্থপতি ছিলেন বাঙালী বিদ্যাধর ভট্টাচার্য, যার সম্বন্ধে আমরা আগেই জেনেছি।

সেখাওয়াতের সাথে আরেকজন যিনি ছিলেন তাঁর নাম বলবীর সিং, একজন স্থানীয় তরুণ ব্যবসায়ী, যার মাধ্যমেই সেখাওয়াত আমাদের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। বলবীরের পিতা বর্তমানে রাজ্য বিধান সভার সদস্য। আমরা চারজন বলবীরের গাড়িতে চড়ে পুরাতন জয়পুর বা পিংক সিটির দিকে রওয়ানা হলাম। রাস্তায় যেতে যেতে সেখাওয়াত নিজের সম্বন্ধে জানালো যে সে ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত গাইড। ইতিহাসে মাস্টার্স করেছে জয়পুর ইউনিভার্সিটি থেকে, পরে দিল্লীতে জার্মান ভাষা শিখেছে। জার্মান ভাষা জানার কারণে তৎকালীন পূর্ব-ইউরোপ এবং জার্মানীসহ পশ্চিম ইউরোপের বহু পর্যটন সংস্থার তালিকায় তিনি তালিকাভুক্ত। যেহেতু জয়পুর বা রাজস্থান একটি বিশাল পর্যটন অঞ্চল এবং দিল্লীর ও আগ্রার সন্নিকটে, কাজেই পর্যটন মৌসুমে তাকে প্রায়শই বাইরেই থাকতে হয়। এ সময়টা পর্যটকদের জন্য অনুকূল নয়, সে কারণেই তার হাতে কিছুটা সময় রয়েছে। তার সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে সে জানালেন যে জয়পুর তৎকালীন আমের-এর রাজধানী হিসেবে পর্যটকদের প্রথম পছন্দনীয় স্থান হলেও রাজস্থানের অন্যান্য শহরও পর্যটক আকর্ষণের জন্য কম নয়। রাজাস্থানের শহরগুলো সত্যই বৈচিত্র্যময়। বিকানীর, জয়ছলমির, উদয়পুর এবং যোধপুর নিজ নিজ সংস্কৃতি আর বৈশিষ্ট্যের কারণে বিশ্বে পরিচিত। আমার মনে হয়েছে উপমহাদেশের সবচাইতে বিচিত্র, আকর্ষণীয় আর রঙের বাহারের এমন সমাবেশ আর কোন অঞ্চলে নেই। এ সব শহরের মধ্যে আরেকটি শহর রাজস্থানকে অন্যান্য রাজ্য

www.pathagar.com

থেকে ভিন্নতর করেছে– শহরটির নাম আজমীর। উপমহাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সূফী সাধক খাজা মঈনউদ্দিন চিশতির দরগা আজমীরকে বিখ্যাত করেছে।

রাজস্থানের আরেকটি ছোট শহর আজমীর হতে পনের মাইল রাস্তায় যেতে হয়। শহরের নাম পুশকার, ওই শহরে রয়েছে হিন্দু ধর্মের একমাত্র ব্রাহ্ম মন্দির। হিন্দু তীর্থ যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র বলে চিহ্নিত এ শহর। ভগবান ব্রাহ্ম, যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন বলে হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্যেই নির্মিত বহু পুরাতন এ মন্দির। আর ভেলী পাহাড়ের পাদদেশে পুশকার শহরের আকর্ষণীয় স্থান পুশকার হ্রদ– এখানে ডুব দিয়ে পাপমুক্ত হওয়া যায় এমন বিশ্বাস হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের। দাবি করা হয়, এখানে বছরে একবার বিশ্বের সর্ববৃহৎ পশুর মেলা জমে। ওই মেলাকে কেন্দ্র করে সমগ্র পুশকার শহর মেলার শহরে পরিণত হয়। আমরা আজমীর থেকে সন্ধ্যায় পুশকার গিয়ে নামতে পারিনি। কেন পারিনি সে বিষয়ে আরও পরে জানাবো।

রাজস্থান, উপমহাদেশের অন্যতম উটের দেশও বলা যায়। জয়পুর শহরেও উটের বাহার দেখা যায়। এ অঞ্চলে উটকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে সাজিয়ে গাড়ি টানা অথবা বাহন হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রাজস্থানে উটে চড়ে বেড়ানো পর্যটকদের একটি আকর্ষণীয় বিষয়।

এর আগে আমি সেখাওয়াতের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলাম রাজস্থানের একটি অঞ্চলের নাম সেখাওয়াতী। এখানকার অধিবাসীরা সাহসী যোদ্ধা হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। মোগল বাহিনী হতে শুরু করে বর্তমান ভারতীয় সেনাবাহিনীতে রাজস্থানের সেওখাওয়াতীদের সংখ্যা সবচাইতে বেশি। এখানকার বেশির ভাগ লোকের নামের পেছনে সেখাওয়াত জুড়ে দেয়া হয়। হরি সিং সেখাওয়াতও এই উত্তর রাজস্থান অঞ্চলের একজন। সেখাওয়াতীকে ভারতের স্কটল্যান্ড বলা হয় ভৌগোলিক আঙ্গিকে নয় বরং স্কটিশের শৌর্য বীর্যের জন্য। এ অঞ্চল ব্রিটিশ রাজের সময় অন্যতম সামরিক বাহিনীর সদস্য সংগ্রহের স্থান ছিল।

ঘাগড়া, চোলী আর অপূর্ব গহনায় সজ্জিত রাজস্থানের সাধারণ মহিলারা, তবে গ্রামাঞ্চলে মহিলারা লম্বা ঘোমটা দিয়ে চলে। বিয়ের অনুষ্ঠানে বরযাত্রীর সামনে থাকে ঘোমটা দেয়া মহিলারা। বাদ্যের তালে তালে রাস্তায় রাজস্থানী ঐতিহ্যের নাচে অভূতপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি করেন সুন্দর সাজে সজ্জিত মহিলারা। অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন এ দৃশ্য, যে কোন পর্যটককে আকর্ষণ করতে সক্ষম। লোক সঙ্গীত আর রাজস্থানী নাচ বলিউডের বদৌলতে আমাদের কাছে অতি পরিচিত হয়ে উঠেছে।

রাস্তায় যেতে যেতে আমরা বাস্তবে এমন কয়েকটি দৃশ্য দেখেছি। মনে হচ্ছিল বলিউডের ছবির স্যুটিং চলছে। হরি সিং গাইড আমাদের জানালো আগামী দিন ৭ মে বিবাহের বাৎসরিক শুভলগ্ন। এই দিনে রাজস্থানের রাস্তায় রাস্তায় বরযাত্রীর শোভা যাত্রা

www.pathagar.com

দেখা যাবে। পত্রিকায় পড়েছিলাম যে, আশঙ্কা করা হচ্ছে যে ওই দিনে রাজস্থানের নির্বাচনে এ কারণেও ভোটার সমাগম কম হতে পারে। হয়েছিলও তাই।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দেয়ালে ঘেরা প্রায় তিনশত বছরের পুরাতন আদি পিংক সিটিতে 'সাংগানেরি গেট' দিয়ে প্রবেশ করলাম। পুরাতন হলেও নিখুঁত পরিকল্পিত শহর। পুরাতন হলেও যথেষ্ট পরিষ্কার আর ছিমছাম শহর। রাস্তাগুলো মোটামুটি প্রশস্ত। আমরা বাপু বাজারের রাস্তা পার হয়ে সোজা ঢুকলাম জোহারী বাজারের রাস্তায়। বাপু বাজার রাস্তা পার হতেই দু'পাশে দু'টি বিশাল মন্দির। দুটোর নামই হনুমান মন্দির। সমগ্র শহর একটি বিশাল বাজার। থরে থরে সাজানো হরেক রকমের পণ্য। বিশেষ করে রাজস্থানী পাগড়ি, ঘাঘড়া, চোলী এবং আকর্ষণীয় হস্তশিল্পের বাহার। এক কথায় আকর্ষণীয় ও চোখ জুড়ানো। দেখলে মনে হবে সব পণ্যের নমুনা হিসেবে একটা করে ক্রয় করতে। তবে আমার উদ্দেশ্য বাজার করা নয়। আমার সহধর্মিণীর আগ্রহ কয়েকটি বার্থ স্টোন কেনা এবং পুরাতন জয়পুর বা পিংক সিটি দেখা। জোহরী বাজারের রাস্তা ধরে আমরা আরও সামনে 'সিটি প্যালেস' এবং এর একপাশে জোহরী বাজারের রাস্তার উপর 'হাওয়া মহল' দেখবার উদ্দেশ্যেই এ রাস্তায় এসেছিলাম। 'বাদি চোপাটি' রোড জংশন পার হতেই চোখে পড়ল গোলাপী রংয়ের বিশাল রাজপ্রাসাদ। এগুতেই হাতের বায়ে রাজস্থানের তথা জয়পুরের বিখ্যাত 'হাওয়া মহল'। অত্যন্ত নয়নাভিরাম অপূর্ব শৈলীতে নির্মিত গোলাপী রংয়ের 'হাওয়া মহল'।

জোহরী বাজারের প্রাণ কেন্দ্রে, গোলাপী রংয়ের স্যান্ড স্টোনের তৈরি বিখ্যাত হাওয়া মহল বা বাতাসের মহল। নিঃসন্দেহে এটি জয়পুরের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। হরি সিং সেখাওয়াত জানালেন যেহেতু বিকেল পাঁচটা পার হয়ে গিয়েছে সে কারণে এখন আর মহলে প্রবেশ করা যাবে না। অগ্যতা বাইরে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা আর দেখার কাজ শেষ করতে হচ্ছে। সিটি প্যালেসের গা ঘেঁষে এ মহলের অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে কয়েক শত বেলকনি সদৃশ্য কামরা। যার ভেতরে দাঁড়িয়ে সামনে, ডানে এবং বায়ের বাজার, রাস্তা এমনকি বাজারের মানুষের চলাচল অবলোকন করা যায়। 'সিটি প্যালেস' এখনও মহারাজা জয়পুরের বাসস্থান। বর্তমানে অশীতিপর বৃদ্ধা মহারাণী গায়ত্রী দেবী বাস করেন। (এ লেখা পর্যন্ত। তিনি জুলাই ২০০৯-এ মৃত্যুবরণ করেন)

হাওয়া মহল ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে স্থপতি লাল চন্দ্র উস্তা সাওয়ায়ী প্রতাপ সিং-এর নির্দেশে নির্মাণ করেছিলেন। তবে এটি কেন তৈরি করা হয়েছিল তার কোন ব্যাখ্যা হরি সিং দিতে পারেনি। শুধু বলেছিলেন। প্রচলিত বিশ্বাস যে বিকেলে রাজপরিবারের মহিলাদের প্যালেসের বাইরে দৃশ্য দেখতেই এ পাঁচ তলা ভবন তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু গাইড বই হতে জানা যায় যে, মহারাজা সাওয়ায়ী প্রতাপ সিং নিজে একজন কবি

www.pathagar.com

ও সাহিত্যিক ছিলেন। ধর্মপ্রাণ এ মহারাজা রাধা-কৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেমের আসক্তিতে এটি তৈরি করে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে স্মৃতিময় করে উৎসর্গ করেছিলেন। মহল হাওয়া মহল অবশ্যই দর্শনীয় স্থান। প্রতাপ সিং-এর জয়পুরের রাজত্বের সময় ছিল ১৭৭৮ হতে ১৮০৩ পর্যন্ত।

গায়ত্রি দেবী দ্বিতীয় সাওয়ায়ী মান সিং-এর বিধবা পত্নী জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। পশ্চিম বাংলার কুচবিহারের শান্তি নিকেতনের ছাত্রী, অপূর্ব সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা এ মহিলার সাথে দ্বিতীয় মান সিং-এর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে হয়। তার একমাত্র পুত্র রাজকুমার জগত সিং ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। বিয়ের পর থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত রাণীর উপাধিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমানে জয়পুরে তিনি রাজমাতা হিসেবে সবার কাছে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে- তিনি এক সময় ভারতের উচ্চস্তরের ফ্যাশনের দেবী ছিলেন।

গায়ত্রী দেবী গিনেস বুক অব রেকর্ডে তালিকাভুক্ত হন ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লোকসভা নির্বাচনে ২,৪৬,৫১৬ ভোটের মধ্যে ১,৯২,৯০৯ ভোট পেয়ে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন বলে।[১০] ওই সময় এটাই ছিল বিশ্ব রেকর্ড। এরপরে ১৯৬৭ এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দেও লোকসভার সদস্য ছিলেন। তিনি প্রতিবারই কংগ্রেস পার্টিকে চ্যালেঞ্জ করে জিতেছেন। তার সাথে ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধের কারণে ১৯৭১-এ ভারত সরকার মহারাণীর সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রত্যাহার করেন। এমনকি কর ফাঁকি দেবার অভিযোগে পাঁচ মাস বিহারের তিহার জেলে ছিলেন। এর পরপরই তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। ১৯৯৯তে তৃণমূল কংগ্রেস কুচবিহার হতে তাঁকে মনোনয়ন দিতে চাইলে তিনি কোন সাড়া দেননি। গায়ত্রী দেবীর জীবনগাঁথা নিয়ে ফ্রানসিয়েস লেভী একটি ছবি তৈরি করেন যার নাম ছিল 'Memoris of a Hindu Princes' সেখাওয়াত জানালেন যে আজকাল রাণী মাতা গায়ত্রী দেবী লোকসম্মুখে খুব কম আসেন।

বর্তমানের ভ্রমণ পর্যন্ত সময় উত্তরাধিকারী ছিলেন গায়ত্রী দেবীর সৎ সন্তান ভবানী সিং। তিনি দ্বিতীয় মান সিং-এর প্রথম স্ত্রী যোধপুরের মারুবার কানওয়ারের পুত্র। ভবানী সিং ভারতীয় সেনাবাহিনী হতে ব্রিগেডিয়ার পদে অবসর গ্রহণ করেন। পরে তিনি ১৯৯৪-১৯৯৮ পর্যন্ত ব্রুনাইয়ে ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন। ভবানী সিং-এর সেনাজীবন ছিল যথেষ্ট বীরত্ব গাথা। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের সিন্ধু অপারেশনে তার বীরত্বের জন্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গ্যালেন্টারি এওয়ার্ড 'মহাভীর চক্র' (Mahavir Chakra) দেয়া হয়েছিল। বর্তমানে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রাসাদগুলোকে হোটেলে রূপান্তরিত

১০. *The Battle Royal- Maharani Gayatri Devi & Jaipur' TIME, July 28, 1967.*

www.pathagar.com

করে হোটেল ব্যবসার সাথে জড়িত রয়েছেন।

আমরা সেখাওয়াত আর বলবিন্দরকে নিয়ে হাওয়া মহল সংলগ্ন একটি হস্তশিল্পের দোকানে দাঁড়িয়ে দু'একটি টুকিটাকি জিনিস কিনে কিছু দূরে একটি 'জেম' স্টোরে (Gem store) গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফিরতি পথে সেখাওয়াতের পরিচিত এক দোকানে গিয়ে ছেলেদের এবং বৌমার জন্য রাজস্থানী ঐতিহ্যবাহী দু'একটি কাপড় কিনে ফিরতে গেলে দোকানের মালিক মসালা চা পরিবেশন করলেন। সাথে হাতের কাজ করা একসেট কুশন কভার আমার সহধর্মিণীকে উপহার স্বরূপ দিলে আমরা কিছুটা ইত:স্তত করাতে কিছুটা বিমর্ষ হলেন দোকানের মালিক। অবশেষে আমাদের গ্রহণ করতে হল। কিনতে হল আরও একটি সেট। তখন সময় প্রায় সন্ধ্যা ৮টা। চারদিকের দোকানগুলো বন্ধ হচ্ছিল। আমরা জোহরী বাজার ছেড়ে যখন হোটেলে ফিরলাম তখন রাত প্রায় নয়টা। সেখাওয়াত কাল আবার আসবে বলে বিদায় নিলেন। আমরা আগামী দিনের প্রস্তুতি নিয়ে রাতের আহার শেষ করলাম। আগামী দিন ভারতের নির্বাচন প্রত্যক্ষ করব এই ভেবে বেশ উৎফুল্ল হলাম। আমাদের নির্বাচনের সাথে তফাতটা সরজমিনে দেখতে পাব।

www.pathagar.com

ছয়

লোকসভা নির্বাচন–রাজস্থান

মে ৭, ২০০৯। সকালে শহীদ ভাগত সিং পার্কে প্রাত:ভ্রমণ শেষ করে হোটেলে পৌঁছে আজকের দিনের জন্য তৈরি হতে শুরু করলাম। আজ ভারতের ৮টি রাজ্যে, রাজস্থানের ২৫টি আসন সহ ভোট গ্রহণ হবে। ভোট গ্রহণ শুরু হবে সকাল ৭টা থেকে চলবে একটানা বিকেল ৫টা পর্যন্ত। গণনা হবে সর্বভারতে একই দিনে মে ১৬, ২০০৯-এ। আজকের দিনটি এমনিতেই আমার ব্যক্তিগত জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। কারণ, ১৯৬৬-এর এই দিনে আমার জীবনের একটি বড় অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল। ওই দিনে আমি পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমী থেকে সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হই। আমি মিলিটারিতে চাকরি করব এমন কখনও কল্পনাও করেনি। আমার মাতা-পিতা কোনদিন এমন কথা বলেননি। ছাত্র হিসেবে ভাল ছিলাম। ওই সময়কার মধ্যবিত্ত সরকারি চাকুরে বাঙালী বাবারা ছেলেরা লেখাপড়া করে সরকারের চাকরি করবে, বেসামরিক প্রশাসনে থাকবে এমনই স্বপ্ন দেখতেন। আমার পিতাও কোন ব্যতিক্রম ছিলেন না। যাক সে উপাখ্যান অনেক বড়। এখানে সে প্রসঙ্গ টানতে চাই না। সংক্ষেপে, একরকম না চাইতে প্রবেশ করেছিলাম সামরিক জীবনে। এখন পিছে ফিরে তাকালে মনে হয় আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না। যা হয়েছে ভালই হয়েছে।

হোটেলের গাড়ি বারান্দায় যথারীতি পুলিশি প্রটেকশনের গাড়ি, দাঁড়িয়ে ছিল। দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে আমাদের জন্যে সকাল ৯টায় প্রথম প্রহরে 'রুরাল' জয়পুরের কয়েকটি কেন্দ্র এবং দুপুরের আহারের পরে জয়পুর 'আরবান' আসনের কয়েকটি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণের কর্মসূচি করা হয়েছিল। পর্যবেক্ষণ শেষ হবার কথা বিকেল চারটায়। পরের দিন, মে ৮, ২০০৯ এ সকালে আমি আমার সহধর্মিণী ডা: রেহানা খানম এবং ছহুল হুসাইন ছাড়া সকলেই দিল্লীর উদ্দেশে বিমানে জয়পুর ত্যাগ করবার কথা আর আমরা তিনজনের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সড়ক পথে আজমীরের খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি (রঃ) সাহেবের মাজার জিয়ারতের জন্য আজমীর যাবার কথা রয়েছে। আজমীরের মাজার জিয়ারতের ইচ্ছা আমার সহধর্মিণীর ছিল বহুদিনের। জয়পুরে আসব শুনেই এ সুযোগ তিনি নিলেন। আমরাও প্রথম থেকেই জিয়ারতের কথা ভেবেছিলাম। এতদূর আসবার পর উপমহাদেশের অন্যতম এ মহাসাধকের মাজারে

www.pathagar.com

ফাতেহা পাঠ না করে যাওয়াই আমার কাছে অশোভন মনে হতো। 'খাজা গরিব নেওয়াজ' বলে পরিচিত এ সাধকের মাজারে দোয়া, প্রার্থনা এবং ফাতেহা পাঠ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষেই করে থাকেন। উপমহাদেশের অতীত সম্রাট, রাজা, বাদশাহ, বর্তমানের শাসকদের, এমনকি আমাদের দেশের রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানদের আগমন হয়েছে খাজার দরবারে। ধর্মীয় অনুভূতি ছাড়াও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আজমীরের স্থান অনন্য।

যাই হোক আমরা তিনজন, সাথে একজন লিয়াজোঁ অফিসার কারতার সিং, এক গাড়িতে এবং অপর গাড়িতে ফিলিপিন্স্-এর দুই প্রতিনিধি এবং লোকাল লিয়াজোঁ অফিসার সহকারে সামনের পুলিশের প্রটেকশন আমাদেরকে প্রথম গন্তব্য শহরের বাইরে গ্রামের কেন্দ্রগুলোর দিকে নিয়ে রওয়ানা হল। আমাদের প্রথম গন্তব্য রাজস্থানের ঐতিহাসিক আমের (Amer) গ্রামাঞ্চল। আমের অঞ্চলেই রয়েছে রাজপুতদের শৌর্য বীর্যে গাঁথা বিখ্যাত 'আম্বর', আমের দুর্গদ্বয় এবং দর্শনীয় 'জলমহল'।

আমাদের তিনজনের পেছনের সিটে কারতার সিং তার জীবনের ভয়াবহ দিনগুলোর কথা আমাদের শুনিয়ে বললেন যে, কিভাবে ১৯৮৪-এর দাঙ্গায় তাঁর বাবা মা সহ অন্যরা বেঁচে গিয়ে দিল্লীর তিলোকপুরী থেকে চলে এসেছিলেন রাজস্থানে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পড়াশুনা করে রাজস্থানে স্টেট সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন কারতার সিং। এখন দেখে বুঝবার উপায় নেই যে বাস্তবে তিনি একজন শিখ সুবক।

কারতার সিং হাসিখুশি আর আমুদে লোক। প্রায় পুরোদিন আমাদের সাথে কাটিয়েছিলেন। যতক্ষণ আমরা গাড়িতে থাকতাম কারতার সিং ওই সারাটা সময় তার মোবাইলে শেয়ার বাজারের খবর নিতেন। তাকে জিজ্ঞাসা না করেও বুঝতে বাকি থাকলনা যে, তিনি শেয়ার বাজার সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রেখে থাকেন। অবশ্যই নির্বাচনের আইন-কানুন এবং পদ্ধতির উপরেও তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তা আমরা ভোট কেন্দ্রগুলোতেই টের পেয়েছিলাম। গ্রামের কেন্দ্রগুলোতে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য মিঃ সিং তার অধীনস্থ এক তেহসিলদারদকে নিয়োগ করে রেখেছিলেন।

আমাদের গাড়ির বহর হাইওয়ে এন এম-৮ হয়ে জয়পুর শহরের বাইরে উত্তর দিকে পাথুরে পাহাড়ের দিকে ধাবিত হল। খোলামেলা রাস্তা– দু'পাশে অপসৃয়মান দৃশ্য। চারদিকে শূন্য। জনবসতি তেমন চোখে পড়ছে না। রাস্তার দু'পাশে যে গাছগুলো খুব বেশি দেখা যায় সেগুলো শুকনায় বেঁচে থাকার মত গাছ। ডালে প্রচুর কাঁটা। আমরা এ সব গাছকে বাবলা গাছ বলে জানি। এগুলোর স্থানীয় নাম 'কিকুর'। গাছের কাণ্ডের কাঠ অত্যন্ত শক্ত আর কাঁটাসহ কচি পাতাগুলো উটের প্রিয় খাদ্য। গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য এ গাছ জ্বালানি কাঠ হিসেবে অধিক ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে

www.pathagar.com

কিছু গাছ অন্যগুলোর তুলনায় বড় এবং বেশ ঘন পাতার। আমাদের লিয়াজোঁ অফিসার কারতার সিং জানালেন যে, এ বড় গাছগুলো বিদেশ থেকে আনা বীজ হতে উৎপন্ন। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাজস্থানসহ কয়েকটি রাজ্যে, যার মধ্যে হরিয়ানা আর পাঞ্জাবও রয়েছে, এসব বীজ ছিটিয়ে দেবার প্রকল্প নিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের জ্বালানি কাঠের অভাব দূর করানোর প্রচেষ্টা ছিল। এ প্রকল্পের ফল এখন গ্রামের সাধারণ মানুষ পেতে শুরু করেছে। দূরে মাঝে মধ্যে পাহাড়ের চূড়ায় পুরাতন জরাজীর্ণ পোড়াবাড়ির অস্তিত্ব দেখা যায়। কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন কয়েকটি গ্রাম্য বসতবাড়ি। দূরে উটের সমাগম। মাঝে মধ্যে চোখে পড়েছে দু'তিনটি উটের কাফেলার মত। জলের উৎস তেমন দৃশ্যমান নয়।

আমরা ক্রমেই পাহাড়ি পথে উপরের দিকে যাচ্ছিলাম। বেশ কিছু দূরে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে সূর্যের রশ্মি এক বিশাল জলাশয়ের উপর পড়ে চিকচিক করছে। সময় প্রায় দশটা। পানির উপরে সূর্যের রশ্মির এতই তেজ যে, চোখ রাখাও সহজ হচ্ছে না। কাছে আসতেই দেখতে পেলাম মধ্যম সাইজের একটি হ্রদ। স্বচ্ছ চিকচিকে রূপালি বর্ণের পানি। হ্রদ ঘেঁষে রাস্তার ফুটপাতের পাশে সুন্দর সরু সবুজ চত্বরে বাগান করা। হ্রদের এ ধারাটা সিমেন্টের রেলিং দেয়া। অনেকগুলো সারি সারি সিমেন্টের তৈরি বসবার সুন্দর পরিষ্কার জায়গা। কোথাও কোথাও বেলকনির মত ছবি তোলার নির্ধারিত স্থান চিহ্নিত করা।

হ্রদের পূর্ব পার্শ্বে, প্রায় তিরিশ চল্লিশ মিটার ভেতরে, সাদা পাথরের বড় বড় জানালার এক মনোরম প্রাসাদ। লিয়াজোঁ অফিসার আমাদের জানালেন, এটি জয়পুরের অন্যতম দর্শনীয় স্থান 'জলমহল' আর হ্রদটির নাম 'জলমহল তালাব' (জলমহল দীঘি) জলমহলের দক্ষিণ পাশ দিয়ে সরু একটি রাস্তা- এটিই জলমহলের সাথে ডাঙ্গার একমাত্র যোগাযোগ। অন্যথায় নৌকা অথবা মোটরবোটই একমাত্র বাহন।

'জলমহল তালাব'কে ঘিরে গড়ে উঠেছে ছোট্ট অথচ পরিপাটি করে সাজানো উপশহর, 'সঙ্করনগর'। বেশ কয়েকটি হোটেল এবং মোটেল দেখতে পেলাম। আমাদের লিয়াজোঁ অফিসার এবার অধিকতর উৎসাহের সাথে বললেন যে পর্যটক মৌসুমে এ রাস্তা ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠে। ঐ সময় এসব হোটেল থাকে পর্যটকে ভরপুর। সে সময়ে বিকেলে এ জায়গায় দাঁড়াবার স্থান সংকুলানই সমস্যা হয়ে উঠে। হোটেল মোটেলগুলো থাকে পূর্ণ। অনেক আগে 'বুক' না করলে জায়গা পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়ে। জলমহল তালাবের পূর্ব পাশে হোটেল 'ট্রাইডন হিলটন'।

আমাদের গাড়ির বহর পাহাড়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া রাস্তা ধরে আমের এর কাছাকাছি পৌঁছল। দূর হতে পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট শহরটি যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন। শহরের একাধারের উঁচু পাহাড়ে চোখে আসল রাজস্থানের অন্যতম 'আম্বর দুর্গ' এবং তার উপরে

www.pathagar.com

'ফ্লাগ স্টাফ বুরুজ'। এটা তোপখানা বুরুজ বলেও অধিক পরিচিত। আমের বা আম্বরের বর্তমান শহর গড়ে উঠে আমের এবং আম্বর দুর্গ দু'টিকে ঘিরে। 'আমের দুর্গের' গোড়াপত্তন হয়েছিল প্রথম রাজা মান সিং-এর শাসনামলে ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি দুর্গ আর তার ভেতরের বাসস্থানগুলো তৈরি করেছিলেন।

রাজা মান সিং আকবরের প্রধান সিপাহসালার ছিলেন এবং তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল রাজপুতদের ভেতরে একতা স্থাপন করতে। তিনি ছিলেন আকবরের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সিপাহসালাদের একজন। দুর্গটি পরে আরও বাড়ানো হয় এবং এর আশেপাশে গড়ে তোলা হয় জনবসতি। এখানেই প্রায় ১৫০ বছর রাজপুতদের উপগোষ্ঠী 'কাচওহা' (Kachwaha)-দের রাজধানী ছিল। পরে, যেমনটা আমরা আগেই জেনেছি, সাওয়ায়ী (Sawai) দ্বিতীয় জয় সিং জয়পুরে রাজধানী স্থানান্তর করেন। দুর্গের ঠিক পাদদেশে, বর্তমান হাইওয়ের পূর্ব পাশে, ছিল বিশাল জলাশয় বা হ্রদ যা বর্তমানে শুকিয়ে গেছে। তবে কখনও বেশি বৃষ্টিপাত হলে অল্প সময়ের জন্য কিছু পানি জমে। আমরা পাহাড়ের সরু রাস্তা ধরে ফিরতি পথে দুর্গের ভেতরে দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দিনটি বৃহস্পতিবার হওয়াতে ভেতরের বাসস্থানগুলো বন্ধ ছিল। দুর্গটি শুধু আমাদের জন্য খুলে রেখেছিল। আমের দুর্গের উপরে তোপখানা বরুজটিই ছিল প্রথম 'আম্বর দুর্গ' যার সাথে পরে যুক্ত হয় আমের দুর্গ। এ দু'টির মধ্যে নিরাপদ যাতায়াতের রাস্তা রয়েছে।

দুর্গ দু'টি সামরিক কৌশলের দিক থেকে অত্যন্ত কার্যকরী মনে হয়েছে। উপরের ছোট দুর্গ থেকে চারদিকে বহু দূর পর্যন্ত খোলা চোখে পরিষ্কার দেখা যায়। তাছাড়া এমন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নির্মিত যে কোন শত্রু বাহিনীর পক্ষে এ দুর্গকে পাশ কাটিয়ে অকস্মাৎ আক্রমণ করা সহজ হতো না। জয়পুরে আসলে পর্যটকদের জন্য দর্শনীয় স্থান, জলমহল ছাড়াও একদার জয়পুর রাজ্যের পুরাতন রাজধানী আমের আর এ দু'টি দুর্গ।

আমরা আমের দুর্গকে বাঁয়ে রেখে এনএম ৮ ছেড়ে ছোট পথে ছোট্ট শহর আমেরে প্রবেশ করলাম। রাস্তার পাশেই গভঃ সিনিয়র হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুলে একটি ভোট কেন্দ্র। স্কুলটি একটু উঁচুতে। নিচে অনাড়ম্বর দু'টি নির্বাচনী ক্যাম্প যেখানে বসে প্রার্থীর এজেন্টরা ভোটারদের ভোটার সিরিয়াল নম্বর ছোট কাগজে লিখে দিচ্ছে। তাদের কাছে রয়েছে ছবি ছাড়া ভোটার লিস্ট।

ভারতীয় ভোটার লিস্ট আইনে ভোটারদের সামাজিক, শারীরিক নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে প্রার্থী বা প্রার্থীর এজেন্টকে ছবিসহ ভোটার তালিকা সরবরাহ করা হয় না। আমাদের নতুন ভোটার লিস্ট আইনে একই বিধান রাখা হয়েছে। প্রথমে আমাদের এ আইনের ধারাটির বিরোধিতা করেছিল কয়েকটি রাজনৈতিক দল। পরে প্রেক্ষাপট বিস্তারিভাবে ব্যাখ্যা করবার পর তারা আর বিরোধিতা করেনি। তবে অনেকেই বিষয়টি না জেনে অন্যরকম ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াসও পেয়েছিলেন। আমাদের

www.pathagar.com

দেশের সামাজিক, ধর্মীয় এবং নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করেই এমন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল।

ভোট কেন্দ্রের বাইরে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন নির্বাচনের সাথে জড়িত একজন কর্মকর্তা। কেন্দ্রের চৌহদ্দিতে ঢুকতেই প্রথমে টেবিল-চেয়ার পেতে বসে থাকা কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে দেখা হল। এরাই বুথ লেভেল অফিসার (BLO) যাদের কথা আমাদেরকে জেলা নির্বাচন অফিসার তথা জেলা কালেক্টর তার ব্রিফিং-এ জানিয়েছিলেন। প্রত্যেকের সামনে যার যার দায়িত্বের বুথের ভোটার লিস্ট ছিল। প্রতিটি ভোটার এখানে এসে যার যার বুথ নম্বর জেনে ওই বুথের লাইনে দাঁড়ান। ব্যবস্থাটি আমার কাছে ভালই মনে হল। এ ব্যবস্থায় একজন ভোটারকে বুথ খুঁজতে অযথা সময়ক্ষেপণ করতে হয় না।

ভোট কেন্দ্রের মূল চত্বরে পৌঁছে আমি বেশ অবকই হলাম। তখন সকাল প্রায় ১০-৩০। ভোটার বলতে একটি বুথের সামনে হাতে গোনা কয়েকজন নারী-পুরুষের লাইন। ওই কয়জন ছাড়া পুরো চৌহদ্দি খালি। কোন ভিড় নেই, বাইরেও কোন উৎসাহ নেই। বেশির ভাগ মহিলার মাথায় লম্বা ঘোমটা দেয়া। ঘাগড়া চোলী পরা। মহিলাদের প্রাথমিক পরিধেয় অত্যধিক রঙিন তবে সমস্ত জমিনে হয় চুমকির অথবা কাঁচ বসানো হাতের কাজ। হাতের বাহু হতে কব্জি পর্যন্ত বিভিন্ন জাতের চূড়ি। কোন কোন বলিউডি চলচ্চিত্রের রাজস্থানের নায়িকার ভেশভুষার মত। জিজ্ঞেস করে জানলাম এ সব কাপড়-চোপড়ই সাধারণ পরিধেয়। পুরুষের মাথায় পাগড়ি– রঙিন সূতির তৈরি। পাগড়ির আবার প্রকারভেদ রয়েছে। গরীব প্রজা হতে এককালের রাজা বা ঠাকুরদের মধ্যে এ সব পাগড়ি ২০ হাতের কাপড়ের তৈরিও হতে পারে।

প্রথম কেন্দ্রে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করলাম ভোটার সমাগমের। তেমন সমাগম চোখেই পড়লো না। দু'টি বুথে গিয়ে দেখলাম পোলিং কর্মকর্তারা গল্প করছেন। জিজ্ঞেস করাতে জানালেন যে প্রচণ্ড গরম আর ৭ মে-এর গণ বিবাহের আয়োজনের কারণে সমাগম কম হবে। যে বুথে কথা বলছিলাম সেখানে প্রায় তিন ঘণ্টায় পাঁচশ' ভোটারের মধ্যে ছত্রিশজন ভোটার ভোট দিয়ে গেছেন। বুথের প্রিজাইডিং অফিসার আমাদেরকে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের কার্যপ্রণালী বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন। ওই সময়েই একজন ভোটারের আগমনে বুথে চাঞ্চল্য দেখা দিল। দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলাম কিভাবে কন্ট্রোল প্যানেল থেকে গোপন কক্ষে রাখা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনকে সচল করে এবং সঠিক ভোট প্রদান না হওয়া পর্যন্ত ভোটিং মেশিন ভোট গ্রহণ না করে ভোটারকে পুনরায় চেষ্টা করতে বলে। একবার ভোট মেশিনে গ্রহণ করলে দ্বিতীয়বার ভোট দেবার অবকাশ থাকে না। কারণ, মেশিন একটা ভোট গ্রহণের পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় চালু হয় কন্ট্রোল প্যানেল হতে। সবই

www.pathagar.com

কম্পিউটারাইজড সফটওয়্যার ভিত্তিক। এ মেশিন এবারই ব্যাপকভাবে সর্বভারতে ব্যবহার হয়েছে। ব্যাটারি দ্বারা চালানো সম্ভব বলে বিদ্যুতের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় না।

আমাকে প্রিজাইডিং অফিসার অন্তত একজন ভোটার এবং মেশিনের ব্যবহার দেখাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করলেন। ফোকলা দাঁতে হেসে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি কোথা হতে এসেছি। আমার পরিচয় জানার পর বললেন, "বাংলাদেশের কথা বইতে পড়েছি– কলকাতার কাছে, কিন্তু এই প্রথম একজন বাংলাদেশীকে দেখলাম।" একই রকম দেখতে দেখে প্রায় চল্লিশের কোঠার উদয়পুরের অখ্যাত গ্রামের স্কুলের ভূগোল মাস্টার সুখবিন্দুর সিং এমনটাই বললেন, "হাম এক হি দিখতে হ্যায় ক্যায়সে ছামঝে আপ বাহার মুলক ছে হ্যায়।" সুখবিন্দুর সিং জাতে পাঞ্জাবী রাজস্থানে বিয়ে করে উদয়পুরেই এক সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। জাতে শিখ হলেও পাঞ্জাবে 'অপারেশন ব্লু স্টারের' পর দেশ ছেড়ে ভেশভুষা বদলিয়েছেন। তাকে দেখে বোঝবার উপায় নেই যে, তিনি শিখ সম্প্রদায়ের একজন সদস্য। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের শিখ বিরোধী দাঙ্গার পর বহু শিখ তাদের চেহারা তেশভুষা পাল্টিয়ে ছিলেন। এর বৃত্তান্ত আমরা কারতার সিং-এর মুখেই শুনেছি।

সুখবিন্দু সিং-এর সাথে আলাপ শেষ করে আঙ্গিনায় আসতেই চার পাঁচ জন রাজস্থানী মহিলাদের, একহাত লম্বা ঘোমটা দেয়া, বুথ লেভেল অফিসারদের সাথে বাক-বিতণ্ডাতে জড়িয়ে পড়তে দেখলাম। বিষয়টি জানতে চেষ্টা করলাম। মহিলাদের অভিযোগ তারা তাদের নির্দিষ্ট বুথে গিয়ে ভোট দিতে পারেনি কারণ লিস্টে তাদের ছবি নেই। ছবি ছাড়া রেশন কার্ড প্রিজাইডিং অফিসার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাদের আরও অভিযোগ যে, তাদের বক্তব্য গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে কর্মকর্তারা। আরও অভিযোগ যে, এতদূর হেঁটে এসে তারা কেন ভোট দিতে পারবেন না? বুথ অফিসার তাদের আইন বুঝাতে হিমশিম খাচ্ছিল। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ধমকের সুরে এক কর্মকর্তা তাদের কেন্দ্র ত্যাগ করতে বলাতে মহিলারা ওই জায়গাতেই বসে পড়লেন। আমাদের দেখে কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ভেবে রাজস্থানী মিশ্রিত হিন্দিতে যা বললেন তা হল এদেশে 'হুকুম' (বড়লোক) অথবা 'হুকুম' এর গোলামরা ছাড়া গরীবদের ভোট নেই। তাদের রেশন কার্ড সরকার দিয়েছে, এতে ছবি না থাকলে তাদের দোষ কোথায়। আমি মুচকি হেসে কোন বাক্য ব্যয় না করে সরে আসলাম। ওদিকে এদের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার সহধর্মিণী ছবি তুলে নিলেন। ততক্ষণে কয়েকজন ঘোমটা থেকে মুখ বের করেছেন। ওই কেন্দ্রে আমরা প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে পরের কেন্দ্রের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। সূর্য তখন প্রায় মাথার উপরে। প্রচণ্ড রোদ। প্রচণ্ড গরম তবে ঘাম না হওয়াতে রক্ষা।

www.pathagar.com

এরপরে প্রায় বেলা ১টা পর্যন্ত আমরা আরও দু'টি কেন্দ্র দেখলাম। সবখানেই ভোটার উপস্থিতির একই চিত্র আর প্রতিটি কেন্দ্রেই ভোট দিতে না পেরে ক্ষিপ্ত কয়েকজনকে তর্কে জড়িয়েও পড়তে দেখলাম।

আমাদের এ পর্বের শেষ কেন্দ্র ছিল গভঃ আপার প্রাইমারি স্কুল : 'ধানদ্' নামক গ্রামে। বেশ পুরাতন স্কুল। বিশাল চত্বর। বৃহৎ আকারে খেলার মাঠ। কক্ষগুলোর চেহারা প্রায় বিখ্যাত ভারতীয় লেখক খুসবন্ত সিং-এর বর্ণনার বান্ধবী ভাগমতীর মত। মনে হয়, বহু বছর ধরে এর সংস্কার হয়নি। নেহাত এখানকার রাজারা স্থাপন করেছিলেন বলে, না হয় এখানে এ স্কুলটিও এ গ্রামের ভাগ্যে জুটতো না। আমাদেরকে গেটে প্রবেশ করতে দেখে একজন কর্তব্যরত পুলিশ নড়েচড়ে বসলেন। তার চেহারা দেখে মনে হল এতক্ষণ দিবা নিদ্রায় ছিলেন। দু'চারজন ভোটার এক বুথে দেখলাম। আমরা ওই বুথের কিছু তথ্য জেনে নিচ্ছিলাম। প্রিজাইডিং অফিসার জানালেন যে, ১৩১৪ ভোটারের মধ্যে ওই সময় পর্যন্ত মাত্র ১৭০ জন ভোট দিয়েছেন। পাশের বুথে বেশ হৈচৈ হচ্ছিল কারণ ওই একই। এবার প্যান্টশার্ট পরা এক যুবক তার ছবি না থাকাতে ভোট দিতে পারেনি কারণ, যে রেশন কার্ড তার হাতে তাতে ছবি নেই। সে বার বার আকুতি করছিল যে মাত্র কিছুক্ষণ আগে তার বিবি সাহেবা ভোট দিয়ে গেছেন অথচ তাকে ভোট দিতে কেন দেয়া হবে না? বুথ লেভেল কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হল। ওই কর্মকর্তা তাকে শান্ত করে বললেন, "আপনি ছবিসহ ১৩টি বৈধ দলিলের যে কোন একটি নিয়ে আসুন, আপনি ভোট দিতে পারবেন।" বেশ কিছুক্ষণ পর ওই যুবক স্থান ত্যাগ করলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "রেশন কার্ডে ছবি থাকবার কথা থাকলেও প্রায় জায়গাতেই দেখলাম ছবিছাড়া রেশন কার্ড নিয়ে ভোট কেন্দ্রে আসতে, এর কারণ কি?'' ওই কর্মকর্তা জানালেন যে, এগুলো ভুয়া রেশন কার্ড বলে তারা মনে করেন। কারণ, আগে এ ধরনের রেশন কার্ড থাকলেও এগুলো এখন পরিবর্তিত হয়েছে।

ওই কর্মকর্তার মতে ভোট জালিয়াতির পন্থা হিসেবে যে সব ভোটারের ছবি নেই তাদের নামে হয়ত এ সব কার্ড করা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু ছবিসহ ভোটার তালিকা পায় কোথায়?'' হেসে বললেন "কেয়া নেহী হো সেকতা (কিনা হতে পারে)? আবার বললাম, "আপনার যদি মনে হয় এ একজন ভুয়া ভোটার ছিলেন তাঁকে গ্রেফতার করলেন না কেন?" উত্তরে হেসে বললেন, "কোন ইয়ে সব লাফরামে জানা চাহতা হায় (কে এত সমস্যার মধ্যে যেতে চায়)। আমরা তাকে ভোট দিতে দেইনি এটাই আমাদের দায়িত্ব ছিল।"

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, আমরা পরবর্তীতেও যত জায়গায় গিয়েছি দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলকেই আইন অনুযায়ী কাজ করতে দেখেছি। দায়সারা গোছের কাজ করতে

www.pathagar.com

কোথাও দেখিনি। আমরা জয়পুর রুরালের কয়েকটি কেন্দ্র দেখে ফেরবার পথে এ কেন্দ্রের সামনে গ্রামের রাস্তার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। এ আসনে মোট প্রার্থী ছিল ২১ জন, কিন্তু কোন বুথে দু'টি বড় দল, বিজেপি ও কংগ্রেসের প্রার্থীর এজেন্ট ছাড়া আর কোন এজেন্ট চোখে পড়েনি। অন্তত রুরাল আসনে তো নয়।

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ভাবলাম আমাদের নির্বাচনগুলোতে যে প্রাণচাঞ্চল্য আর উৎসাহ দেখা যায়, তার বিন্দুমাত্র এতবড় নির্বাচনে দেখলাম না। সে ধরনের ভোটার সমাগমও দেখলাম না। যে ধরনের ভোটার সমাগম দেখলাম এ রকম বাংলাদেশের নির্বাচনে দেখা গেলে পরের দিন খবরের কাগজের শিরোনাম হতো "ভোটারবিহীন নির্বাচন–নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ"। আর ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রতিযোগিতায় ভোটার শূন্য কেন্দ্র দেখাবার হিড়িক পড়ত। হয়ত খবরে বলা হত "হাজার হাজার ভোটারকে ভোটদানে বাধা দিয়েছে কর্মকর্তারা"। এমন কোন খবরই স্থানীয় অথবা ভারতীয় জাতীয় প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ পায়নি। প্রসঙ্গত পরের দিন জানতে পারলাম রাজস্থানে ভোট পড়েছে ৪৯% (উনপঞ্চাশ শতাংশ)। আমার মতে, যেহেতু ভারতে গণতন্ত্র নিরবচ্ছিন্ন রয়েছে এবং নির্বাচন একটি রুটিন ব্যাপার সে কারণেই সাধারণ জনগণের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে তেমন উৎসাহ অবশিষ্ট নেই। সাধারণ জনগণের কাছে নির্বাচন একেবারেই সাধারণ ব্যাপার। তবে যারা ভোট দিতে আসেন তাদের বেশির ভাগই প্রার্থী এবং দলের সমর্থক। সাধারণ ভোটার বোধহয় কমই ভোট দেয়। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে বহু বছরে নির্বাচনের অব্যাহত ধারার কারণে প্রার্থীর পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

যাই হোক, আমি দাঁড়িয়েছিলাম আমাদের পর্যবেক্ষণের এ পর্যায়ে শেষ কেন্দ্রের সাথে লাগোয়া গ্রামের এক দোকানের সামনে। ধুলোয় ভরা পাকা রাস্তা। দু'একটা টেম্পো সাদৃশ্য গাড়ি যাত্রী নিয়ে অন্য কোন গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিল। দুপুর প্রায় দুটোর কাছাকাছি। চামড়া পোড়ানো রোদ আর অসহ্য রকমের গরম। যে দোকানটির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম সেটি একটি গ্রাম্য জুতার দোকান। জুতো বলতে পুরুষদের জন্য পিভিসি দ্বারা তৈরি স্যান্ডেল আর রং-বেরংয়ের কৃত্রিম চামড়ার তৈরি মহিলাদের চপ্পল। দোকানি তার মাথাটা ধুলোয় মাখা টেবিলে রেখে সুখ-ঝিমুনিতে। একবার মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হলেন আমি কোন খদ্দের নই। আমার অবস্থা দেখে অলস শরীরে দোকানি পূর্ববৎ অবস্থায় ফিরলেন। আমার সফরসঙ্গী, অন্য কমিশনার, স্কুলে টয়লেটের খোঁজে। আমি রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষায়–বাদবাকি সবাই গাড়ির শীতাতপ হাওয়ায় বসা। আমার সামনে রাস্তার অপর পারে কয়েকটা উট গাছের নিচে বসে চোখ বুঁজে ঝিমুচ্ছে। গ্রামের বাড়িগুলোর বেশির ভাগই; পাকা অন্যগুলো মাটির তৈরি। আমাদের গ্রামের দৃশ্যের মত নয়। শুকনো ধূসর আর ধুলোর রাজত্ব।

www.pathagar.com

আমি ভাবছিলাম গাড়িতে গিয়ে বসে অপেক্ষা করব, তা না করে রাজস্থানের গ্রামের দোকান দেখতে দাঁড়িয়েছিলাম। দূরে পুলিশের 'এসকর্টের' গাড়ি– শুধুমাত্র ইন্সপেক্টর সাহেব বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু একটা খাচ্ছেন। হঠাৎ সামনে একটা ঢোলের বিকট শব্দ আর সানাই সদৃশ্য এক বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে চমকে সামনে তাকাতেই দেখলাম অপরপ্রান্ত থেকে একটি ট্রাক্টর তার পেছনে হুক করা ট্রেইলর ভর্তি মহিলা এবং কিছু শিশু পেছনে আর এদের পেছনেই রঙ্গিন পোশাক পরা বাদকের দল, সংখ্যায় চারজনের বেশি নয়। ঢোলের আওয়াজ ওই ট্রাক্টর থেকেই আসছিল। সবাই উৎসাহিত বোধ করলেন। এতক্ষণ ধরে ঝিমুতে থাকা দোকানি হাই তুলতে তুলতে বাইরে দাঁড়াতেই ট্রাক্টর থেকে সবাই নেমে রাস্তার উপরে বাদ্যের তালে তালে নাচতে শুরু করলেন। একেবারে খাস রাজস্থানী নাচ। আমার পেছনের কয়েকটি বাড়ি থেকে আরও বেশ কিছু আবাল বৃদ্ধ-বনিতা এসে যোগ দিলেন ওই দলের সাথে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা রাস্তার বেশ অংশ জুড়ে এই ভর দুপুরে ৪২° (ডিগ্রি) তাপের মধ্যে উৎসবের আমেজে ভেসে গেল। মহিলাদের রঙিন ঘাগড়া চোলী আর বাহারের শাড়িতে লাগানো জড়ির ছটায় সমগ্র এলাকা রঙিন মনে হল। আমি আকস্মিক এ ঘটনায় কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। পাশের দোকানিকে জিজ্ঞেস করে জানলাম আজ মে মাসের ৭ তারিখ। এ তারিখটি রাজস্থানীদের কাছে, শাস্ত্র মতে, সবচাইতে শুভ সময় বিশেষ করে বিয়ের জন্যে। এরা সব বরযাত্রী। পেছনের বাড়িটি বরের বাড়ি। সবাই মিলে উৎসব করতে করতে গ্রামের এক প্রান্তে কমিউনিটি সেন্টারে বরকে নিয়ে যাবেন। ভিন গ্রাম থেকে কনেকে নিয়ে আসবেন। অন্যান্য গ্রামেরও এ দিনে বিয়ের জন্য বহু বর কনে হাজির হবে কমিউনিটি সেন্টারে আর সেখানেই বিয়ে হবে 'গণহারে'। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কখন বর বের হবে"। উত্তরে দোকানি জানালো, "বিকেলের আগে নয়।" কিছুক্ষণের মধ্যেই বাদকসহ নর-নারীর দল নাচতে নাচতে গ্রামের মধ্যপ্রান্তে চলে গেলে; ততক্ষণে আমরা ফেরবার পথ ধরলাম। বিষয়টি আমাকে পুলকিত করেছিল এই ভেবে যে এ স্বল্প সময়ে স্থানীয় সংস্কৃতির ক্ষুদ্রাংশ প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ হল। এ দিনে রাজস্থানে ভোটার সংখ্যা কম হবার এটাও একটা কারণ হতে পারে বলে আমরা আগেও জেনেছিলাম।

আমরা হোটেলে ফিরে যাব। আধা ঘণ্টায় হোটেলে পৌঁছে দুপুরের খাবার খেয়ে ৩টার মধ্যে আবার বের হতে হবে আরবান আসনের কয়েকটি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করতে। গ্রামের রাস্তা ছেড়ে আবার এনএম-৮ মহাসড়কে উঠে রওনা হলাম জয়পুরের দিকে। রাস্তায় এবার ডান দিক পড়বে 'আমের' এবং 'অম্বর দুর্গ'। বেশ কিছুক্ষণ পর নজরে আসল জলমহল দীঘি বা মানসাগর হ্রদ বা জলমহল তালাব আর জলমহল। রোদের ছটায় চিকমিক করছিল পাহাড়ে ঘেরা হ্রদের স্বচ্ছ পানি। অত্যন্ত পরিষ্কার। দূষণ নেই

www.pathagar.com

বললেই চলে। পানির মধ্যে জলমহল, রোদের ছটায় সাদা প্রাসাদটির দৃশ্য অপূর্ব মনে হচ্ছিল। থেমে দেখতে চাইলে আমার সফর সঙ্গীদের কাছ থেকে তেমন উৎসাহব্যঞ্জক সায় পেলাম না। সবাই ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত। তারপরেও কয়েকটি ছবি নিতে দাঁড়াতে বলে আমি ফুটপাত পেরিয়ে একটা বেলকনি সদৃশ্য জায়গায় গিয়ে কয়েকটি ছবি নিলাম। আমার কাছে সনাতনি ক্যামেরা, রোদ সামনে। পরে দেখলাম ছবি তেমন ভাল আসেনি, তবুও তাতেই আমি সন্তুষ্ট। ছবি উঠিয়ে আমরা যখন হোটেলে পৌছলাম তখন প্রায় দুপুর দুটোর উপরে। লবি থেকেই ফ্রেশ হয়ে তাড়াহুড়া করে দুপুরের খাবার সেরে নিলাম।

আমরা এবার ভোটের দিনের শেষাংশে জয়পুর শহরের কয়টি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণের জন্য যখন বের হলাম তখন বেলা প্রায় ৩-৩০। আমার সহধর্মিণী রুমেই থেকে গেলেন। প্রখর রোদে আর বের হতে চাইলেন না। কেন্দ্রগুলো কাছাকাছিই হবে বলে মনে হল কারণ, জয়পুর শহর তেমন বড় নয়।

এরই ফাঁকে পাঠকদের 'জলমহল' সম্বন্ধে সামান্য তথ্য দিতে চাই। এটি মানসাগর নামক হ্রদের একপ্রান্তে জলের মধ্যে খোলা প্রাসাদ। তৈরি হয়েছিল ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ওই সময়কার জয়পুরের মহারাজার এবং তার উত্তরসূরিদের হ্রদে মাছ এবং পাখি শিকারসহ চিত্ত বিনোদনের জন্য। মহলটি আজও ভাল অবস্থায় রয়েছে। তবে এটি এখন আর শিকারগাহ হিসেবে ব্যবহার হয় না। জয়পুরের অন্যতম ট্যুরিজম স্পট এই জলমহল। জয়পুর ট্যুরিজম-এর সম্পত্তি। মানসাগর হ্রদ কেউ দখল করেনি। দখল করেনি প্রাসাদ বা প্রাসাদের আশেপাশের জমি। আমরা বাংলাদেশীরা এমনটা চিন্তা করতে পারিনি। আমাদের নদী, ঢাকা শহরের আবাসিক এলাকার কয়েকটি হ্রদ বা লেক সব ক্রমেই দখল করা হচ্ছে অবলীলাক্রমে। ভরাট হচ্ছে জলাশয়–যে কারণে বর্ষায় তলিয়ে যাচ্ছে ঢাকা। আমরা নিজেদের এ সব সুন্দর জায়গাগুলো মানসাগরের মত দর্শনীয় করতে কস্মিনকালেও পারব না। এ সব দেখতে হলে, আমাদের যাদের সামর্থ্য থাকবে, ছুটে আসতে হবে বিদেশে আর কোথাও না হয় ভারতে। বর্তমানে ঢাকার যে অবস্থা তাতে মনে হয় ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরসূরিরা জানবে ঢাকা নামক এক শহর ছিল যা বছরের অর্ধেক সময় পানির নিচে থাকতে থাকতে ডুবে গেছে, আটলান্টিসের হারানো শহরগুলোর মত।

জয়পুর আরবান সংসদীয় আসনে বিজেপি, বিএসপি এবং কংগ্রেসসহ ২৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল। আমরা ভোট প্রদানের শেষ সময়ের মধ্যে কয়েকটি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করব বলে দুপুরের আহারের পরে বের হলাম। আমাদের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নির্বাচন উপলক্ষে রাজস্থানে সরকারি ছুটি থাকলেও দোকানপাট খোলাই ছিল, তবে রাস্তায় তেমন ভিড় ছিল না। আমরা জয়পুর শহরের

www.pathagar.com

'তিলক মার্গ' দিয়ে আরও কয়েকটি রাস্তা ঘুরে প্রথমে যে কেন্দ্রটিতে আসলাম, সেটি ছিল 'ইন্দিরা সুন্ধি নুহার' (হয়ত আমার উচ্চারণ ঠিক নাও হতে পারে)। এখানে প্রায় রুরাল জয়পুরের মতই চিত্র। বিকেল ৩ঃ৪৫ মিঃ আমরা কেন্দ্রে আসা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৫৮০টি মাত্র–মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১০৮০। আরও পরে আমরা বীমা ভবন, মহারাণী স্কুল এবং সিন্ধি কলোনিতে কেন্দ্রগুলো পর্যবেক্ষণ করলাম। সিন্ধি কলোনি সেন্টারে যখন পৌঁছলাম তখন ভোটের নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট বাকি। এখানে জনা বিশেক (২০+) ভোটার আর গেটের ভেতরে হন্তদন্ত হয়ে কয়েকজনকে ঢুকতে দেখলাম। পাঁচটা পর্যন্ত এ কেন্দ্রে ১৩২২ ভোটারের মধ্যে ভোট পড়েছিল মাত্র ৭০৪টি। তবে কেন্দ্রের পোলিং কর্মকর্তারা নিজের দায়িত্বে কোন গাফলতি করেননি। একজনকে জিজ্ঞাসা করায় জানালেন দুপুরের খাবার ভোটের ফাঁকে ফাঁকেই শেষ করেছেন। তবে যেহেতু ভোটারের চাপ কম ছিল তাই তাদের দুপুরের আহার করতে কোন অসুবিধা হয়নি। আমাদের দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় প্রিজাইডিং এবং পোলিং অফিসারদের উপর যে ধরনের চাপ থাকে তাতে দুপুরে খাবার সময়ও পেতে তাদের সমস্যা হয়। এদিক থেকে ভারতীয় প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসাররা ভাগ্যবান বলব।

ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার বিন্যাসের কারণে এখানে নির্বাচনে নিয়োজিত প্রিজাইডিং ও পোলিং কর্মকর্তারা আমাদের দেশের সমকক্ষদের চাইতে কম চাপে দায়িত্ব পালন করেন। কেন্দ্রের নির্বাচন শেষ হলে ভোটিং মেশিন প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টের সামনেই সিল করে ইউনিক নম্বর এজেন্টকে লিখে দিয়ে পূর্বনির্ধারিত গণনা কেন্দ্রে ভোটিং মেশিনসহ অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ জমা দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেন। যেহেতু গণনা হয় সমস্ত ধাপের (Phase) নির্বাচন শেষ হবার পর একদিনে সে কারণে প্রিজাইডিং অফিসাররা আমাদের দেশের নির্বাচনের গণনা সময়ের মত চাপে থাকেন না। তাছাড়া ভারতীয় ব্যবস্থায় ভোট গণনার জন্যে আলাদা কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়।

আমাদের দেশের বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থায় একজন প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রচুর দায়িত্ব দেয়া হয়ে থাকে। ভোটের আগের দিন বিভিন্ন সরঞ্জাম সংগ্রহ করে ঐ রাতে ভোট কেন্দ্রে রাতযাপন করে পরের দিন সকালেই প্রস্তুত থাকতে হয় ভোটারদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। ভোট শেষ হবার পর হতেই চাপ পড়তে থাকে গণনার জন্য। দু'দিনের ক্লান্তির পর গণনার মত অতি স্পর্শকাতর কাজটি তাকে সম্পন্ন করতে হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। বহু জায়গায় কৈফিয়ত দিতে হয় রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসারকে। প্রায় সারা রাত কাটে এ কাজে। এর উপরে রয়েছে পরাজিত প্রার্থীর নানা ধরনের অভিযোগময় লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। এ এক অমানুষিক কাজ।

www.pathagar.com

তবে আমাদের দেশে যারা এ কাজে জড়িত থাকেন তাদের দেশপ্রেম আর মনোবল প্রশংসার দাবি রাখে। এ পরিস্থিতিকে সহজ করতে হলে গণনার জন্য আলাদা ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যয় সামান্য বাড়বে। নির্বাচনকে স্বচ্ছ করতে এতটুকু কোন মূল্য নয়।

আমরা ফিরতি পথে জয়পুরের নতুন শহরের মধ্যে দিয়ে আসছিলাম। রাজ্যের বিধান সভার ইমারতের পাশ কাটিয়ে অনেক দূর ঘুরে 'ঘাট দরওয়াজা' এবং পরিচিত পিংক সিটি হয়ে যখন হোটেলে পৌঁছলাম তখন প্রায় বিকেল ৫-৪৫। হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা রয়েছে যারা এখনও কোন ধরনের বাজার করতে পারেনি তাদের জন্যে। আমার বা আমার সহধর্মিণীর কোন তাড়া ছিল না কারণ, শপিং কখনই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। তাছাড়া আমি আগামী সপ্তাহখানেক দিল্লীতে থাকবার জন্য ছুটি নিয়েই রেখেছিলাম, কাজেই কিছু কেনাকাটি করতে হলে সেখানেই করব। রাতে এশিয়া ফাউন্ডেশনের ডিনারের পর আমাদের অফিসিয়াল সফর শেষ হবে। সকাল নয়টায় আমি, আমার সহধর্মিণী এবং ছহুল সাহেবসহ সড়ক পথে আজমীরের পথে রওয়ানা হব। এক রাত আজমীর কাটিয়ে পরের দিন ভোরে সড়ক পথে দিল্লী ফিরব। জয়পুরে আসবার পূর্বেই, ছহুল সাহেবসহ আমাদের নির্ধারিত ব্যক্তিগত পর্যায়ের সফরসূচি ছিল রবিবার ১০ মে, ২০০৯-এ দিল্লী হতে 'শতাব্দী এক্সপ্রেসে' ভোর ৬-৩০ মিনিটে আগ্রা রওয়ানা হয়ে ওই দিনই বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম তাজমহল, লাল কেল্লাসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখে ওইদিন বিকেলেই ফিরতি মেইল-এ দিল্লী ফেরত আসার। আমি কয়েকদিনের জন্য দিল্লী থেকে যাব আর ছহুল সাহেব ঢাকায় ফেরত আসবেন। ওই দিন বিকেলেই আমাদের দিল্লী-আগ্রা-দিল্লী রেল টিকেট হয়ে গেছে বলে নিশ্চয়তা দিলেন দিল্লীর বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রটোকল কর্মকর্তা।

সন্ধ্যায় আমার ঢাকার বন্ধু সতেন্দ্রার জয়পুরের আত্মীয় মিঃ বলবীর এবং বহুল আলোচিত মিঃ হরি সিং সেখাওয়াত তাদের সাথে ডিনার খেতে পীড়াপীড়ি করলে এবারের মত মাফ চেয়ে পরিত্রাণ পেলাম। পরে ফোনে মিঃ সেখাওয়াত জানালেন যে আমাদের আজমীরে নিয়ে যাবার জন্য বলবীর আমাদের জন্য একটি জিপ ঠিক করে রেখেছেন। আমি বলবীরকে 'ধন্যবাদ জানিয়েছি' বলে সেখাওয়াতকে বললাম যে আমাদের আজমীরে যাতায়াত এবং এক রাত থাকার ব্যবস্থা করা আছে। অশেষ ধন্যবাদ দিলাম তাদের আন্তরিকতা আর যথেষ্ট সময় আমাকে দেবার জন্য। এ দু'জন অচেনা মানুষ কয়েক ঘণ্টায় অত্যন্ত আন্তরিক হয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে সেখাওয়াত। আমি তাদেরকে বাংলাদেশে বেড়াতে দাওয়াত দিয়ে বিদায় নিলাম। সত্যিই এ দু'জন অতি চমৎকার লোক যেমন চমৎকার ছিলেন ঢাকায় অল্প সময়ের মধ্যে আন্তরিকভাবে পরিচিত হয়ে উঠা ড. সাতেন্দ্রা।

www.pathagar.com

ড. সাতেন্দ্রা মধ্যম উচ্চতার উজ্জ্বল শ্যামলা সুঠাম দেহের পঞ্চাশের কোঠার হাস্যোজ্জ্বল মুখের মানুষ। আমি প্রথম তাকে প্রাত:ভ্রমণের সময় গুলশান-২ এর লেক পার্কে দেখি এবং সেখানেই পরিচয়। সাতেন্দ্রা ভারতের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা-জাতিসংঘের ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের এনভায়রনম্যান্ট এন্ড ইকোলেজিক্যাল ব্যালেন্সের প্রজেক্টের উপদেষ্টা হিসেবে গত একবছর ঢাকায় ছিলেন। স্বল্পভাষী এ ভদ্রলোক এক সময় বিহার রাজ্যের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব এর পিএস ছিলেন। তার কাছ থেকে লালুজি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। পরিচয় হবার পর হতে ভদ্রলোক খুব আন্তরিকভাবেই মিশতেন। তেমনি আরেকজন ভারতীয় মিঃ মুকুলের সাথে প্রায় প্রতিদিন প্রাত:ভ্রমণে দেখা হতো। ড. সতেন্দ্রা জন্ম সূত্রে ইউপির কিন্তু বাসিন্দা দিল্লীর। আমি দিল্লী আর জয়পুর যাচ্ছি শুনে আমাকে বিদেশে সহযোগিতা করবার জন্যে তিনি সর্বধরনের প্রয়াস নিয়েছিলেন। তারই সূত্রে বলবীর আর সেখাওয়াতের সাথে পরিচয়। সতেন্দ্রা পার্কের নির্ধারিত ফুটপাথে কমই হাঁটতেন। তাকে সবসময় গাছের ফাঁকে ফাঁকে হাঁটতে দেখতাম। সে কারণেই তাকে 'জাঙ্গল ম্যান' বলে আমরা ডাকতাম। সাত্যেন বলতেন, জীবনের বহু সময় জঙ্গলে কাটিয়েছে বলেই গাছপালার ছায়া এবং তাদের মধ্য দিয়ে হাঁটতে তাঁর ভাল লাগে। সাত্যেনের মতে বাংলাদেশীরা অতিথিপরায়ণ এবং বন্ধুবৎসল। কিন্তু অতিরিক্তভাবে রাজনীতি নিয়ে মাতামাতির জন্য বাংলাদেশের যেখানে পৌছানোর কথা ছিল সেখানে এখনও পৌছতে পারেনি। ড. সাত্যেন প্রমোশন পেয়ে বর্তমানে দিল্লীতে রয়েছেন। মুকুল তার পশ্চিম বাংলার বউ নিয়ে এখনও ঢাকায় আছেন। এ দম্পতি প্রায়ই বলেন যেদিন তারা ঢাকা ছেড়ে যাবেন সেদিন হবে তাদের জীবনের একটি দুঃখ ভরা দিন।

অনেকের কাছে ড. সাত্যেন প্রসঙ্গ ছন্দপতন মনে হতে পারে, তবে আমার কাছে তেমন মনে হয়নি। যে কারণেই এতটুকু উল্লেখ করা মাত্র।

যেমনটা বলেছি যে, পরের দিন সকালে, মে ৮, ২০০৯-এ আমরা ব্যক্তিগত সফরের প্রারম্ভে আজমীর যাবার পরিকল্পনা করেছিলাম। সেই পরিকল্পনা মোতাবেক আজমীরের পথে রওয়ানা হবার প্রস্তুতি নিয়ে হোটেল কক্ষে বসে ভারতের এ পর্যায়ের নির্বাচনের পর্যালোচনা শুনছিলাম। পর্যালোচনায় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা দিল্লীর ভোটের গড় ৫১ শতাংশ হওয়াকে দিল্লীর ভোটারদের আগের তুলনায় আগ্রহ বাড়বার উদাহরণ বলে মনে করছিলেন। এ আগ্রহ বেশি দেখা গিয়েছিল দিল্লীর মত শহরের নতুন ভোটারদের মধ্যে। ভারতের নির্বাচনের ফলাফলে প্রতীয়মান হয়েছিল যে ইন্ডিয়ান কংগ্রেস এবার দিল্লীর ৭টি আসনে অত্যন্ত ভেবে-চিন্তে প্রার্থী দিয়েছিল। এমনকি অত্যন্ত প্রভাবশালী হলেও জগদিশ টাইটলারকে প্রার্থী হতে দেয়া হয়নি।

জগদীশ টাইটলার ইন্দিরা গান্ধীর সময় যুব কংগ্রেস প্রধান ছিলেন। ইন্দিরার

www.pathagar.com

মৃত্যুর পর ১৯৮৪তে দিল্লীতে শিখ বিরোধী দাঙ্গায় তার সম্পৃক্ততার বিষয় নিশ্চিত করেছিল 'নানাভাতি কমিশন'। কংগ্রেস জগদিশ টাইটলারকে মনোনয়ন দেবার ইচ্ছা পোষণ করলেও শিখদের এবং দলের মধ্যে চাপ সৃষ্টি হওয়াতে কংগ্রেস প্রধান সোনিয়া গান্ধী মিঃ টাইটলারকে প্রার্থিতা থেকে বাদ দেন। একই অভিযোগে অভিযুক্ত ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে আউটার দিল্লী থেকে নির্বাচিত সজ্জন কুমারকেও বাদ দেয়া হয়েছিল ২০০৯-এর নির্বাচনে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে একজন সম্মানিত লোকসভা সদস্যকে মারাত্মক অভিযোগ উঠায় বাদ দিয়ে অন্য প্রার্থী দেয়ায় এবং যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের কারণেই এবারের নির্বাচনে দিল্লীর ৭টি আসনেই বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিল কংগ্রেস প্রার্থীরা।

আমি মনে করি, আমাদের দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্র অনুরূপভাবে আরও যত্নবান হওয়া উচিত। বর্তমান আইনে তৃণমূল পর্যায় হতে প্যানেল কেন্দ্রে বিবেচনার জন্য উপস্থাপনের বিধান রাখা হয়েছে। আমি আশা করি, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো আইন অনুসরণ করলে যোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া সহজতর হবে।

www.pathagar.com

সাত

খাজা গরিব নেওয়াজ

মে ৮, ২০০৯, শুক্রবার। সকাল প্রায় দশটায় আমরা পূর্বনির্ধারিত গাড়িতে সড়ক পথে আজমীরের উদ্দেশে জয়পুর ত্যাগ করলাম। প্রায় ২৫০ কিঃ মিঃ পথ। আমরা আজমীরে পৌঁছে জুমার নামাজ আদায় করবার মনঃস্থির করলাম। জয়পুর শহর থেকে বের হয়ে ন্যাশনাল মোটরওয়েতে (NM-8) উঠতেই গাড়ি প্রাণ ফিরে পেল। আমাদের দক্ষ চালক সত্যপ্রকাশ জানালো যে মাঝে একটা ছোট বিরতিসহ আমরা আনুমানিক আড়াই ঘণ্টায় আজমীরের মান সিং হোটেলে পৌঁছব।

এনএম-৮ হাইওয়েতে কোন সিগন্যাল নেই, দু'এক জায়গায় বড় ধরনের ক্রসিং তাও টার্ন পাইক-এর মাধ্যমে। সমগ্র রাস্তার দু'পাশে রেলিং দেয়া। হাইওয়ে ইউরোপিয়ান মানদণ্ডে তৈরি। জয়পুরের এরিয়া ছেড়ে বের হতেই শুরু হয়, দু'পাশে যত দূর চোখ যায় খোলা, ধুধু তামাটে মাটির মরুভূমি। খোলা প্রান্তর, বালির ঝড় না হলেও গাছপালার অভাব আর বাতাসে শুষ্ক ধুলোর আবরণের কারণে তাপমাত্রা বোঝা যায় না। ওই দিন তাপমাত্রা ৪৪° সেলসিয়াস থাকার কথা। তেমনি মনে হয়েছিল সকাল প্রায় এগারোটার দিকে। দূরে কিছু কিছু বড় ধরনের বাবলা বা 'কিক্কর' গাছ। প্রায় এক ঘণ্টা চলার পর দূরে বেশ কয়েকটি ঘর দেখা গেলেও মানুষ দেখতে পাইনি বা নজরে আসেনি। ঘরের পাশে উটগুলো বাবলা গাছের নিচে গরমে ঝিমুচ্ছে। গাছ থেকে কয়েকটি, আমাদের দেশের চাইতে ঈষৎ বড় ধরনের, ঘুঘু পাখি একগাছ থেকে আরেক গাছে উড়ে বেড়াচ্ছে। দ্রুত অপসৃয়মান দৃশ্যপটে কিছুটা পরিবর্তন হতে লাগল। কয়েকটি খোলা চালের 'ধাবা' বা নিম্ন আয়ের অথবা ট্রাক চালকদের প্রিয় খাবারের দোকানের দেখা পেলাম অনেকক্ষণ চলার পর। দোকানের চুলোয় বড় বড় ডেগচি চড়ানো–মনে হয় দুপুরের খাবার তৈরি হচ্ছে। চালার নিচে রশির 'চারপাই'।✦ খাবার এবং বিশ্রাম একই সাথে করা যায়। কোথাও কোথাও ধাবাগুলোর সামনে বড় সাইজের কয়েকটি ট্রাক। কোনটা খালি, কোনটা তেরপাল দিয়ে ডাকা। প্রায় দেড়ঘণ্টা চলার পর মিঃ সত্যপ্রকাশ আমাদেরকে নিয়ে টুরিস্টদের জন্য উপযোগী একটি রেস্তোরাঁর সামনে থামালেন। আমরাই তাকে পূর্বেই অনুরোধ করেছিলাম। উদ্দেশ্য এককাপ চা খাওয়া

✦ *চকির ফ্রেমে রশি দিয়ে শোবার স্থান তৈরি করা। এগুলো সাধারণত উত্তর ভারত, পাঞ্জাব এবং পাকিস্তানে ব্যবহৃত হয় বেশি। হালকা ধরনের বলে সহজে স্থানান্তর করা যায়।*

www.pathagar.com

আর একই সাথে টয়লেট ব্যবহার করা। সমস্ত পথে পানি পান করতে করতে ব্লাডার ধারণক্ষমতার শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। কাজেই একান্ত প্রয়োজন ছিল বিরতির। তাছাড়া সত্যপ্রকাশেরও বিরতির প্রয়োজন। আমরা তিন জনেই গাড়ি থেকে নামলাম। নামতেই মনে হল আগুনের হলকা গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁর ভেতরে প্রবেশ করে স্বস্তি পেলাম। জায়গাটির নাম 'ডাডো'। মোটামুটি একটি বড়সড় গ্রাম বা আমাদের ভাষায় মফস্বল শহর–জয়পুর আর আজমীরের মাঝামাঝি পথে। এখান থেকেই ভৌগোলিক দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করেছে। আমরা আজমীর তথা রাজস্থানের মার্বেল পাথরের অঞ্চলে প্রবেশ করেছি। দু'পাশের পাহাড় থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে মার্বেলের বড় বড় বোল্ডার–যেগুলোকে ছোট ছোট ফ্যাক্টরিতে নিয়ে স্লাবে কাটা হয়। পাঠানো হয় দূর দূরান্তে। বাংলাদেশেও সৃষ্টি হয়েছে রাজস্থানের মার্বেলের বড় বাজার–বিশেষ করে মার্বেলের, সাদা এবং বিভিন্ন রংয়ের চিপস্। ব্যবহার করা হয় মোজাইক দানা হিসেবে।

আমরা রাজস্থানের এক প্রকার পূর্বপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। রেস্তোরাঁতে চায়ের অর্ডার দিয়ে আমরা তিনজনে পাশের শো রুমে রাজস্থানের হস্তশিল্পের সমাহার দেখতে উৎসাহিত হয়ে গায়ে লাগানো দাম দেখছিলাম। এসব দোকানে এ ধরনের জিনিসের দাম কত চড়া হতে পারে তা হয়ত বলবার তেমন প্রয়োজন হয় না। আমি কাঠের কাজের কয়েকটি বিশেষ আকর্ষণীয় ডেকোরেশন 'পিছ' দেখছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল মোটামুটি সাইজের অশ্বারোহী, মাথায় রাজপুত পাগড়ি, একহাতে উন্মুক্ত তলোয়ার অন্য হাতে লাগাম ধরা, ঘোড়ার সামনের একপা শূন্যে তোলা অশ্বারোহীর কোল ঘেঁষে বসা এক নারীর কাঠের তৈরি প্রতিকৃতি। আমার উৎসুক দৃষ্টি দেখে দোকানী এগিয়ে বলল, "সাহাব ইয়ে হায় পৃথ্বীরাজ চৌহান আউর রাজকুমারী সংযুক্তা"। বাংলা করলে যা দাঁড়ায়, তা হল মূর্তিটি পৃথ্বীরাজ চৌহানের যিনি বিয়ের পিড়ি থেকে রাজকুমারী সংযুক্তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। পৃথ্বীরাজ চৌহান ছিলেন দিল্লীর দ্বিতীয় শেষ হিন্দু শাসক। শেষ হিন্দু শাসক ছিলেন হিমু। এ সময়েই মুসলমানরা দিল্লীতে রাজত্ব স্থাপন করে।

পৃথ্বীরাজ চৌহানকে বর্তমানে ভারতে অন্যতম বীর বলে নতুনভাবে ইতিহাসে পরিচিত করানো হচ্ছে। তিনি ছিলেন হিন্দু রাজপুত চৌহান বংশের শাসক। পৃথ্বীরাজ শুধু শাসক হিসেবেই নয়–প্রেমিক হিসেবেও শত শত বই, নাটক আর বেশ কয়েকটি মেগা সিরিয়ালের বিষয়বস্তু হয়ে আছেন। বক্স অফিস হিট ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে সমাদৃত এ প্রেমকাহিনী এখনও স্টার প্লাস (ভারতীয় টিভি চ্যানেলে) ধারাবাহিকভাবে দেখানো হচ্ছে।

পৃথ্বীরাজের প্রেমগাঁথার সাথে দিল্লীর তথা আজমীরের রাজত্ব হারানোর ইতিহাস

www.pathagar.com

জড়িত। পৃথ্বীরাজের মাতামহ ছিলেন বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা বল্লাল সেন। পৃথ্বীরাজ ১১৪৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ২০ বছর বয়সে ১১৬৯-এ চৌহান দিল্লী এবং আজমীর থেকে তার রাজত্ব শাসন করেন। আজমীর মায়ের উত্তরাধিকার সূত্রে মাতামহের নিকট হতে উপহার স্বরূপ পেয়েছিলেন।

১১৯১-এ গজনীর (আফগানিস্তান) আফগান গভর্নর মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন ঘোরী পৃথ্বীরাজের সীমানায় আক্রমণ করেন। জায়গার নাম 'তারাই' (বর্তমানে হরিয়ানায়)। ঘোরী পরাজিত হন। চৌহান তাকে প্রাণে রক্ষা করে গজনীতে ফেরত যেতে দেন। পুনরায় ঘোরী চৌহানদের সাথে কান্নুজদের পুরাতন শত্রুতার সুযোগ নিয়ে এক বছরের মাথায় ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে ১,২০,০০ অশ্বারোহীসহ বিশাল বাহিনী নিয়ে চৌহানকে একই জায়গায় (তারাই) আক্রমণ করলে এবার চৌহানের বাহিনীর পরাজয় হয়। মুহাম্মদ সাহাবুদ্দীন ঘোরী (সংক্ষেপে মোহাম্মদ ঘোরী) পৃথ্বীরাজ চৌহানের মত ভুল করেননি। পৃথ্বীরাজ চৌহানকে হত্যা করেন ঘোরী। কথিত আছে ওই সময়ে গাহাধাবলা রাজবংশের জয় চন্দ্র রাঠোরের কন্যা, পৃথ্বীরাজের প্রেয়সী, রাণী সংযুক্তা অন্যান্য রাজপুত মহিলাদের নিয়ে আক্রমণকারীদের হাতে পড়ার চাইতে শ্রেয় মনে করে আত্মহত্যা করেন। পৃথ্বীরাজ চৌহান আর সংযুক্তা ছিলেন দিল্লী এবং গৌড়ের একসময়কার শাসক বল্লাল সেনের✦ সূত্র ধরে আত্মীয়। তারপরেও দু'বংশে শত্রুতা হয় সংযুক্তাকে ঘিরে।

পৃথ্বীরাজ চৌহান আর সংযুক্তার উপাখ্যান ইতিহাসে যতখানি না চর্চিত তার চাইতে খ্যাত রোমাঞ্চকর কাহিনী হিসেবে। পৃথ্বীরাজের বীরত্বের কথা দিল্লী-আজমীর ছাড়িয়ে সকল রাজপুত রাজ্যে এবং তার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ায় বিভিন্ন রাজপরিবারে চর্চার বিষয়ে পরিণত হয়। বহু রাজকুমারী মনে প্রাণে পৃথ্বীরাজের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। এমনি একজন ছিলেন অসামান্য সুন্দরী গাহাধাবলা বংশের রাজপুত রাজা জয় চন্দ্র-এর ষোড়শী কন্যা সংযুক্তা। হৃদয়ে প্রেমের কথা চেপে রাখতে পারেননি ষোড়ষী সংযুক্তা। গোপনে পৃথ্বীর সাথে দেখা করবার বাসনা জানালে দু'জনই ছদ্মবেশে কোটেশ্বর মন্দিরে দেখা করতে আসেন। পৃথ্বীরাজ সূর্য নামে আর সংযুক্তা নন্দিনী নামে দেখা করলেও সংযুক্তা পৃথ্বীরাজকে চিনতে পারেন। পরে দু'জনের পরিচয় সূত্র ধরে ছদ্মনামেই পরিণয় চলে বেশ কিছু সময়। জয় চন্দ্র-এর কানে শত্রুর সাথে কন্যার গোপন অভিসারের কথা উঠতেই তিনি ওই সময়কার হিন্দু প্রথা মোতাবেক কন্যার বিবাহের জন্য 'সয়ম্বর' এর ব্যবস্থা করেন। 'সয়ম্বর' প্রথায় কন্যাকে উপস্থিত আমন্ত্রিত বিবাহযোগ্যদের মধ্যে একজনকে স্বামী হিসেবে বেছে নেয়ার রেওয়াজ ছিল।

✦ *রাজা বল্লাল সেন তৎকালীন বাংলায় (গৌড়) রাজা গোবিন্দপালকে পরাজিত করে সেন বংশের শাসনের গোড়াপত্তন করেছিলেন। কথিত আছে রাজা বল্লাল সেন-এর অনুপ্রেরণায় এবং ওই সময়েই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মন্দির স্থাপন করা হয়।*

www.pathagar.com

সংযুক্তার সয়ম্বর হবার জন্য, পৃথ্বীরাজ চৌহান ছাড়া, অন্যান্য রাজ্যের রাজপুত রাজকুমারদের জয়চন্দ্র-এর দরবারে আমন্ত্রণ জানানো হল। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের মূর্তি পাহারাদারদের ভূষণে তৈরি করে দরবারের প্রবেশ পথে স্থাপিত করলেন। রাজা জয়চন্দ্র এ ধরনের আচরণ করে একদিকে পৃথ্বীরাজ চৌহানকে অপমান করার সুযোগ নিয়েছিলেন অপরদিকে কন্যাকে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে তিনি সংযুক্তার প্রেমিককে কতখানি হেয় মনে করেন। সংযুক্তাও পিতার এ ধরনের আচরণে রুষ্ট হয়ে পৃথ্বীরাজ চৌহানের মূর্তিকে 'সয়ম্বর' নির্বাচিত করতে মনঃস্থির করলেন।

সংযুক্তা তাঁর পাণি প্রার্থী উপস্থিত রাজুকমারদের উপেক্ষা করে প্রবেশপথে পৃথ্বীরাজের মূর্তিতে মালা পরালে মূর্তির পেছন থেকে স্বয়ং পৃথ্বীরাজ চৌহান বের হয়ে সংযুক্তাকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে উল্কা বেগে নিজ রাজ্যে নিয়ে এসে বিয়ে করেন। পৃথ্বীরাজ চৌহানের এ ঔদ্ধত্যকে জয়চন্দ্র সহজে হজম করতে পারেননি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চৌহান এবং গাধালেবাদের মধ্যে তিক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় তারাই যুদ্ধে মোহাম্মদ ঘোরীর সহযোগী হয়েছিলেন।

পৃথ্বীরাজ চৌহানের বীরগাথা আর প্রেমের উপাখ্যান যেমন হালে নতুনভাবে দক্ষিণপন্থী হিন্দুবাদীদের দ্বারা বেশি আলোচিত তেমনি জয়চন্দ্রকে মুসলমানদের হিন্দুস্থান জয়ের সুযোগ করে দেবার জন্য তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করেছে কট্টরপন্থী হিন্দুরা।

পৃথ্বীরাজের মৃতদেহ ঘোরী আফগানিস্তানে নিয়ে সমাহিত করেছিলেন বলে ব্রিটিশ রাজের রাজপুতানা রাইফেলসের ক্যাপ্টেন বিৎগ্‌লে উদ্ধৃত করেছেন। তার ভাষ্যমতে, ওই সমাধিতে খোদাই করা রয়েছে 'এখানে হিন্দুস্থানের কাফির রাজা শায়িত।'[১] ওই ব্রিটিশ সেনা অফিসারের নেতৃত্বে ওই সময় পৃথ্বীরাজের কথিত সমাধিতে রাজপুতানা রাইফেলস 'গার্ড অব অনার'ও প্রদান করেছিল।[২] সময়টা ছিল প্রথম আফগান যুদ্ধের সময়কাল।

হালে রাজস্থানে আর বিহারে পৃথ্বীরাজ চৌহানের সমাধি আফগানিস্তান হতে ভারতে স্থানান্তর করতে ভারত সরকারকে বাধ্য করবার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম হয়েছে বলে বিভিন্ন তথ্যে প্রকাশ।[৩] আজমীরের প্রবেশ পথেই অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট পৃথ্বীরাজ চৌহানের বিশাল আকৃতির তাম্রের মূর্তি স্থাপিত রয়েছে।

মুহাম্মদ ঘোরী কুতুবউদ্দিন আইবেককে বিজিত অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। পরে কুতুবউদ্দিন আইবেক ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী জয় করে প্রথমবারের

১. *Sri Ram Sharma, "Outline of Indian Histroy"*
২. *August Rudolf Hoernie, Herbert Aleik Stark, "A History of India"*
৩. *http//en, wkipidie. orgi.wk/pritiviraj-chauhan*

www.pathagar.com

মত দিল্লীকে মুসলমান শাসকদের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ওই বিজয়কে ধরে রাখতেই গোড়াপত্তন করেছিলেন তৎকালীন দিল্লীর মেহেরুলী অঞ্চলে ইতিহাস খ্যাত অন্যতম দৃশ্যমান স্থাপনা কুতুব মিনার।[৪]

আমি কাঠের কাজটি বেশ অনেকক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখলাম। সন্দেহাতীতভাবে কাজটি অত্যন্ত নিখুঁত ছিল। কিন্তু মূল্যের সাথে আমার সংগতির মিল না থাকায় চুপচাপ সরে আসলাম। ওয়েটার চা পরিবেশন সম্পন্ন করেছে বলে সংবাদ দিলে আমরা রাজস্থানের বিখ্যাত 'মশলা চা' পান করে আজমীরের দিকে যখন পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম তখন সূর্য প্রায় মাথার উপরে। গরম হাওয়া বইছে ঐতিহাসিক রাজপুতানা, বর্তমানের রাজস্থানের, বিস্তীর্ণ ধূসর এ প্রান্তে।

আমরা আজমীরের প্রায় কাছাকাছি। রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য ছোট ছোট ধূসর রঙ্গের পাহাড় দেখতে পেলাম যার প্রায় প্রতিটি হতেই কেটে বের করা হচ্ছে বৃহৎ মার্বেল খণ্ড। এগুলোকে অদূরে, রাস্তার পাশেই, স্থিত ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে স্ল্যাব তৈরি করবার জন্য। হাইওয়ের ডানের লেন দিয়ে শত শত ট্রাক বোঝাই মার্বেলের স্ল্যাব রাজস্থানের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে মনে হল। আর কয়েক কিলোমিটার এগুতেই রাস্তার দু'পাশে মার্বেল বোল্ডার থেকে স্ল্যাব কাটিং-এর বহু ছোট ছোট ফ্যাক্টরি চোখে পড়ল। রাস্তার পাশে রাখা রয়েছে নমুনা। মনে হয় এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মার্বেল জড়িত। এসব মার্বেলের চাহিদা ক্রমেই বাংলাদেশেও বাড়ছে। আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিদের বাড়ি আজকাল এ মার্বেল পাথর দ্বারাই তৈরি হচ্ছে বললেই চলে।

আমরা আজমীর শহরের প্রান্তে এসে পৌছলাম। চার পাশে পাহাড়ে ঘেরা শহর আজমীর, জেলার প্রধান শহর। কিছুদূর এগুতেই হাতের বাঁয়ে দেখলাম রাজস্থানের বিখ্যাত আন্না সাগর (লেক)। অত্যন্ত পরিষ্কার পানি। চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা। যুগে যুগে শহরের প্রধান পানি সরবরাহের আঁধার হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে আন্না সাগর। আমরা আন্না সাগর পার হয়ে সামান্য এগুতেই পেলাম মান সিং প্যালেস হোটেল। এখানেই আমাদের আজকের রাতে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছোট হোটেল। কয় তারা সঠিক বলতে পারব না, তবে একরাত কাটাবার জন্য যথেষ্ট উপযোগী বলে মনে হল।

দিনটি শুক্রবার। আমি আর জনাব ছহুল হুসাইন জুম্মার নামাজ পড়ব বলে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম। রুমে গিয়ে সেভাবেই তৈরি হচ্ছিলাম। রিসিপশন থেকে খবর দিল যে দরগা থেকে প্রধান খাদেমের একজন প্রতিনিধি আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। আমার মনে হল এশিয়া ফাউন্ডেশনের মিঃ আগারওয়াল খবর দিয়ে

৪. *History of India Sereize 'First Battle of Tarai"*

www.pathagar.com

থাকবেন। জয়পুরেই মিঃ আগারওয়াল আমাদের আজমীর সফরে কিছুটা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। প্রথমে জানালেন যে এতদূরে পথে নিরাপত্তা দেয়া সম্ভব হবেনা, তবে তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে মাজার কর্তৃপক্ষকে আমাদের দেখাশোনা এবং জিয়ারতের সুষ্ঠু ব্যবস্থার কথা বলে রাখবেন। আমি তাকে বলেছিলাম, "যেহেতু আমরা নিজেরাই নিজেদের সময়েই আজমীরে যাচ্ছি, তাই কোন সরকারি প্রটোকল আমরা আশা করি না এবং প্রয়োজনও বোধ করিনা।"

একথা শুনে আগারওয়াল কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "আমি অন্যান্য ব্যবস্থা করে রাখব যাতে তোমাদের জিয়ারতের কোন অসুবিধা না হয়।" আমরা তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। আগারওাল জয়পুর থেকেই কাকডাকা ভোরে দিল্লী চলে গিয়েছিলেন বলে ওই সকালে আমাদের সাথে তাঁর আর দেখা হয়নি। হয়ত আগারওয়ালের খবরের প্রেক্ষিতেই ওই প্রতিনিধির আগমন। পরে তাঁর (মাজারের প্রতিনিধি) মুখেই শুনলাম আগারওয়াল সাহেবের নিকট হতেই তারা আমাদের এবং হোটেলের তথ্য পেয়েছেন।

আমরা দু'জন তৈরি হয়ে নিচে লবিতে নামতেই সালোয়ার কুর্তা পরা দু'জন ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখলাম। তাঁরা আমাদের কাছে দরগা জেয়ারতের সময় জানতে চেয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করে বললেন যে দরগাহ পৌঁছে তাদের খোঁজ করলেই তারা আমাদের জিয়ারতের বন্দোবস্ত করবেন। আরও বললেন যে দরগা-এর প্রায় দু'কিলোমিটার পথ দূরে গাড়ি দাঁড় করাতে হবে এবং সেখান হতে হয় হেঁটে অথবা অটোরিক্সা চেপে দরগা গেট পর্যন্ত যেতে হবে। আমি বিস্তারিত শুনে কিছুটা হকচকিয়ে গেলাম।

ইতিপূর্বে আমাকে অনেকেই আজমীরে খাজা গরিব নেওয়াজের দরগাতে জেয়ারতের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, কিন্তু বিস্তারিত কখনও জানা হয়নি। তবে উপমহাদেশের, বিশেষ করে ভারত পাকিস্তানে, সূফী সাধকদের মাজার ঘিরে এক ধরনের অতিরিক্ত উন্মাদনার বিষয়টি আন্দাজ করতে অসুবিধে হবার কথা নয়। বিশেষ করে আজমীর শরিফ উপমহাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ সাধকের দরগা যাকে বলা হয় সূফীদের চিশতিয়া তরিকার অন্যতম সাধক হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতির (রঃ) ইবাদতের স্থান এবং সেখানে তিনি চিরশায়িত আছেন– কাজেই সেখানকার উত্তেজনা আর উন্মাদনার মাত্রা কত বেশি বলার অপেক্ষা রাখে না।

যাই হোক আমরা আমাদের অতিথিকে জানালাম যে, আমরা প্রথমে জুম্মার নামাজ আদায় করতে চাই। যদিও আমাদের ইচ্ছা ছিল দরগা মসজিদে নামাজ আদায় করবার। কিন্তু আমাদের অতিথিদের একজন জানালেন সেখানে নামাজ পড়া জুম্মার ভিড়ের জন্য সম্ভব হবেনা, বিশেষ করে এ অত্যধিক গরমের মধ্যে। তারা আমাদের

www.pathagar.com

ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরেটের সন্নিকটের মসজিদে নামাজ আদায় করতে পরামর্শ দিয়ে আছরের পর দরগা যেতে অনুরোধ করে দরগার দিকে চলে গেলেন। আমাদের চালক সত্যপ্রকাশও আজমীরে প্রথমবার এসেছে। কাজেই সেও আমাদের মত এ শহরে নতুন। অবশেষে অনেককে জিজ্ঞাসা করবার পরই আমরা কালেক্টরেট মসজিদে পৌছতে পারলাম। রাস্তার পাশে একটি মসজিদ যার উপরতলা নির্মাণাধীন। মনে হল এলাকাটি মুসলিম অধ্যুষিত বলেই মসজিদটি কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। আমরা নামাজ শেষ করে হোটেলে ফিরে এসে দুপুরের খাবার খেতে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পর পছন্দমত একটা খাবারের দোকানে সুলভে আহার সেরে হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতির (রঃ) দরগায় জিয়ারতের জন্য তৈরি হলাম।

আমি আর আমার সহধর্মিণী ডা: রেহানা খানম যিনি দরগা জিয়ারত করবার মনঃস্থির করেই এতদূর এসেছেন, তৈরি হয়ে আমাদের অপর সহযাত্রী ছহুল হুসাইনের রুমের সামনে গিয়ে আওয়াজ দিলে জানালেন যে, তিনি আজমীরের ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরকে খোঁজ করেছিলেন কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর শহরের বাইরে রয়েছেন বলে কথা বলতে পারেননি। এক্ষণে তিনি পুলিশ সুপারকে খোঁজ করছিলেন। পুলিশ সুপার শহরের বাইরে থাকায় কোতোয়ালী থানার ওসিকে পুলিশ সুপারের জন্য ছহুলের মোবাইল নম্বর দিতে গিয়ে ওসিকে পরিচয় দিয়ে আমাদের অবস্থান জানালেন। ওসি কতোয়ালী আরেক ধাপ এগিয়ে আমরা কখন মাজারে যাব জেনে ছহুল সাহেবকে জানালেন যে, আমরা তাদের মেহমান যদিও পূর্ব সংবাদ তারা পায়নি তবুও দরগা এলাকায় পুলিশ আউটপোস্টে খবর দিয়ে দিয়েছেন এবং পুলিশ সুপারকে ছহুল হুসাইনের মোবাইল নম্বরও জানিয়েছেন। আমি অনুযোগের সুরে আমার সহকর্মীকে বললাম, "আমরা ব্যক্তিগত সফরে এসে এখানকার প্রশাসনকে জড়ানো কি সঠিক হয়েছে?" ছহুল সাহেব উত্তরে বললেন, "হয়ত জানাতাম না, কিন্তু মনে হল জানিয়ে রাখা ভাল। কারণ, দুপুরে যে দু'জন আমাদের কাছে এসেছিলেন তাদের হাবভাব দেখে মনে হল আমাদের পরিচয় পুলিশের কাছে থাকাটা ভাল।" আমি তার যুক্তি খণ্ডন করার ইচ্ছা পোষণ না করে ভাবলাম হয়তোবা তিনি ঠিকই করেছেন। আর কোন মন্তব্য করলাম না।

আমরা দরগা-এর কাছাকাছি যেতেই ছহুলের মোবাইলে পুলিশ সুপার ফোন করে বললেন যে, তিনি পুলিশের আউটপোস্টে বলে রেখেছেন। আউটপোস্টের অফিসার দিল্লীগেটে আমাদের অপেক্ষা করবে। তিনি অনুরোধ করলেন যে, দরগা এলাকায় আমরা পুলিশের সাহায্য ছাড়া অন্য কোন লোকের সাহায্য যেন না নেই। অবশ্য পুলিশ সুপার কেন আমাদের এ ধরনের অনুরোধ করেছিলেন, তা বুঝতে আমাদের বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। আমি একটি ভিন দেশের পুলিশ সুপারের তৎপরতায় বিমোহিত হয়েছিলাম। দরগা হয়ে জিয়ারত শেষে আমি ছহুল সাহেবকে পুলিশের সাথে

www.pathagar.com

যোগাযোগ করায় ধন্যবাদ জানালাম। বস্তুতপক্ষে ওই দিন শুক্রবার পুলিশের সাহায্য না পেলে আমাদের জিয়ারত করা কঠিন হয়ে যেত।

আমরা আজমীরের আন্নাসাগরের দক্ষিণ তীরের পুরাতন আজমীর শহরের দিকে সবজি মন্ডি রোড ছেড়ে রওনা হয়ে দরগা রোডের প্রান্তে পৌঁছলাম। রাস্তাটি অত্যন্ত সরু গলি বলেই মনে হল। বহু শতকের ব্যস্ত এ রাস্তা। ক্রমেই গলিটি একটি টিলার দিকে উঠছিল। রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। প্রচুর অটোরিক্সা আর পায়ে চলা হাজার হাজার মানুষ। বিচিত্র পোশাকের বিভিন্ন ধর্মের। বোরকা, হিজাবের সাথে সাথে মাথায় বড় করে সিঁদুর আঁকা সাথে ধুতি পরা ভক্তরা। এখানে ধর্মের কোন বিভেদ নেই, যেমন দেখেছি দিল্লীর নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারেও।

গলিটি ক্রমেই উপরের দিকে উঠছিল। বয়োবৃদ্ধ ভক্তদের হেঁটে উঠা কষ্টকর। দু'পাশে গায়ে গায়ে লাগানো হরেক রকমের দোকান। মিষ্টি জাতীয় 'তাবারকের' দোকানই বেশি চোখে পড়ল। আতর, আগরবাতি হতে নামাজের সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায় বিস্তর। অজস্র তাজা ফুলের দোকান বিশেষ করে গোলাপ ফুলের পাঁপড়ির, সমগ্র ভারত থেকে, এমনকি সময় সময়ে মধ্য এশিয়া থেকেও গোলাপ ফুলের পাঁপড়ি আমদানী হয় ভক্তদের জন্যে সরাসরি আমদানি করা হয় মাজার সংলগ্ন এ দোকানগুলোতে। আরও রয়েছে বহু খাবারের দোকান। দোকানগুলোর উপরে ছোট ছোট গেস্ট হাউজ মাজারের বিভিন্ন খাদেমের নামে। আজমীরে জিয়ারতকারীরা সাধারণত খাদেমের মাধ্যমে আসলে থাকার বন্দোবস্ত হিসেবে মাজারের কাছেই খাদেমদের গেস্ট হাউসেই থাকেন বলে শুনেছিলাম।

আমরা গলিমুখে প্রবেশ করে একটু এগুতেই সামনে দৃশ্যমান হল দিল্লী গেট। তবে ওই পর্যন্ত যেতে আমাদের তিন জায়গায় বাধা দেয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বাধা দিচ্ছিল কিছু যুবক। পরে শুনলাম এরা পার্কিং-এর ঠিকাদারের মাস্তান। এরা কোন প্রাইভেট গাড়িকে এ গলিতে দিল্লী গেটের আগে যেতে দেয় না। কারণ, ওই গেটের পর অটো অথবা পায়ে হাঁটারই নিয়ম। এখানে যথেষ্ট দুই নম্বরি কারবার আর চাঁদাবাজি চলে। তবে বিশেষ মেহমানদের জন্য সর্বত্রই কিছু ব্যতিক্রম থাকে। আজমীরের পুলিশ সুপারের আয়োজনের কারণে আমরাও সে ব্যতিক্রমে পড়লাম। এখানে পার্কিং-এর কোন রেট নেই, ১০০ হতে ১০০০ রুপীও হতে পারে। অটো রিক্সারও কোন বাধা ধরা রেট নেই, ২০ হতে ২০০ রুপীও হতে পারে। ফুল আর চাদরের দোকানের সামনে দাঁড়ালে মৌমাছির মত ছেঁকে ধরে বিভিন্ন নামের খাদেমদের প্রতিনিধিরা। মাজার চত্বরে কোন খাদেমের প্রতিনিধিদের হাতে পড়লে 'ইমোশনাল ব্ল্যাক মেইলিং'-এ পড়তে হতে পারে। যদিও মুসলমানদের হাতেই মাজার কমিটি তবুও এখানে যে ধরনের 'ইমোশনাল' বাণিজ্য গড়ে উঠেছে তেমনটা আমাদের দেশের সূফী-সাধকদের

www.pathagar.com

মাজারগুলোতে সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনাসহ কোন জায়গাতেই দেখা যায় না। এতখানি ইমোশন আমরা হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার (রঃ) মাজারেও দেখিনি।

খাজা সাহেবের মাজারকে কেন্দ্র করে বাজার হতে মাজার প্রাঙ্গণ পর্যন্ত দিনে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়ে থাকে। অথচ যে সূফী সাধককে ঘিরে আজমীর শরিফ তথা পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যে ধরনের অর্থের লেনদেন হয়ে থাকে, সে মহান ব্যক্তি জীবিতকালে ছিলেন অতি সাধারণ মানুষের মত জীবনধারণকারী অত্যন্ত বড়মাপের দরবেশ সূফী। যার মূলমন্ত্র ছিল আল্লাহকে ভালোবাসার সাথে তার সৃষ্টি মানুষকে ভালবাসা। খাজা সাহেবের বহু হেদায়েতের মধ্য অন্যতম ছিল গরীব হওয়ার মধ্যেই প্রাচুর্য খুঁজে পেতে চেষ্টা করা। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তার সাধারণ ভক্তরা এই অতি সাধারণ সূফী দরবেশকে ডাকতেন 'খাজা গরিব নেওয়াজ' বলে। এ নামে তিনি অধিক পরিচিত।

খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি (রঃ) গরিবে নেওয়াজ ১১৩৮ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পারস্যের (বর্তমানে ইরান) সিসতান প্রদেশে যখন জন্মগ্রহণ করেন– সে সময়ে আজমীর অঞ্চলের শাসক ছিলেন পৃথ্বীরাজ চৌহানের পিতা সমেশ্বর চৌহান। তিনি (খাজা সাহেব) ৫২ বছর বয়সে ১১৯০ খ্রিস্টাব্দে যখন আজমীরে পা রাখেন তখন তার ৩০ বছরের ছোট, পৃথ্বীরাজ চৌহান রাজপুতানার এ অঞ্চলের শাসক ছিলেন। খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি (রঃ) আজমীরে 'আস্তানা' তৈরি করবার এক বছরের মাথায় প্রথম মধ্যএশীয় মুসলমান বাহিনী স্থলপথে হিন্দুস্থান আক্রমণ করে। সুলতান মোহাম্মদ সাহাবুদ্দীন ঘোরী, হিন্দুস্থানে প্রথম মুসলিম শাসন প্রবর্তন করবার উদ্দেশ্যেই আক্রমণ করে, যদিও ইতিপূর্বে গজনীর সুলতান মোহাম্মদ বর্তমান পাকিস্তানের কিছু অংশ দখল করে সেখান হতে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন জায়গায় সতেরবার ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে ছিলেন কিন্তু সাম্রাজ্য স্থাপন করেননি। খাজা গরিব নেওয়াজ মঈনউদ্দিন চিশতির (রাঃ) আজমীরে আগমনের দুই বছরের মাথায় মুহাম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজ চৌহানকে পরাজিত করে উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য হিন্দুস্থানে মুসলিম শাসনের সূত্রপাত করেন। এই মোহাম্মদ ঘোরীর হিন্দুস্থানের গভর্নর কুতুবউদ্দিন আইবকের প্রেরিত ঘোরীর সিপাহসালার মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি গৌড়ের তৎকালীন শাসক লক্ষণ সেনকে পরাজিত করেছিলেন। তবে তখনও বাংলা জয় করতে পারেনি; সেটা ছিল ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ। ওই সময়ে খাজা মঈনউদ্দিনের (রঃ) বয়স প্রায় ৬৬ বছর। তিনি ৬৮ বছর বয়সে, ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে, দিল্লীতে ঘোরীর গভর্নর দাশ বংশের প্রথম সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবককে দিল্লীর প্রথম মুসলমান সুলতান হতে দেখেছিলেন।

কুতুবউদ্দিন আইবক ১২১০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। পরে সুলতান হন আরাম শাহ। আরাম শাহ-এর শাসন ছিল সংক্ষিপ্ত। মাত্র এক বছরের মাথায় আরাম শাহকে পরাজিত

www.pathagar.com

করে কুতুবউদ্দিন আইবেকের জামাতা, কুতুবউদ্দিনের দাশ বলে পরিচিত, সামসউদ্দিন ইলতুতমিশ দিল্লী সালতানাতের তৃতীয় এবং দাশ বংশের দ্বিতীয় সুলতান হন। সামসুদ্দিন ইলতুতমিশ ১২১১ হতে ১২৩৬ পর্যন্ত দিল্লীর সুলতান ছিলেন। ওই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর শ্বশুরের শুরু করে যাওয়া কুতুব মিনারের কাজ শেষ করে আনেন। ইলতুতমিশ দিল্লীর মেহেরুলীতে কুতুব মিনার চত্বরে সমাধিস্থ আছেন। ইলতুতমিশ-এর মৃত্যুর পর মাত্র সাত মাসের জন্য তার পুত্র রোকনউদ্দিন ফিরোজ দিল্লীর চতুর্থ সুলতান ছিলেন। তিনি অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন এবং তাকে হত্যা করা হয় ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে। রোকনউদ্দিন ফিরোজের হত্যার পর দিল্লীর সালতানাতে তথা দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন একমাত্র মুসলিম নারী শাসক ইলতুতমিশ এর কন্যা রাজিয়া সুলতানা। মামলুক বংশের শাসনকাল শেষ হয় ১২৯০-তে মঈনউদ্দিন কায়কোবাদের মৃত্যুর পর। কায়কোবাদ ছিলেন ইলতুতমিশ-এর চতুর্থ পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদের নাতী। কায়কোবাদ ইলতুতমিশ এর জামাতা দাশ বংশের নবম সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। দিল্লীতে এই গিয়াসউদ্দিন বলবনের দরবারেই গ্রেফতার করে হাজির করা হয়েছিল আরেক সূফী সাধক যুবা বয়সের হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া (রঃ)কে।

রাজিয়া সুলতানা যে বছর দিল্লীর সুলতান হয়ে মসনদে আরোহণ করেন ওই বছরের ১৬ মার্চ (১২৩৬) আজমীরের তথা উপমহাদেশের অন্যতম সূফী সাধক 'গরিব নেওয়াজ' খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি (রঃ) ৯৭ বছর বয়সে তার 'হুজুরা' (আস্তানা)তেই পরলোকগমন করেন (রজব ৬৩৩ হিজরি)। তাঁকে তাঁর হুজরা (আস্তানা)তেই দাফন করা হয় যা এখন আজমীরের খাজা গরিব নেওয়াজের দরগা শরীফ বলে সমগ্র উপমহাদেশে পরিচিত। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণে যারা হিন্দুস্থানে (বর্তমান ভারতে) তথা উপমহাদেশে সূফীবাদ প্রচার করেছেন, তাদের মধ্যে হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী (রঃ) হযরত শেখ ফরিদউদ্দিন গনজ সাক্কার, হজরত নিজামউদ্দীন আউলিয়া (রঃ), হযরত শেখ নাসিরউদ্দিন চিরাগ দিল্লী (রঃ) এবং হযরত খাজা বন্দে নওয়াজ গেচু দারাজা (রঃ) রয়েছেন।

এতক্ষণে আমাদের জিপটি দিল্লী গেটের (দরওয়াজার) পাশ কাটিয়ে সোজা দরগা গেটের দিকে যাবার পথেই দরগার পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর রাম শর্মা আমাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে সঙ্গ নিলেন। রাম শর্মা দরগা গেট পর্যন্ত আসলেন ঠিকই কিন্তু তিনি পরে ট্রাফিক পুলিশকে আমাদেরকে পৌঁছাতে নির্দেশ দিয়ে নিজেও এগুবার প্রাণপণ চেষ্টা করে গলদঘর্ম হচ্ছিলেন। গলিতে টহলরত ট্রাফিক আমাদের জিপ যাতে সহজে এবং নিরাপদে নিজাম দরওয়াজা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। প্রচুর মানুষের সমাগম নিজাম দরওয়াজার ওই

www.pathagar.com

গলিতে। গলিটি দিল্লী দরওয়াজা হতে সোজা উঠে গিয়েছে নিজাম দরওয়াজায়। প্রায় পনের মিনিট চলার পর আমাদের বহনকারী জিপটি নিজাম গেটের সামনে নালা বাজার এবং দরগা রোডের টি জংশনে এসে থামলে আমরা দরগাতে প্রবেশের জন্য বহু কষ্টে নেমে গেলাম।

বিশাল আকারের নিজাম দরওয়াজা। মাঝখানে বসানো ম্যাগনেটিক নিরাপত্তা আর্চ। দু'পাশে পুলিশের প্রহরা। দরগার ভেতরেও পুলিশের প্রহরা। দরগার ভেতরে প্রায় এক সেকশান পুলিশ মোতায়েন। নিজাম দরওয়াজার বাইরে থেকেই জুতা খুলে প্রবেশ করতে হয়। দরওয়াজার বাইরে জুতা পাহারা দিয়ে রাখবার জন্য বেশ কয়েকজন বসে থাকতে দেখলাম। জুতা রাখবার জন্য কোন নির্ধারিত ফি নেই। দাবিও করে না। যার যা খুশি তাই দিয়ে যায়। নিজাম দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশের মুখে দরগায় দায়িত্বরত পুলিশের হাবিলদার ভৈরব সিং আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে গার্ড করে নিয়ে যেতে উদ্যোগ নিলে তার সাথে যোগ দিলেন হোটেলে পরিচিত হওয়া প্রধান খাদেমের প্রতিনিধি (নাম মনে নেই)। হাবিলদার ভৈরব সিং সব সময় আমাদের সাথেই ছিলেন। এমনকি তিনি প্রবল চাপের মধ্যে জায়গা করে আমাদের তিনজনকে দরগার ভেতরে হযরত মঈনউদ্দিন চিশতির কবরের পাশের রূপার তৈরি রেলিং-এর গা ঘেঁষে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা নিজাম দরওয়াজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে মূল দরগার দিকে যেতে গিয়ে কেবলই চাপের মুখে পড়ছিলাম। ভাগ্যিস ছহুল সাহেব স্থানীয় এসপির সাথে কথা বলেছিলেন, অন্যথায় আমাদেরকে একদিকে যেমন ভক্তদের চাপের মুখে পড়তে হতো অন্যদিকে দরগার অগণিত খাদেম, উপ-খাদেম এবং তাদের প্রতিনিধিদের হাতে পড়তে হতো।

দরগার প্রধান ফটকে নিজাম দরওয়াজা নির্মিত হয়েছিল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন হায়দ্রাবাদের নিজাম মীর ওসমান আলী খানের অনুদানে। ভারত স্বাধীন হবার পরপরই তৎকালীন ভারত সরকার হায়দ্রাবাদকে ভারতের সাথে অঙ্গীভূত করে। হায়দ্রাবাদ-এর পাকিস্তান অথবা ভারতের সাথে যোগ দেবার বিষয়টি ব্রিটিশ রাজ সুরাহা করে যায়নি। এটি ছিল স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য। অদ্ভুত মানুষ ছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম 'হিস এক্সলটেড হাইনেস' স্যার ওসমান আলী খান বাহাদুর। ভারতের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন আক্ষরিক অর্থে হাড়কিপটে। ১৯৪০ এর দিকে তার কাছে রক্ষিত নগদ অর্থের পরিমাণ ছিল দুই (২) বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সে সময়ে, ১৯৫০ এ স্বাধীন ভারতের রাজস্ব আয় ছিল এক (১) বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাঁর সম্পত্তির মূল্য আজকের বাজারে দাঁড়িয়েছিল ২২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

হায়দ্রাবাদের এই নিজামের শখ ছিল সর্বশেষ মডেলের রোলস রয়েস গাড়ি কেনার। ভারত কর্তৃক হায়দ্রাবাদ দখলের পর তার রাজমহলের গ্যারেজ হতে প্রায়

www.pathagar.com

২৫টি বিভিন্ন মডেলের রোলস্ রয়েস গাড়ি পাওয়া গিয়েছিল। সিন্দুকে রক্ষিত ছিল নগদ ক্যাশ রুপীর বান্ডিল যার অনেকগুলোই উঁই পোকায় নষ্ট করে ফেলেছিল।[৫]

নিজাম দরওয়াজা পার হবার পর আরেকটু সামনে আরও একটি বড় দরওয়াজা পার হয়ে খাজা গরিব নেওয়াজ দরগাহ-এর মূল চত্বরে প্রবেশ করতে হয়। এর নাম শাহজাহানী দরওয়াজা, এটিই ছিল নিজাম দরওয়াজা তৈরির আগ পর্যন্ত প্রধান ফটক। দরওয়াজাটি তৈরি করে দিয়েছিলেন মোগল সম্রাট শাহজাহান। গেটের উপরে পবিত্র কালেমা শরীফ ইসলামী ঐতিহ্যবাহী ক্যালিওগ্রাফীর মাধ্যমে অঙ্কিত হয়েছিল যা আজও বেশ উজ্জ্বল রয়েছে। এ দরওয়াজাটি অত্যন্ত মূল্যবান কাঠের তৈরির। কাঠের খণ্ডগুলো যুক্ত করা হয়েছে রূপার তৈরি বড় বড় বোল্ট দিয়ে। দরওয়াজার উপরের দু'পাশে বিশাল আকারের দু'টি ঢোল স্থাপিত রয়েছে। মূল দরগা বা মাজারের কাছেই শাহজাহানী দরওয়াজার সামনে রয়েছে আরেকটি দরওয়াজার-এর নাম বুলন্দ দরওয়াজা। এ দরওয়াজাটির উচ্চতার জন্যে এর নাম বলুন্দ দরওয়াজা।

শাহজাহানী দরওয়াজা আর বুলন্দ দরওয়াজার মধ্যবর্তী স্থানে, ডান হাতে, রয়েছে আকবরি মসজিদ। এ মসজিদটি তৈরি করেছিলেন মোগল সম্রাট আকবর। লাল স্যান্ডস্টোনের মসজিদটি নজর কারার মত সুন্দর। প্রতিটি ওয়াক্তে এ মসজিদে মুসল্লীরা নামাজ আদায় করে থাকেন। এখানে পর পর তিনটি মসজিদ রয়েছে, মাজারের পূর্বদিকে, প্রায় একই লাইনে। মাজারের একবারে সংলগ্ন মসজিদটি প্রথমে সুলতান মোহাম্মদ খিলজি✦ তৈরি করেছিলেন যা পরে সংস্কার করেন মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব। সবচাইতে বড় মসজিদটি তৈরি করেছিলেন সম্রাট শাহজাহান। শাহজাহানের অন্যান্য কীর্তির মত এ মসজিদটি সম্পূর্ণ সাদা মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরি, দৃশ্যত মনে হবে দিল্লীর জামে মসজিদের ছোট সংস্করণ। এটাই দরগা প্রাঙ্গণের জামে মসজিদ। এখানে ঈদের জামাতও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মাজার শরিফের পূর্বের দরওয়াজার পাশে অবস্থিত বেগমি দালান। এটি তৈরি করিয়েছিলেন সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহানারা বেগম সাহেবা। আরও রয়েছে 'মেহ্ফিলখানা'। তার সাথেই রয়েছে বিশাল লঙ্গরখানা যেখানে দু'বেলা বিনামূল্যে গরীবদের মধ্যে খাবার বিতরণ করা হয়ে থাকে। পেছনে একটি আচ্ছাদিত ছোট পুকুর। আচ্ছাদনটি তৈরি করে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ রাজ সরকার বৃটেনের রাণী মেরীর স্মরণে। এখন এ পুকুরটি ভিক্টোরিয়া পুকুর নামে পরিচিত। মাজার শরীফের উত্তরে বড় ধরনের উঠোন যেখানে মিলাদ মাহফিল থেকে শুরু করে প্রতিদিন কাওয়ালী পর্যন্ত গাওয়া হয়। আমরা যখন

৫। *Larry Collins and Dominioue lapierre; Freedom at Midnigt'-pp-143-144 Vikas Publications, Delhi.*

✦ *সুলতান মোহাম্মদ খিলজি ছিলেন খিলজি বংশের মালওয়া সালতানাতের প্রথম শাসক (১৪৩৬-১৪৬৯)।*

www.pathagar.com

ওই চত্বরে তখনও কাওয়ালী গাওয়া হচ্ছিল। কাওয়ালীর বড় এবং বিশেষ আসর জমে বৃহস্পতিবার। সেদিন মাজার প্রাঙ্গণে তিল ধারণের জায়গা হয়না।

আমরা হাবিলদার ভৈরব সিং-এর পেছনে পেছনে বুলন্দ দরওয়াজা পার হতেই ডানে এবং বামে দেখতে পেলাম অতি উচ্চে স্থাপিত দু'টি বৃহৎ আকারের তামার তৈরি ডেগ্‌চি। ডান পাশের, পশ্চিম দিকের, বড় ডেগ্‌চিটির নাম 'আকবরি ডেগচি'। এ ডেগ্‌চিতে ঝাল জাতীয় খাবার তৈরি হয়। এর ধারণ ক্ষমতা একশত বিশ মণ (৪,৮০০ কেজি)। এ ডেগ্‌চিটি সম্রাট আকবর তার পুত্র সেলিম (জাহাঙ্গীর)-এর ভূমিষ্ঠ হবার পর স্থাপন করেন। তাজিক-ই জাহাঙ্গীরীতে বর্ণিত আছে যে সম্রাট আকবর তার পুত্রের জন্মের পর আগ্রা হতে পায়ে হেঁটে খাজা গরিব নেওয়াজের দরবারে এসেছিলেন। আকবরী ডেগ্-এর বিপরীতে, পূর্বদিকে, আকারে আকবরি ডেগ্ থেকে একটু ছোট, স্থাপিত রয়েছে 'জাহাঙ্গীর ডেগ্'। সম্রাট জাহাঙ্গীর এটা পাঠিয়েছিলেন মাজারে ভক্তদের খাবার পাক করবার জন্য। এর ধারণ ক্ষমতা ষাট মণ (২,৪০০ কেজি)। এটাতে শুধুমাত্র মিঠা খাবার তৈরি করা হয়। ভৈরব সিং আমাদেরকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে বললে আমরা ফিরতি পথে দেখব বলে মূল মাজার চত্বরে প্রবেশ করে জিয়ারতের জন্য গরিব নেওয়াজের কবরের ধারে রেলিং পর্যন্ত যেতে তৈরি হলাম।

মূল গম্বুজের নিচে 'গরিব নেওয়াজ' চির নিদ্রায় শায়িত। উত্তর দিকের অপেক্ষাকৃত ছোট দরওয়াজা দিয়ে ভৈরব সিং আমাদেরকে প্রবেশ করাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। আমি বারবার আমার সহধর্মিণীকে সামনে রেখে এগুতে গিয়ে চাপের মুখে পিছিয়ে পড়ছিলাম। ওই দরওয়াজা দিয়ে কয়েক ডজন ভক্ত বড় বড় ডেগ্ ভর্তি গোলাপের পাঁপড়ি নিয়ে প্রবেশের সময়ে তাদের পেছনেই ঢুকতে হল। রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে আমি ছহুল সাহেবকে মোনাজাত করতে বললাম। পেছনে ছোট পরিসর, প্রচণ্ড চাপ অনুভব করছিলাম, বহু কষ্টে ভারসাম্য বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। মূল কবরের উপরে গিলাফ চড়ানো। ইতিমধ্যেই কয়েকজন গোলাপের পাঁপড়ি, বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মনোবাসনায় পাঠিয়েছেন, যা সমগ্র কবরকে ঢেকে দিতে কয়েকজন ছিটিয়ে চলছিলেন। এ রকম চলছিল যতক্ষণ আমরা ফাতেহা পাঠে ছিলাম। ছোট্ট কবর আর দরগার মূল ঘরটি গোলাপের সুবাসে ভরে উঠছিল। হঠাৎ মনে হল রেলিং-এর ভেতর থেকে আমার গলায় কেউ একটা কিছু পরাবার চেষ্টা করছে। তাকিয়ে দেখলাম পূর্বে আলোচিত প্রধান খাদেমের প্রতিনিধি আমার গলায় একটা পাগড়ি সদৃশ্য কিছু পেঁচিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। আমি এবং ছহুল সাহেব বারণ করায় তিনি নিবৃত হলেন। আমার ঠিক পাশে একজন যুবককে আরেকজন প্রতিনিধি একটি চাদর দিয়ে ঢেকে উর্দু ভাষায় তার মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য গরিব নেওয়াজের নাম নিয়ে দোয়া চাইছেন। বেশ কয়েকজন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরও রেলিং-এর পাশে মন্ত্র পাঠ করতে

www.pathagar.com

দেখলাম। মাজারের মূল কক্ষে মহিলাদের প্রবেশ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বলেই মহিলাদের বেশির ভাগই বেগমি দালানের পাশে বসে দোয়া দরুদ পড়তে শুনেছিলাম। অনেকে বিলাপ করে কান্নায় রত ছিলেন।

ফাতেহা পাঠ শেষে পুনরায়, প্রায় ধাক্কাধাক্কি করে, আমাদের বের করে নিয়ে আসলেন ভৈরব সিং। তার মাথা আমাদের মত রুমাল দিয়ে আচ্ছাদিত। আমরা বের হয়ে শাহজাহান নির্মিত জামে মসজিদে আছরের নামাজ আদায় করলাম। আছরের জামাত আগেই হয়ে গিয়েছিল। আমার সহধর্মিণী ডা: রেহানা খানম মাজারের দেয়াল ঘেঁষে মহিলাদের নামাজখানায় নামাজ পড়ে নিলেন।

এবার আমাদের ফেরার পালা। গরিব নেওয়াজের মূল মাজারের দু'পাশেই আরও বহু কবর রয়েছে। প্রায়গুলোই সূফী সাধকের পরিবারের সদস্যদের কবর। রয়েছে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতীর (রঃ) মেয়ের কবর। মাজারের পশ্চিম দিকে রয়েছে সম্রাট শাহজাহানের আরেক কন্যা গওহরা আরার কবর। সম্রাট শাহজাহানের বেগম মমতাজ মহল চৌদ্দ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন, যার মধ্যে সাতজনই জন্মের কিছুদিন পর মারা যান। মমতাজ মহল চৌদ্দতম সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। শাহজাদী গওহরা আরা শিশু বয়সেই মারা গিয়েছিলেন।

যেমনটা বলেছিলেন ভৈরব সিং দরগা থেকে বের হবার পথে আমাদেরকে প্রথমে 'জাহাঙ্গীর ডেগ্' দেখাতে স্যান্ডস্টোন দ্বারা নির্মিত সিঁড়ি বেয়ে উপরে নিয়ে গেলেন। ওই ডেগ্চিতে তখন জর্দা পাক করা হচ্ছিল। এ বিশাল ডেগ্চি প্রায় কানায় কানায় পূর্ণ। দু'জন পাচক নৌকার দাঁড়ের মত বিশাল চামচ দিয়ে নাড়া দিচ্ছে। নাকে আসছিল মিষ্টি সুগন্ধ। প্রধান পাচক জানালেন কোন একজনের মনোবাঞ্ছা, যাকে আমরা মানত বলি, পূরণ হয়েছে বলে এক লাখ রুপীর মিষ্টি খাবার গরীবদের মধ্যে বিতরণের জন্য তৈরি করা হচ্ছে। বেশ কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে নিচে নামার পথে দেখলাম নিচে অপর পাশে আগুনে লাকড়ি দেয়া হচ্ছে। 'জাহাঙ্গীর ডেগ্' দেখার পর পশ্চিম পাশে স্থাপিত আকবরী ডেগ্চি দেখতে গেলাম। একই রকম ধাপ বেয়ে প্রায় দ্বিতল সমান উচ্চতায় উঠতে হল। ধাপগুলো ছিল বেশ বড়। উঠতে এবং নামতে বেশ বেগ পেতে হয়, বিশেষ করে আমাদের মত মধ্যম উচ্চতার মানুষের জন্য। উপরে উঠে বিশাল ডেগ্চির ভেতরে দেখলাম। ওই সময় ওই ডেগ্চিতে পাক হচ্ছিল না। উপরে একজন বসা। সোজা করে দাঁড় করানো বিশাল ঢাকনা। ভিতরে উঁকি মেরে দেখলাম প্রচুর টাকার নোট এবং ধাতব মুদ্রা। ভক্তরা ডেগ্চি দেখতে এসে এখানেই দিয়ে যাচ্ছেন যার যার মত করে নজরানা। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। এ ডেগ্চি দেখে উপবিষ্ট একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা পরিষ্কার করা হয় কিভাবে।" উত্তর পেলাম কয়েকজন ভেতরে নেমে সাধারণত এ দু'টি ডেগ পরিষ্কার করে থাকে। ভাবছিলাম দুই সম্রাট, পিতা পুত্রের

www.pathagar.com

কথা। পুত্র জাহাঙ্গীর যে ডেগ্‌চিটি দিয়েছিলেন সেটার মাপ তিনি পিতা কর্তৃক স্থাপিত ডেগ্‌চির চেয়ে ছোট আকারে রেখেছিলেন।

আমরা ডেগ্‌চি দু'টি দেখে মাজার চত্বর ঘুরছিলাম আর ভাবছিলাম সূফী দরবেশদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার কথা যেখানে মহাপ্রভাবশালী সম্রাট, রাজা, নিজামেরা মাথা নত করেছেন। একজন খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (রঃ) এমনই আধ্যাত্মিক উচ্চমার্গে পৌঁছেছিলেন যে তার এবং তাঁর পরের অনেক সূফী সাধকদের দরবারে হাজিরা দেন বর্তমানের ক্ষমতাধর শাসকরাও। ভাবতে অবাক লাগে যে, সম্রাট আকবর পায়ে হেঁটে আগ্রা থেকে আজমীর দরগায়ে এসেছিলেন এই মহান সূফী সাধকের দরবারে ফাতেহা পাঠের জন্যে।

হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি (রঃ) ছিলেন হযরত আলীর পুত্রদ্বয় হযরত ইমাম হোসেন এবং ইমাম হাসানের সূত্রে বংশধর। পারস্য থেকে হিন্দুস্থানে আসবার পূর্বে তিনি মক্কা ও মদিনা শরিফ জিয়ারত করেন। বিভিন্ন সূত্রে লিখিত রয়েছে যে তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাজার জিয়ারতের সময় সালাম দিলে ইসলামের পয়গম্বর রসূল মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উত্তর দিয়েছিলেন। আরও লিখিত পাওয়া যায় যে কোন এক রাতে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (রঃ) নবী করিম হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর হিন্দুস্থানে মানুষকে সঠিক পথে চালিত করবার নির্দেশ পেয়েছিলেন।[৬] তিনি সমরখন্দ এবং বোখারাতে ধর্মের উপরে শিক্ষা নিয়ে হযরত খাজা ওসমান হারুনী (রঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আজমীরে আসার পথে লাহোরেও অনেকদিন কাটিয়েছিলেন। দিল্লীতে হযরত খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি (রঃ)-এর সাথে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন।

হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (রঃ) সহ উপমহাদেশের অন্যান্য সূফী সাধকরা সমভাবে সকল ধর্মের মানুষের কাছে সহস্র বছর ধরে সমাদৃত হয়ে আসছেন। এর একমাত্র কারণ আল্লাহ্‌র প্রেমে এবং তার সৃষ্টিকে ভালবাসার মূল মন্ত্র প্রচারের জন্য। খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (রঃ) এর দরবারে দিল্লীর মুসলমান শাসক হতে রাজস্থান তথা হিন্দুস্থানের হিন্দু ধর্মেরও শাসকরা জিয়ারত করতে এসেছেন। এসেছিলেন ইংরেজ শাসকরাও। আজও আসছেন উপমহাদেশের তথা বিশ্বের অন্যান্য দেশের শাসকবৃন্দ। এসব মহৎ আত্মা সূফী দরবেশরা পেরেছেন জাতি, ধর্ম, বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে অতি মানবে পরিণত হতে। সে কারণে গত প্রায় ৮০০ বছর অগণিত ভক্তদের নিরবচ্ছিন্ন আগমন ঘটছে এই সব সূফী সাধকদের দরবারে। এমন দৃশ্য বর্তমান উপমহাদেশের কোন শক্তিশালী ইতিহাসখ্যাত রাজা, বাদশাহ, রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রীদের সমাধিতে

৬। *'আঞ্জুমান মঈনিয়া ফখরিয়া চিশতিয়া খাদ্দাম খাজা সাহেব সৈয়দ জাজাগান দরগাহ্ শরিফ আজমীর' প্রকাশিত পুস্তিকা।*

www.pathagar.com

কখনোই দৃশ্যমান নয়। মানুষকে ভালবাসা আর সত্যের পথ দেখাতে গিয়ে ন্যায়-নীতি থেকে বিচ্যুত হয়নি বলেই অতি সাধারণ জীবন-যাপন করা অতি সাধারণ মানুষ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকে হয়ে উঠতে পারেন ব্যাপক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বে। প্রয়োজন হয় না তলোয়ারের প্রয়োজন হয় না পিতৃ হত্যার অথবা ভ্রাতৃ হত্যার অথবা বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করবার মত অমানুষিক কাজের। আমরা এ সব আধ্যাত্মিক সাধকদের মাজার অতি ভক্তির সাথে জিয়ারত করি। কষ্ট স্বীকার করি কিন্তু আমরা কতজন তাঁদের দেখানো পথে চলতে চেষ্টা করি? হয়ত মোটেও না।

আমরা দরগা থেকে বের হয়ে দরগার পুলিশ কর্মকর্তা হাবিলদার ভৈরব সিং আর ইন্সপেক্টর রাম শর্মা এবং মাজারের প্রধান খাদেমের প্রতিনিধিকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলের উদ্দেশে যখন রওয়ানা হলাম, তখন সূর্য পশ্চিমের পাহাড়ের পেছনে চলে গিয়েছিল। গাড়িতে বসে ছহুল সাহেবকে পুলিশ সুপারের সাথে যোগাযোগ করবার জন্য আরেক প্রস্থ ধন্যবাদ জানালাম। দিনটি শুক্রবার বলেই দরগাতে এত ভিড় আর পুলিশের সহযোগিতা না পেলে আমাদের পক্ষে মাজার জিয়ারত করাই অসম্ভব হয়ে পড়তো। ছহুল সাহেব পরে পুলিশ সুপারকে মোবাইল ফোনে ধন্যবাদ জানালেন। আমাদের পক্ষ থেকে সকল সহযোগিতার জন্য তাকে এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাদেরকেও ধন্যবাদ জানালেন।

আমরা হোটেলে ফিরে মাগরেবের নামাজ পড়ে অতি নিকটের শহর পুসকার এ যাবার এবং একই সাথে রাতের আহারের জন্য যখন বের হলাম– তখন রাস্তার সোডিয়াম বাতি জ্বলে উঠেছে। 'আন্না সাগর' লেকের পশ্চিমে আড়াভাল্লী পাহাড়ের পাদদেশে আজমীর শহরের একাংশকে দেখে মনে হচ্ছিল আকাশ বহু নিচে নেমে এসেছে। চিকমিক করছে হাজার হাজার নক্ষত্র। এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

www.pathagar.com

আট

দিল্লীর পথে

আমরা যখন পুসকারের পথে রওয়ানা হলাম তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আমাদের চালক সত্যপ্রকাশ জানালেন যে, পুসকার হ্রদের পাশেই রয়েছে হিন্দু ধর্মের বিশ্বের একমাত্র ব্রহ্মা✦ মন্দির। পুসকার শহর আজমীর থেকে মাত্র পনের কিলোমিটার দূরে আড়াভাল্লী পাহাড়ের অপর প্রান্তে। পুসকার সম্বন্ধে পূর্বে যৎসামান্য উল্লেখ করেছিলাম। পুসকার আজমীর জেলার আরেকটি অন্যতম বিখ্যাত শহর।

সত্যপ্রকাশ গাড়ি নিয়ে পুসকারের রাস্তায় উঠার পর কিছুদূর যেতেই আমরা পাহাড় পার হয়ে গিরিপথে উঠলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পাহাড়ি পথটিও তেমন প্রশস্ত নয়। অপরদিক হতে হাই বীমে বহু ট্রাক আর বাস পাহাড়ি পথ ধরে আজমীরের দিকে যাচ্ছে। ক্রমেই অন্ধকার হয়ে আসছে। সত্যপ্রকাশ অতি উৎসাহ নিয়ে ব্রহ্মা মন্দির দেখাতে আমাদের নিয়ে যাচ্ছিলেন। হিন্দু ধর্মমতে ব্রাহ্মই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের জন্মদাতা। আমার এ এডভেঞ্চার বোধহয় আমার সহযাত্রীর তেমন পছন্দ হচ্ছিল না। পাহাড়ের আরও উপরের দিকে উঠে বাঁয়ে নিচে দেখছিলাম সম্পূর্ণ আজমীর শহরটি আর মাঝখানে বিশাল আন্নাসাগর লেকের সন্ধ্যা ছায়ায় কালো জলরাশি।

প্রায় আধাঘণ্টা চলবার পর আমরা পুসকার শহরের প্রবেশমুখে আসতেই পুলিশ চেকপোস্টের পাশে দাঁড়াতে হল। সত্যপ্রকাশ গাড়ির নম্বর, গন্তব্য স্থান ইত্যাদি লেখাচ্ছিলেন। ওই সময়ে কয়েকজন সুঠামদেহী যুবক এসে ব্রাহ্ম মন্দির দেখাবার গাইড দরকার কিনা জিজ্ঞেস করাতে প্রয়োজন নেই বলে জানালাম। মাত্র ৩০ রুপীতে একজন গাইড নিতে পীড়াপীড়ি করলেও আমরা নিতে চাইলাম না। ভাবলাম এখানেও আবার পাণ্ডাদের উপদ্রব।

চেকপোস্ট থেকে বের হয়ে সত্যপ্রকাশ পুসকার হ্রদ ধরে শহরের মধ্যে প্রবেশ করবার মুখে বিশাল এক আলোকিত স্তম্ভের মধ্যে রামায়ণের প্রধান চরিত্রগুলোর প্রতিকৃতি দেখতে পেলাম। সবার নিচে যে চেহারার প্রতিকৃতিটি ক্ষোদিত রয়েছে তার পরিচয় সত্যপ্রকাশ দিলেন। তিনি মহাঋষি বাল্মিকী। আমি মহাভারত অথবা রামায়ণ

✦ *ব্রহ্মার হাত থেকে একটি পদ্ম পড়ে যাওয়ার পর পুসকার হ্রদের সৃষ্টি হয়। এখানে স্ত্রী সাবিত্রী আসতে চায়নি বলে ব্রহ্মা দ্বিতীয় বিয়ে করলে সাবিত্রী বলেছিলেন ব্রহ্মার পূজা এখানে ছাড়া আর কোথাও হবে না। তাই এটি একমাত্র ব্রহ্মা মন্দির।*

www.pathagar.com

সম্বন্ধে খুব জ্ঞান রাখি না। তবে বহু পূর্বে কিছু কিছু পড়েছিলাম। ওইটুকুই যা জ্ঞান। যতদূর জানতাম তা হল যে, মহাঋষি বাল্মিকী রামায়ণ রচনা করেছিলেন। মহাঋষি বাল্মিকীকে অনেক সাহিত্যিক 'প্রাচ্যের হোমার' বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। সম্পূর্ণ স্তম্ভে রামায়ণের রাম-সীতা বন্দনায় হনুমানকে দেখানো হয়েছে।

বাল্মিকীর স্তম্ভ পার হতেই পুসকার শহরে আসলাম। প্রায় অন্ধকার রাস্তাঘাট ফাঁকা। হঠাৎ গাড়ির পাশে একটি মোটর সাইকেলে পুলিশ চেকপোস্টে দেখা এক যুবক, বেশভূষায় পাণ্ডার মত মনে হল, জোরে জোরে গাইড নেবার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করল। জিপ অনুসরণ করে সামনে পেছনে মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরছিল। এ দৃশ্য এবং ওই যুবকের বেশভূষা দেখে আমাদের মৃদু আলাপী সত্যপ্রকাশও ভড়কে গিয়ে আমতা আমতা করছিলেন। অতঃপর অবস্থা বেগতিক দেখে এবং অচেনা, অজানা আতঙ্কে সত্যপ্রকাশ আতঙ্কিত হলেন। আমরা পুসকার ত্যাগ করে আজমীরের পথে ফেরত যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। পুসকারে ব্রহ্মা মন্দির এবং পুশকার হ্রদ আমাদের আর দেখা হলনা। সত্যপ্রকাশও আমাদের নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় যেতে চাইলেন না। বললেন, "এমন অবস্থায় রাতে যাওয়া ঠিক মনে হচ্ছে না। কারণ, এর ভাবগতি ভাল লাগছেনা। আমি বরং আপনাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই"। ছহুল সাহেব এমনিতেই রাতে পুসকার যেতে চাইছিলেন না। তিনি সত্যপ্রকাশের সাথে সুর মিলিয়ে বললেন,"ফিরেই চলুন"। ছহুল সাহেব আর সত্যপ্রকাশকে সমর্থন দিলেন আমার সহধর্মিণী। অগত্যা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকেই মেনে নিতে হল।

আমরা পুসকার ছেড়ে আজমীরে এক রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে চলে আসলাম। পরের দিন সকালে, মে ৯, ২০০৯-এ, আমরা সড়কপথে দিল্লীর উদ্দেশ্যে আজমীর ত্যাগ করব। আজমীর-দিল্লীর দূরত্ব প্রায় পাঁচশত কিলোমিটার। আজমীর থেকে জয়পুর বাইপাস হয়ে দিল্লী যেতে হবে। সময় লাগবে প্রায় ছয় ঘণ্টা। সাব্যস্ত করলাম সকাল ৯টার মধ্যেই আমাদের হোটেল ত্যাগ করতে হবে। হোটেলে এসে পুসকার না দেখার আফসোস করছিলাম। হোটেলে বসে পুসকার সম্বন্ধে কিছু জানবার চেষ্টা করে কিছুটা জানতে পারলাম মাত্র।

পুসরকার বৈদিক ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ শহর। কবে গোড়াপত্তন হয়েছিল সঠিক কেউ বলতে পারে না। পুসকার আর ব্রহ্মা মন্দির সম্পূর্ণটাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস। বলা হয়ে থাকে ৬০,০০০ বছর পূর্বে ব্রহ্মা এ শহর তৈরি করেছিলেন রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করার জন্য। রামায়ণে পুসকার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে বিশ্বমিত্র এখানে তপস্যা করেছিলেন। রামায়ণে আরও উল্লেখ রয়েছে যে হয়ত পুসকার হ্রদেই মেনকা এসেছিলেন পবিত্র জলে স্নান করতে। উল্লেখ্য যে, পুসকার হ্রদের চারপাশে চারটি মন্দির রয়েছে। রয়েছে ৫২টি ঘাট। এ হ্রদের জলে স্নান করা

www.pathagar.com

মহাপুণ্যের কাজ বলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন। মহাভারতে পুসকারে মহারাজা যুধিষ্ঠিরের আগমন এবং স্নান করবার বিষয়েও উল্লেখ রয়েছে। 'পুরাণ' এ উল্লেখ আছে যে প্রহল্লাদ পুসকারে প্রার্থনা করতে এসেছিলেন। এত সবের কারণেই রাজস্থানের এ ছোট্ট শহরটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পাঁচটি পুণ্যভূমির মধ্যে অন্যতম পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত। এর গুরুত্ব অনুধাবন করেই পুসকার 'তীর্থস্থানের রাজা' বা 'তীর্থরাজ' আখ্যায় আখ্যায়িত হয়েছে। পুরসকারে প্রতি বছর আয়োজিত হয় বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম পশুর, বিশেষ করে উটের, মেলা।

আমি পুসকার-এর দর্শনীয় স্থানগুলো দেখবার সুযোগ পেলাম না বলে আফসোস করা ছাড়া কিছুই করতে পারলাম না। তবুও মনকে আশ্বস্ত করলাম যে আমার ভ্রমণ কাহিনীতে পুসকার, রাজস্থান, সম্বন্ধে যৎসামান্য লিখতে পারব।

পরের দিন সকাল ৯ টায়, মে ৯, ২০০৯, আমরা দিল্লীর পথে আজমীরের হোটেল মান সিং ত্যাগ করলাম। ফিরতি পথেও এনএম-৮ ধরেই আমাদেরকে জয়পুর পর্যন্ত যেতে হবে। জয়পুর বাইপাস করে এনএম-৮ ধরে উত্তর পূর্ব দিকে মোড় নিয়ে এই মহাসড়ক দিল্লীর উপকণ্ঠে পৌঁছাবে। আমাদের জীপটি আন্নাসাগর পার হয়ে আজমীর ছেড়ে এনএম-৮ এ উঠে জয়পুরের দিকে রওয়ানা হল। প্রায় আধাঘণ্টা লেগেছে আজমীর শহর ছাড়তে। শহরে তেমন ভিড় ছিল না বলেই আমরা তাড়াতাড়ি বের হতে পারলাম। আজমীরের 'আড়াভাল্লী' পাহাড় পার হয়ে যখন মহাসড়কে আমাদের জিপ উঠল, তখন বাতাস ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল। ক্রমেই আজমীর শহরকে পেছনে রেখে আমরা দিল্লীর পথে অগ্রসর হচ্ছিলাম।

আজমীরের ইতিহাস হিন্দুস্থানের অন্যসব ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সাথে একই সূত্রে গাঁথা। পুসকারের এত কাছে হবার পরও আজমীর পুসকারের মত পৌরাণিক শহর হিসেবে পরিচিত নয়। পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়ের পর দিল্লী সালতানাত আজমীরের আভ্যন্তরীণ শাসনের ভার বিপুল অর্থের বিনিময়ে চৌহানদের কাছেই ফিরিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে ১৩৬৫ পর্যন্ত জায়গীরদারি প্রথায় আজমীর শাসিত হয়ে আসছিল। আজমীর ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দে মেওয়ারদের শাসনে চলে আসে। মেওয়ারদের হাতে থাকে ১৫৫৯ পর্যন্ত। ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে আজমীর প্রথমবারের মত মোগল রাজত্বের অংশে পরিণত হলেও প্রায়শই বিদ্রোহ ঘটত। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে মারাঠারা আজমীর দখল করে নেয়। ১৭৭০ থেকে ১৮১৮ পর্যন্ত আজমীর নিয়ে মারাঠা আর মেওয়ারদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে মারাঠীরা ৫০,০০০ রুপীতে আজমীরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে বিক্রয় করেছিল। ১৮৫৭ খ্রস্টাব্দে আজমীর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে 'সিপাহী' বিদ্রোহের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এর পর হতে ১৯৪৭ পর্যন্ত আজমীর রাজপুতানার (বর্তমানে রাজস্থান) বাইরে আলাদাভাবে শাসিত হতো।

www.pathagar.com

ভারতের স্বাধীনতার বহু বছর পর আজমীর পুনঃগঠিত রাজস্থান রাজ্যের অংশে পরিণত হয়।[১]

আমরা প্রায় বেলা ১১টার দিকে জয়পুর-বাইপাস হয়ে উত্তর দিকে দিল্লীর পথে এনএম-৮ দিয়ে অগ্রসর হলাম। জয়পুর-বাইপাস ছাড়ার পর হতে মহাসড়কটি আট লেনের বদলে ছয় লেনে নেমে আসল। কোথাও কোথাও এখনও চার লেন রয়ে গেছে। তবে এ রাস্তা সম্প্রসারণ হচ্ছে। আমাদের চালক সত্যপ্রকাশ বিশুদ্ধ নিরামিষভোজি, আমাদের জানালেন যে জয়পুর-আজমীর সড়ক বিজেপি-এর সময় পুনঃ নির্মিত হয়েছিল। রাস্তার এ অংশটি এখনও শেষ হয়নি। তার মতে সর্বভারতে হালের রাস্তা ঘাটের উন্নতির পেছনে বিজেপি-এর অবদান রয়েছে। তার কথায় মনে হল সত্যপ্রকাশ একজন হিন্দুবাদী এবং বিজেপির একনিষ্ঠ সমর্থক। রাস্তার এ অংশে প্রচুর ট্রাফিক, বিশেষ করে আট চাকার ট্রাক এবং ট্রেইলারই বেশি। যাত্রীবাহী বাসের সংখ্যাও কম নয়। আজমীর হতে ফেরার পথে আজমীর-জয়পুর-দিল্লীর পথে দোতলা বাসের উপর তলায় ট্রেনের কুপের মত শোবার বন্দোবস্ত প্রত্যক্ষ করলাম। এ ধরনের বাস আমি এই প্রথম দেখলাম। সত্যপ্রকাশ জানালেন যে ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে এ ধরনের বাস চলাচল করে। তবে বাসের একজন যাত্রী কত নিরাপদে বা কত আরামে নিদ্রাতে যেতে পারেন তা ভাববার বিষয়।

জয়পুর-দিল্লীর রাস্তার দু'পাশ তেমন অনাবাদী নয় যেমনটা আমরা জয়পুর আজমীরের রাস্তার দু'পাশে দেখেছি। যথেষ্ট চাষাবাদযোগ্য জমি রয়েছে এ এলাকায়। অপেক্ষাকৃত সবুজের সমারোহ চোখে পড়ছিল। সত্যপ্রকাশ তথ্য দিলেন যে আমরা হরিয়ানার একপ্রান্ত দিয়ে যাব, যেখান হতে তার বাড়ি বেশ নিকটে। হরিয়ানা কাছে বলেই হয়ত এ অঞ্চলে সবুজের সমারোহ। জয়পুর ছাড়িয়ে প্রায় এক ঘণ্টার উপরে গাড়ি চালিয়ে আমরা শাহপুরা নামক ছোট একটি উপশহরে থামলাম চা পান করব বলে। আশেপাশে তেমন কোন স্থান না পেয়ে আমি একচালা এক 'ধাবাতে'✦ গিয়ে চায়ের জন্য বসে পড়লাম। ধাবার মালিকের বিস্ফারিত চোখের দৃশ্যপটের মধ্যে বসেই চা পান করে পুনরায় যাত্রা শুরু করলাম।

হাইওয়ের সমান্তরালে রেল লাইন। তবে যেখানে রেল লাইন ক্রসিং রয়েছে সেখানে ওভারব্রিজ তৈরি করা ছিল–কাজেই কোথাও যাত্রা ব্যাহত হয়নি। যাত্রা ব্যাহত না হলেও প্রায় তিন জায়গায় টোল আদায় করতে হয়েছে, যে কারণে যাত্রায় বেশ কিছু বাড়তি সময় লেগেছে। সত্যপ্রকাশ জানালেন জয়পুর-আজমীর একবার টোল দিতে

১। *Encylopaedia Britannica, Eleventh Edition.*

✦ *রাস্তার পাশের একচালা সস্তা খাবার দোকানগুলোকে ধাবা বলা হয়। এগুলো দূরপাল্লার ট্রাক ড্রাইভারদের পছন্দনীয় খাবার ও বিশ্রামের স্থান।*

www.pathagar.com

হয়েছে আর দিল্লী পর্যন্ত দিতে হবে চারবার প্রায় ৭০০ হতে ৮০০ রুপীর মত প্রতি টোল প্লাজায়। বড় গাড়ির টোল গুনতে হয় আরও বেশি।

আমাদের হিসেবে দিল্লীতে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌছবার আনুমানিক সময় ছিল বিকেল তিনটার মধ্যে; কিন্তু আমরা পৌছলাম সন্ধ্যা ছয়টায়। কারণ দিল্লীর কাছাকাছি এসে মহাসড়কের একপাশে একটি বৃহৎ আকারের ট্রাক দুর্ঘটনায় পড়লে রাস্তা বন্ধ হয়ে প্রায় দশ কিলোমিটার জ্যাম তৈরি হলে ওই ট্রাক না সরানো পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। মহাসড়ক বিভাগীয় পুলিশের কাছে যে ধরনের যন্ত্রপাতি ছিল তা দিয়ে এতবড় ট্রাক উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। মহাসড়কের উন্নতির সাথে উন্নত ট্রাফিক কন্ট্রোল ব্যবস্থায় হাইওয়ে পুলিশ পিছিয়ে রয়েছে বলে মনে হল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আটকে থাকার পর যখন আমরা দিল্লীর উপশহর গুড়গাঁওয়ের সেক্টর-৩৫ এ পৌঁছলাম তখন বিকেল চারটা। দুপুরের খাওয়া ঠিকমত হয়নি। গুড়গাঁওয়ের গ্যাস ফিলিং স্টেশনের ফাস্টফুডের দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে দিল্লীর লাজপৎ নগর হয়ে আমার গন্তব্যস্থল বসন্ত বিহারের মাসফি বিনতে সামস এর বাসায় যে সময়ে পৌছলাম তখন বিকেল পাঁচটা। আমাকে আর আমার সহধর্মিণীকে নামিয়ে ছহুল সাহেবকে একটি রেস্ট হাউসে নিয়ে যাবার কথা। মাসফির ছোট নাম, শম্পা। আমরা ওকে ওই নামেই ওর ছোটবেলা থেকে ডাকছি।

ইতোমধ্যেই ছহুল সাহেব জানালেন পরের দিন, মে ১০, ২০০৯-এ আমাদের আগ্রা যাবার কথা থাকলেও তিনি যেতে পারছেন না। কারণ, তাকে পারিবারিক কারণে জরুরি ভিত্তিতে ঢাকা পৌছতে হবে। অগত্যা তিনি পুনরায় এয়ার টিকেট পরিবর্তন করলেন। কিন্তু দিল্লী-আগ্রা শতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকেটটি আমার কাছেই রয়ে গেল। ওটা কম্পিউটার টিকিট এবং পরিবর্তনের অথবা বাতিলের প্রক্রিয়া অল্প সময়ে সম্পন্ন করা যাবে না বলে জানালাম। টিকেট অবশ্য শম্পার সাহায্যেই হাইকমিশনের প্রটোকল অফিসার আমাদের জন্য অগ্রিম নিয়ে রেখেছিলেন। অগত্যা ছহুল সাহেবকে বিদায় জানিয়ে পরের দিন সকাল ৬-৩০ মিনিটে দিল্লী থেকে আগ্রা এবং একই দিনে সন্ধ্যায় আগ্রা-দিল্লী ফিরতি ট্রেনে ভ্রমণের মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাতের খাবার আগেভাগে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। আগামী দিন চারেক আমরা যে শম্পার বাসা বসন্ত বিহারেই থাকব সে কথা আগেই বলেছি।

যেমনটা বলেছি শম্পার সাথে আমার আর আমার সহধর্মিণীর পরিচয় প্রায় ৩৯ বছরের। শম্পা তখন অনেক ছোট। জনাব শামসুদ্দোহা সাহেবের তিন কন্যার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। দোহা সাহেব তখন লাহোরে পাকিস্তান রেলওয়ের কারিগরি বিভাগের একজন বড়সড় কর্মকর্তা। পেশায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। দোহা সাহেবের স্ত্রী মিসেস মমতাজ বেগম অত্যন্ত অমায়িক হাস্যোজ্জ্বল এবং স্নেহময়ী একজন আদর্শ

www.pathagar.com

গৃহিণী ছিলেন। মাত্র বছরখানেক আগে তিনি মারা গেছেন (আল্লাহ তাকে বেহেশত নছিব করুন)। আমার সাথে দোহা পরিবারের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়েছিল অনেকটা আকস্মিক এবং কিছুটা নাটকীয়ভাবে।

আমি তখন লাহোরে চাকরিরত তরুণ ক্যাপ্টেন। বোধকরি ১৯৭০-এর প্রথম দিকে। অফিসার্স মেসে থাকি। রোজার সময়ে সেহরী ছাড়া মেসে খাবার পরিবেশন হত না, তবে ইফতার পাওয়া যেত প্রচুর পরিমাণে সাথে সন্ধ্যা রাতের খাবারও। আমাদের মত ওই সময়ে যারা রোজায় নিয়মিত ছিলেন না সময়টা তাদের জন্য বেশ কষ্টকর ছিল। তেমনি ছিল ঈদের দিন। ঈদের দিন সকালের নাস্তার পর মেস বন্ধ থাকত। খাবার পরিবেশনার কোন ব্যবস্থাই রাখা হতো না।

এমনই অবস্থায় ওই বছরের রোজার ঈদে আমার আর আমার আরেক সহকর্মী বঙ্গ সন্তান, তৎকালীন ক্যাপ্টেন মোতাহারের দুপুরে দাওয়াত ছিল আমাদের সিনিয়র (মরহুম) মেজর আখতার হেসেন-এর বাসায়। পুরো সকাল আমরা দু'জন হেথায় হোথায় আড্ডা মেরে যখন আখতার হোসেন সাহেবের বাসায় পৌঁছলাম, তখন জানলাম যে তিনি সপরিবারে লাহোর সেনানিবাস সংলগ্ন ওয়ালটন রেলওয়ে অফিসার্স কোয়ার্টারে জনাব মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা সাহেবের বাসায় দাওয়াত খেতে গেছেন। আমাদের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ছিল যে, যেহেতু আমরা যার বাসায় দাওয়াত খেতে এসেছি তিনি আরেক জায়গায় দাওয়াত খেতে গিয়েছেন- সেহেতু আমরাও ওই বাড়িতে দাওয়াতী, হোক না অচেনা। অবাঙালির দেশে বাঙালি আমরা সবাই আত্মীয়। যে কথা সে কাজ। কিছুটা খোঁজ নিয়ে সোজা জনাব দোহা সাহেবের বাড়িতে দুই ব্যাচেলর তরুণ অফিসার হাজির।

আমাদের দেখে মেজর আখতার সহাস্যে পরিচয় করিয়ে দিলে আমরা আমাদের আগমনের হেতু জানালে দোহা পরিবার আমাদের এমনভাবে আপ্যায়ন করলেন যে, মনেই হয়নি এটি আমাদের প্রথম পরিচয় বা আমরা অনাহুত মেহ্মান। সেই থেকে তিনি আমার বড় ভাইয়ের মত, দোহা ভাই। আর বেগম দোহা? অমন অমায়িক স্নেহময়ী মৃদুভাষিণী মহিলা সচরাচর চোখে পড়েনি। দোহা সাহেবের মেয়ে তিনটির সাথে আমার সম্পর্ক চাচা-ভাতিজী, আমি ওদের আঙ্কেল। ওইদিকে আমার সহধর্মিণী ডাঃ রেহানা লাহোরে মেডিক্যাল কলেজে পড়া অবস্থা থেকেই দোহা কন্যাদের বড় বোন হিসেবে পরিচিত। জনাব দোহা সাহেব আমার বিয়ের সময় আমার উকিল বাপ হয়েছিলেন। দোহা সাহেবের মেয়েদের কাছে আমি চাচা আর সহধর্মিণী বড় বোন এ ধরনের আত্মীয়তার প্রেক্ষাপট অনেকের ধারণার বাইরে। দোহা সাহেবের দু'টি মেয়ে

www.pathagar.com

আমেরিকাতে বসবাস করছে। ছোট মেয়ে আমাদের সবার একটু বেশি আদরের, বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা। এ পর্যন্ত দিল্লীতে পলিটিক্যাল কাউন্সিলর ছিলেন। বাবা মা শম্পার কাছেই ছিল। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা দোহা সাহেব মেয়ের সাথেই আছেন। দোহা সাহেবের বয়স হলেও তিনি আগের মতই প্রাণবন্ত রয়েছেন। যে কয়টা দিন শম্পার বাসায় ছিলাম এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়নি আমরা আমাদের পরম আত্মীয় ছাড়া অন্য কোথাও আছি। দোহা সাহেবদের মত মানুষের আজ বড় অভাব। যতদিন দোহা সাহেব আর শম্পার সাথে আমরা কাটিয়েছি প্রায় প্রতিদিনই বেগম দোহার অনুপস্থিতি দারুণভাবে অনুভব করেছি। দোহা ভাই সব সময়ই প্রিয় পত্নীর কথা মনে করেন। এ পরিবারের অমায়িকতার কথা আমরা কোনদিন ভুলিনি।

www.pathagar.com

নয়

আগ্রার পথে

মে ১০, ২০০৯। খুব ভোরে উঠে সকাল পাঁচটার মধ্যে আমরা তৈরি হয়ে পড়লাম। সকাল সাড়ে পাঁচটায় আগ্রার উদ্দেশে দিল্লী সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছতে হবে। স্টেশনে খুঁজে বের করতে হবে 'শতাব্দী' এক্সপ্রেসের জন্য নির্ধারিত প্ল্যাটফরম। শতাব্দী এক্সপ্রেস দিল্লী ছাড়বে সময় সকাল ৬:৩০ মি. এবং আগ্রা পৌঁছবার নির্ধারিত সময় সকাল ৮:৩০ মি.। ফিরতি পথে আগ্রা থেকে সন্ধ্যা ৮টায় আর দিল্লী পৌঁছবে রাত ১০টায়। আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দেবার এবং রাতে বাসায় নিয়ে আসবার সকল বন্দোবস্ত করে রেখেছিল শম্পা। সকালেই শুনলাম ছহুল সাহেব ওই দিন ১০টায় ঢাকা ফিরে যাচ্ছেন। এবারে ওনার আগ্রা আর তাজমহল দেখা হলো না বলে আফসোসই করছিলেন।

দিল্লীর পথে ঢাকা ছাড়ার আগেই আমরা দু'জন আজমীর এবং দিল্লী পর্যন্ত এক সাথে থাকব তেমনটাই পরিকল্পনা করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন "জয়পুর যাব আজমীর যাব না, দিল্লী যাব আগ্রার তাজমহল দেখব না তা কিভাবে হয়"। কিন্তু তিনি পারিবারিক কারণে দিল্লীতে একদিন থাকতে পারলেন না। অবশ্য একদিনের ছুটি তিনি নিয়ে রেখেছিলেন, আমরা আগ্রা ভ্রমণে তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করলাম।

বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামছুল হুদার সাথে আমার পূর্ব পরিচয় থাকলেও মিঃ ছহুল হুসাইন-এর সাথে নির্বাচন কমিশনে যোগদানের পরেই আমার পরিচয়। একসাথে প্রায় তিন বছর (এ লেখা পর্যন্ত) কাটালাম। ভদ্রলোক অমায়িক এবং অত্যন্ত বন্ধুবৎসল মানুষ। ভারত সফরসহ আমরা একসাথে তিনবার দেশের বাইরে ভ্রমণ করেছি। প্রতি ভ্রমণেই আমরা এক সাথেই যেখানে যাবার গিয়েছি। কাজেই হঠাৎ করে তাঁর ঢাকায় ফেরত যাওয়ার কারণে আগ্রা সফরকালে তাঁর অনুপস্থিতিতে মনে হল থাকলে হয়ত ভালই হত। তবে তাঁর টিকেট নিয়ে আসার যে অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা হল সেটা তিনি উপস্থিত থাকলে হত না আর আমার লেখার বিষয়ও হত না।

আমি আগেই জয়পুর থেকে মিঃ হরি সিং সেখাওয়াতের মাধ্যমে আগ্রায় ঘুরবার জন্যে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এসি ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করে রেখেছিলাম তার এক পরিচিত কার রেন্টাল আর ট্যুর (Tour) গাইড কোম্পানি হতে। সেখাওয়াত নিশ্চয়তা দিয়েছিল

www.pathagar.com

যে এ সময়ের মধ্যে ফতেহপুর সিক্রি✦ ছাড়া আগ্রার বাকি দর্শনীয় স্থান দেখতে কোন অসুবিধা হবে না। ট্যাক্সি চালক স্ব উদ্যোগেই এ সব জায়গায় নিয়ে যাবে।

আমি এখন সম্পূর্ণ পর্যটকের বেশভুষায়। কাঁধে ব্যাগ। ব্যাগে ক্যামেরা, মোবাইল, স্যান্ডেল, তোয়ালে, সাবান, চিরুনী আর কয়েকটি গেঞ্জি এবং সহধর্মিণীর কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। সাথে ছোট কাপড়ের ব্যাগ যার মধ্যে ক্যামেরা আর পানির বোতল বহন করা যায়। কারণ, পানির বোতল ছাড়া ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর চত্বরে যে কোন ধরনের খাবার বহন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একই সাথে আমাদেরকে শম্পা বলেছিল তাজমহল-এ প্রবেশ মূল্য ভারতীয়দের জন্য ২০ রুপী আর বিদেশীদের জন্য ৭৫০ রুপী। অন্যান্য জায়গায় বিদেশীদের জন্য ২৫০ রুপী আর ভারতীয়দের জন্য ১০ হতে ২০ রুপী। এসবই শম্পার পাওয়া ভ্রমণ তথ্য। শম্পা আরও বলেছিল সার্কভুক্ত দেশের পর্যটকদের জন্য প্রবেশ মূল্য ভারতীয়দের সমান করবার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার মানলেও উত্তর প্রদেশ সরকার কমপক্ষে ২৫০ রুপীর নিচে রাজি হয়নি। শম্পাও সঠিক বলতে পারছিল না যে, ওই সিদ্ধান্ত আদৌ কার্যকর হয়েছে কিনা। তবুও সে আমাদেরকে পাসপোর্ট নিয়ে যেতে বললে আমরা পাসপোর্টও সাথে নিলাম। সাথে নিলাম আমাদের জাতীয় পরিচয়পত্র। বিদেশে পর্যটনের উদ্দেশ্যে গেলে প্রতিটি পয়সা মূল্যবান হয়ে উঠে। কোন এক পর্যটকের ভ্রমণ কাহিনীতে পড়েছিলাম বিদেশে একমাত্র পকেটের টাকাই পর্যটককে সচল রাখতে পারে। কাজেই ৭৫০ রুপী থেকে প্রবেশ মূল্য যত কমই হোক না কেন সে সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি।

আমরা দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনে পৌছলাম। আমি উপমহাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে গিয়েছি, ট্রেনেও সফর করেছি কিন্তু রেলওয়ে স্টেশনে এত মানুষের ভিড় দেখিনি। এত যাত্রী যে দিল্লীর এত বড় রেলওয়ে স্টেশনেও জায়গা সংকুলান সম্ভব হচ্ছিল না। দিল্লীর রেলওয়ে স্টেশনে প্রবেশ করে জন মাস্টারস্-এর উপন্যাস 'বাওয়ানী জংশন'-এর কথা মনে পড়ে গেল। প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে শোয়া বসা মানুষ। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার কিচির মিচির। সাথে মোবাইলে উচ্চস্বরে কথোপকথন। বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন স্থান হতে ট্রেনের আগমন অথবা বিভিন্ন গন্তব্য পথে ট্রেন নির্গমনের বার্তা মাইকে ঘোষিত হচ্ছিল অনবরত। প্রতিটি ঘোষণার সাথে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয় যাত্রীদের। একই সাথে শুরু হয় কুলীদের তৎপরতা। অনেকে দেরিতে বুঝতে পারেন যে তিনি অথবা তাঁরা ভুল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন। শুরু হয় প্ল্যাটফরম খুঁজে বের করতে ঊর্ধ্বশ্বাসের দৌড়। আসলে এ ধরনের রেলওয়ে স্টেশন এক বিচিত্র জায়গা। সকল প্রকার চরিত্রের মানুষের দেখা পাওয়া যায়। এ ধরনের এত বড় স্টেশনে, বিশেষ করে উপমহাদেশের ব্যস্ততম জংশনগুলোতে, আঞ্চলিক বৈচিত্র্য আর আচার আচরণ প্রত্যক্ষ করতে করতে অনেক সময় কাটানো যায়। ভারতের এ সব জংশনের নিত্যকার ঘটনা নিয়ে বহু উপন্যাসও

✦ *ফতেহপুর সিক্রি আগ্রা হতে প্রায় ৪০ কি.মি. দূরে আগ্রা-ফতেহপুর মহাসড়কের ধারে আকবরের দরবার ছিল।*

www.pathagar.com

রচিত হয়েছে। আমি বেশ উৎসুক হয়েই প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের যাত্রীর কার্যকলাপ মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম। প্ল্যাটফর্মে অনেকে সপরিবার চাদর বিছিয়ে নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কুলীদের হাঁকডাক। অবশ্য ফেরীওয়ালাদের তেমন দৌরাত্ম্য নেই। আছে ছোট ছোট স্টল। আমরা আট নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো। শতাব্দী এক্সপ্রেস আরও বিশ মিনিট পর এ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবে। প্রত্যেকটি বগির নম্বর মোতাবেক যাত্রীদের দাঁড়াবার স্থান নির্দিষ্ট করে প্ল্যাটফর্মে জায়গা নির্ধারণ করে চিহ্নিত করা আছে। কাজেই ট্রেন আসলে বগি খুঁজতে ছুটাছুটির প্রয়োজন নেই। আমরা এসি চেয়ার কোচে উঠব। আমাদের বগি থামবার নির্ধারিত জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হল। কারণ, প্ল্যাটফরমে বসবার জায়গা খালি নেই। সামনে দাঁড়ানো সাদা পাজামা কালো সেরওয়ানী ধাঁচের পিরহান (পরিধেয়), মাথায় পাগড়ি আর তকমা আঁটা দু'জন যুবককে খাবারের প্যাকেট ভর্তি বেশ কয়েকটি বড় বড় কাগজের কার্টনের সামনে ট্রলি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। পাশে রাখা অনেকগুলি পানির বোতলের কার্টন। গায়ে লেখা For Indian Railway। জানলাম এ সবই যাত্রীদের পরিবেশনের জন্য। অপেক্ষা করতে হল কিছুক্ষণ। ভাবছিলাম বগি জায়গামত আসবে কিনা, নাকি খুঁজতে হবে।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেটি দিল্লী জংশনের নিউ ন্যাশনাল-এর নতুন অংশ, ঠিক তার পেছনে দেয়ালের বাইরে ইতিহাস খ্যাত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড।✦ কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোষণা হল দিল্লী হতে আগ্রা হয়ে লক্ষ্ণৌ যাবার জন্য শতাব্দী এক্সপ্রেস এখনই প্ল্যাটফরমে আসছে। ঘোষণার সাথে সাথে প্ল্যাটফর্মে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। ঠিক ৬-২০ মিনিটে শতাব্দী ট্রেনের কাঙ্ক্ষিত বগি আমাদের সামনে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই উঠে পড়লাম। ট্রেনের প্রায় ৭৫ শতাংশ বগি এসি চেয়ার কার। মজার বিষয় হল ট্রেনের টিকিটের মূল্য ৫৫ বছরের উর্ধ্বে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্যে বয়সের হিসেবে বছরওয়ারী কমতে থাকে। সে সুবাদে আমাদের টিকিটে প্রচুর রেয়াত পাওয়া গিয়েছিল। এই প্রথম আমি নিজেকে সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে জানলাম; অবশ্য সিনিয়র সিটিজেন হবার সুবিধা অসুবিধা দুই রয়েছে। ট্রেনের বগিতে নির্ধারিত দু'টি সিটে বসলাম এবং পাশের সিট যেহেতু নির্ধারিত ছিল ছহুল হুসাইনের জন্য তাই সেটা খালিই রইল। আমরা দু'জন যাত্রী হলেও এক প্রিন্ট আউটে টিকেট হওয়াতে তিনজনের টিকিটই আমার কাছে। ট্রেনে বেশ কিছু সাদা চামড়ার পর্যটক দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম একদল কোরিয়ান আর জাপানী ছাত্র-ছাত্রী। মনে হল স্থাপত্য নিয়ে পড়াশুনা করছে। ট্রেনটি নির্ধারিত সময়ে রওনা হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে একদা নবাবদের 'পিরহান' পরিহিত ওয়েটাররা পানির বোতল, চা আর বিস্কুট দিয়ে গেল। সিটগুলো বিমানের মতই। সামনের সিটের পেছনে সংযুক্ত আছে ট্রে। টেনে ট্রে বের করলে খাবার রেখে খেতে কোনই অসুবিধে হয় না। যেহেতু সকালে নাস্তা সারতে পারিনি তাই

✦ *শের শাহ সূরী তৈরি করেছিলেন এ রাস্তা– লাহোর হতে দিল্লী হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত।*

www.pathagar.com

বেশ ক্ষিদেও পেয়েছিল সেহেতু ভাবলাম দুটো বিস্কুটে পেট ভরবে কিনা। এতটুকুতে পেট না ভরলে পরে নাস্তা হয়ত ক্যাফেটেরিয়া থেকে কিনে আনতে হবে। তেমনটা করতে হয়নি। চা ছিল সকালের বেডটি আর আধা ঘণ্টা পরে পছন্দমত নিরামিষ বা আমিষের বিষয়টি সুরাহা করে নাস্তা পরিবেশন করল। পরিমাণে যথেষ্ট। সাথে আরেক পশলা চা এবং আরেকটি পানির বোতল। মিঃ লালু প্রসাদ যাদবকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলাম না। পরে জানলাম দূরপাল্লার অন্যান্য ট্রেনেও খাবার, চা এবং পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশন করা হয়। এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোতে চড়লে খাবারের চিন্তা যাত্রীদের করতে হয় না। এ সবই যাত্রীদের সেবার মান বাড়াতে আর ট্রেনকে যাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় করতে রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদের একান্ত প্রয়াস।

আমার জন্য আরও কিছু চমক অপেক্ষা করছিল। নাস্তা শেষ করবার পরপরই টিটি বা টিকেট পরিদর্শক এসে উপস্থিত। টিকেট দেখাতেই প্রশ্ন করলেন, "তৃতীয় ব্যক্তি কোথায়?" জানালাম, "তিনি আসতে পারেননি এবং তাঁর সিটটি খালি।" টিটি আমাকে বললেন, "তাঁর সিটটি খালিই থাকবে তবে আপনার উচিত ছিল টিকিট বাতিল করানো।" আমি তাঁকে জানালাম যে সময়ের অভাবে এমনটা করা সম্ভব হয়নি। টিকিট পরিদর্শক মহোদয় আমাকে অনুরোধ করলেন যে, আমি যেন অবশ্যই সামনে ট্রেন সুপারের কাছে গিয়ে নির্ধারিত টিকেটটি বাতিল করিয়ে নেই। এ বিষয়ে গাফিলতি না করতে অনুরোধ জানালেন। আমি বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারলাম। নিরাপত্তা এর প্রধান কারণ। ছুটলাম সুপার মহোদয়ের খোঁজে। কয়েকটি বগি পার হয়ে দুই মহোদয়কে রুডিয়ার্ড কিপলিং✦-এর সময়ের বর্ণিত ধাঁচের ইউনিফরম পরা অবস্থায় কিছু কাগজপত্র পরীক্ষা করতে দেখতে পেয়ে আমার আগমনের হেতু জানালে সিনিয়র গোছের একজন বললেন, "দুই এমএস হোসেনের মধ্যে কোন জন আসেনি"? প্রসঙ্গত টিকেটের গায়ে আমাদের দু'জনের নাম মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন আর মোহাম্মদ ছহুল হুসাইনকে অবলীলাক্রমে এমএস হোসেন লিখেছিল। সুপার সাহেব কম্পিউটার প্রিন্টে আমাদের নাম বের করলে আমি কিছুটা নির্বোধের মত জানালাম যে যে কোন একটা কেটে দিলেই হয়। সুপার সাহেব আমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আমার বয়স জিজ্ঞাসা করলেন। মনে মনে ভাবলাম বয়সের সাথে টিকিট বাতিলের কি সম্পর্ক? অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের বয়সটা বলতে হল। আমি আমার বয়স বলাতে অন্য এমএস হোসেনের নাম কাটলেন। ওই এমএস হোসেনের বয়সের সাথে আমার বয়সের মিল ছিল না। এবার আমি নিরাপত্তার এবং বয়স জানতে চাওয়ার কারণটা বুঝতে পেরে আমার নির্বুদ্ধিতার জন্যে লজ্জিত বোধ করলাম। কেন দেরিতে বুঝলাম তা নিয়ে চিন্তা করবার সময় পরে পেয়েছি। এমনটা দেখে অভ্যস্ত ছিলাম না বলেই হয়ত প্রথমে

✦ *রুডিয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫-১৯৩৬)-বোম্বাইতে (মুম্বাই) জন্মগ্রহণকারী বৃটিশ ঔপন্যাসিক ও কবি। সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত অন্যতম কবিতা 'গঙ্গারাম'। এ কবিতা তাঁকে নিয়ে যায় খ্যাতির শিখরে।*

www.pathagar.com

বুঝতে পারিনি।

চমক আরও অপেক্ষা করছিল। সুপার সাহেব টিকিট থেকে নামতো কাটলেনই একই সাথে নামটি কাটলেন তাঁর কাছে রক্ষিত যাত্রীর তালিকা হতেও। তারপরে পায়ের কাছে রক্ষিত কালো ব্যাগ থেকে একটি রসিদ বই বের করলেন। বইয়ের কাগজের রং প্রায় তামাটে। তিনি অতি যত্নে বেশ কিছু সময় নিয়ে রসিদটিতে জনাব এমএস হোসেন সাথে বয়স লিখে সই করে আমার হাতে দিয়ে যে হেদায়েত দিলেন সেটাই চমকপ্রদ। সুপার সাহেব অনুরোধ করলেন, "ইসকো আপ ফোল্ড (Fold) নেহী কিজিয়ে। কিউকি এ রশিদ কি কিতাব ১৯৪৭ কে আগেকা হ্যায়। ইংরেজকে জমানা সে হ্যায়। ফোল্ড কিজিয়ে গা তোইয়ে চুরচুর হো জায়গা।"

(বাংলা তর্জমা ঃ এটাকে ভাঁজ করবেন না। কারণ, রসিদ বইটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগের ইংরেজদের সময়ের। ভাঁজ করলে এ কাগজখানি চূর্ণ বির্চূণ হয়ে যাবে)।

আমি সুপার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন? স্বাধীন ভারতে রেলের রসিদ ছাপানো হয়নি?" উত্তরে সুপার সাহেব জানালেন যে, রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের হুকুমে স্টোর হতে হাজার হাজার টন ব্যবহারযোগ্য বহু পুরাতন ফরম ইত্যাদি বের করে ব্যবহার উপযোগীগুলোকে ব্যবহারের জন্য পাঠানো হয়। দুর্ভাগ্যবশত সুপার সাহেব সেখান থেকেই আমাকে একটা দিলেন। সুপার সাহেবের কথা নির্ভেজাল সত্য প্রমাণিত হল। আমি ফিরে এসে রসিদটা বেগম সাহেবকে সোজা করে তার ব্যাগে রাখতে বললাম। তিনি তেমনিভাবেই রাখলেন। কিন্তু দিল্লীতে ফিরে বিষয়টি যখন উপমহাদেশের অন্যতম জ্যেষ্ঠ রেলের কর্মকর্তা দোহা সাহেবকে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে রসিদটি দেখাতে গিয়ে আমরা দেখলাম কাগজটি কাঁচের মত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। তারপরও লালুজীর দেশপ্রেমে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই।

এমনি রেলমন্ত্রী ছিলেন মিঃ লালু প্রসাদ যাদব। ভারতীয় রেলওয়েকে লোকসান হতে লাভের পর্যায়ে নিয়ে এসেছিলেন। এ সাফল্যের পেছনে ছিল লালুর অতি বাস্তব পদক্ষেপ। সর্বভারতে জবরদখল করা রেলওয়ের অস্থাবর সম্পত্তি, জমি ইত্যাদি লালুজি পুনরুদ্ধার করে নিলামে বিক্রি করে রেলের বাজেট বাড়িয়েছিলেন। ওই অর্থ দিয়ে রেলের সংস্কার করেছেন। যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়েছিলেন। রেলকে গতিশীল করেছেন, নির্ধারিত সময় মত রেলের চলাচল নিশ্চিত করেছেন বিশেষ করে এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোর বেলায়। বলা হয়ে থাকে লালু ভারতের অন্যতম সফল রেলমন্ত্রী। এত কিছুর পরেও লালু এবার নির্বাচনে ভাল করতে পারেননি। বিহারের দু'টি আসনের একটিতে হেরেছেন।

প্রায় এক ঘণ্টা ট্রেন চলার পর ঘোষণা শুনলাম অল্পক্ষণের মধ্যে মথুরা স্টেশনে ট্রেন থামবে। শতাব্দী এক্সপ্রেস দিল্লী-লক্ষ্মৌ-এর মাঝে দু'জায়গায় থামে। মথুরা আর

www.pathagar.com

আগ্রায়। তিনটি ইতিহাসখ্যাত শহরই উত্তর প্রদেশে। ঘোষিকা ইংরেজি আর হিন্দিতে ঘোষণা করে জানালেন "শ্রী কৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরায় অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন থামতে যাচ্ছে–যাত্রীরা নামার প্রস্তুতি নিতে পারে।" ট্রেন থামতেই বেশ কিছু ইউরোপিয়ান পুরুষ ও মহিলা গেরুয়া কাপড় পরা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, 'হরে কৃষ্ণা হরে রামা' জপতে জপতে নেমে পড়ল। এ ধরনের সাদা চামড়ার ভক্তদের আমি দলবেঁধে লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিটেও 'হরে রামা হরে কৃষ্ণা' জপতে জপতে ঢাক ঢোল বাজিয়ে যেতে দেখেছি। এরা 'হরে রামা হরে কৃষ্ণা' সংগঠনের সদস্য বলে পরিচিত। সমগ্র ইউরোপে বহু ইউরোপিয়ান এ সংগঠনের সদস্য বলে কথিত। মথুরায় প্রায় পাঁচ মিনিট থামার পর ট্রেন পরবর্তী গন্তব্যস্থান আগ্রার দিকে পুনঃ যাত্রা করল। মথুরা-বৃন্দাবন দেখার খুব শখ ছিল। কিন্তু সে আগ্রহ থেকেই গেল। মথুরা শুধু হিন্দু ধর্মের পুণ্যভূমি হিসেবেই গুরুত্বপূর্ণ তেমনটি নয়। মথুরা ভারতের সামরিক কৌশলগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মথুরা ভারতের অন্যতম বৃহৎ সেনানিবাস। পশ্চিম রণক্ষেত্রের জন্য মথুরা সেনানিবাসে '১ কোর' (স্ট্রাইকিং ফোর্স)সহ ট্যাংক ডিভিশনসহ মোতায়েন রয়েছে। মথুরাতে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিউক্লিয়ার, বায়োলজিক্যাল এবং কেমিক্যাল যুদ্ধের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।[১] মথুরা থেকে আগ্রা প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণে। দিল্লী হতে মথুরা ২৫০ মাইল দক্ষিণে।

আমরা মথুরা ছেড়ে ঠিক সময়েই আগ্রা সেনানিবাস রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছলাম। সময় তখন সকাল ৮:৩০। প্ল্যাটফরমের বাইরে বের হতেই প্রচুর ট্যাক্সি চালকরা ট্যুর ট্যাক্সি নেবার প্রস্তাবনা নিয়ে আসলে আমি জানালাম আমাদের বাহন পূর্ব নির্ধারিত আছে। স্টেশন থেকে বের হয়ে আমি পূর্বে নির্ধারিত চালক কৃষ্ণকান্ত চৌবের✦ মোবাইলে যোগাযোগ করলে তিনি জানালেন যে, তিনি আমার পেছনেই দাঁড়ানো রয়েছেন। সামনে আসতেই পরিচিত হলাম। আমাদের নিয়ে গিয়ে এয়ার কন্ডিশন্ড 'ওয়েগানারে' বসালেন এবং কোথায় কোথায় নিয়ে যাবেন তার ফিরিস্তি দিলেন। প্রথমে তাজ, পরে যথাক্রমে আগ্রার রেডফোর্ট (Redfort), ইতিমাদ্দৌলার সমাধি এবং পরে সেকেন্দ্রায় সম্রাট আকবরের সমাধিতে নিয়ে যাবেন। একদিন এসব জায়গা দেখার পর এত অল্প সময়ে ফতেহপুর সিক্রি যাওয়া সম্ভব হবেনা বলেও জানালেন। চৌবে বললেন, "তাজ দেখতে অনেকে পুরো দিন সময় নেয়।" আমরা মিঃ চৌবেকে জানালাম যে, আমরা প্রথমেই বিশ্বের সবচাইতে নয়নাভিরাম এবং নির্মাণ শৈলির অত্যাশ্চর্য, বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম, তাজমহল থেকে শুরু করতে চাই। চৌবে বললেন যে, সেটাই উত্তম এবং আমাদের তাজনগর পৌঁছুতে ৯টা বেজে যাবে। ওই সময় থেকে তাজ উন্মুক্ত হয় পর্যটকদের জন্যে। খোলা থাকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

১। *http://www.India-Defence.com*

✦ *পরিবর্তিত নাম।*

www.pathagar.com

দশ

তাজমহল-এর শহর

আমরা আগ্রা শহরের রাস্তায়। শহরটির সাথে এক সময়কার লাহোরের মিল রয়েছে। অনেক রাস্তায় এখনও ঘোড়ার গাড়ি চলে। শহরের এ প্রান্তে ঘোড়ার বিষ্ঠার দুর্গন্ধ। শহরটি খুব পরিষ্কার তেমন মনে হলো না। তবে এটা যে সম্পূর্ণভাবে পর্যটকদের শহর তাতে কোন সন্দেহ নেই। আগ্রা খ্যাত তাজমহল-এর শহর হিসেবে। হালে তাজমহলকে পরিবেশ দূষণ থেকে বাঁচাতে ভারতের সুপ্রীমকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে সব ভারী শিল্প কারখানা সরিয়ে নেয়া হয়েছে। আগ্রা উত্তর প্রদেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সবচাইতে বিখ্যাত জেলা। আগ্রার তাজমহল, লাল কেল্লাসহ প্রায় সব দর্শনীয় স্থান 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' হিসেবে ঘোষিত। শহরের বুক চিরে আবহমান কাল থেকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত নদী, যমুনা। তবে বর্তমানে যমুনা ওই অবস্থাতে নেই। মৃত প্রায় যমুনা এখন দৃশ্যত খালে পরিণত হয়েছে। এ যমুনার পানিতে পূর্ণিমায় তাজমহলের প্রতিবিম্ব আর দেখা যায় না। যমুনা তাজমহলের ভিত থেকে প্রায় এক কিলোমিটার উত্তরে সরে গেছে।

আমরা তাজমহলের উদ্দেশে 'মিয়া নাজির রোড' হয়ে রওনা হলাম। 'কাসেরাত বাজারকে' পশ্চিমে রেখে আমরা তাজের মূল ফটক থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরের গাড়ি পার্কিং-এর দিকে যাচ্ছিলাম। মিঃ কৃষ্ণকান্ত চৌবে জানালেন যে, তাজমহলের এক কিলোমিটারের মধ্যে ব্যাটারি চালিত গাড়ি অথবা এক্কাগাড়ি✦ ছাড়া আর কোন গাড়ি যাবার আইনত অনুমতি নেই। কাজেই তিনি আমাদেরকে, তাঁর মতে, ভিআইপি কার পার্কে নিয়ে যাচ্ছেন। অন্যথায় তিন কিলোমিটার দূরে নামাতে হতো। 'কাসেরাত' বাজারের পূর্বে 'পুরানী মন্ডি' (পুরাতন বাজার)। এ জায়গাটুকু পুরাতন আগ্রার একাংশ। ছোট আকারের জিপ থেকে বাইরে আগ্রার ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক জায়গাগুলো দেখছিলাম। ইতিহাসের বহু অধ্যায় রচিত হয়েছে এই শহর আগ্রাকে ঘিরে। বহু বছর আগ্রা ছিল মোগল সাম্রাজ্যের দুই রাজধানীর অন্যতম। তবে বেশি সময় পর্যন্ত আগ্রাই ছিল প্রধান রাজধানী। মোগল সম্রাট শাহজাহানসহ অনেক সম্রাটের কীর্তির আর ইতিহাসের সাক্ষ্য আগ্রা। শুধু তাজমহল নয়, মোগল সময়ের আগ্রার ইতিহাসের কালের

✦ *এক ঘোড়ার গাড়ি। এ অঞ্চলে প্রচলিত নাম 'এক্কা'।*

www.pathagar.com

সাক্ষী আগ্রার 'লাল কেল্লা'✦ (রেড ফোর্ট) বা 'আগ্রার দুর্গ'।

আগ্রা যমুনা নদীর দু'তীরে বিস্তীর্ণ শহর। বর্তমানে উত্তর প্রদেশে। কথিত আছে যে আগ্রাও মহাভারতের শহর। যার নাম 'আগ্রেভানা' হিসেবে উল্লেখ রয়েছে বলে ধর্মীয় ঐতিহাসিকরা দাবি করে থাকেন। কোন কোন ইতিহাসে আধুনিক আগ্রার পত্তনের সময় ধরা হয়েছে ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে যখন দুর্গ শহর বানিয়েছিলেন রাজা বাদল সিং। দুর্গের নাম ছিল বালানাগ। বলা হয়ে থাকে এখানেই পরবর্তীতে গড়ে উঠেছে আগ্রার দুর্গ। তেমন ইতিহাস আগ্রার দুর্গেও হালে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যাই হোক, ১১ শতাব্দীতে পারস্যের কবি মাসুদ সাদ সালমান তার কবিতায় রাজা জয়পালের আগ্রায় গজনীর সুলতান মাহমুদের উপর্যুপরি আক্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন।[১]

দিল্লীর সুলতান সিকান্দার লোধীই প্রথম যিনি আগ্রাতে রাজধানী নিয়ে আসেন। সময় ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দ । ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার লোধীর মৃত্যু হলে তার পুত্র ইব্রাহিম লোধী আরও নয়বছর শাসক হিসেবে আগ্রাতেই ছিলেন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহিম লোধী বাবর বাহিনীর নিকট 'পানিপথ' নামক যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হন। সে সাথে শুরু হয় মোগল সাম্রাজ্য।

আগ্রার স্বর্ণযুগ ছিল ১৫২৬ থেকে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। শুধুমাত্র অল্প সময় ছাড়া এ সম্পূর্ণ সময় আগ্রা ছিল মোগলদের রাজধানী। তখন কিছু সময়ের জন্য এর নাম ছিল 'আকবরাবাদ'। সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান আগ্রাকে রাজধানী হিসেবে রেখেছিলেন। অবশ্য শাহজাহান ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর নতুন শহর শাহজাহানাবাদে [বর্তমানে পুরাতন দিল্লীর ওয়াল সিটি (wall city)] স্থানান্তর করেছিলেন। এখানে বাবর আর হুমায়ুন পদার্পণও করছিলেন। হুমায়ুনের করোনেশান, (তাজপোষী), আগ্রার দুর্গেই হয়েছিল।

মোগলদের রাজধানী হিসেবে আগ্রা পরিচিত হওয়া শুরু হলেও বেশ কয়েক দফা এ শহরের নাম পরিবর্তন করা হয়। তবে ক্রমেই শহর গড়ে উঠে যমুনার তীরদেশে। আজও সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বখ্যাত আগ্রার পুরাতন দুর্গকে ঘিরে। এ দুর্গের আমূল পরিবর্তন শুরু করেছিলেন মোগল সম্রাট আকবর। পরিপূর্ণতা দেন শিল্প আর সন্দৌর্যের পিপাসু বলে খ্যাত শাহজাহান। শাহজাহানের শখ ছিল সুন্দর মসজিদ, সমাধি, ইমারত আর সুদৃশ্য বাগান তৈরির। যার ফলে তাজমহলের মত অবাক করা বাগানসহ সমাধি তৈরি হয়েছিল। শাহজাহানের পিতা জাহাঙ্গীরের দুর্বলতা ছিল সুদৃশ্য বাগানের। জাহাঙ্গীর বানিয়েছিলেন আগ্রার আরাম বাগ, লাহোরের শালিমার বাগ আর নিজের সমাধি লাহোরের শাহদরা। শাহজাহান পরে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর করলেও শেষ

✦ *একই নাম দিল্লীর 'লাল কিলা'-বা দিল্লীর দুর্গ।*

১। *District Profile-government website (india)*

www.pathagar.com

জীবন কাটিয়েছেন আগ্রার দুর্গে ছেলে আওরঙ্গজেবের বন্দি হিসেবে। আওরঙ্গজেব কিছুদিন দিল্লীতে অবস্থান করে রাজধানী নিয়ে আসেন 'আকবরাবাদে' (আগ্রা)। পরে ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। আওরঙ্গজেবের পর মোগল সম্রাটরা দিল্লীতে রাজধানী পুনরায় স্থাপন করলে আগ্রা মারাঠা আর জাটদের আধিপত্যে থাকে ১৮০৩-এ ব্রিটিশ রাজের হাতে আসা পর্যন্ত। আকবরের প্রবর্তিত ধর্মের নতুন সংস্করণ দ্বীন-ই-এলাহী আগ্রাতেই জন্ম নিয়েছিল যেমন নিয়েছিল 'রাধা স্বামী' বিশ্বাস। আজও রাধা স্বামী-এর বহু অনুরাগী রয়েছে কিন্তু দ্বীন-ই-এলাহী ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে দ্বীন-ই-এলাহীর অনুরাগী কতজন আছেন তার পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না।

আকবরের দ্বীন-ই-এলাহী ছিল ওই সময়ের হিন্দুস্থানে পালনকৃত সব ধর্মের সংমিশ্রণ। তবে এর মধ্যে খ্রিস্টান এবং ইয়াহুদি ধর্মের ভাবধারাও গৃহীত হয়েছিল। পণ্ডিতদের মতে দ্বীন-ই-এলাহী যতটা না ছিল নতুন ধর্ম, ততটা ছিল মানুষের নৈতিক মতাদর্শ।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে আগ্রাকে ব্রিটিশ রাজ প্রেসিডেন্সি শাসনে নিয়ে আসে। প্রেসিডেন্সি শাসনের কেন্দ্র হবার পরপরই ১৮৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দে আগ্রায় ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হয়। এ দুর্ভিক্ষে জনমনে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে থাকে। আগ্রা তখনও ছিল ব্রিটিশ রাজের শক্তি আর প্রশাসনের কেন্দ্র। দিল্লী ছিল মোগলদের হাতে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহে, যা হিন্দুস্থানের ইতিহাসে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে খ্যাত, আগ্রা বিশাল ভূমিকা রেখেছিল। ওই সময়ে আগ্রার দুর্গ সিপাহীদের হাতে পড়লে হিন্দুস্থানের ইতিহাস হয়ত অন্যভাবে লেখা হতো। কিন্তু সিপাহীরা আগ্রা শহর দখল করতে পারলেও দুর্গ দখল করতে পারেনি। দুর্গ দখল না করতে পেরে সিপাহীরা দিল্লীর পথে রওয়ানা হলে জুলাই ৮, ১৮৫৭তে কোম্পানির বাহিনী শহর পুনঃদখল করে। সেপ্টেম্বরে (১৮৫৭) কোম্পানির বাহিনী দিল্লী দখল করে বিদ্রোহ দমন করে। মোগলদের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর নির্বাসিত হন বার্মায় (মায়ানমার)। নির্বাসিত অবস্থায় বাহাদুর শাহ জাফর মৃত্যুবরণ করেন নভেম্বর ৭, ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে বার্মার (মায়ানমার) রাজধানী রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন), সেখানেই রয়েছে বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধি। আগ্রা ব্রিটিশ রাজের অন্যতম শহর হিসেবে ১৯৪৭ পর্যন্ত রাজের 'জুয়েল ইন দা ক্রাউন' (Jwell in the crown) এর অন্যতম জুয়েল (Jwell) ছিল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুস্থানের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে আগ্রার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খুব সংক্ষেপে তার উল্লেখ না করলে আমার আগ্রা ভ্রমণ সম্পূর্ণ হবার নয়। আগ্রা ব্রিটিশদের হাতে আসার পর হিন্দুস্থানের সবচেয়ে বড় এবং দর্শনীয় দুর্গকে

www.pathagar.com

সেনাছাউনি বানানো হল। দুর্গে রাখা হল ইউরোপিয়ান ব্যাটালিয়ন, ৩ বেঙ্গল ফুসিলিয়রস্, (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম ইউরোপিয়ান ব্যাটালিয়ন)। এই পদাতিক বাহিনীতে স্থানীয় সৈনিক ছিল না। সাথে ছিল একটি আর্টিলারি (কামান) ব্যাটারি (কোম্পানি)। এটাও ছিল সম্পূর্ণ ইউরোপিয়ান সেনা সদস্য দ্বারা তৈরি। সাথে আরও ছিল দু'টি পদাতিক ব্যাটালিয়ন, 'বেঙ্গল রেজিমেন্ট', এটা ছিল নামমাত্র বাঙালি সদস্যদের দ্বারা গঠিত নয়। শুধুমাত্র নামে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, তবে রেজিমেন্টটি ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মিরাট থেকে হিন্দুস্থানী সিপাহীরা বিদ্রোহ শুরু করলে ক্রমেই তা ছড়িয়ে পড়ে হিন্দুস্থানের বহু অঞ্চলে। সিপাহীদের লক্ষ্য ছিল দিল্লীতে বাহাদুর শাহ জাফরকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ ঘোষণা করে ইংরেজদের বিতাড়িত করা।

ওই সময়ে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন জায়গা হতে বিদ্রোহের খবর আগ্রাতে পৌঁছতেই আলোচিত বেঙ্গল রেজিমেন্টের দু'টি ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করা হয়। নিরস্ত্র করলেও বহু সিপাহী আগ্রার দুর্গ হতে পালিয়ে বিদ্রোহে যোগ দেয়। বাকি সিপাহীদের রাখা হয় বন্দি অবস্থায়। ওই সময় বর্তমান উত্তর প্রদেশের প্রায় ৬ হাজার ইউরোপিয়ান পরিবার আশ্রয় নেয় আগ্রা দুর্গে। বহুদিন ওই সব পরিবারসহ ইউরোপিয়ান ব্যাটালিয়ন দুর্গে আটকা পড়েছিল। রোগ ছড়িয়ে পড়ে দুর্গে। বহু ইউরোপিয়ান কলেরায় মারা যায় এমন কি ওই অঞ্চলের লেফট্যানেন্ট গভর্নর জন রাসেল কলভিন ও (John Russell Colvin) কলেরায় মারা যান আগ্রার দুর্গে। তাকে কবর দেয়া হয় আগ্রা দুর্গের দেওয়ান-ই-আমের সামনে।

আগ্রার পরিস্থিতি ব্রিটিশরা অনুকূলে আনে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন সেনা ছাউনি হতে ব্রিটিশ, শিখ আর পাঠান সৈন্যদের আগ্রায় আনবার পর। উল্লেখ্য ১৮৫৭ থেকে প্রায় দু'বছরের হিন্দুস্থানের এ স্বাধীনতা যুদ্ধে, যা ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে আখ্যায়িত করেছে, ব্রিটিশদের পক্ষে মূলত পাঞ্জাব হতে সেনাবাহিনীতে রিক্রুট এসেছে সবচাইতে বেশি। হিন্দুস্থান ভাগ হবার পরেও ভারত আর পাকিস্তান রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবের আধিপত্য থেকেই গিয়েছিল। ভারতে এ প্রভাব কমলেও পাকিস্তানে আজও পাঞ্জাবের প্রভাব রয়েছে সবচাইতে বেশি।

আমাদের চালক কৃষ্ণকান্ত চৌবেজি আমাদেরকে আগ্রার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য দিলেন। তিনি জানালেন আগ্রা মূলত পর্যটকের শহর। এ শহরে হোটেল মোটেল আর অজস্র রেস্তোরাঁ গড়ে উঠেছে। উত্তর প্রদেশ আর লক্ষ্মৌ-এর সাহিত্য-সংস্কৃতি, হাতের কাজ, মার্বেলসহ অন্যান্য পাথরের তৈরি সুভ্যেনিয়রের দোকান, ঘোড়ার গাড়ি আর ট্যুর অপারেটরদের শহর আগ্রা। তাঁর মতে বাইরের পর্যটক ভারতের যে শহরে যে উদ্দেশ্যেই আসুক না কেন, আগ্রা দর্শনীয় স্থানের মধ্যে থাকবেই। তবে এখনকার মৌসুম (গরম) পর্যটকদের জন্য উৎকৃষ্ট নয়। কারণ (এ

www.pathagar.com

সময়) বছরের মাঝামাঝি আগ্রার তাপমাত্রা ৪৫°তে উন্নীত হয়। এখন প্রচণ্ড তাপদাহ চলছে। তাঁর মতে আগ্রায় প্রচুর বৃষ্টি হয়, তবে এ বছর বৃষ্টির তেমন দেখা মেলেনি। তাপের নমুনা সেই সকালেই আমরা পাচ্ছিলাম। দুপুরে কেমন হবে জানি না। কৃষ্ণকান্ত বললেন যে, এ শহরে মুসলমানদের সংখ্যা অনেক। তবে সহজে দাঙ্গা হয় না। মিলে মিশে থাকে। তার মতে 'হিন্দু-মুসলমান' ছোটখাটো ফ্যাসাদ যা হয় তাও রাজনৈতিক উস্কানিতেই হয়। তার মতে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলে তাও হয় না। বিজেপি-এর সময়ে টেনশন ছিল। দাঙ্গা এ শহরে অভিশাপ হিসেবে দেখা হয় কারণ, দাঙ্গা হলেই পর্যটক কমে যায়। যেমন এ বছরে অর্ধেক হোটেল বুকিং বাতিল হয়েছে বোম্বের তাজ হোটেলে সন্ত্রাসী আক্রমণের পর। বছরের এ সময়ে বিদেশী পর্যটক যত হবার কথা ছিল ততখানিও হয়নি। মৌসুমে কত হবে এখনও বলতে পারছে না। তার কথনে উৎকণ্ঠা যেমন ছিল আন্তরিকতাও তেমন ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম উত্তর প্রদেশের বহুল আলোচিত মুখ্যমন্ত্রীর কথা। মনে হল চৌবেজি খুব পছন্দ করলেন না। শুধু বললেন কুমারী মায়াবতী এত ধনী হয়েছেন তার সমাধিও তাজমহলের মত করে গড়তে পারবেন। অভিনেতা রাজ বাব্বরকে সফল রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি মনে করেন। তবে ১৫তম লোকসভা নির্বাচনে রাজ বাব্বর পরাজিত হয়েছিলেন। তিনি (রাজবাব্বর) বিজেপি-এর প্রার্থী ছিলেন। চৌবেজি মনে করেন এবারও কংগ্রেস জিতবে। তাঁর মতে, বিগত পাঁচ বছর কংগ্রেস ভাল কাজ করেছে। কৃষ্ণকান্ত চৌবে বললেন "রাহুলজি হবেন ভারতের সবচাইতে জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী"। আমি তাঁর এ মতামতের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "রাহুলজিকে আন্দার কোয়ি গুরুর নেহি হ্যায়। উ আম আদমকীকে সাথ বহুত গরম দিলিসে মিলতে হ্যায়। ধাবামে বৈঠকে আম আদমিকে সাথ চায়ে পিতে হায়।"

[বাংলা তর্জমা ঃ রাহুলজির (রাহুল গান্ধী) মধ্যে কোন অহমিকা নেই। তিনি সাধারণ লোকের সাথে অতি আন্তরিকতার সাথে মিশেন। ধাবাতে (ছাপড়া দোকান) বসে সাধারণ মানুষের সাথে চা পান করেন।]

আমিও কৃষ্ণকান্তের সাথে সুর মিলালাম। তিনবারের লোকসভার সদস্য হয়েও রাহুল গান্ধী এখনও কোন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেননি। রাহুল গান্ধী নেহাত যুবক নন। তার বয়সে তার প্রয়াত পিতা রাজীব গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

কৃষ্ণকান্ত অবশেষে তাজমহল-এর গাড়ি পার্কে এসে দরাদরি করে ২০ রুপীতে ব্যাটারি চালিত একটি গাড়ি আমাদের তাজমহল-এর প্রধান ফটকের টিকেট কাউন্টার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য ভাড়া করলেন। টিকেট কাউন্টারে নেমে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বিদেশীদের কাউন্টারে দাঁড়ালাম। দু'টো টিকেটের জন্য ১৫০০ রুপি বের করে হাতে নিয়ে কাউন্টারে এগুতেই অপর কাউন্টার থেকে একজন ডেকে বলল, "ভাই সাহেব

www.pathagar.com

ইধার আইয়ে, ওহ কাউন্টার গোড়োকে লিয়ে হ্যায়" (ভাই সাহেব এ কাউন্টারে আসুন, ওটা সাদা চামড়ার বিদেশীদের জন্য)। তার ডাকে সাড়া দিয়ে ২০ রুপী করে দুটো টিকেট কিনলাম। আমি ভাবছিলাম হয়ত আমাকে কোন উদাসীন ভারতীয় মনে করে টিকেট দু'টো দিয়েছে। কিন্তু আমার ভুল ভাঙতে বেশি দেরি হয়নি। জানতে পারলাম সার্ক (SAARC) এবং বিমস্‌টেক (BIMSTEC) ভুক্ত দেশের নাগরিকদের জন্য প্রবেশমূল্য ভারতীয় নাগরিকদের সমান করা হয়েছে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে। এরপর হতে কোথাও বিদেশী কাউন্টারে উচ্চ মূল্যে টিকেট কিনতে হয়নি। এ নিয়ে দ্বিতীয় একটি দেশে সার্কভুক্ত দেশের নাগরিক হবার সুফল পেলাম। প্রথম পেয়েছিলাম নেপাল বিমান বন্দরে। মনে মনে খুশি হলাম এই ভেবে যে টিকেটের মূল্য হ্রাস হওয়াতে বেশ কিছু টাকার সাশ্রয় হবে।

টিকেট হাতে নিয়ে আমি আর আমার সহধর্মিণী নিরাপত্তা তল্লাশির পর যখন তাজমহলের বাইরের দেয়াল ঘেরা আঙ্গিনায় পৌঁছলাম তখন আমাদের যে অনুভূতি হয়েছিল তা বর্ণনা করবার মত ভাষা আমার কাছে নেই। এ এক অপূর্ব শ্বাসরুদ্ধকর অনুভূতি। দেয়ালের উপর তাজমহলের বড় গম্বুজটি দেখা যাচ্ছিল।

আমরা টিকেট ঘর পেছনে ফেলে সামনে এগুতে কয়েকজন ফটোগ্রাফার আমাদের ছবি তুলবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে আমরা নিজেরা নিজেদের ছবি তুলতে চাই বলে তাদের নিবৃত করলাম। কিছু দূরে এগুতেই উত্তরের দেয়ালের উপর দিয়ে সকালের রোদে সাদা ধবধবে মার্বেলের তিনটি গম্বুজ অপূর্ব সুন্দর লাগছিল। ক্রমেই আমরা তাজমহলের বিশাল চার বাগানের প্রবেশ পথ 'দরওয়াজা-ই-রওজা'-এর সামনে এসে দাঁড়ালাম। এক অভূতপূর্ব দৃশ্য আমাদের সামনে ফুটে উঠল। মোগল স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য বিশাল আর্চের নকশার দু' দরওয়াজার প্রবেশ পথের সম্পূর্ণটা জুড়ে ছবির ফ্রেমের মত সাদা ধবধবে তাজমহল আমাদের সামনে। আর্চের ভেতরটা গভীর অন্ধকার মত হওয়াতে তাজমহল যেভাবে ওই জায়গা হতে দেখা যায়, তা শিল্পীর তুলিতে অথবা পেশাদার ফটোগ্রাফারের ছবির মাধ্যমেও প্রকাশ করা সম্ভব হবে কিনা জানি না। তাজমহল-এ প্রবেশের দিনের প্রথম প্রহর হলেও আমাদের আগে যত পর্যটক প্রবেশ করেছেন তার বেশির ভাগ এখনও এখানে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিলেন। আমাদের সামনেই ছিল একদল জাপানী পর্যটক সাথে, স্থানীয় গাইড, কাজেই সহজেই প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। আমরাও কয়েকটি ছবি তুলে 'দরওয়াজা-ই-রওজা' পার হয়ে গেটের সামনের প্ল্যাটফরমে দাঁড়ালাম। আমাদের সামনে তাজমহল। তাজমহল শুধু সমাধিটিই নয়, তাজমহল বলতে সামনের 'চারবাগ' (চাহারবাগ) সহ ভেতরের দেয়াল দিয়ে ঘেরা সম্পূর্ণ কমপ্লেক্সকে বুঝায়।

এই তাজমহল প্রথমবার দেখে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাদের অভিব্যক্তি যেভাবে

www.pathagar.com

প্রকাশ করেছিলেন সেগুলোর উল্লেখযোগ্য বহু অভিব্যক্তি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। এমনি একজন ছিলেন ব্রিটিশ রাজের সেনাকর্মকর্তা, যিনি আগ্রায় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পরে প্রথম চাকরিতে যোগদিয়ে সস্ত্রীক বহুল আলোচিত এ সমাধি দেখতে এসেছিলেন। কর্নেল স্লীমান তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "নেটিভদের তৈরি এ সমাধি কেমন লেগেছে।" ভাবাবেগে আপ্লুত মিসেস স্লীমান বলেছিলেন, "আমি বলতে পারছিনা আমি কি ভাবছি। আমি জানিনা এ ধরনের দালানকে আমি সমালোচনা করব কিনা তবে আমি বলতে পারি আমি কি অনুভব করছি। আমার মৃত্যুর পর আমার সমাধিতে আরেকটা তাজ বানালে আমি কালই মরতে প্রস্তুত আছি।"– এ ধরনের সমাধি সৌধ এই একবিংশ শতাব্দীতেও এখন পর্যন্ত বানানো সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

এগারো

যমুনার তীরে

'দরওয়াজা-ই-রওজা' পিছনে রেখে সামনে দাঁড়াতেই সোজা উত্তর দিক জুড়ে আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান হল মে মাসের সকালের রোদে স্নান করা সাদা ধবধবে, বিশ্বের সবচাইতে আলোচিত, এক সম্রাট আর তাঁর প্রেয়সী সাম্রাজ্ঞীর প্রেমকে অমর রাখতে নির্মিত সমাধি, তাজমহল। তাজমহল, মমতাজমহল আর শাহজাহানকে নিয়ে বিশ্বের এমন কোন ভাষা নেই যে ভাষায় নভেল, নাটক এবং কবিতা লেখা হয়নি। কত কবি, সাহিত্যিক কত কবিতা আর গল্প লিখেছেন তার হিসাব নেই। উপমহাদেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না তাজমহলের চর্চা না করে। সম্রাট শাহজাহানের যে সমস্ত কীর্তি আজ দর্শনীয় স্থানে গণ্য হয়েছে এবং স্থাপত্যের ছাত্রদের কাছে অবশ্য পঠনীয় তার মধ্যে তাজমহল শীর্ষে। 'তাজমহল চত্বর' শুধু 'তাজমহল' নামক মার্বেলের দালানের জন্যই নয়, এর সৌন্দর্যের অন্যতম উপাদান 'চাহার বাগ' (চার বাগান) সবুজ ঘাসের চত্বর। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমে পানির প্রবাহের জন্য সুদৃশ্য নহর (খাল) আর তার মাঝে কয়েকশ ফোয়ারার সন্নিবেশে অপূর্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তাজমহল।

আমরা দু'জন 'দরওয়াজা-ই-রওজায়' দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল এই অতি পরিচিত জায়গাটি। মনে হল বহুবার এসেছি অথচ আমার জীবনের এটাই প্রথম 'তাজ' দর্শন। স্কুলের দিনগুলো হতে অদ্যাবধি যে সমাধি সম্বন্ধে এত শুনেছি, ছবি দেখেছি, কবিতা পড়েছি, গান শুনেছি তার প্রথম দর্শন হতবাক হবার মত ঘটনাই বলে আমার মনে হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে যতটুকু শুনেছি তার চাইতে অধিক মনোমুগ্ধকর এ সমাধি চত্বর। সম্রাট হিসেবে শাহজাহানকে ঐতিহাসিকরা যেভাবেই বিচার করুক না কেন তিনি আর মমতাজমহল অমর হয়ে থাকবেন যতদিন এ তাজমহল থাকবে। আমরা দরওয়াজার চত্বরে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ছবি তুলে নিচে নেমে পানির নহরের একপাশের লাল ইটের হাঁটার পথ দিয়ে উত্তরে তাজমহলের দিকে এগুচ্ছিলাম এবং হাঁটতে হাঁটতে দু'পাশের অত্যন্ত পরিপাটি সাজানো 'চাহার বাগ'-এর সৌন্দর্য দেখছিলাম। 'চাহার বাগ' বাদ দিয়ে তাজমহলের সৌন্দর্য অসম্পূর্ণ। তাজমহলসহ 'চাহার বাগ'টি ৩০০ স্কয়ার মিটারের বাগান। বাগানটির মাঝে উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমে নহর এবং দু'পাশের লাল ইটের পায়ে চলার পথ তৈরি করে চারটি অংশে এমনভাবে বিভক্ত যে প্রতিটি অংশ সমানভাবে

www.pathagar.com

বিভাজিত। প্রতিটি অংশে ১৬টি সমকোণি ফুলের বাগানের জায়গা তৈরি করা রয়েছে। নহর সংযোগে এবং বাগানের মাঝখানে, 'দরওয়াজাই-রওজা' হতে সমাধি পর্যন্ত সমান দূরত্বে তৈরি করা হয়েছে মার্বেল পাথরের পানির বিশাল চৌবাচ্চা। এর চারধারে মার্বেলের বেঞ্চ যার উপর বসেই যুগলবন্দি ছবি তোলা হয়ে থাকে। বিশেষ করে দক্ষিণের বেঞ্চ কোন সময়েই খালি পাওয়া যায় না। এখানে বসলে পেছনে ফুটে উঠে সম্পূর্ণ সমাধির দালান (তাজ)। তাজকে প্রেক্ষাপটে রেখে এখান থেকে যত ছবি এ পর্যন্ত তোলা হয়েছে বিশ্বে আর কোন দালান বা সমাধির এত ছবি তোলা হয়নি।

তাজমহল শুধু সৌন্দর্য বা নির্মাণশৈলীর জন্য বিশ্বের সপ্তাশ্চার্যের একটি হয়নি। বরং প্রায় চার শত বছর পূর্বে এর নির্মাণ শৈলীর সাথে জ্যামিতি এবং গণিতের যে একটা যোগসূত্র রাখা হয়েছিল সেগুলোর কারণেই এই সম্পূর্ণ চত্বর (Complex) টি পৃথিবীর মধ্যযুগীয় সপ্তাশ্চার্যের একটি হয়ে আছে।

তাজমহলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ১৬৩২ এ এবং শেষ হয় ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে। সৌধের প্লিন্থ (Plinth) পর্যন্ত তৈরি করতে লেগেছিল ১২ বছর। বাকি ১০ বছর লেগেছিল বাদবাকি কাজ শেষ করতে। সমান্তরালভাবে চলেছে বাগানের কাজ। সমাধির প্লিন্থ বা ভিত্তিমূল উঠানো হয়েছে ওই সময়কার যমুনা নদীর দক্ষিণ পাড় ঘেঁষে নদীর নিচের অংশ থেকে। তাজমহল চত্বরের এ সম্পূর্ণ জায়গাটি আগ্রার দেয়াল শহরের দক্ষিণে। এ জায়গাটি ছিল মহারাজা জয় সিং-এর ব্যক্তিগত বাগান বাড়ি। সম্রাট শাহজাহান মহারাজাকে আগ্রার কেন্দ্রে এক বিশাল রাজমহলের পরিবর্তে জায়গাটি বেছে নেন তার প্রিয়তম স্ত্রীর সমাধি তৈরির জন্য।[১]

তাজমহলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল শাহজাহানের তৃতীয় স্ত্রী মমতাজ মহল চৌদ্দতম এক কন্যা সন্তান গওহরা আরা বেগমের জন্ম দেয়ার সময় মারা যাবার পর। গওহরা বেগমও জন্মের এক বছর পর মারা যান। মমতাজ মহল মারা যান ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে।

মমতাজ মহল ওরফে আরজুমান্দ বানু ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের বেগম নূরজাহানের ভ্রাতার কন্যা ইতিমাতদ্দৌলার মেয়ের ঘরের নাতনী। মমতাজ মহলের মৃত্যু হয় দাক্ষিণাত্যে এবং সেখানে তাকে দাফন করা হয়। ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মমতাজ মহলের মৃত্যুর প্রায় ২২ বছর পর আগ্রার তাজমহলের সৌধে পুনঃদাফন করা হয়। দাক্ষিণাত্য হতে মমতাজ মহলের শবাধার আনা হয়েছিল রাজকীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পুনঃসমাধিস্থ করবার আগে একদিন শবাধারটি রাখা হয় তাজমহলের পশ্চিম পাশের জামে মসজিদ চত্বরে।

১। *Chagtai, Muhammad Abdullah, "Le TadjMahal" P 54 and Rewuari 'Badshanama, Vol-1 PP. 54 & 403.*

www.pathagar.com

মৃত্যুশয্যায় শাহজাহানের প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজ মহল শেষ ইচ্ছা হিসেবে সম্রাটের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে তার মৃত্যুর পর তার সমাধি এমনভাবে নির্মিত হোক যেমনটা বিশ্ব কখনও দেখেনি। হিন্দুস্থানের পঞ্চম✦ মোগল সম্রাট, আল-সুলতান আল-আজম-ওয়াল খাকান, আল-মোকারাম, আবুল-মোজাফফার সিহাবউদ্দিন মোহাম্মদ, সিহাব-ই-কিরান-ই-সানি, শাহজাহান-১, বাদশাহ গাজী, জিল্লে এলাহি, ফেরদৌস-আসিয়ানী ওরফে শাহজাহান সে কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। যে সমাধি তিনি তৈরি করেছেন তার মত বিশ্বে আজও কোন সমাধি তৈরি হয়নি।[২]

আমরা হাঁটতে হাঁটতে আর ছবি তুলতে তুলতে 'চাহার বাগ'-এর মাঝখানের অতি পরিচিত সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি মধ্যখানের পানির চৌবাচ্চার কাছে এসে পৌঁছলাম। চৌবাচ্চাটি প্রায় ৮/৯ ফুট উঁচু। দক্ষিণ বেঞ্চে ছবি তোলার জন্য প্রচণ্ড ভিড় করছে জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন বয়সের অগণিত নারী-পুরুষ। এদের মধ্যে বিদেশী পর্যটক ছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক সদ্য বিবাহিত দম্পতি। চৌবাচ্চাটির ভেতরে রাখা পানি প্রায় কাণায় কাণায় থাকে এবং এর দিকে তাকালে গোটা তাজমহল-এর সমাধি সৌধটির প্রতিবিম্ব দেখা যায়। চৌবাচ্চাটি এ কারণেই এমন দূরত্বে এমনইভাবে তৈরি। লক্ষণীয় বিষয় হল নির্মাণের সময় হতে এখনও পানির নহর আর চৌবাচ্চার পানি চলমান। ওই সময় যমুনার পানি গরু বা উটের সাহায্যে পারসিয়ান হুইলের সাহায্যে উঠিয়ে প্রবাহিত করা হতো; আজ সে কাজটি পাম্পের সাহায্যে করা হয়। আমরা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দক্ষিণ বেঞ্চে বসে ছবি তোলার সুযোগ না পেয়ে ফিরতি পথে তুলব ভেবে মূল সমাধি, যা সাধারণত তাজমহল বলে আখ্যায়িত হয়ে আসছে, দেখতে উত্তর দিকে যাবার পথে পা বাড়াতেই পেছন থেকে একজন বাংলাদেশী ভদ্রলোক সালাম দিয়ে পরিচয় দিতে নিজের নাম বললেন, মিঃ শাহিন সরওয়ার হোসেন। তিনি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের একজন কর্মকর্তা, দিল্লীতে এক ওয়ার্কশপে এসেছেন এবং রবিবারের ছুটির দিনে আগ্রা ভ্রমণ করতে এসেছেন। আমাকে বললেন, "স্যার আমার সৌভাগ্য যে আপনাদের সাথে এখানে দেখা হয়েছে।" জানলাম তিনি একাই এসেছেন এটা তারও প্রথম আগ্রা সফর। হাসিমুখে সরওয়ার সাহেব প্রস্তাব দিলেন যে, তিনি আমাদের দু'জনের ছবি আমাদের ক্যামেরা দিয়ে উঠিয়ে দেবেন। আমিও তাকে একই প্রস্তাব দিয়ে বললাম, "আমরা একজন আরেকজনের ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করতে পারি।" সরওয়ার সাহেব আমাদের কয়েকটি ছবি উঠিয়ে দিলেন আমরাও তার ক্যামেরায় তাজমহলসহ তাঁর ছবি উঠিয়ে দিলাম।

এতক্ষণে আমরা সমাধির প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি। ইতিহাস বলে তাজমহল

✦ *২০০৯-এ প্রকাশিত* Fergus Nicoll *রচিত পুস্তক* Shah Jahan; The Rise and fall of The Mughal Emperor. Penguin Book, India, Pvt. Ltd. *এ বর্ণিত ষষ্ঠ মোগল সম্রাট।*

২. Carroll, David (1971) The Taj Mahal; News week, Books.

www.pathagar.com

তৈরির জন্য উস্তাদ আহমেদ লাহোরীর অধীনে আব্দুল করিম মামুর খান এবং মোকাররম খানসহ একটি তদারকি বোর্ড গঠিত হয়েছিল। ধারণা করা হয় উস্তাদ লাহোরীই ছিলেন প্রধান নক্সা প্রস্তুতকারী ব্যক্তি।[৩] ২০,০০০ শ্রমিককে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মোহাম্মদ হাসিল। প্রধান নক্সাকারী জনাব লাহোরী ছিলেন পারস্যের স্থপতি। তাজমহল তৈরি করতে মোগল সম্রাট শাহজাহানের খরচ হয়েছিল ওই সময়ের ৩২ মিলিয়ন রুপী।

আমরা তাজমহলের সমাধি চত্বরের প্লিন্থ-এর নিচে চলে এসেছি। প্লিন্থ লেভেল হতে তাজমহল-এর (ভিত্তিমূল) উচ্চতা ৬ মিটারের উপরে। সমাধির চত্বরে উঠতে হলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠত হয়। জুতা খুলে অথবা জুতা প্লাস্টিকের মোড়কে মুড়িয়ে নিয়ে উপরের চত্বরে উঠতে হয় যাতে বাইরের ময়লা মার্বেলের কোন ক্ষতি না করতে পারে। আমরা তিনজনে নিচে জুতা খুলে জুতা পাহারারত একজনের দায়িত্বে পিজন হোলে রাখলাম। এর জন্য কোন নির্ধারিত ফি নেই। যে তাকে যত দেয়। কোন দাবি নেই। আমি ভেবেছিলাম উপরের মার্বেল আচ্ছাদিত চত্বর এতক্ষণে তেতে রয়েছে, কিন্তু উপরে উঠে তেমন মোটেই মনে হয়নি। আমরা স্বাচ্ছন্দে-খালি পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি।

সমাধির প্রধান গম্বুজের নিচে, ঠিক মধ্যখানে, মমতাজ মহলের কবর আর তার পশ্চিমে একটু উঁচু করে তৈরি শাহজাহানের কবর।[৪] সম্পূর্ণ মার্বেল পাথরের দুটো কবরই মনে হয় একটি মার্বেল পাথরের ব্লক। একটু লালচে হয়েছে। অপূর্ব নক্সার কাজ –প্রতিটি নক্সা করা ফুল এবং লতা-পাতার মাঝে কোন এক সময় দামী পাথর বসানো ছিল। শাহজাহান আর মমতাজ মহলের আসল কবর প্ল্যাটফরমের ঠিক নিচে, বেসমেন্টে। সমাধি প্রকোষ্ঠের উপরে প্রধান গম্বুজ যার সর্বমোট উচ্চতা ৬০ মিটার। বর্তমানে উপরে পিতল জাতীয় কভার দিয়ে গম্বুজটির উপরের অংশ ঢাকা। তৈরির পর গম্বুজটি দিয়ে পানি চুয়াত। ওই সময় আগ্রার কেল্লায় বন্দি বৃদ্ধ সম্রাট তার পুত্র আওরঙ্গজেবকে অনুরোধ করেছিলেন বৃষ্টির পানি চুয়ানো বন্ধ করতে। আওরঙ্গজেব সোনার উপরে দামি পাথর বসানো পাত দিয়ে গম্বুজের সংযোগস্থল মুড়ে দিয়েছিলেন। তার স্থলেই এখন পিতল বসানো।

এ গম্বুজ মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হবার পর মারাঠারা লুট করে সোনার জায়গায় দামী ধাতুর তৈরি পাত দিয়ে গম্বুজের উপরের অংশ বন্ধ করেছিল। আগ্রা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে আসবার পর তাজমহল আরেকবার লুট হয়। সরিয়ে নেয়া হয় দামি পাথরসহ গম্বুজের দামী ধাতুর পাত। পরে তামার পাত দিয়ে মুড়ে দেয়া হয়। এমনই ছোট্ট ইতিহাস প্লিন্থের বাইরে খোদাই করে লেখা রয়েছে।

---

৩. Chagtai. Muhammad Abdullah, Ibid.

৪। *নক্সা ও তদারকি করেছিলেন তুরস্কের স্থপতি ইসমাইল-খান-আফ্রিদি।*

www.pathagar.com

সমাধির চত্বর ৯৪ বর্গ মিটার জায়গায় ব্যাপৃত। সম্পূর্ণ সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি চত্বরের চার কোণায় চারটি মিনার রয়েছে। প্রতিটি মিনার সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি, ৪০ মিটার উঁচু। সাদা মার্বেলের চত্বরের দু'পাশে দু'টি একই মাপের একই ডিজাইনের লাল স্যান্ডস্টোনের মোগল ডিজাইনের গম্বুজ এবং আর্চের সংমিশ্রণে নির্মিত দু'টি দালান রয়েছে। দু'টির মধ্যে তফাৎ হল পশ্চিমের দালানে একটি মিম্বর রয়েছে যেটি জামে মসজিদ নামে খ্যাত তার পূর্ব পাশের দালানে মিম্বর নেই। সেটি ব্যবহার হত মুসাফিরখানা হিসেবে। সমাধির উত্তর প্লিন্থের দেয়াল ঘেঁষে যমুনা নদী। এক সময় প্রমত্তা যমুনা নদীর স্বচ্ছ পানি উত্তরের প্লিন্থ-এর দেয়ালে আছাড় খেত। নদীর পানিতে ফুটে উঠত সমাধির প্রতিচ্ছায়া। আজ যমুনা যৌবনহারা মৃতপ্রায়, খালের আকার ধারণ করেছে। এখন উত্তরের প্লিন্থের দেয়াল হতে ধুধু বালুর রাশি আর প্রায় আধা কিলোমিটার বালুর মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃত প্রায় যমুনা নদী। তাজমহলের সীমানার বাইরের দেয়াল সংলগ্ন যমুনার তীরে ফেলা হচ্ছে আগ্রা শহরের আবর্জনা। করুণ সে দৃশ্য। তবুও রক্ষা যে, ভারতীয় সুপ্রীমকোর্টের রায়ে আগ্রা থেকে ভারী শিল্প-কারখানা সরিয়ে নেয়া হয়েছে। না হলে হয়ত আগামী প্রজন্ম তাজমহলের নামই শুনত মাত্র। এ এলাকাকে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো (UNESCO) 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ঘোষণা দেয়ায় কিছুটা রক্ষা। তবুও তাজমহলের মার্বেল পাথরগুলো লালচে হয়ে গেছে। এর রং ফিরিয়ে আনতে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে শুনিনি।

আমরা শাহজাহান আর মমতাজ মহলের সমাধি চেম্বার থেকে বের হয়ে পাশের প্রকোষ্ঠগুলো দেখছিলাম। তাজমহল তৈরি শৈলীর সবচাইতে আকর্ষণীয় দিকটি হল প্রত্যেকটি অংশ একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ-আধা ইঞ্চির তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনই নির্মাণশৈলী। চারদিকের চারটি বৃহৎ প্রবেশ পথের আর্চের বা খিলানের তিন দিকে, নিচ হতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত, ইসলামিক ঐতিহ্যে ক্যালিওগ্রাফি করা কোরআন শরীফ হতে নেয়া সূরা কালো মার্বেল পাথরের দ্বারা অংকিত। ক্যালিওগ্রাফির পাশাপাশি দেয়ালে রঙ্গিন পাথর দিয়ে নানান ধরনের ফুলের নক্সা অংকিত। এসব পাথরের গভীরতা দেখতে হলে টর্চের আলোতে দেখা সম্ভব। এগুলো তদারকি ও নক্সা করেছেন আমানত খা সিরাজী যার নাম প্রথম দরওয়াজাতেই ক্ষোদিত রয়েছে। আমানত খাঁ সিরাজীই কোরআন শরিফ হতে সূরার আয়াতগুলো বেছে নিয়েছিলেন। কোরআনের যেসব সূরাগুলো তাজ-এর খিলানগুলোসহ অন্যান্য জায়গায় অংকিত, সেগুলো নিম্নররূপ ঃ

সূরা ৯২ (সূর্যের উপর), সূরা ১১২ (বিশ্বাসের পবিত্রতা) সূরা ৮৯, সূরা ৯৩, সূরা ৯৫ সূরা ৯৪, সূরা ৩৬, সূরা ৮১, সূরা ৮২, সূরা ৮৪, সূরা ৯৮, সূরা ৬৭, সূরা ৪৮, সূরা ৭৭, এবং সূরা ৩৯। মোট পনেরটি পবিত্র কোরআনের সূরা অংকিত রয়েছে

www.pathagar.com

প্রত্যেকটি প্রধান দরওয়াজার খিলানের তিন পাশে এবং অন্যত্র।

তাজমহল-এর সমাধি তৈরি হয়েছিল সমগ্র হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে আমদানী করা বিভিন্ন ধরনের দামী পাথর, সাদা এবং রঙ্গিন মার্বেল দ্বারা। প্রায় ২০০০ হাতি ব্যবহার করা হয়েছিল তাজমহলের বিভিন্ন সামগ্রী বহন করবার জন্য। রাজস্থানের সাদা মার্বেল ব্লক ব্যবহার হয়েছে তাজমহল তৈরিতে। জেড এবং কৃস্টাল আনা হয়েছিল চীন হতে। অন্যান্য পাথর আনা হয়েছিল তিব্বত আর আফগানিস্তান হতে। সর্বমোট ২৮ ধরনের দামী পাথর ব্যবহৃত হয়েছিল তাজমহল তৈরিতে। আজ তার অনেকগুলো নেই। অনেক জায়গায় যেখানে দামী পাথর বসানো ছিল, সেগুলো ভরে দেয়া হয়েছে মার্বেল চূর্ণ দিয়ে যা খালি চোখেও দেখা যায়।

তাজমহলের রূপ দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের দেখা যায়। চন্দ্রবিহীন রাতের অমাবস্যার আঁধারে একরকম আর চন্দ্রের আলোতে অপূর্ব দেখা যায় এ সমাধি। রাতের অন্ধকারে আকাশ হতেও তাজমহল দৃশ্যমান। যে কারণে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জার্মান এবং জাপানের বিমান আক্রমণে তাজমহল দিক-নির্দেশনার জন্য ব্যবহার হবার আশঙ্কায় তৎকালীন ব্রিটিশ রাজ ঢেকে রেখেছিল সম্পূর্ণ তাজমহলকে। একইভাবে ঢেকে রাখা হয়েছিল ১৯৬৫ তে পাক-ভারত যুদ্ধ এবং ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়।

আমরা অনেকক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত নিঃশব্দে চারদিক ঘুরে হতবাক নয়নে দেখছিলাম। কিভাবে প্রায় চারঘন্টা কেটে গেল টেরও পাইনি। মনে হল এখানে একটা গোটা দিন ক্লান্তিবিহীন কাটানো কোন ব্যাপার নয়। তবে মে মাসের আগ্রার গরম আমাদের একাগ্রতায় মাঝে মধ্যে ছেদ টানছিল। ফিরবার পথে সমাধির প্রধান প্রকোষ্ঠের পাশ দিয়ে আসতে তাজমহল চত্বরে একটি মাত্র অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করলাম। সেটি হল শাহজাহান আর মমতাজ মহলের পাশাপাশি দু'টি কবর। যেমনটা বলেছি মমতাজ মহলের কবর প্রকোষ্ঠের জ্যামিতিক মাঝখানে আর শাহজাহানের কবর পরে দেয়া হয়েছিল মমতাজ মহলের পশ্চিম পাশে। উচ্চতায় মমতাজ মহলের কবর ছাড়িয়ে। এটাই একমাত্র অসামঞ্জস্য। আমাদের পাশে একদল জাপানী পর্যটকের একজন চৌকষ গাইড তোতা পাখির বুলির মত সমগ্র তাজমহলের সামঞ্জস্যের উপর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "মরণেও বাদশাহ নিজের বড়ত্ব দেখাতে ভুল করেনি। নিজেকে বেগম হতে বড় দেখিয়ে এ অসামঞ্জস্য তৈরি করে গেছেন।"

গাইডের কথায় কিছুটা সত্য থাকলেও সম্পূর্ণই সত্য নয়। শাহজাহানের জীবদ্দশায় তাজমহলের নির্মাণ শেষ হয়েছিল। সম্রাটের মৃত্যু হয়েছিল বন্দি দশায়। তাকে তাঁর বেগমের পাশে কবর দিয়েছিলেন পুত্র সম্রাট আওরঙ্গজেব। তিনি

www.pathagar.com

অসামঞ্জস্য তৈরি করেন। কারণ, পরে উল্লেখ করব।

কথিত আছে যে যমুনার বাকে, দুর্গের কাছে তাজমহলের সরাসরি উত্তর দিকে শাহজাহান নিজের জন্য কালো পাথরের তাজমহল-এর অনুরূপ আরেকটি সৌধ তৈরি করবার কাজ হাতে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্লিন্থ ছাড়া আর কিছুই সম্পূর্ণ করতে পারেননি। কারণ, ওই সময়েই তিনি আওরঙ্গজেবের হাতে বন্দি হন এবং আওরঙ্গজেব, তাঁর মতে, সরকারি কোষাগার থেকে এ অপচয় বন্ধ করেন। তবে কালো তাজমহলের বিষয়টি ইতিহাস সমর্থিত নয়। যমুনার অপর পাড়ের কালো পাথরের এ অংশকে মনে করা হয় যে তাজমহলের 'চাহার বাগের' একাংশ যমুনার অপর পাড়ে বিস্তীর্ণ করবার পরিকল্পনা ছিল যা সম্পূর্ণ হয়নি। পাথরগুলো অন্য রংয়ের ছিল যা রাসায়নিক ক্রিয়ার কারণে কালো আকার ধারণ করেছিল। হয়তো বা শাহজাহান এখানেই তার অন্তিম শয়ন রচনা করতে চেয়েছিলেন।

শাহজাহানের মৃত্যুর পর পুত্র আওরঙ্গজেব ওরফে আলমগীর তার পিতাকে তাজমহলেই সমাধিস্থ করবার মনঃস্থির করেন। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, আওরঙ্গজেব তাজমহলের সব বিষয়ের সামঞ্জস্য ভাঙতেই শাহজাহানের সমাধি এমনভাবে তৈরি করেন যাতে কিছুটা অসামঞ্জস্য তৈরি হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন তার সময়ের অত্যন্ত গোঁড়াপন্থী ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি বলেছিলেন, "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন বান্দা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু তৈরি করবার ক্ষমতা রাখে না।" আগেই বলেছি সমগ্র সমাধি চত্বরে এটুকুই অসামঞ্জস্যপূর্ণ যা চোখে পড়বে।

তাজমহল সম্বন্ধে আরও বেশ কিছু কিংবদন্তি চাউর আছে। অনুযোগ উঠেছিল যে লর্ড উইলিয়াম বেনটিক, ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার গভর্নর ছিলেন, তাজমহল ভেঙে বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। বিষয়টি বেনটিক এর জীবনী লেখক, জন রাসেল অস্বীকার করে লিখেছেন যে, এ ধরনের গল্প সত্য নয়। জন রাসেলের মতে বিষয়টি গুলিয়ে গিয়েছিল। লর্ড বেনটিক আগ্রার দুর্গে রক্ষিত অতিরিক্ত সাদা মার্বেলের ব্লকগুলো অপসারণের জন্য বিক্রি করেছিলেন। তিনি তাজমহল ধ্বংস অথবা বিক্রির কথা চিন্তাও করেননি। কিন্তু অনেকেই এখনও মনে করেন লর্ড বেনটিক এর জীবনী লেখক শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা করেছেন মাত্র। ওই সময় লর্ড বেনটিক ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় ছিলেন।

আমরা বাল্যকাল থেকে শুনে আসছিলাম যে তাজমহল তৈরির সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাদের হাতের অঙ্গুলিগুলো কর্তিত হয়েছিল যাতে তাঁরা দ্বিতীয় তাজমহল গড়তে না পারেন। এটাও শুনেছি যে, প্রধান নক্সাকারীদের অন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। অথচ কোন গবেষণা অথবা কোন ঐতিহাসিক এ ধরনের কল্পকাহিনীর সত্যতা খুঁজে পাননি।

www.pathagar.com

কয়েক বছর পূর্বে ভারতে হিন্দুবাদের উত্থানের পরপরই তাজমহল নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেন হিন্দুবাদী অধ্যাপক পিএন ওক (PN Oak)। তার রচিত বই "Tajmahal : The True Story" তে তিনি দাবি করেন যে, তাজমহল আসলে হিন্দুদের শিব মন্দিরের উপরে বানানো। তিনি আরও দাবি করেন যে নামটিও শিব মন্দিরের নাম। তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে দাবি করেন তাজমহল-এর সমাধিতে মমতাজমহল বলে কাউকে কবরও দেয়া হয়নি। তিনি এ তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য ভারতের কোর্টে রিট দাখিল করেন তাজমহলের সমাধি ভেঙে শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বের করতে। যাই হোক ভারতের কোর্ট তার আরজি নাকচ করে দেয়াতে আপাতত এ অধ্যায়ের ইতি হয়েছে। তবে আমার সংক্ষিপ্ত সফরে যা দেখেছি তাতে প্রতি জায়গাতে হিন্দুবাদের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। আগ্রার দুর্গের সামনে হিন্দুবাদীরা ছত্রপতি শিবাজীর মূর্তি দাঁড় করিয়েছে। এ বিষয়ে আগ্রার দুর্গ দেখার পর আলোচনা করব।

আমরা ফিরতি পথে মিঃ সরওয়ার সহ আরেকবার 'চাহারবাগ' এর মধ্যখানের চৌবাচ্চার দক্ষিণ মার্বেলের বেঞ্চে বসে তাজমহলকে পেছনে রেখে ছবি তুলে যখন 'দরওয়াজা-ই-রওজার' ছাদের তলায় আসলাম, তখন হঠাৎ আকাশ মেঘে ঢেকে কয়েক মিনিটের মধ্যে শিলা বৃষ্টি ঝরালো। অনেকক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে আগ্রায় শিলাবৃষ্টি উপভোগ করলাম। এ বৃষ্টির ফলে আবহাওয়া কিছুটা সহনীয় হলেও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আবার গুমোট গরম শুরু হল। আমরা বের হয়ে কৃষ্ণকান্ত চৌবেকে আমাদের অবস্থান জানিয়ে গাড়ি নিয়ে সামনে আসতে বললাম। মিঃ সরওয়ারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঢাকায় দেখা হবে আশ্বাস দিয়ে আমরা তার কাছ থেকে আপাতত বিদায় নিলাম। সময় তখন প্রায় দেড়টা। প্রচণ্ড ক্ষিদে অনুভব করলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম ম্যাকডোনাল্ড থেকে দুপুরের খাবার খেয়ে আগ্রার দুর্গ দেখতে যাব। দুর্গ থেকে ফেরার পথে সম্রাট, জাহাঙ্গীরের শ্বশুর সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পিতা, মমতাজ মহলের পিতামহ, ইতিমতাদ্দৌলার সমাধি এবং সেকেন্দ্রায় সম্রাট আকবর দি গ্রেটের সমাধি দেখে আগ্রার পাট শেষ করব।

তাজমহল থেকে বের হবার পথে আরও দু'টি ছোট সৌধ আছে। এ সৌধ সমাধি দু'টি সম্রাট শাহজাহানের বাকি দু'জন বেগম সাহেবার। এদের মধ্যে একজন আকবরবাদী বেগম অপরজন ফতেহপুরী বেগম। এ দুই বেগমই দিল্লীর শাহজাহানবাদের 'চাঁদনী চক'-এ দু'টি মসজিদ বানিয়েছিলেন। এর একটি ফতেহপুর মসজিদে এখনও নামাজ হয়। অপরটি আকরাবাদী মসজিদ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহীরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করেছিল বলে পরে ইংরেজ সরকার কর্তৃক গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। ওই সময়ে তাজমহল-এরও প্রভূত ক্ষতি হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলের পর তাজমহল ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন হয়। বিনষ্ট হয় আদি

www.pathagar.com

'চাহার বাগ'।

আমরা দুপুরের খাবার খেতে অতি পরিচিত ফাস্টফুড রেস্তোরাঁ ম্যাকডোনাল্ডে বসে তাজমহল দেখার প্রবল ইচ্ছাটা সার্থক হয়েছে মনে করে তৃপ্তিবোধ করলাম। তাজমহল যারা দেখেননি, সামর্থ্য থাকলে দেখবার অনুরোধ করব। সপ্তাহের শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন তাজমহল দর্শনার্থীদের জন্যে খোলা থাকে। তবে বিকেল পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যায়। রাতে খোলা থাকে না। শুক্রবারে তাজমহল চত্বরের জামে মসজিদে জুমার জামাত অনুষ্ঠিত হয়। মমতাজ মহলের মৃত্যুর পর পুনঃ সমাধিস্থ করবার আগ পর্যন্ত এই মসজিদেই কফিন রাখা হয়েছিল।

www.pathagar.com

বারো

পুত্রের হাতে পিতা যেখানে বন্দি

ম্যাকডোনাল্ড রেস্তোরাঁ থেকে যখন আমরা আগ্রার দুর্গ দেখবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকান্তকে নিয়ে রওনা হলাম সময় তখন প্রায় দুটোর উপরে। প্রচণ্ড গরমের তাপ অনুভব করছিলাম। একটু আগে শিলা বৃষ্টির পর কড়কড়া রোদ উঠাতে ভ্যাপসা আর কিছুটা গুমোট লাগছিল। দিল্লীর দুর্গ লালকেল্লা বা রেড ফোর্ট হিসেবে পরিচিত হলেও আগ্রার দুর্গই আদি লাল কেল্লা বা রেড ফোর্ট। প্রকৃতপক্ষে মোগলদের স্বর্ণ যুগ বলে চিহ্নিত সময়ে আগ্রা রাজধানী হওয়াতে আগ্রার দুর্গ হয়ে উঠেছিল হিন্দুস্থানে মোগলদের নির্মিত সবচাইতে বড় এবং জৌলুসময় দুর্গ। দিল্লীর দুর্গ আগ্রার দুর্গের চাইতে মাপে অনেক ছোট। দিল্লীর দুর্গের আদি নাম ছিল 'লাল হাভেলি'।

তাজমহলের উত্তর দিকের চত্বরের শেষ প্রান্তে যমুনার পাশে দাঁড়ালে আগ্রার দুর্গকে যমুনার অপর পারে মনে হয়। সাধারণত অনেকে তাই মনে করে থাকেন। আমারও তেমনই ধারণা ছিল। প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তাজমহল আর দুর্গ একই পাড়ে। তবে দুর্গটি যমুনা নদী ও তাজমহল হতে উত্তর পশ্চিম দিকে যেখানে ঘোড়ার পায়ের নালের মত বাঁক নিয়েছে সে বাঁকের প্রায় শেষ প্রান্তে বলে দূর হতে অপর পারে মনে হয়।

যাই হোক আমরা শহর ছেড়ে কিছুটা বের হয়ে আউলিয়া রোড ধরে আগ্রার দুর্গের 'অমর সিং দরওয়াজা' বা গেটের সামনে হাজির হলাম। আগ্রার দুর্গে শহরের দিক থেকে দু'টি দরওয়াজা রয়েছে, একটি অমর সিং, অপরটি 'দিল্লী দরওয়াজা' বা দিল্লী গেট। দিল্লী দরওয়াজা সর্বসাধারণের প্রবেশ পথ নয়। আগ্রার দুর্গের যে প্রান্তে মোগল সৈনিকদের এবং রাজকর্মচারীদের বাসস্থান ছিল সে জায়গাটি এখন আগ্রাস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর এলিট ফোর্স-এর প্যারা ব্রিগেডের নিবাস। কাজেই দুর্গের অধিকাংশ এলাকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে অমর সিং গেট বা দরওয়াজা। দুর্গের পূর্ব পাশ দিয়ে যমুনার তীর ঘেঁষে হালে নির্মিত হয়েছে 'যমুনা কিনারা রোড'। 'বিজলি ঘর সার্কেল' থেকে দু'টি রাস্তা দুর্গের উত্তর-দক্ষিণ দিক থেকে 'যমুনা কিনারা রোডে' মিলে একটি ত্রিভুজের সৃষ্টি করেছে। আর এ ত্রিভুজের মাঝে আগ্রার দুর্গ।

মোগলদের সমতলের দুর্গগুলো সাধারণত নদীর তীরে তৈরি। বস্তুতপক্ষে

www.pathagar.com

সমতলে যেখানে নদী তার পাশেই বিশ্বের বহু জায়গায় রয়েছে মধ্যযুগীয় দুর্গ। যেহেতু নদীই ছিল সামরিক এবং প্রশাসনিক কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা এ কারণে এবং সামরিক কৌশলগত কারণেই বেছে নেয়া হত এ ধরনের জায়গা। তাছাড়া দুর্গের ভেতরে এবং পাশে গড়ে উঠা সংরক্ষিত শহরগুলোতে পানির ব্যবস্থা করাও ছিল এর অন্যতম কারণ। দিল্লী অথবা লাহোরে প্রায় একই সময়ের তৈরি দুর্গগুলো নদীর কিনারাতেই গড়ে উঠেছিল। লাহোরে জাহাঙ্গীরের নির্মিত দুর্গটিও এককালে রাভী নদীর পাড় ঘেঁষেই ছিল। সামরিক সরবরাহের প্রধান ব্যবহার্য ছিল এ নদী পথ। আগ্রার দুর্গে শাহজাহানের মৃত্যু হলেও তার মরদেহ যমুনা নদী দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাজমহলে দাফনের জন্য। দুর্গের তিন পাশে পাকা পরিখা, যার মধ্য দিয়ে আজও পানি প্রবাহিত হয়, নদীর সাথে যুক্ত ছিল। অপর পাশে ছিল যমুনা নদী যা এখন বহুদূরে সরে গিয়েছে।

আমরা আমাদের বাহন ছেড়ে পরিখার উপরের পুল পার হয়ে অমর সিং দরওয়াজার সামনের টিকিট ঘর থেকে টিকিট কিনে নিরাপত্তা তল্লাশির পর ভেতরে প্রবেশ করলাম। অমর সিং দরওয়াজা বিশাল আকারের, মোগল স্থাপত্যের বিশেষত্ব বজায় রেখেছে। দরওয়াজার খিলানের নিচে দিয়ে রাজকীয় হাতির আনাগোনা হতো। এক সময়ে উভয় গেটের সামনে ছিল কাঠের ড্র ব্রিজ (Draw Bridge) বা টানা সেতু। সেতুটি উঠিয়ে ফেললে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ অথবা হামলা করা কঠিন হয়ে পড়ত। এ কৌশল ছিল দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অংশ। গেটের পেছনে মূল দেয়ালের উপরে রয়েছে 'নহবতখানা'। এখানে দাঁড়িয়ে মোগল সেনাদের গার্ড সংকেত দিত সম্রাটদের আগমন, নির্গমন অথবা যে কোন ধরনের বিপদের। সমগ্র দুর্গের দেয়াল লাল রংয়ের বিশাল স্যান্ড স্টোন (Sandstone) দ্বারা তৈরি। দেয়ালের উপর দিয়ে ঘোড়া চালাবার মত চওড়া রাস্তা আর তার নিচে ছিল কর্তব্যরত সেনাদের বাস করবার প্রকোষ্ঠগুলো।

অমর সিং গেটের নামকরণ করেন খোদ সম্রাট শাহজাহান। পূর্বে এর নাম ছিল 'আকবরী দরওয়াজা'। পরে সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে পিতামহের নাম বদলিয়ে তাঁর শত্রু বলে পরিচিত যোধপুর, রাজপুতানার রাও অমর সিং-এর নামে নামকরণ করেন।

ইতিহাসের তথ্য মতে রাও অমর সিংকে শাহজাহানের দরবারে হাজির করা হয়েছিল। শাহজাহানের প্রধান খাজাঞ্চি (কোষাধ্যক্ষ) সালাবাত খানের অভিযোগ ছিল অমর সিংয়ের বিরুদ্ধে। সালাবাত খান মীর বকশি অমর সিংকে সম্রাটের দরবারে নিয়ে আসলে এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটির সূত্রপাত হলে রাও অমর সিং নিজের তরবারির আঘাতে দরবারের মধ্যেই সালাবাত খানকে হত্যা করেন। হত্যার পর পরই কিংকর্তব্যবিমূঢ় উপস্থিত রাজ দরবারের সদস্য এবং সম্রাটের সামনেই অমর সিং তার ঘোড়ায় চড়ে 'আকবরী দরওয়াজা' দিয়ে লাফিয়ে পড়লে ঘোড়ার তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে

www.pathagar.com

এবং অমর সিং গ্রেফতার হন। পরে অমর সিংকে শাহজাহান মৃত্যুদণ্ড দেন। তথাপি রাও অমর সিং-এর সাহসের প্রতি সম্মান দেখিয়ে একদার 'আকবরী দরওয়াজা'-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় অমর সিং দরওয়াজা। সালাবাত খানকে বর্তমানের আগ্রা-দিল্লী মহাসড়কের কাছেই সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর সমাধি এখন দর্শনীয় স্থান এবং 'চৌষাট খাম্বা' (চৌষট্টি খাম্বা) নামে পরিচিত। ঘটনাটি ঘটে ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে।

আমি আর আমার সহধর্মিণী অমর সিং গেট পার হয়ে একটু উপরের দিকে উঠে 'লাহোরী দরওয়াজা' দিয়ে মূল দুর্গের রাজকীয় প্রাসাদের অংশে প্রবেশ করলাম। এ দুর্গ থেকে বাবর হতে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত হিন্দুস্থান শাসন করেছেন। আগে যেমনটা বলেছি অল্প সময়ের জন্য শাহজাহান রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তর করে শাহজাহানবাদ এবং লাল হাভেলী বা দিল্লীর লাল কেল্লা, জামে মসজিদ, চাদনী চক নির্মাণ করলেও পুনরায় আগ্রায় ফিরে এসেছিলেন। এখানে বাবরের পুত্র হুমায়ুন ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং ওই বছরেই হুমায়ুন আফগান সেনাপতি শেরশাহ সূরীর কাছে পরাজয় বরণ করে রাজ্য হারান এবং ক্ষমতাচ্যুত হন। শেরশাহ পাঁচ বছর এ দুর্গে ছিলেন। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে আফগানদের পরাজিত করে হুমায়ুন পুনরায় আগ্রার দুর্গে ফিরে আসেন।

বাল্যকালে পড়েছি যে হুমায়ুন শের শাহের কাছে পরাজিত হবার পর বহুদিন ছদ্মবেশে আগ্রার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন। ওই সময়ে এক ভিস্তিওয়ালা তার জীবন বাঁচিয়েছিল বলে কথিত। হুমায়ুন ভিস্তিওয়ালাকে (পানি বহনকারী) বলেছিলেন যে জীবনে তিনি পুনরায় হিন্দুস্থানের বাদশাহ হতে পারলে একদিনের জন্য হলেও তাকে (ভিস্তিওয়ালাকে) হিন্দুস্থানের বাদশাহ বানাবেন। ভিস্তিওয়ালা পাগলের প্রলাপ ভেবে ঘটনাটি ভুলে গিয়েছিলেন। হুমায়ুন পুনরায় রাজ্য উদ্ধারের পর তাঁর কথা রেখেছিলেন। মোগল সম্রাট হুমায়ুন ভিস্তিওয়ালাকে একদিনের বাদশাহ বানিয়েছিলেন।

শেরশাহও মোগলদের পদাঙ্কে দিল্লীতে দুর্গ সংস্কার করেছিলেন যা আজ পুরানা কেল্লা নামে পরিচিত। ওই কেল্লাতেই লাইব্রেরি থেকে পা পিছলিয়ে পড়ে গিয়ে সম্রাট হুমায়ুন মারা গিয়েছিলেন। দিল্লীতে একমাত্র গ্রেট মোগল সম্রাটদের মধ্যে হুমায়ুনের সমাধি 'ওয়ান্ড হেরিটেজ' হিসেবে রক্ষিত রয়েছে।

আগ্রার দুর্গ থেকেই দাক্ষিণাত্যের হিন্দু কিংবদন্তির মহারাজা শিবাজী, যিনি মারাঠা রাজ্যের স্থপতি হিসেবে অধিক পরিচিত, অভিনব উপায়ে পালিয়েছিলেন। শিবাজী ছিলেন অত্যন্ত চতুর; তবে নৃশংস হিসেবেই অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন। ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে শিবাজী দক্ষিণের গোলকুন্ডা সালতানাতের সিপাহসালার আফজল খাঁকে বাঘের নখের আঘাতের পর বিষাক্ত বিচ্ছু দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন। শিবাজী আফজাল খাঁ-এর আমন্ত্রণে এক মন্ত্রণা সভায় গিয়েছিলেন। সেখানেই এ হত্যার

www.pathagar.com

ঘটনা ঘটানো হয়। শিবাজীর পক্ষের ঐতিহাসিকরা বলে থাকেন যে সে সভায় আফজল খাঁ শিবাজীকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ পরিকল্পনার কথা আগাম টের পেয়ে শিবাজী আফজাল খাঁ-এর সাথে আলিঙ্গন করার ছলে তার পরিধেয়র মধ্যে লুকানো বিষাক্ত বাঘের নখ পিঠে বসিয়ে দেন এবং বিচ্ছুর বিষ প্রয়োগ করেন। আফজাল খাঁ ওই আঘাতের বিষক্রিয়ায় মারা যান।

শিবাজী মোগলদের বিরুদ্ধেও তার বাহিনী ব্যবহার করেন। বিশেষ করে আওরঙ্গজেব কর্তৃক হিন্দু প্রজাদের উপর জিজিয়া কর আরোপের তিনি ঘোর বিরোধিতা করেন। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে আগ্রার দুর্গে শিবাজী বাহিনীর একাংশ এবং তাঁর ছয় বছরের পুত্রসহ শিবাজীকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে হাজির করা হয়। শিবাজী সম্রাটের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এসেছিলেন এমনটি নয়। তাঁকে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। অবশ্য এ তথ্য নিয়ে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। তবে শিবাজী নিজ থেকে আসার পাত্র ছিলেন না তা তার চরিত্র বিশ্লেষণেই প্রতীয়মান হয়। আওরঙ্গজেব তাঁর পক্ষ হয়ে শিবাজীকে আফগানদের শায়েস্তা করতে কান্দাহার যেতে বলেন। অনেক ঐতিহাসিক বলেন, সম্রাট শিবাজীর ছয় বছরের পুত্র সাম্ভাজীকে দুর্গে বন্ধক হিসেবে রেখে যেতে বলেছিলেন বলেই শিবাজী সম্রাটের মনোভাব বুঝতে পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। অপরদিকে সম্রাট শিবাজীকে মহারাজার সম্মান না দেয়াতে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখালে তাকে আগ্রার কোতোয়াল (পুলিশ প্রধান) ফওলাদ খানের তত্ত্বাবধানে দুর্গের এক প্রান্তে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। ওই অবস্থাতেই ছত্রপতি শিবাজী আওরঙ্গজেবের হাতে বন্দিত্ব অবস্থা থেকে পালাবার পরিকল্পনা করেন।

পরিকল্পনা মোতাবেক শিবাজী হাকিমের সহায়তায় জীবননাশকারী কঠিন রোগের ভান করে চিকিৎসা নিতে থাকেন। কোতোওয়ালকে রাজি করিয়ে তার সাথের সৈনিকদের দাক্ষিণাত্যে মারাঠা রাজ্যে ফেরৎ পাঠান যাতে সম্রাটের সেনা দ্বারা তার বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। একই সাথে শিবাজীর জীবন রক্ষার প্রার্থনার জন্য প্রতিদিন আগ্রার বিভিন্ন দরগা এবং মন্দিরে বড় বড় বাক্সে ফুল এবং মিষ্টান্ন ভোগ এবং তবারক হিসেবে পাঠাতে থাকে। কয়েক সপ্তাহ এ প্রক্রিয়া চলার পর একদিন শিবাজী ও তার ছয় বছরের পুত্র ভোগ আর তবারক-এর বাক্সে লুকিয়ে দুর্গ থেকে বের হতে সক্ষম হন। শিবাজী আর তার পুত্র সাধুদের বেশ ধরে দাক্ষিণাত্যে পালিয়ে যান। শিরাজী পাহাড়ে চলে যান আর দাক্ষিণাত্যে তার নাবালক পুত্রের মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করে ছেলেকে আওরঙ্গজেবের রোষানল থেকে বাঁচাতে প্রয়াস নিয়েছিলেন। শিবাজীর পুত্র সাম্ভাজী ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে মারাঠা রাজ্যের মহারাজা হয়েছিলেন।

আগ্রার দুর্গ থেকে শিবাজীর পলায়ন দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন মারাঠা রাজ্য গঠনে ভারতের হিন্দুবাদীরা মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে প্রতীকী হিসেবে দেখে থাকেন।

www.pathagar.com

বর্তমান সময়ে মহারাষ্ট্রের মারাঠা নেতা বালঠাকরে শিবাজীকে ইতিহাসের পাতায় মহিমাময় করে তুলতে চেষ্টা করেন। আগ্রার দুর্গের সামনে মহারাজা শিবাজী অশ্বারোহিত অবস্থায় স্থাপিত বিশাল মূর্তি দুর্গে প্রবেশকারী প্রতিটি দেশি-বিদেশি পর্যটককে শিবাজীর কথা মনে করিয়ে দেয়।

শিবাজীর জীবনগাঁথা থেকে প্রতীয়মান যে ইতিহাস খুব সহজ বিষয় নয়। ইতিহাস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে রচিত হতে পারে। শিবাজী আর মোগলদের দ্বন্দ্বকে বহুভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব এবং সেটাই বর্তমানের ভারতের কিছু কিছু রাজনীতিবিদ আর ঐতিহাসিকরা করছেন।

হালে মহারাষ্ট্রে শিবসেনারা ছত্রপতি শিবাজীর বিশাল মূর্তি মুম্বাইয়ের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে, অনেকটা নিউইয়র্কের অদূরে স্ট্যাচু অব লিবার্টির মত। একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে এ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে। শিবসেনারা এর মাধ্যমে মারাঠাদের ঐতিহ্য আলাদাভাবে বজায় রাখতে জোরেসোরে নেমেছে। অবশ্যই মারাঠারা মনে করে একমাত্র ছত্রপতি শিবাজীই পেরেছিলেন মারাঠাদের মধ্যে একপ্রকার একতা আনতে। অনেকেই অবশ্য শিবাজীকে নিয়ে বাড়াবাড়ির কারবার প্রয়াসকে শিবসেনাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ মনে করেন।

আমরা আগ্রার দুর্গে প্রবেশ করে ভেতরের প্রধান ফটক পার হতেই সামনে চোখে পড়ল অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর লাল রংয়ের বৃহৎ প্রাসাদ। এ প্রাসাদের নাম 'জাহাঙ্গীর মহল'। এটি ছিল মহিলাদের অন্তঃপুরী। যদিও নাম জাহাঙ্গীর মহল, কিন্তু তথ্যে প্রকাশ এ মহল প্রথম ব্যবহার করেন আকবর রাজপুত বেগমদের জন্য। আগেও বলেছি যে আকবরের রাজপুত বেগম যিনি জাহাঙ্গীর ওরফে সেলিমের মাতা তার নাম যোধা বাঈ ছিল কিনা তা সন্দেহাতীত নয়। যদিও আইন-ই-আকবরীতে এক জায়গায় এ নাম উল্লেখ করা আছে। ইতিহাসে সেলিমের মাতা এবং সম্রাট আকবরের তৎকালীন রাজপুতানার আমের-এর (আমের এ নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের সফরের বর্ণনা আগেই করেছি।) কাচওয়া (Kacchwha) রাজপুত রাজা ভারমল -এর কন্যা কোনাওয়ারী বাঈ ওরফে হারকা বাঈ-এর মোগল দলিলাদি হতে প্রাপ্ত পরিবর্তিত নাম মরিয়ম জামানী বেগম হিসেবে পাওয়া যায়।[১] জাহাঙ্গীরের মায়ের নামে পাকিস্তানের লাহোরে মরিয়মী জামানী মসজিদও রয়েছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন নুরুদ্দীন সেলিম, ওরফে জাহাঙ্গীর, তার রাজত্বের সময়ে মায়ের নামে এ মসজিদ তৈরি করেন। মরিয়ম জামানী ছিলেন আকবরের তৃতীয় বেগম। তাঁর মৃত্যু হয় ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে। মরিয়ম জামানীর সমাধি রয়েছে আগ্রার অদূরে, আগ্রা-দিল্লী মহাসড়কের উপরে। দুটি ভারতীয়

১. *Christopher Buyers 'The Rathor Dyneasty Genology'*

www.pathagar.com

ছায়াছবিতে আকবরের রাজপুত স্ত্রী জাহাঙ্গীরের মাতার নাম যোধা বাঈ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে যা ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে সঠিক নয় বলে অনেক ঐতিহাসিকরা মনে করেন।[২] প্রফেসর এন আর ফারুকী, আল্লাহাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (Allahabad Central University) খ্যাত ঐতিহাসিক বলেন যে, যোধা বাঈ আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের রাজপুত বেগমের নাম ছিল। জাহাঙ্গীর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে জগত গোসাইন পরে যার ঐতিহাসিক নাম রাজকুমারী মানমাতিকেও বিয়ে করেছিলেন।

হালের বলিউডের ছবি 'যোধা আকবর' নিয়েও রাজস্থানে ইতিহাস বিকৃতির বিতর্ক হয়েছিল। সে বিষয় আগেই উল্লেখ করেছি। যাই হোক এটা একটা ঐতিহাসিক বিতর্ক। আমি শুধু উল্লেখ করলাম; তবে আইন-ই- আকবরীতে নাম ছাড়া আর কোন বিবরণ পাইনি। সে কারণে আমিও এ বিষয়ে নিশ্চিত নই। এটুকু শুধু উৎসুক পাঠকদের গবেষণার খোরাক হতে পারে ভেবে উল্লেখ করলাম।

আমরা অভূতপূর্ব এ সুন্দর মোগল স্থাপত্যের নিদর্শন জাহাঙ্গীর মহল ছেড়ে দেওয়ান-ই-আম এলাকায় আসলাম। এটি ব্যবহার হত মোগল সম্রাটদের সাথে সাধারণ লোকের দেখা সাক্ষাত এবং প্রতি দিনকার রাজকার্য পরিচালনার জন্য। সম্পূর্ণ মার্বেল পাথরের তৈরি পিলারের উপরে এ দরবার। দরবারের উঁচু জায়গায় সম্রাটের সিংহাসনের নির্দিষ্ট স্থান ছিল; এর নিচে ছিল মন্ত্রী ও পরিষদের স্থান। আগেই বলেছি দেওয়ান-ই-আম-এর সামনেই রয়েছে ইংরেজ শাসকদের একজন, জন রাসেল-এর এ সমাধি। এ সমাধি মনে করিয়ে দেয় ১৮৫৭ আর দু'শত বছর ইংরেজ শাসনের সময়কাল এবং উপনিবেশবাদের কুফল যার কুপ্রভাব থেকে আজও উপমহাদেশ বের হতে পারেনি।

দেওয়ান-ই-আম-এর পরেই রয়েছে সুন্দর একটি ফুলের বাগান। সমগ্র বাগানটি ৮৫ স্কয়ার মিটার জায়গা জুড়ে। এখন কিছুটা বিবর্ণ। বাগান আর 'দিওয়ান-ই-আম' পার হয়ে ভেতরে আসতেই দেখতে পেলাম দিওয়ান-ই-খাস। এটি ছিল বাদশাহ- এর সাথে উচ্চপর্যায়ের বিশেষ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারের জায়গা। এটি দুর্গের সবচাইতে সংরক্ষিত জায়গাগুলোর একটি। এখানে এখনও দেখা যায় সম্রাট জাহাঙ্গীর নির্মিত কালো পাথরে সিংহাসনের নির্দিষ্ট স্থানটি। এখানেই সম্রাট শাহজাহান তার জন্য নির্মাণ করেছিলেন অন্যতম বিস্ময় "ময়ূর সিংহাসন' (Peacock throne)। পরে তিনি দিল্লীর দুর্গে 'দিওয়ান-ই-আম' এ তৈরি করেন এ সিংহাসনের নির্দিষ্ট স্থান যার চর্চা আমরা পরে করব। এই সিংহাসনেই বসানো ছিল বিশ্বের বিখ্যাত 'কোহিনূর' হীরা যা বর্তমানে

২. *A fact, myth blend in relook at Akbar-Jodha Bai" Ashley D' Mellow, Times of India Dec. 10, 05.*

www.pathagar.com

ব্রিটেনের রাণীর মুকুটে শোভা পাচ্ছে।

ময়ূর সিংহাসন ছিল মোগল সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যের প্রতীক। সোনা আর প্লাটিনামের পাত দিয়ে মোড়ানো সিংহাসনের পেছন দিকটা দু'টি ময়ূরের মেলা পেখমের মত দেখতে ছিল। সিংহাসন স্যাফায়ার, রুবী, এমেরাল্ড, মুক্তা এবং অন্যান্য দামী রত্ন দ্বারা খচিত ছিল। সবচাইতে আকর্ষণীয় ছিল কবুতরের ডিমের আকারের ওই সময়ের সবচাইতে বড় হীরক খণ্ড 'কোহিনূর'। ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের বাদশাহ নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করে দিল্লী পর্যন্ত দখল করে প্রায় এক বছর ধরে দিল্লী তছনছ করেন। ইতিহাসে উল্লেখিত যে নাদির শাহ এক বছরে ৫০,০০০ হতে ১,৫০,০০০ দিল্লীবাসীর প্রাণ হরণ করেন। সে সময় মোগল সম্রাট ছিলেন মোহাম্মদ শাহ রঙ্গীলা✦। দুর্বল চরিত্রের মোহাম্মদ শাহের দরবার লুট করে ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে নাদির শাহ। পারস্য ফিরে যাবার সময় ময়ূর সিংহাসন সাথে নিয়ে যান। একই সাথে অত্যন্ত চতুরতার মাধ্যমে মোহাম্মদ শাহের সাথে পাগড়ি বদল করবার উছিলায় 'কোহিনূর' হস্তগত করেন। ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে পারস্যে নাদির শাহের হত্যার পর ময়ূর সিংহাসনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঐতিহাসিকরা মনে করেন সিংহাসনটি ভেঙে লুট করা হয়েছিল। তবে পারস্যের নাদির শাহ আফসারী হতে ইরানের শেষ বাদশাহ, রেজা শাহ পাহলভী পর্যন্ত যে সিংহাসনে বসতেন তার নামও ছিল ময়ূর সিংহাসন। অনেকটা শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসনের মত দেখতে ছিল বলে ওটাকেই মোগল সম্রাট শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসন মনে করা হতো।

অনেকে মনে করেন ময়ূর সিংহাসন মোগল রাজত্বের জন্য অপয়া প্রমাণিত হয়েছিল। সম্রাট শাহজাহান এ সিংহাসন তৈরি করবার পর বেশি দিন ব্যবহার করতে পারেননি। দিল্লী ছেড়ে পুনরায় আগ্রাতে আসবার পর ছেলের হাতে বন্দি হলেন। আর শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে সিংহাসনের দাবিতে ভাইয়ের হাতে ভাইদের নিহত হতে হল। শুধু পুত্ররাই নয়, নিহত হয়েছিল শাহজাহানের বেশ কয়েকজন পৌত্রও। আওরঙ্গজেব ময়ূর সিংহাসন ব্যবহার না করলেও তাঁর রাজত্বের পর ধস নামতে শুরু করল মোগল রাজত্বের।

'কোহিনূর' হীরার কাহিনী অনেক বড়। বিশ্বাস করা হয় বিশ্বের সবচাইতে বড় এ হীরক খণ্ড দাক্ষিণাত্যের গোলকুন্ডার হীরার খনি হতে জাঠ মারাঠাদের হাত ঘুরে খিলজি, তুঘলক আর লোধীদের হাতের ছোঁয়া থেকে বাবরের হাতে আসে। মোহাম্মদ শাহ রঙ্গীলা এটাকে হারান নাদির শাহ আফসারীর নিকট। বহু হাত ঘুরে পাঞ্জাবের মহারাজা রনজিৎ সিং-এর কাছে আসে 'কোহিনূর' যিনি তার মৃত্যুকালে উড়িষ্যার

✦ *মোহাম্মদ শাহ ছিলেন দুর্বল চিত্তের মোগল শাসক যিনি আমোদ ফূর্তির মধ্যেই ব্যস্ত থাকতেন। তার ছোট নাম ছিল রঙ্গীলা।*

www.pathagar.com

মন্দিরে দান করতে চেয়েও দিতে পারেননি। পাঞ্জাব (১৮৪৯) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে আসলে শিখ রাজত্বকে স্বীকৃতি দিতে শর্ত ছিল 'কোহিনূর' কোম্পানির হাতে তুলে দেবার। অবশেষে লর্ড ডালহৌসী শর্তসাপেক্ষে মহারাজা দিলীপ সিংকে রণজিৎ সিং-এর উত্তরাধিকার মেনে নিলে 'কোহিনূর' উপহার হিসেবে দেয়া হয়। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনের মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভেট দেয়া হয় এ কোহিনূর হীরা। এরপরের কাহিনী আরও বিশদ। কোন এক পর্যায়ে কোহিনূর তৎকালীন সুবে বাংলাতেও এসেছিল বলে অনেকেই দাবি করে থাকেন। বর্তমানে 'টাওয়ার অব লন্ডনের' ক্রাউন জুয়েলের প্রদর্শনী গ্যালারিতে দেখা যায় খণ্ডিত কোহিনূর। আমি যতবার লন্ডনে গিয়েছি ততবার দেখবার উদ্যোগ নিলেও মাত্র ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে কোহিনূর দেখবার সুযোগ হয়েছিল। সত্যই দেখবার মত রত্ন কোহিনূর। অপর দিকে ময়ূর সিংহাসন দিল্লী থেকে বের হবার পর আর দিল্লীতে ফেরেনি এমনকি এর হদিসও নিশ্চিত করা যায় না। ইতিহাস যেমন নির্মম তেমন চমকপ্রদও বটে।

আমরা মন্ত্রযুদ্ধের মত দিওয়ান-ই-খাস-এর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম বেশ কিছুক্ষণ। পরে দিওয়ান-ই-খাস ছেড়ে 'খাস মহল' এর দিকে এগিয়ে গেলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম বেগম সাহেব কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ক্লান্তি আমারও লাগছিল। প্রচণ্ড গরম। পানির দু'টি বোতল শেষ, ব্যাগে রয়েছে আর একটি মাত্র। তবুও ঐতিহাসিক এ দুর্গ সম্পূর্ণ না দেখে যাব না বলে সংকল্প নিলাম। হেঁটে হেঁটে প্রতিটি জায়গা দেখলাম। বিকেল প্রায় তিনটার উপরে। এরই মধ্যে একঘণ্টা কিভাবে পার হল টের পাইনি।

'খাস মহল' প্রধান হল রুমের মত। দু'পাশে বেশ বড় বড় ঘর। সমস্ত দালানটি সাদা মার্বেলের তৈরি। অদ্ভুত সুন্দর রঙিন মার্বেল খচিত পেইন্টিং সমগ্র দেয়ালে। এ এলাকা ছিল মোগল হেরেম। অগণিত নর্তকী, নারী খেদমতগার আর তথাকথিত বান্দীদের সরব উপস্থিতি ছিল এই এলাকায়। একপাশে বাদশাহদের অন্যান্য বেগমদের বাসস্থান। আরেক পাশে শীষ মহল। তবে লাহোরের শীষ মহলটি আগ্রার শীষ মহল হতে অধিক সংরক্ষিত। এ জায়গা হতে পেছনে যমুনা নদী দৃশ্যমান আরও দৃশ্যমান নদীর বাঁকে তাজমহল সৌধ। এ এলাকাতে দুটি মসজিদ রয়েছে। একটি মতি মসজিদ যেটি ব্যবহার করতেন রাজকীয় পরিবার অন্যটি 'মীনা মসজিদ' অন্যান্য মহিলাদের জন্য।

'শীষ মহল' থেকেই সূত্রপাত হয়েছিল শাহজাদা সেলিম আর প্রধান নর্তকী সুন্দরী আনারকলির বিতর্কিত প্রেম কাহিনী। অথচ কথিত আছে যে সম্রাট আকবর আনারকলিকে গোপনে লাহোর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লাহোরে সবচাইতে পুরাতন এবং বড় বাজারের নাম আনারকলি বাজার আর বাজারের একপ্রান্তে মোগলদের নির্মিত

www.pathagar.com

আনারকলি মসজিদকে ঘিরে শাহজাদা সেলিম আর আনারকলির প্রেমাখ্যান আজও জীবন্ত। এ প্রেম কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই ভারতে বহু ছবি নির্মিত হয়েছে। বহুল আলোচিত ছবি 'মোগল-ই-আজম' এ কাহিনীর ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছিল। তবে ঐতিহাসিকরা এ ধরনের কাহিনীর সত্যতা নিরূপণ করেননি। তথাপি স্থান কাল পাত্র ভেদে সেলিম আর আনারকলির প্রেম কাহিনী মোগলদের নিয়ে সৃষ্ট সাহিত্যের অন্যতম উপাদান হিসেবে সমাদৃত। লাহোর (পাকিস্তানে) আনারকলি এলাকার ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকরা সহজে দিতে পারেন নাই।

'শীষ মহল' এর পাশেই 'জেনানা মিনা বাজার'। এক সময় একেবারে যমুনার তীর ঘেঁষে ছিল এ ব্যালকনি সদৃশ মার্বেল পাথরের চত্বর। এ জায়গাটিতে শুধুমাত্র মহিলা ব্যবসায়ীদের তাদের মনোহরী জিনিস হেরেমের মহিলাদের নিকট বিক্রির জন্য অনুমতি দেয়া ছিল। এখন সে নয়নাভিরাম দৃশ্য নেই। এখন ওখানে দাঁড়িয়ে যমুনা নামক নদীকে খুঁজতে হয়।

আমরা যত দ্রুত সম্ভব আগ্রার দুর্গ দেখা শেষ করতে চেয়েছিলাম বলে আরও বহু দর্শনীয় অংশে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে শেষ করেছিলাম সম্ভবত মোগল ইতিহাসের অন্যতম দুঃখজনক ঘটনার সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা 'মুসাম্মান বুরুজ' দেখার পর।

'মুসাম্মান বুরুজ' সম্বন্ধে শাহজাদী জাহানারার সমাধি নিয়ে আলোচনার সময় আমি যৎসামান্য উল্লেখ করেছি। এখানে পুত্রের হাতে পিতা বন্দি দশায় ছিলেন জীবনের শেষ আটটি বছর। বৃদ্ধ শাহজাহান এখানে থেকেই তার প্রিয়তমা পত্নীর সৌধ তাজমহল দেখে সময় কাটাতেন। তিন পুত্র আর কয়েকজন পৌত্রের মৃত্যুর সংবাদ তিনি এখানে বসেই শুনেছেন। শুনেছেন তার পুত্র আল-সুলতান, আল-আযম ওয়াল খাকান, আল-মোকাররম আবুল মোজাফফর মহিউদ্দিন মোহাম্মদ আওরঙ্গজেব বাহাদুর আলমগীর-১ বাদশাহ গাজী, ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুস্থানের ষষ্ঠ✦ মোগল সম্রাট ঘোষিত হবার সংবাদ। আলমগীর বা আওরঙ্গজেবের মসনদে আরোহণে হিন্দুস্থানের কট্টরপন্থী মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল। যদিও বিষয়টি বিতর্কিত। তবুও সিংহভাগ ঐতিহাসিক তেমনটাই মনে করেন।

শাহজাহান জানুয়ারি ২২, ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে আগ্রার দুর্গের 'মুসাম্মান বুরুজ' এ ৭৪ বছর বয়সে মারা যান। কথিত আছে যে শাহজাহানের মৃতদেহ আগ্রার দুর্গের কোন দরওয়াজা দিয়ে বের করা হয়নি বরং 'বুরুজের' পাশে যমুনার বক্ষে রক্ষিত নৌকায় করে তাজমহল সৌধে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কথিত আছে যে শাহজাহান তনয়া

✦ *Fergus Nicoll, opcit : এর মতে জাহাঙ্গীরের পৌত্র দওয়ার বক্স। 'শের শাহ ছিলেন পঞ্চম মোগল সম্রাট (১৬২৭-২৮)। দওয়ার বক্স এক বছর সিংহাসনে ছিলেন।*

www.pathagar.com

জাহানারা বাবার মৃতদেহ একজন বাদশাহের প্রাপ্য মর্যাদায় দাফন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আওরঙ্গজেব ইসলামী প্রথা মতে অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে দাফন করতে ইচ্ছুক ছিলেন বলে জাহানারার পরিকল্পনা বাতিল হয়। অন্তত চন্দনের কফিনে মৃতদেহ যমুনা বক্ষ দিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন জাহানারা।[৩]

'মুসাম্মান বুরুজ' দেখে আমরা ফিরে আসছিলাম। প্রচণ্ড গরম। এর মধ্যেও কিছু বিদেশি পর্যটকদের দেখলাম অবাক দৃষ্টে মোগলদের অবিস্মরণীয় কীর্তি দেখছে। আমি ফিরতি পথে পেছনে ফিরে আগ্রা দুর্গের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশের দিকে তাকালাম। ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস যে মোগলদের স্বর্ণযুগ বলে যার শাসনকালকে আখ্যায়িত করা হয়েছে সেই বাদশাহর জন্য তার নামে কোন সমাধি সৌধ আলাদাভাবে গড়া হয়নি। শাহজাহান ছাড়া আর প্রত্যেকের সৌধই আলাদাভাবে গড়া হয়েছে। ভাবছিলাম আকবরের পর হতে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মোগলদের আত্মঘাতি কর্মকাণ্ডের কথা। ভাবছিলাম শাহজাহানের শেষ জীবনের দুঃসহ দিনগুলোর কথা।

আওরঙ্গজেবের হাতে জন্মদাতা পিতা শাহজাহানের বন্দি হওয়া এবং আট বছর অন্তরীণ জীবনের বিবর্ণ অধ্যায় নিয়ে বাংলা ভাষায় বেশ কিছু হৃদয়স্পর্শী নাটক ও নভেল লিখা হয়েছে। এ সব নাটক নভেলের ঘটনার বর্ণনা আর নাটকীয়তায় মনে হতে পারে মোগল ইতিহাসে পুত্রের হাতে পিতার অন্তরীণ হওয়ার অথবা ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের হত্যার মত ঘটনা এটাই প্রথম অথবা শেষ উদাহরণ ছিল, কিন্তু তেমনটি নয়। মোগল শাসকদের হেরেমে একাধিক রক্ষিতা, রক্ষিতা হতে বেগমের মর্যাদা, একাধিক বেগমের সন্তানদের মধ্যে পিতার উত্তরাধিকারী হবার প্রতিযোগিতা মোগল সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির পর হতেই একাধিকবার ঘটেছে। মস্নদের মোহে ভাইয়ের হাতে ভাইকে প্রাণ দিতে হয়েছে। হয়েছে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। বাবর হতে বাহাদুর শাহ জাফরের শাসনকাল পর্যন্ত এ সব ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় থেকেছে।

সম্রাট শাহজাহান, ওরফে খুররম, ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজপুত বেগম বিবি বিলকিস মালকানি বেগম সাহেবা ওরফে মানমতির পুত্র। মালকিনি বেগম সাহেবা ছিলেন যোধপুরের রাজা শ্রী উদয় সিং সাহেব বাহাদুর এবং রাণীমাতা রাজভাত কাচ্ছাবাঈ রাণী মাদরাঙ্গ দেবজী সাহিবার কন্যা। তবে আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে শাহজাহানের মায়ের নাম জগত গোসাইনী হিসেবে উল্লেখ রয়েছে।[৪] শুধু শাহজাহানের মাতাই নন তার পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর ওরফে সেলিমের মাতাও ছিলেন

---

৩. *Koch' Ebba "The Complete Tajmahal and the River front Gardens of Agra;" Thames & Hudson ltd.*

৪. *The Ain -Akbari -(Translated by Colonel H.S. Jarret), P . 323 New Taj office, New Delhi .*

www.pathagar.com

হিন্দু রাজপুত নারী। তবে তাঁর নাম যোধা বাঈ ছিল কিনা তা নিয়ে খোদ রাজপুতদের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে।

শাহজাহান, ওরফে খুররম, পারস্য সাম্রাজ্যের আক্রমণ ঠেকাতে পিতা এবং ভ্রাতা শাহরিয়ারের উপর্যুপরি অনুরোধের পরেও সহযোগিতা করেনই নাই বরং উল্টো বিদ্রোহ করেছিলেন। ওই বিদ্রোহে তিনি পরাজিত হলে তাঁর দুই পুত্রকে, দারাশিকো আর আওরঙ্গজেব, নূরজাহান নিজের কাছে জিম্মি রেখে শাহজাদা খুররমকে চুক্তি মোতাবেক, পরিবারসহ, দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়েছিলেন। খুররম দাক্ষিণাত্যের শাসকদের সহযোগিতায় নিজের অনুগত বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করে পিতার মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকেন। শাহজাদা খুররম তার পথ নিষ্কন্টক করতে ভাই খসরুকে পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের এবং বিদ্রোহের অভিযোগে হত্যা করেছিলেন। অপর দিকে তাঁর শ্বশুর, আসিফ খাঁ হত্যা করেন জাহাঙ্গীরের উত্তরাধিকারী বলে পরিচিত শাহরিয়ারকে। এ হত্যাও তৎকালীন শাহজাদা খুররমের পরোক্ষ সম্মতিতে সংঘটিত হয়েছিল। হত্যা করা হয়েছিল শাহজাহানের নিজের ভ্রাতুস্পুত্র দওয়ার বক্সকেও।✦

এত সব রক্তাক্ত ঘটনা এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে খুররম ফতেহপুর সিক্রিতে পৌঁছে সৎমাতা নূরজাহানকে বন্দি করে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। সম্রাট শাহজাহানও পিতারই পথ অনুসরণ করেছিলেন।

জাহাঙ্গীর, ওরফে শাহজাদা সেলিমও তাঁর পিতা সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে একাধিকবার বিদ্রোহ করেছিলেন। কারণ, সম্রাট আকবর শাহজাদা সেলিমকে নয় সেলিমের পুত্র শাহজাদা খুররমকে তাঁর উত্তরাধিকারী করতে চেয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরই মোগল শাহজাদা হিসেবে প্রথম বিদ্রোহের সংস্কৃতির পথে পা বাড়িয়েছিলেন। এর ধারাবাহিকতায় সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শুধু পিতাকেই বন্দি করেননি- হত্যা করেছিলেন একই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী বাকি তিন ভ্রাতাকে। বড় বোন জাহানারাকেও পিতার সাথে বন্দি রেখেছিলেন পিতার মৃত্যু পর্যন্ত।

মোগল ধারাবাহিকতায় শাহজাহানের হেরেমেও তাঁর তৃতীয় স্ত্রী ছাড়াও ছিল একাধিক রক্ষিতা, যাদের অনেককে বেগমের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। এ ধারায় শাহজাহানের মোট বেগমের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল নয় জনে। মমতাজ মহল ছাড়াও যে দু বেগম ইতিহাস খ্যাত হয়েছিলেন তাদের কথা আমরা আগেই জেনেছি। এদের একজন আকবরাবাদী বেগম অপর জন ফতেহ্পুরী বেগম। এ দু'জনই জনহিতকর কাজের জন্য ইতিহাসে আলোচিত রয়েছেন।

✦ *দওয়ার বক্স পঞ্চম মোগল সম্রাট, যার রাজত্বকাল ছিল এক বছর। তিনি ছিলেন খসরুর পুত্র।*

www.pathagar.com

সম্রাট শাহজাহানের একাধিক বেগম থাকলেও তিনি তাঁর তৃতীয় বেগম মমতাজ মহলের প্রতি ছিলেন সবচাইতে দুর্বল। মমতাজ মহল শাহজাহানের সিংহাসন আরোহণের তিন বছরের মাথায় ১৬৩১খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের বোরহানপুরেই মৃত্যুবরণ করেন। আগ্রায় তাজমহল নির্মাণ শেষে পুনঃ সমাধিস্থ না হওয়া পর্যন্ত তিনি বোরহানপুরেই সমাধিস্থ থাকেন প্রায় ২৩ বছর।

আগ্রার দুর্গের ইতিহাস মোগলদের মসিময় অধ্যায়েরও সাক্ষীর ইতিহাস। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ভ্রাতৃ হত্যা, ছলচাতুরী, ষড়যন্ত্র সবকিছুই করা হয়েছে। ক্ষমতা এমনই যেখানে স্বার্থপরতা ছাড়া নৈতিকতা অনেক কম।

আগ্রার দুর্গের 'নওবত খানা' 'রং মহল' 'শীষ মহল' 'খাস মহল'এ সবখানেই হেরেমের বারবণিতারা হেসে গেয়ে নেচে সম্রাট, সম্রাজ্ঞী আর রাজপুত্রদের মনোরঞ্জন করেছেন। যাদের হেরেম থেকে বের করে দেয়া হতো তারা দুর্গের বাইরে কাছাকাছি পতিতালয়ে আশ্রয় পেতেন। এখনও এসব ঐতিহাসিক দুর্গগুলোর কাছাকাছিতেই রয়েছে ঐতিহাসিক পতিতালয়। সম্রাজ্ঞী আর শাহজাদীদের খেদমতে দাসী, বান্দী ছাড়াও আরেক সম্প্রদায় প্রাধান্য পেতেন যাদেরকে আমরা 'হিজড়া' বলে জানি। হিজড়াদের মধ্যে যারা দুর্গে স্থান পেত তাদের প্রতিপত্তিও কম ছিল না। দিল্লীর পুরাতন অঞ্চলে 'লাল কউন' (Lal Kaun) তুর্কমান গেট নামক জায়গাগুলোতে ছিল হিন্দুস্থানের হিজড়াদের সবচাইতে বড় পল্লী। আজও ভারতের বৃহৎ হিজড়া পল্লী 'লাল কউন' আর 'তুর্কমান গেট'। এদের মধ্যে অনেকেরই প্রতিপত্তি আর প্রভাব ছিল অনেক দরবারিদের চাইতে বেশি। আজও ভারতের বড় বড় শহরে এদের দেখা যায় দলে দলে মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন উপায়ে অর্থ আদায় করতে। এদের সামাজিক অবস্থান সুলতানী এবং মোগল আমলে যেমন ছিল আজ তার ধারে কাছেও নেই।

আমরা অমর সিং দরওয়াজার কাছাকাছি এসে পাশের ছোট্ট একটি বাগানে বেঞ্চের উপর কিছুক্ষণ বসতে যেতে যেতে মুল ফটকের নহবত খানার কাছে আগ্রার দুর্গের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস খোদাই করা একটি ফলক দেয়ালের পাশে একটি বেদীতে বাধানো দেখলাম। রোদের তাপ উপেক্ষা করে ফলকটি মনোযোগ দিয়ে পড়লাম।

এ দুর্গটি সিকারওয়ার রাজপুতদের তৈরি ছোট কলেবরের ইটের দেয়ালের দুর্গ ছিল। গজনভীরা যখন দিল্লী হামলা করেন ১০৮০ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের বিবরণে প্রথমে এ দুর্গ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা যায়। সিকান্দার লোধী ছিলেন দিল্লীর প্রথম সুলতান যিনি আগ্রার এ দুর্গে বাস করতে আসেন। প্রসঙ্গত: সম্রাট আকবরের সমাধি সিকান্দ্রাবাদ যার নামে নামকরণ করা হয়েছিল তিনি সিকান্দার লোধী। সিকান্দার লোধী আগ্রাকে দ্বিতীয় রাজধানী বানিয়েছিলেন। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দর লোধী মৃত্যুবরণ করেন। সিকান্দার লোধীর পুত্র ইব্রাহিম লোধী আগ্রার দুর্গ নয় বছর ব্যবহার করেন। ওই সময়ে মোগল

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের স্থপতি সম্রাট জহিরুদ্দিন বাবরের হাতে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোধী পরাজিত হলে বাবর এ দুর্গ থেকে সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। বাবরই প্রথম আগ্রা দুর্গের সংস্কার শুরু করেন। যমুনা নদী হতে দুর্গে পানির ব্যবস্থা করেন। দুর্গে পুকুর আর কূপ খননের মাধ্যমে পানির সরবরাহ নিশ্চিত করেন। এই সময়ে বাবর 'কোহিনূর' হীরাসহ প্রচুর ধনসম্পত্তি অর্জন করেন।

আগেই যেমন বলেছি এ দুর্গে সম্রাট হিসেবে হুমায়ুনের অভিষেক হয়। সময়টা ছিল ১৫৩০ এবং একই বছরে তিনি আফগান জেনারেল শেরশাহ সূরীর নিকট পাঁচ বছরের জন্য সাম্রাজ্য হারান। হুমায়ুন ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে আফগানদের পানিপথ-এর যুদ্ধে হারিয়ে বিজয়ীর বেশে আগ্রার দুর্গে পুনঃপ্রবেশ করেছিলেন।

সম্রাট আকবরই প্রকৃতপক্ষে আগ্রার দুর্গের সংস্কার করে এর পরিধি বাড়িয়েছিলেন। ওই সময় এ দুর্গের নাম ছিল 'বাদলগড়'। আকবর ইটের বদলে 'লাল স্যান্ডস্টোন' দিয়ে দুর্গের উঁচু দেয়াল তৈরি করেন। তৈরি করেন বিভিন্ন মহল এবং সৈনিকদের আবাসস্থল। আবুল ফজল, আকবরের ঐতিহাসিক, লিখেছেন; আগ্রার দুর্গের পুনঃ নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে। ১৪,৪৪,০০০ শ্রমিক ৮ বছর কাজ করেছিল এ দুর্গকে বর্তমান (ওই সময়ের) পর্যায়ে আনতে।

জাহাঙ্গীর আগ্রার দুর্গ উন্নয়নে তেমন মনোযোগ দেননি। কারণ, তিনি লাহোরকেই বেছে নিয়েছিলেন বেশিরভাগ সময় কাটাবার জন্য। আগ্রার দুর্গের জৌলুস বাড়িয়েছিলেন আকবরের পৌত্র (নাতী) সম্রাট শাহজাহান। শাহজাহানের পরে আওরঙ্গজেব আগ্রাতে বহুদিন কাটিয়েছিলেন কিন্তু তিনি দুর্গে তেমন কোন নতুন স্থাপনায় হাত দেননি।

এরপরের ইতিহাস ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে আগ্রার দুর্গ পরিণত হয় "সিপাহী বিদ্রোহ"-এর (স্বাধীনতা যুদ্ধ) ঐতিহাসিক স্থানে।

আগ্রার দুর্গ দেখে ভেতরের গেট পার হয়ে কৃষ্ণকান্তের গাড়ির জন্যে 'লাহোরী দরওয়াজার' দিকে হাঁটতে হাঁটতে পেছনে ফিরে 'নক্কর খানাটি' আবার দেখলাম। এক সময়ের নক্কর খানা দেওয়ান-ই-আম-এর সাথে একটি আচ্ছাদন দ্বারা সংযুক্ত ছিল। এখন আর সে সংযোগ নেই। এই নক্কর খানা থেকেই সম্রাটদের দর্শনার্থী এবং আমন্ত্রিত রাজা-মহারাজাদের আগমন ও বিদায়ের সময়ে নির্দিষ্ট সুরে নহবৎ আর বড় ঢোল বাজিয়ে আগমন ও নির্গমন বার্তা ঘোষণা করা হত। এ দুর্গের ভেতরে সাধারণদের প্রবেশাধিকার ছিল দিওয়ান-ই আম পর্যন্ত। এখানেই চলত দরবারের প্রতিদিনকার কাজ, ব্যক্তিগত শুনানি এবং দর্শন। অন্তঃপুরী অথবা সম্রাটদের ব্যক্তিগত আরামগাহ্ আম লোকদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ। খুব নিকটতম কেউ না হলে অন্যরা দিওয়ান-ই আম পার হতে পারতেন না। অন্তঃপুরীতে ছিল রমরমা অবস্থা। জৌলুসে আর চোখ ধাঁধানো

www.pathagar.com

সাজে সজ্জিত ছিল দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস এবং জেনানা (মহিলা) মহল। আজ এসব ইমারত দেখলে ওই সময়কার রমরমা অবস্থা কল্পনা করা যায় না। আমরা এখন যা দেখেছি তা ওই সময়কার ইমারতের প্রাণহীন কঙ্কাল মাত্র। এখন মার্বেলের দেয়ালগুলো লালচে রং ধরেছে বা ধরতে দেয়া হচ্ছে। পরিষ্কার করবার প্রয়াস নেই। দেয়ালে, খিলানে রঙিন মার্বেলের যে কাজগুলো ছিল তার অনেক জায়গা ফাঁকা দেখা যায়। চুরি হয়েছে এসব মূল্যবান রত্ন এবং পাথর। ইতিহাস পাঠে এবং স্থানীয়দের কাছে শোনা যায় যে, মোগলদের ঐতিহ্যবাহী সম্পদ, এমনকি দেয়াল থেকে এসব মূল্যবান পাথর আর রঙিন মার্বেল চুরি হয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এবং পরে। এ চুরি আর লুট চলে কয়েক বছর। একই অবস্থা দিল্লীর লালকেল্লার। তারপর নাম কা ওয়াস্তে রক্ষণাবেক্ষণ হয়েছে। দুটো দুর্গের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকরা এমনভাবে সৈনিকদের ব্যারাক তুলেছে যার সাথে দুর্গের ভেতরের স্থাপত্যের কোন সামঞ্জস্য নেই। সোজা সৈনিক ব্যারাক। ওগুলো দেখলে মনে হয় মোগলকীর্তি গুলোকে খাটো করে দেখাতে এমনটি করা হয়েছে। সৈনিক ব্যারাকগুলো আজও তেমন অবস্থাতেই রয়েছে।

এখনও দুর্গ দু'টিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী থাকলেও এর দর্শনার্থীদের থেকে প্রচুর পয়সা আয় হলেও রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা দেখে আমার কল্পনা হোঁচট খেয়েছে। মোগলদের বিশ্বখ্যাত এসব স্থাপনার বর্তমান হাল দেখে আমার মনে হয়েছে এ গুলোকে অবহেলা করার একটা প্রচেষ্টা এখন চলছে। যে সব স্থাপনা 'ওয়ার্লড হেরিটেজ' (World heritage) হিসেবে চিহ্নিত সেগুলোর কিছু রক্ষণাবেক্ষণ হলেও আগ্রা আর দিল্লীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বহু নিদর্শন ক্রমেই ধ্বংস স্তূপে পরিণত হচ্ছে। দিল্লীর জামে মসজিদের কথা আগেই বলেছি। ওই মসজিদের ভেতরের অবস্থা আর বাইরের বস্তি যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তার চাইতে আরও সুন্দর পরিবেশ দেখব বলে আমার ধারণা ছিল। অবশ্য এ অবস্থার জন্য কিছুটা মসজিদ কমিটিও দায়ী বটে। জানিনা আগামী পঞ্চাশ অথবা একশত বছর পর এসব স্থাপনার অবস্থা কেমন হবে। অনেক স্থাপনাই হয়ত বিলীন হয়ে যাবে, থাকবে হয়ত ইতিহাসের পাতায়। হয়ত আরো বিতর্ক হবে এই সব স্থাপনার অতীত পরিচয় আর মালিকানা নিয়ে। এমন হলে হারিয়ে যাবে উপমহাদেশের ইতিহাসের সবচাইতে গৌরবময় ও জৌলুসময় অধ্যায়। এসব স্থাপনা শুধুমাত্র একটি দেশের সম্পদ নয়, এগুলো আগামী প্রজন্মের এবং বিশ্ব সভ্যতার সম্পদ। এসব কীর্তি ধ্বংস হলে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানব সভ্যতা।

আমরা আগ্রার দুর্গে প্রায় দু'ঘণ্টা কাটিয়ে মিঃ কৃষ্ণকান্তকে ইতিমাতদ্দৌলার সমাধি সৌধে যেতে বললাম। কৃষ্ণকান্ত চৌবে একটু হেসে বললেন যে তিনি এ জায়গার কথা আমার মুখ থেকে শুনে কিছুটা আশ্চর্য হয়েছিলেন। কারণ, বেশিরভাগ বিদেশি পর্যটকদের কাছে জায়গাটি অপরিচিত। আরও হেসে বললেন, "আমরাই

www.pathagar.com

আমাদের কষ্ট কম করতে ধারে কাছের জায়গা হিসেবে ইতিমাতদ্দৌলার সমাধি দেখতে বলে থাকি এবং অনেক সময় কাটাতে গাইডদের ইঙ্গিতও দিয়ে থাকি।" আমি মিঃ কৃষ্ণকান্ত চৌবের অকপট স্বীকারোক্তিতে আনন্দিত বোধ করলাম। কৃষ্ণকান্ত চৌবে আরও বললেন তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, আমরা কোন গাইড নেইনি। তার মতে বেশিরভাগ গাইডই মনগড়া গল্প শুনিয়ে পর্যটকদের সহমর্মিতা উসকে দিয়ে কিছু উপরি আয় করতে চান। মহিলা পর্যটক হলে ওই সময়কার মহিলাদের অসহায়ত্বের কথা, পুরুষ হলে হেরেমের গল্প আর বৃদ্ধ হলে সম্রাটদের শেষ জীবনের করুণ পরিণতির কল্পকাহিনী ফাঁদে। অবশ্য সবাই নয়। এদের মধ্যে অনেকেই ইতিহাসের সঠিক অধ্যায়গুলো তুলে ধরেন বটে।

www.pathagar.com

তের

মোগল-ই-আজম : আকবর দি গ্রেট

আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই যমুনা নদীর পশ্চিম পাড়ে মির্জা গিয়াস বেগ, যাকে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইতিমাতদ্দৌউলা নাম দিয়েছিলেন, তাঁর সমাধি সৌধে এসে পৌছলাম। সৌধটি যমুনার পূর্ব তীরে। ইতিমাতদ্দৌলার সমাধিকে ছোট তাজমহল বলা হয়ে থাকে। কারণ, এর বাগান হতে শুরু করে সৌধের নক্সা প্রায় তাজমহলের মত। ইতিমাতদ্দৌলার সমাধি মোগল স্থাপত্যে এনে দেয় নতুনত্ব। ইতোপূর্বের রেড স্যান্ডস্টোনের বদলে এ সৌধের অভ্যন্তরের নির্মাণে প্রথম বারের মত ব্যবহার করা হয় সাদা মার্বেল। প্রথমবারের মত ব্যবহার হয় মার্বেলের ঝালর। এ সৌধে মার্বেলের ঝালর তৈরির অপূর্ব শৈলী দেখা যায়। তাছাড়া সাদা মার্বেলের উপর রঙিন মার্বেলের সাহায্যে ফুলের নক্সা প্রথমবারের মত এখানে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও মূল সৌধে পাশাপাশি কবর দেয়া হয় ইতিমাতদ্দৌলা এবং তাঁর বেগম সাহেবাকে। কবর দু'টি তাজমহল সৌধে শাহজাহান আর মমতাজ মহলের কবরের অনুরূপ। ঐতিহাসিকরা মনে করেন এখান থেকেই তাজমহলের ধারণা নেয়া হয়েছিল। ইতিমাতদ্দৌলার সমাধি মোগল স্থাপত্যের নির্মাণ শৈলীর পরিবর্তনের। সূচনা হয় মূল দালানে স্যান্ডস্টোনের জায়গায় মার্বেলের ব্যবহারের মাধ্যমে।

ইতিমাতদ্দৌলা ছিলেন একাধারে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শ্বশুর, সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পিতা। অপরদিকে তিনি সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের পিতামহ এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মৃত্যুর পর এ সৌধ ১৬২২-১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তৈরি করেছিলেন তাঁর কন্যা, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। এ সমাধি সৌধে নূরজাহানের বহু আত্মীয়ের সমাধি রয়েছে। যেহেতু কবরগুলোর গায়ে কোন নাম লিখা নেই তাই পরিচয় পাওয়া কষ্টকর।

আমরা ইতিমাতদ্দৌলার সমাধি থেকে বের হয়ে যমুনা নদী পার হয়ে সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি সৌধ দেখতে রওয়ানা হলাম। তখন বিকেল ৪-৩০। হাতে মাত্র ৩০ মিনিট সময়। পাঁচটার মধ্যে এ সব জায়গা বন্ধ হয়ে যায় এবং পাঁচটার মধ্যে চত্বরে প্রবেশ করতে পারলে দেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকা যায়। তবে সূর্য ডোবার আগেই বের হয়ে যেতে হয়।

যমুনা নদী পার হতে নদীর পূর্ণ দৃশ্য দেখে আমার মনে হল হয়ত আগামী কয়েক

www.pathagar.com

দশকে এখানে নদী ছিল বলে ধারণা করাও কষ্টকর হবে। কৃষ্ণকান্ত বললেন, "এ নদীর যতটুকু বাকি আছে তাতে বেশ মাছ পাওয়া যায়।" তাঁর মতে নদীর এ হাল হয়েছে উজানে বেশ কিছু বাঁধ দেয়ার কারণে। তার মতে এক সময় আগ্রার-অন্যতম আকর্ষণ ছিল যমুনা নদী। আমি ভাবছিলাম আমাদের নদীগুলোর কথা। ভারতের অভ্যন্তরে রাজ্যের মধ্যে নদীতে বাঁধ দেয়া নিয়ে প্রায়শইয় সংঘর্ষ হয় সেখানে সেখানে আমাদের মত দুর্বল দেশের পক্ষে ভারতের সাথে পানির ভাগাভাগির প্রশ্নে বিবাদ কিভাবে মিটবে? ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ আর টিপাইমুখে বাঁধ দেয়ার বিষয়ে আন্তর্জাতিক চাপ অথবা ভারত সরকারের আন্তরিক ইচ্ছা ছাড়া সুরাহা হবার নয়। আমাদের অনেক নদী অচিরেই আগ্রা অথবা দিল্লীর সন্নিকটের যমুনা নদীর মত হতে যাচ্ছে। প্রায়শই বিশেষজ্ঞরা এ ধরনের মতামত দিয়ে থাকেন।

আমরা সময়মত সেকেন্দ্রাতে জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর, যার জন্মের পরের নাম ছিল বদরউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর-এর তাঁর সৌধের বাইরে পৌঁছলাম। জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর জন্মগ্রহণ করেন ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে। পিতা সম্রাট নাসিরউদ্দিন হুমায়ুনের অকাল মৃত্যুর পর ১৪ বছর বয়সে তৃতীয় মোগল সম্রাট হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আকবর হিন্দুস্থান শাসন করেন ১৫৫৬ হতে আমৃত্যু, ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আকবরের মৃত্যুর সময় মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল ১ (এক) মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার। প্রায় ৪০ বছরের রাজত্বে আকবর বহুবিধ কারণে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন। হিন্দুস্থানের তথা ভারতীয় ঐতিহাসিকরা অশোকের পরে আকবরকে আকবর মহান' (Akbar the Great) বলে আখ্যায়িত করেছেন। বলা হয়ে থাকে যদিও আকবর প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি তথাপি তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠীর এবং ধর্মের হিন্দুস্থানীদের এক করতে পেরেছিলেন। এর কারণ, আকবর তাঁর মন্ত্রণাদাতা হিসেবে যে নবরত্ন নির্বাচন করেছিলেন তাদের মেধা এবং সততা নিয়ে আকবরের সময়ে এবং পরেও কোন ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলতে পারেননি। আকবর সার্থক শাসক হতে পেরেছিলেন কারণ তিনি প্রত্যেকের মতামত শুনে সিদ্ধান্ত নিতেন। তাঁর নবরত্নে ছিল হিন্দুস্থানের ইতিহাসের খ্যাতিমান ব্যাক্তিবর্গ। আকবরের নবরত্নদের মধ্যে ছিলেন ঃ

আবুল ফজল (১৫৫১-১৬০২), তিনি ছিলেন আকবরের রাজত্বের সময়ের ইতিহাস রচয়িতা। তিনি 'আকবর নামা' এবং আইন-ই-আকবরী নামক ঐতিহাসিক বিবরণী সাত বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে শেষ করেছিলেন।

ফয়েজী (১৫৪৭-১৫৯৫), আবুল ফজলের অগ্রজ, ছিলেন গণিতবিদ এবং কবি। তিনি জাহাঙ্গীরের শিক্ষকও ছিলেন।

মিয়া তানসেন, ছিলেন বিশ্বের অন্যতম সঙ্গীতজ্ঞ।

www.pathagar.com

রাজা বীরবল (১৫২৮-১৫৮৩), ছিলেন একজন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তার অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি আর হাস্যরসের জ্ঞানের কারণে তিনি আকবরের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহচর হয়ে উঠেন। রাজা বীরবলের আসল নাম ছিল মহেশ দাস। তিনি ব্রাহ্মা ছদ্মনামে কবিতাও লিখেছেন। বীরবল উত্তর-পশ্চিম হিন্দুস্থানে আফগানদের সাথে যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

বীরবলের উপস্থিত বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রচুর জনশ্রুতি রয়েছে। একবার বীরবলকে দিল্লীর কাক গণনা করতে আদেশ দেয়া হয়। প্রায় মাসখানেক পর রাজা বীরবল সম্রাট আকবরকে জানালেন যে দিল্লীতে তার গণনা শেষ হবার দিন পর্যন্ত ৯,৯৯,৯৯৯টি কাক ছিল। সম্রাট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এ হিসাব কি সঠিক? এখনি কোন সময়ে গণনা করলে এ সংখ্যা পাওয়া যাবে?" বীরবল উত্তর দিলেন, "কম পেলে মনে করতে হবে ওইদিন দিল্লীর কাক আগ্রায় বেড়াতে এসেছে আর বেশি পেলে ধরে নিতে হবে আগ্রার কাক দিল্লীতে বেড়াতে গিয়েছে।" এমনই বোধ করি পরিসংখ্যান। এখনকার বহু পরিসংখ্যানকে দিল্লীর কাক গণনার মত মনে হয়।

আকবর আর রাজা বীরবলের বন্ধুত্ব ছিল বেশ গভীর। আকবর বীরবলকে যেমন সমীহ করতেন বীরবলও তেমনি আকবরের প্রতি ছিলেন অনুগত। তবে স্বভাবজাত কারণেই বীরবল আকবরের ছোটখাট ভুলগুলো হাস্যচ্ছলে ধরিয়ে দিতেন। আবার মাঝে মধ্যে উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে আকবরের টিপ্পনির সুন্দর উত্তর দিতেন।

একদিন সকালের দিকে আকবর তার দুই পুত্রকে নিয়ে যমুনার তীরে বেড়াতে গেলেন। দিনটি অত্যন্ত সুন্দর ছিল। আকবর এবং তার ছেলেদের নদীতে গোসল করতে ইচ্ছা হল। তিনজনে নদীতে নেমে যেতে যেতে বীরবলকে তাদের গায়ের বস্ত্রগুলো দেখে রাখতে বলে সাঁতরিয়ে বহু দূর চলে গেলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনজনকে না পেয়ে বীরবল বস্ত্রগুলো কাঁধে নিয়ে পায়চারি করছিলেন। এতক্ষণে সম্রাট আকবর বীরবলের পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে বীরবল তোমাকে এ অবস্থায় দেখে ধোপার গাধা যেমন অনেক ওজনের বস্ত্র নিয়ে বেড়ায় সে রকম মনে হচ্ছে।"

বীরবল সময়ক্ষেপণ না করে স্মিত হেসে বললেন, "জাঁহাপনা তার চাইতেও খারাপ। ধোপার গাধা এক গাধার ওজন উঠায়– আমি গাধাতো তিন গাধার ওজন নিয়ে হাঁটছি।" সম্রাট আকবর বীরবলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

আকবর বীরবলের মাঝে এ ধরনের বহু হাস্যরস আর বুদ্ধির প্রতিযোগিতার গল্প লিপিবদ্ধ আছে।

অন্যান্য নবরত্নদের মধ্যে আরও যারা ছিলেন তারা হলেন ঃ

রাজা টোডর মল। রাজা টোডারমল ছিলেন আকবরের অর্থমন্ত্রী এবং তিনি তার

www.pathagar.com

বিচক্ষণতা আর প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য কিংবদন্তি হয়ে আছেন। রাজা টোডরমলের রাজস্ব আদায়ের ফর্মুলার রেশ ব্রিটিশ রাজ হতে অদ্যাবধি রয়ে গেছে। তিনি সুবে বাংলায় আকবরের হয়ে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানও করেছিলেন।

রাজা মানসিং : কাচ্ছাওয়া রাজপুত। আকবরের আত্মীয় মান সিং ছিলেন অন্যতম প্রধান সেনাপতি। মান সিং-এর বংশধররা জয়পুরের মহারাজা হিসেবে আজও পরিচিত আছেন। রাজা মান সিং বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের সফল জেনারেল ছিলেন। তিনি সুবেবাংলার সুবেদারও ছিলেন।

আব্দুল রহিম বৈরাম খান, তিনি ছিলেন একজন কবি। আকবর যখন নাবালক অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করেন ওই সময় হতে আকবর আইনত সম্রাট হওয়া পর্যন্ত সম্রাটের প্রশিক্ষক ও গাইড ছিলেন। পরে আকবর তাঁকে মক্কা শরীফে হজ্বে পাঠিয়েছিলেন।

ফকির আজিজ দীন, তিনি ছিলেন আকবরের ধর্মগুরু।

মোল্লা দোপেয়াজা, উপস্থিত বুদ্ধি আর তাঁর বুদ্ধিমত্তার জন্য পরিচিত মোল্লা দোপেয়াজা ছিলেন আকবরের অন্যতম পরামর্শদাতা।

আকবরের নবরত্ন শুধু ইতিহাসেই বিখ্যাত নয়। এই নবরত্নের নামে ভারতে আজও বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্য সংগঠন রয়েছে।

আকবরের শেষ জীবন সুখে কাটেনি। কয়েকবার তার পুত্র শাহজাদা সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। উত্তরাধিকারী হওয়া নিয়ে পিতার সাথে বিবাধ ছিল পুত্রের, যার নাম আকবর মানত করে তাঁর পীর হযরত সেলিম চিশতি (রঃ) এর নামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে রেখেছিলেন। পিতার বিরুদ্ধে সেলিমের বিদ্রোহ চলাকালে আকবরের অন্যতম সহচর নবরত্নের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আবুল ফজলকে শাহজাদা সেলিম হত্যা করেন। আবুল ফজল গিয়েছিলেন পিতা-পুত্রের মধ্যে শান্তি স্থাপনার দূত হিসেবে। অবশ্য শাহজাদা সেলিমও, (পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর), শান্তিতে ছিলেন না। পুত্র শাহজাদা খুররমও (পরে সম্রাট শাহজাহান), পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সিংহাসনের দাবিদার হিসেবে।

আমরা যখন সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধি সৌধে পৌছলাম তখন প্রায় পাঁচটা। টিকিট কেটে বাইরের গেট পার হয়ে মোগল স্থাপত্যের প্রতীক লাল স্যান্ডস্টোনে নির্মিত সৌধ চত্বরে প্রবেশের জন্য বিশাল দরওয়াজার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করলাম। এসব দরওয়াজা সাধারণ দরওয়াজাই নয়, এগুলো এমনভাবে তৈরি হয়েছিল যে, দু'পাশে একাধিক প্রকোষ্ঠে একাধিক প্রহরী থাকতে পারে। ওই গেট দিয়ে প্রবেশ করলে সামনেই আকবরের সমাধি সৌধ অপূর্ব মহিমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে। মোগল

www.pathagar.com

স্থাপত্যের প্রথম দিককার প্রতীক হিসেবে অনেকটা দিল্লীতে আকবরের পিতা সম্রাট হুমায়ুন-এর সমাধি সৌধের মতই। গেটের সামনে ছোট করে সৌধের ইতিহাস সাটানো রয়েছে। আকবরের জীবদ্দশাতেই এ সৌধের কাজ শুরু হয়েছিল এবং শেষ হয়েছিল আকবরের পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়।

আকবরের সমাধির প্রধান দরওয়াজা পার হলেই অতি পরিচিত মোগল সময়কার বাগান যার নাম 'চারবাগ' দৃষ্টি কাড়ে। চারবাগ পানির ফোয়ারা আর পানির নহর (খাল) দ্বারা সমান চার ভাগে ভাগ করা। অত্যন্ত যত্নের সাথে সংরক্ষিত রয়েছে এ সুন্দর বাগান। আকবরের সৌধ পর্যন্ত যেতে যে ফুটপাত রয়েছে তার দু'পাশে আছে ফুলের বাগান। অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর পরিবেশ।

আকবরের সমাধি প্রকোষ্ঠে ঢুকতে হলে সুড়ঙ্গের মত পথে সৌধের নিচের দিকে যেতে হয়। ওই সুড়ঙ্গ (টানেল) দিয়ে আকবরের সমাধি প্রকোষ্ঠে ঢুকতে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল যেভাবে এ সুড়ঙ্গ নির্মিত তাতে সামনে সম্রাটকে কুর্নিশ করবার মত দৃশ্যের অবতারণা হয়। ঠিক সে রকমই প্রায়। ওই সমাধি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে হলে নিচের দিকে যেতে হয়। যাহোক, আমি 'আকবর দি গ্রেটের' সমাধির সামনে। এখানে এই প্রথম একজন ভক্তকে মাথায় রুমাল দিয়ে আগরবাতি জ্বালিয়ে বসে ফাতেহা পাঠ করতে দেখলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম অতি মলিন বেশভুষার এ ব্যক্তিটি চোখ বন্ধ করে মোনাজাত করছেন। মনে হল তিনি সাধারণ একজন পর্যটক নন। এখানেই কোথাও থাকেন। পরে জানলাম তিনি প্রতিদিনই এখানে আসেন এবং বংশ পরম্পরায় মোগলদের বংশজাত বলেও নিজেকে বিবেচনা করে থাকেন। আমি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে ফাতেহা পাঠ করে আকবরের সমাধি কক্ষ থেকে বের হয়ে আশেপাশের কক্ষে আরও কয়েকটি সমাধি দেখলাম। এখানে আকবরের দুই কন্যা সাকরুন নিছা আর আরাম বানোর সমাধিও রয়েছে।

বের হবার পথে গেটের সামনের ফলকে লেখা পড়ে সমাধি সৌধ সম্বন্ধে আরেকটু জানলাম। সমাধি সৌধটি 'চারবাগ'-এর (চারবাগান) ঠিক মাঝখানে এবং সমাধি সৌধের চারদিকে চারটি পানির নহর এমনভাবে চার খণ্ডে ভাগ করেছে মনে হবে সৌধটি চারটি নদী আর বাগানের সংযোগ রক্ষা করছে। এর ব্যাখ্যায় বলা হয় 'বেহেস্তের' বর্ণনায় যে চার বাগান (চারবাগ) এবং চারটি নদীর কথা উল্লেখ রয়েছে তারই অনুকরণে আকবর নিজের সমাধি রচিত করেছেন। ঐতিহাসিকরাও আবুল ফজলের 'আকবরনামা' এর উদ্ধৃতি দিয়ে এমন কথা বলেন। প্রতিটি মোগল বাগান আর সৌধ এ তত্ত্বের প্রভাতেই নির্মিত।

বিকেল পাঁচটার উপর বেজে যাওয়াতে আমাদেরকে আকবরের সমাধি দেখা সংক্ষিপ্ত করে আগ্রার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে পৌছতে যাত্রা শুরু করতে হল। সময়ের

www.pathagar.com

অভাবে মাত্র ১ কিলোমিটার দূরে আগ্রা-মথুরা-দিল্লী রোডের উপরে বহুল আলোচিত আকবরের রাজপুত বেগম সম্রাট জাহাঙ্গীরের মাতা মরিয়ম-উজ-জামানীর (যাকে যোধা বাঈ হিসেবে বিতর্কে আনা হয়েছে) সমাধি দেখা হলো না।

ফেরার পথে ভাবছিলাম শুধুমাত্র বাবর ছাড়া মোগল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগের প্রথম ছয়জন সম্রাটের সমাধি হিন্দুস্থানের, বর্তমান উপমহাদেশের, বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে, যদিও জাহাঙ্গীরের সমাধি বর্তমান পাকিস্তানে। এর মাধ্যমে হিন্দুস্থানকে একত্র রাখবার মোগল প্রচেষ্টার বিষয়টি ইতিহাসে পর্যালোচিত হয়েছে কিনা জানি না। যদিও আওরঙ্গজেবের পরে হিন্দুস্থানে মোগলদের সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়েছিল, তবুও স্বীকার করতেই হবে আজকের উপমহাদেশের ইতিহাস-সংস্কৃতি আর গৌরবগাঁথায় দিল্লীর সালতানাত হতে মোগল যুগ পর্যন্ত সময়ের অবদান বিশ্বের ইতিহাসে উজ্জ্বলতর অধ্যায় হিসেবে রচিত ও লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং থাকবে।

আমরা আগ্রার শহর ছেড়ে রেলওয়ে স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা প্রায় ৬-৩০-এর কাছাকাছি। আমাদেরকে আরও দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে ফিরতি ট্রেনের জন্য। এবার শতাব্দী দিল্লীর পথে আগ্রায় আসবে লক্ষ্মৌ থেকে। মিঃ কৃষ্ণকান্ত চৌবেকে ধন্যবাদ দিয়ে তার পাওনা আর বকশিস দিয়ে বিদায় জানালে তিনি আবার আগ্রায় আসলে তাকে মনে করতে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। আমরা আগ্রার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের প্রধান প্লাটফরমে এসে উঠলাম।

আগ্রা শহরের মধ্যে যে ছয়টি রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ আর প্রধান স্টেশনই 'আগ্রা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশন'। আগ্রার নিকটবর্তী রেলওয়ে জংশন হল আলীগড়, মাত্র ৮২ কিঃমিঃ উত্তরে। স্টেশনটি ব্রিটিশ রাজের সময় তৈরি হলেও বর্তমানে এর বেশ সংস্কার করে যথেষ্ট উন্নত করা হয়েছে। আদলটা অনেকটা আমাদের চট্টগ্রামের পুরাতন স্টেশনের মত। তবে আগ্রার স্টেশনে পর্যটকদের জন্য ভাল সুবিধা তৈরি হয়েছে। সুন্দর একটি ক্যাফেটরিয়া রয়েছে।

ভারতে তথা সমগ্র উপমহাদেশে রেল ব্যবস্থাকে আজও ওই দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সামরিক কৌশলে অপরিহার্য মনে করা হয়। তাছাড়া যাত্রী এবং মালামাল বহনে সস্তা এবং সবচাইতে উপযোগী ভারতীয় রেল ব্রিটিশ রাজের সময় হতেই ছিল বিশ্বের বৃহৎ রেল ব্যবস্থা। বর্তমানের ভারতেও বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম রেল ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্বের সবচাইতে বেশি যাত্রী পরিবহন করে ভারতীয় রেল ব্যবস্থা।

ভারতে তথা উপমহাদেশে রেলের পরিকল্পনা শুরু হয় মাদ্রাজ-এ (বর্তমানে চেন্নাই) ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে, সিপাহী বিদ্রোহের পঁচিশ বছর পূর্বে। ওই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান অফিস লন্ডন থেকে চাপ দেয়া শুরু হয় উপমহাদেশে রেল ব্যবস্থা চালু করবার জন্য। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে তখনকার গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ, যার নামে

www.pathagar.com

আমাদের দেশের অন্যতম বৃহত্তম রেল সেতুও রয়েছে, উপমহাদেশে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব পাকাপোক্ত করতে রেলের অবদান যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে সে বিষয়ে অনুধাবন করে কোম্পানির পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে রেলওয়ের দু'টি কোম্পানি; স্থাপন করা হয়। একটি 'ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি' অপরটি গ্রেট ইন্ডিয়ান 'পেনিনসুলা রেলওয়ে'। হার্ডিঞ্জ উপমহাদেশে রেল স্থাপনার সাথে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সম্পৃক্ত করেন। কলকাতায় প্রথম যে ব্যক্তি সাড়া দিয়ে রেল ব্যবস্থা কার্যকর করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠাকুরদাদা যুবরাজ দ্বারকনাথ ঠাকুর। দ্বারকনাথের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান 'কার টেগোর এন্ড কোম্পানি' ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে এক তৃতীয়াংশ অর্থ যোগান দিয়েছিলেন কলকাতা হতে বর্ধমান পর্যন্ত রেলওয়ে ব্যবস্থা চালু করতে। অবশেষে এপ্রিল ১৬,১৮৫৩-এ প্রথম যাত্রীবাহী ট্রেন চালু হয় বোম্বাই (মুম্বাই) থেকে থানে পর্যন্ত ২১ মাইল পথে। এরপর উপমহাদেশে রেলপথ বিস্তারের যাত্রা থেমে থাকেনি। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উপমহাদেশে ৬১,২০০ কিঃ মিঃ রেলপথ তৈরি হয়েছিল।

বর্তমানে ভারতীয় রেল ব্যবস্থায় ৯,০০০ যাত্রীবাহী ট্রেন প্রতিদিন ১৮ মিলিয়ন যাত্রী বহন করে। ভারতের তিনটি রাজ্য সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ আর মেঘালয় ছাড়া ভারতের প্রতিটি রাজ্য রেল ব্যবস্থার সাথে যুক্ত। বর্তমানে 'রাজধানী' এবং 'শতাব্দী এক্সপ্রেস' ভারতের সবচাইতে দ্রুতগামী ট্রেন। আমরা এখন শতাব্দীর যাত্রী হয়ে প্লটফর্ম-১এ অপেক্ষারত। অপেক্ষায় থাকতে হবে প্রায় দু'ঘণ্টা।

এ সময়ে আগ্রার প্লাটফরমে প্রচুর যাত্রীর ভিড়। আমরা দু'জন সারাদিনের ঘোরাফেরা আর গরমে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। প্রথম শ্রেণীসহ কোন যাত্রী বিশ্রামাগারে বসবার জায়গাও ছিল না। প্লাটফরমে বসে পড়া ছাড়া কোন উপায় দেখছিলাম না। বেশ কিছুক্ষণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে কাটিয়ে ভাবলাম স্টেশন ম্যানেজারকে নিজের পরিচয় দিয়ে বসবার এবং অন্তত মুখ হাত ধোবার জায়গা পাওয়া যায় কিনা সে চেষ্টা করতে পারি। সামনে একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করতে 'স্টেশন ম্যানেজারের' কক্ষ দেখিয়ে দিলেন। আমি বেগম সাহেবাকে অপেক্ষা করতে বলে নির্দেশিত রুমে প্রবেশ করলাম। অতি পরিচিত রেলওয়ে স্টেশনের মতই রুমের পরিবেশ। উপরে বৈদ্যুতিক পাখা আরাম আয়েশে ঘুরছে। দেখে মনে হয়েছে এ ধরনের বৈদ্যুতিক পাখা এখন আর বোধহয় ভারতে তৈরি হয় না। সামনের টেবিলখানা ব্রিটিশ রেলওয়ে হতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তেমনি মনে হল পেছনে রাখা রূপালী রংয়ের অতি বড় ধরনের হাতলওয়ালা সিন্দুকও। ভেতরে প্রবেশ করতেই কালো কুচকুচে গায়ের রংয়ের উপরে রেলওয়ের সাদা ইউনিফরম পরা মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক পান চিবুতে চিবুতে মোবাইল ফোনে উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন। সামনে চায়ের পিরিচে রাখা কয়েকটি পান। মনে

www.pathagar.com

হচ্ছিল লক্ষ্মৌ হতে আনা হয়ে থাকতে পারে। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে পাশে রাখা বালুভরা একটি বালতির উপরে পানের পিচকি ফেলে প্রায় স্যান্ডস্টোনের রং করে ফেলেছিলেন। বালিভরা বালতিটি ছিল অগ্নি নির্বাপকের জন্য তবে যেহেতু অগ্নিটগ্নি তেমন সচরাচর লাগেনা তাই হয়ত ম্যানেজার সাহেব এর সদ্ব্যবহারই করছিলেন। এগুলো আমরা অহরহ দেখে অভ্যস্ত কাজেই মোটেও আশ্চর্য হলাম না। মনে হল কিছুদিন ধরে এ কাজ চলছে। বালি আর বদলানো হচ্ছে না।

সামনে রাখা নামের প্লেটে 'পেল্লাই' টাইপের কোন নাম দেখলাম, এখন সম্পূর্ণ নাম মনে করতে পারছি না। তবে তিনি যে আমাদের মত দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত তাতে কোন সন্দেহ নেই। উত্তর ভারতের শংকর জাতীয় নন।

কিছুক্ষণ পর কথা বন্ধ করে তিনি আমার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করলে প্রথমে আমি আমার টিকেট এবং সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র দেখিয়ে আমি যে বাংলাদেশের দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত একজন তা প্রমাণ করলাম। প্রথমে প্রমাণ করলাম আমি ভিনদেশি পর্যটক। পান চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞাসা করলেন "সো, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ"? (আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?) ভাবলাম এখন আমার বর্তমান অবস্থানের পরিচয় দেয়া প্রয়োজন। আমি ভারতীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদেয় পরিচয়পত্রখানা বের করে তার সামনে রাখতে তিনি হাতে উঠিয়ে মিনিটখানেক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখলেন। পরে আমার দিকে তাকিয়ে মুখের পান ফেললেন পাশে রাখা অগ্নি নির্বাপকের জন্য রাখা বালি ভর্তি বালতিতে। তিনি অবশ্য সরঞ্জামটির ভাল ব্যবহার করছিলেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললেন, "স্যাঁর বৈঠিয়ে"। বৈঠিয়ে ত বল্লেন তবে কোথায় বসব মাত্র একটি চেয়ার তাও আবার আরেকজনের দখলে রয়েছে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুরোধ করলাম আমার এবং আমার সহধর্মিণীর জন্য কোথাও বসবার জায়গা করে দিতে। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে একগোছা চাবি হাতে নিয়ে কাউকে হাঁক দিলেন বলে মনে হল। তার ডাকে কোন সাড়া না পেয়ে নিজেই আমাকে নিয়ে কয়েকজন অর্ধশায়িত যাত্রী ডিঙ্গিয়ে একটি তালাবদ্ধ রুম খুলে বললেন, "স্যার ইয়ে ভিআইপি রুম হ্যায় আপ ইধার বৈঠিয়ে যবতক ট্রেন নেহী আতা"। রুম খুলে কিছুক্ষণ এসি চালাতে গিয়ে বিফল হয়ে পাখা ছেড়ে দিয়ে কোন একজনকে ডাকতে ডাকতে হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে গেলেন।

আমরা তথাকথিত ভিআইপি রুমের একটি সোফাতে বসে পড়লাম। শরীরে রাজ্যের ক্লান্তি। গরমে অতিষ্ঠ। কিছুক্ষণ পর একজন কর্মচারীর সাথে 'পিল্লাই' সাহেব এসে বেশ কসরতের পরে এসি ছেড়ে দিয়ে চায়ের অফার দিলে ধন্যবাদ দিয়ে মানা করলাম। পিল্লাই সাহেব বললেন যে, তার কাছে পূর্ব সংবাদ থাকলে তিনি ভাল ব্যবস্থা করে রাখতেন। আমরা অতটুকুতেই খুশি হয়েছি বলে তাকে ধন্যবাদ জানালে তিনি

www.pathagar.com

বিদায় নিলেন। এসি-এর শব্দের মধ্যেই বাথরুমে গিয়ে হাতমুখে পানির ছিটা দিতে গিয়ে দেখলাম বেসিনের পানি সরাসরি মেঝেতে পড়ছে। বেসিন বন্ধ করে পাশের কল হতে পানি নিয়ে হাত মুখটা ধুয়ে সোফায় গা এলাতে গেলে এক মস্ত ইঁদুরের দৌড়াদৌড়ি দেখে বসে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

প্রায় ঘন্টাখানেক বিশ্রামের পর ট্রেন আসার সংবাদ পেয়ে নির্ধারিত প্লাটফর্মে যাবার পূর্বে পিল্লাই সাহেবকে আরেক প্রস্থ ধন্যবাদ জানিয়ে শতাব্দী এক্সপ্রেসের অপেক্ষায় রইলাম। মনে হল ভারতীয় ট্রেনের প্লাটফরম কিছুটা গোছালো হলেও উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের প্লাটফর্মের মতই চেহারা। তবে ফিরতি পথে আগ্রা থেকে দিল্লী যাবার যাত্রী সংখ্যা কমই ছিল। দিল্লীতে পৌঁছে বসন্ত বিহারে শম্পার বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে রাত প্রায় এগারোটা বেজে গেল। ট্রেনে রাতের পরিবেশিত খাবার খেয়ে নিয়েছিলাম। কাজেই বাসায় আর খাবার প্রয়োজন হয়নি। দোহা সাহেবের সাথে আমাদের ট্রেন যাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর দিনের ক্লান্তিভরা শরীর নিয়ে বিছানায় শোবার আগে আগামী কয়েকদিনের কর্মসূচি তৈরি করে ফেললাম। স্বীকার করতেই হবে সর্বতো বিচারে ভারতীয় ট্রেন ব্যবস্থা উপমহাদেশের অন্যতম উন্নততর ব্যবস্থা, যদিও দুর্ঘটনার সংখ্যাও একেবারে কম নয়। মিঃ লালু প্রসাদ যাদব বেশ সার্থক রেলমন্ত্রী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

আগামী তিন দিন দিল্লীতে কাটিয়ে মে ১৪, ২০০৯-এ দেশে ফিরব বলে আগেই সেভাবে বিমানের টিকেটের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। এ পর্বে আমাদের সাথে পর্যটক হিসেবে যোগ দিতে রাজি হয়েছিলেন ঢাকা থেকে আগত শম্পার স্বামী, মিঃ মিনহাজ। মিনহাজ একজন স্থপতি। ঢাকার এক নির্মাণ সংস্থায় চাকরিরত। মিনহাজ ঢাকাতেই থাকেন তবে বছরের অনেক সময় স্ত্রী-পুত্রের সাথে শম্পা যেখানেই কর্তব্যরত থাকেন সেখানে অনেকটা সময় কাটাবার চেষ্টা করেন।

পরের দিন, মে ১১, ২০০৯ সকাল ১১টায় আমরা তিনজন, শম্পার ড্রাইভার নিয়ে দিল্লীর মেহেরুলীতে কুতুব মিনার দেখতে বের হলাম।

www.pathagar.com

চৌদ্দ

সাম্রাজ্যের উত্থান আর পতনের শহর দিল্লী

আমরা শ্রী অরবিন্দ মার্গ ছেড়ে কুতুব মিনারের রাস্তা ধরলাম। কিছু দূরে ইন্ডিয়ান কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ পার হয়ে কুতুব মিনার চত্বরের প্রধান প্রবেশ পথের বাইরে টিকিট ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে তিনজনের টিকেট সংগ্রহ করে 'চত্বরে' প্রবেশ করলাম। সামনেই দেখা যাচ্ছে সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকা দিল্লীর অন্যতম দর্শনীয় স্থান পাথরের তৈরি বিশ্বের সর্বোচ্চ টাওয়ার কুতুব মিনার। এর উচ্চতা ৭২.৫ মিটার (২৩৮ ফুট)। যে জায়গাটিতে কুতুব চত্বর অবস্থিত জায়গাটির নাম মেহেরুলী, দিল্লী।

দিল্লী অতীতেও যেমন একক শহরের নাম ছিল না আজও নেই। তা পুরাতন দিল্লীই হোক অথবা নতুন দিল্লীই হোক। তাছাড়া দিল্লীর মত দ্বিতীয় শহর হয়ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে যে শহরের ইতিহাসে এত রাজা, মহারাজা, সুলতান, বাদশাহ, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন আর খ্রিস্টানদের কোন না কোন সময়ে রাজত্ব ছিল। তবে দিল্লীতে এবং আশেপাশে একনাগাড়ে প্রায় সাতশত বছর মুসলমানদের রাজত্ব থাকায় দিল্লীর আনাচে কানাচে ওই সময়কার ইতিহাস বিস্তৃত রয়েছে। সে ইতিহাস সমৃদ্ধ ইতিহাস। কালো আর সাদার ইতিহাস। ওই সময়ে একদিকে যেমন ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের অবস্থান ছিল; অপরদিকে তেমনি সূফীদেরও অবস্থান ছিল। দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলে এসব সূফীবাদী মহাত্মাদের মাজারে সব ধর্মের সর্বস্তরের মানুষের ঢল আগেও যেমন ছিল আজও তেমন আছে।

দিল্লীতে উত্থান হয়েছে সালতানাতের আর সুলতানদের। আবার অনেক ক্ষেত্রে ভয়াবহ পরিণতিতে পতনও হয়েছে সালতানাত আর বাদশাহদের। দিল্লী দেখেছে পারস্য রাজা নাদির শাহের নৃশংসতা, হত্যাযজ্ঞ আর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শাসকদের হাতে দেশপ্রেমী সিপাহীদের প্রকাশ্যে নির্বিচারে হত্যা আর জনসম্মুখে ফাঁসি। দিল্লী দেখেছে মসনদের দাবিদার আর ক্ষমতায় থাকা শাসকদের বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্র। আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছে অগণিত শাসক যার জের ছিল ভারতের স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর্যন্ত। মহাত্মা গান্ধী হতে রাজীব গান্ধী ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় আততায়ীর হাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। অতীতেও দিল্লী যেমন দেখেছে ধর্মের নামে হানাহানি, ধর্মে-ধর্মে সংঘাত, বর্তমানেও রয়েছে সে সংঘাতের আলামত। এক কথায় দিল্লী নামক এ শহর গুচ্ছ বিশ্বের ইতিহাসের এক অবাক করা জনপদ যার

www.pathagar.com

অলিগলিতে রয়েছে ইতিহাস।

মেহেরুলী মধ্যযুগীয় দিল্লীর সাতটি শহরের অন্যতম শহর। বর্তমানে দিল্লীর নতুন শহর বা জেলা 'গুড়গাঁও' এর সন্নিকটে। মেহেরুলী দিল্লীর দক্ষিণ পশ্চিমের একটি জেলা। বর্তমানে দিল্লীতে লোকসভার যে সাতটি আসন রয়েছে তার মধ্যে একটি মেহেরুলী অঞ্চলে। মেহেরুলীর ইতিহাস দিল্লীর ইতিহাসের বাইরে নয়। মেহেরুলীর ইতিহাস হিন্দুস্থানের ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। এখানে হযরত খাজা গিয়াসউদ্দিন বখতিয়ার কাকির (রঃ) মত সূফীর শেষ আস্তানা মাজার রয়েছে।

দিল্লীর সুলতানদের আমলের পূর্বেই গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল। ঐতিহাসিক নাম ছিল 'মিহিরওয়ালী', মিহিরের বাড়ি। শহরটির গোড়াপত্তন করেছিলেন সম্রাট মিহির ভোজা মহান।[১] সময়কাল ৮৩৫-৪৯০ খ্রিস্টাব্দ। এ সময়টি ছিল প্রাথিহারাদের রাজত্বকাল। ভোজাদের সাথে বাংলার পাল বংশের সংঘর্ষের ইতিহাসও রয়েছে। এখানে মেহেরুলীর অন্যতম স্থাপনা 'লালকোট দুর্গ' তৈরি করেছিলেন গুরজার প্রধান অঙ্গপাল, সময়কাল ৭৩১ খ্রিস্টাব্দ। এ দুর্গের আরও পরিবর্ধন করেন অঙ্গপাল-২। সময় ছিল এগারো শতাব্দী। গুরজারদের পরাজয় হয় চৌহান বংশের কাছে। পৃথ্বীরাজ চৌহান, যার বিশদ আমরা আগেই আলোচনা করেছি, মেহেরুলীর লালকোট দুর্গ এবং আশেপাশের বসতির ব্যাপ্তি ঘটান। পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয় এবং ঘোরীদের উত্থানের পর কুতুবউদ্দিন আইবক হতে শুরু করে ১২৯০ পর্যন্ত মেহেরুলী বিভিন্ন রাজবংশের রাজধানী হিসেবে গড়ে উঠে। খিলজি শাসনের সময়ে মেহেরুলী হতে রাজধানী তৎকালীন দিল্লীর নতুন শহর 'শ্রী'তে স্থানান্তরিত হয়।[২] 'শ্রী' দিল্লীর সাতটি শহরের তৃতীয় শহর।

ওই সময়ে মধ্যযুগে যে সাতটি শহর নিয়ে গড়ে উঠেছিল তখনকার এবং আজকের দিল্লী সেগুলো ছিল যথাক্রমে; কিলা রাই পিথোরের লালকোট দুর্গ; মেহেরুলী; শ্রী; তোঘলকাবাদ; ফিরোজাবাদ; শেরগড় এবং সর্বশেষ শাহজাহানাবাদ (পুরাতন দিল্লী অথবা দেয়ালে ঘেরা দিল্লী বলে পরিচিত)। এর বাইরে মেহেরুলী আর শাহজাহানাবাদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল জাহানপনা এবং ফিরোজ শাহ কোটলা।

কুতুব চত্বরে প্রবেশ করে আমরা প্রথমে বাঁ দিকে অগ্রসর হয়ে আলাই দরওয়াজা পার হয়ে কুতুব মিনারের দিকে অগ্রসর হলাম। মিনারের আশেপাশে কোন কোন জায়গায় সংস্কারের কাজ চলছিল। কুতুব মিনারের পাদদেশে এসে উপরের দিকে তাকালে কুতুব মিনারের চূড়া পর্যন্ত সহজে দেখা যায় না। কারণ, গোড়া থেকে ২৩৮

১. *Singh, Ganabati, "gujar veer VI ranganen" New Embassy Press, Delhi*
২. *Official Web site : http/delhigovt. nic.in/dep/prj/visitor/city-asp?opt-2*

www.pathagar.com

ফুটের এ মিনারের পাদদেশের ব্যাস ১৪.৩ মিটার অথচ উপরের শীর্ষাংশ ২.৭৫ মিটার মাত্র। প্রথম ধাপে চারদিকে ঘেরা বেলকুনির মত রয়েছে। আর রয়েছে কোরআনের বাণী খোদাই করা। কুতুব মিনারের উপরে উঠার ৩৭৯৭ ধাপের সিঁড়ি মিনারের ভেতরে রয়েছে। কিন্তু সেটা বন্ধ থাকে বলে মিনারের উপরে উঠা সম্ভব হয়নি। মিনারের প্রায় শীর্ষাংশে কিছুটা অংশ সাদাটে ইটের তৈরি। ওই অংশটা পুনঃনির্মিত হয়েছিল।

কুতুব মিনার তৈরি শুরু হয় কুতুবউদ্দিন আইবকের জীবদ্দশায়, ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু কুতুবউদ্দিন, দিল্লীর প্রথম সুলতান, এর শেষ দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তার জামাতা ইলতুতমিশ উপরের অংশের কাজ অনেকখানি এগিয়ে নেন। তিনিও শেষ করতে পারেননি। এটা পরে একবার সংস্কার করেন ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৮৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যুৎ চমকের কারণে কুতুব মিনারের উপরের দুই তালা ধ্বংস হয়ে গেলে ফিরোজ শাহ্ তুঘলক উপরের অংশ পুনঃনির্মাণ করেছিলেন। তিনি ওই সময়ে এর যথেষ্ট সংস্কারও করেছিলেন। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর ভূমিকম্পে কুতুব মিনার চত্বর নষ্ট হয়। ওই সময়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর 'কোর অব ইঞ্জিনিয়ারস-এর মেজর স্মিথকে পুনঃস্থাপনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

কুতুব মিনারই হিন্দুস্থানে প্রথম ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য। অনেক ঐতিহাসিক এ মিনার তৈরির উদ্দেশ্য আর নামকরণ নিয়ে যথেষ্ট দ্বিমত পোষণ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মিনারটি তৈরি করা হয়েছিল 'কুয়াতুল ইসলাম' মসজিদের আযান দেবার স্থান হিসেবে। আবার অনেকের মতে হিন্দুস্থানে ইসলামের বিজয়ের স্তম্ভ হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এ সব মতামতের কোনটি সঠিক তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল।

কুতুব মিনারের নামকরণ নিয়েও রয়েছে ভিন্নমত। অনেকে মনে করেন কুতুবউদ্দিন আইবেকের নামে নামকরণ করা হয়েছে, আবার অনেকে মনে করেন মিনারের সন্নিকটে সমাধিস্থ হযরত কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি (রঃ)-এর নামে রাখা হয়েছিল এ মিনারের নাম এবং এ নাম রেখেছিলেন ইলতুতমিশ। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন বাগদাদ থেকে আগত হযরত কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি (রঃ)-এর অনুরক্ত ছিলেন ইলতুতমিশ এবং ফিরোজ শাহ তুঘলক। যাই হোক যার নামেই নামকরণ করা হোক না কেন কুতুব মিনারের সাথে কুতুবউদ্দিন আইবকের নামই সাধারণত উচ্চারিত হয়ে থাকে।

কুতুব মিনার তৈরির এবং সংরক্ষণের ধারাবাহিকতায় একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, ওই সময়ে ভিন্ন বংশের শাসকদের দ্বারা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে তাঁরা যে উদার মনের পরিচয় দিয়েছিলেন তেমনটা বর্তমানে সচরাচর দেখা যায় না। এসব কারণেই জ্ঞানীজনরা বলে থাকেন ইতিহাসে বাস নয়– ইতিহাস জানতে হয়, পড়তে হয় এর

www.pathagar.com

থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

আমরা কুতুব মিনারের পাশে দাঁড়িয়ে ওখানকার ছোট ইতিহাস সম্বলিত ফলকটি পড়ছিলাম। আমার পাশে ছিলেন মিনহাজ। মিনহাজ একজন স্থপতি। ইতিহাসের প্রতি ঝোঁক তেমন আছে বলে মনে হলো না। আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফলক পড়তে দেখে বললেন যে, তিনি বহু বছর পূর্বে দিল্লী সফরকালে একবার এখানে এসেছিলেন। এরপর আর আসেননি, কিন্তু এ ধরনের ফলক এখানে লাগানো আছে তা তাঁর নজরে পড়েনি। আমাদের কথোপকথন শেষ হলে পাশে দণ্ডায়মান ট্রাউজার, টপ আর মাথায় কাপড়ের ফেল্ট পরা এক মধ্যবয়সী ভদ্র মহিলা শুদ্ধ বাংলা ভাষায় আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, তাঁর কাছে মনে হয়েছে আমি ইতিহাসের কিয়দংশ সম্বন্ধে পরিচিত। সে কারণেই তিনি সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন। "এ মিনারটা বানানোর উদ্দেশ্য কি ছিল?" প্রথমে আমার মনে হল তিনি ঐতিহাসিক কারণ খুঁজছিলেন। আমি যতটুকু জানি বলতে ভদ্রমহিলা খুব প্রীত হয়েছিলেন বলে মনে না হওয়াতে আমি হেসে পরিস্থিতি হালকা করে বললাম, "যার নামেই এ মিনার তৈরি হোক না কেন এটা কুতুবউদ্দিন বানিয়েছিল বলেই আমরা এখানে আর আমাদের মত লক্ষ লক্ষ দেশ-বিদেশের দর্শনার্থী এখানে মিনার দেখতে এসে থাকেন। ভারত সরকার অর্থ পাচ্ছে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি পর্যটক এবং UNESCO থেকে। এটা না থাকলে এখানে আপনিও আসতেন না।" মহিলা হেসে দিলেন। পরিচিত হলাম। তাঁর সাথে তাঁর পুত্র জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির ছাত্র, মায়ের সাথে এসেছিল কুতুবমিনার দেখতে। তিনি ছেলেকে দেখতে পশ্চিম বাংলার বর্ধমান থেকে এসেছেন। আমাদের পরিচয় দেয়াতে তিনি বললেন, "আপনারা বাংলাদেশি তা আমি আপনাদের কথাতেই বুঝতে পেরেছি। আপনারা বাংলা ভাষার মান রেখেছেন। আর কয়েক দশক পরে পশ্চিম বাংলা থেকে বাংলা নির্বাসিত হবে।" আমি এ কথার কোন উত্তর দেয়া সমীচীন মনে করলাম না।

আমরা কুতুব মিনারের পাদদেশ থেকে সামনে কয়েক সহস্র বছর পুরনো লোহার খাম্বা (পিলার) দেখতে যাবার উদ্যোগ নিলে মিসেস সমস্বের ঘোষ (এতক্ষণে তাঁর নাম জানতে পারলাম) বললেন, "শুনেছি এখানে ২৭টি হিন্দু ও জৈন মন্দির ভেঙে কুতুব চত্বর তৈরি করা হয়েছিল। সে মন্দিরের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। মন্দিরের পিলারে ক্ষোদিত দেবদেবীর মুখ বিকৃত করা আছে?" আমি প্রতি উত্তরে বললাম, "এমনটা আমিও ইদানিং প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোতে পড়েছি। একটু এগোলেই হয়ত চাক্ষুস দেখতে পারব"। আরও বললাম, "এটা তো লুকাবার বিষয় হতে পারে না। কারণ, আমাদের সামনে যে দালানটির রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে তার গায়ে সংস্কৃত ভাষায় তৎকালীন রাজমিস্ত্রীরা এখানকার ইতিহাস বিক্ষিপ্তভাবে খোদাই করে গেছেন। সেগুলোকে মিটিয়ে ফেলতে দিল্লীর কোন সুলতানই চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

ওই সময়ে এ চত্বর গড়তে যে সব রাজমিস্ত্রী বা প্রকৌশলীরা কাজ করেছেন তাদের সিংহভাগ ছিলেন হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। কাজেই এ সব লিপিতে তেমন তথ্য থেকে থাকতে পারে।" তাঁকে আরও বললাম, "আমাদের হাতের ডানেই মন্দির চত্বর বলে মনে হচ্ছে।" তার সাথে আলাপ শেষ করে আমি লোহার পিলারের চত্বরে প্রবেশ করলাম। মিনহাজ আমার সহধর্মিণীসহ নিচে একটু ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন দিল্লীর বাতাস গরম হওয়া শুরু হয়েছে। তাপদাহ ক্রমেই বেড়ে চলছিল।

আমি একাই জৈন মন্দির বলে কথিত ধ্বংসাবশেষের উঁচু আঙ্গিনায় 'বুলন্দ দরওয়াজা' (বড় দরওয়াজা) পার হয়ে উঠলাম। বুলন্দ দরওয়াজার খিলানের উপরের পাথরগুলো কালের ভারে খসে পড়েছে। দু'পাশে পিলারের সাথে অবশিষ্টাংশ, অনেকটা দু'টি কান্তের সাদৃশ্য দণ্ডায়মান রয়েছে। UNESCO এ স্থাপনাকে World heritage ঘোষণার পর হতে এর রক্ষণাবেক্ষণ চলছে।

আমি কথিত মন্দিরের চত্বরের মাঝখানে বহুল আলোচিত লোহার পিলারের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এ পিলারটির বয়স কত হবে তা নিয়ে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। বেশির ভাগ ঐতিহাসিকরা মনে করেন এর বয়স প্রায় দু'হাজার বছর, আবার কিছু কিছু হিন্দুবাদী ঐতিহাসিকরা এর বয়স চার হাজার বছর বলে মনে করেন। বয়স যতই হোক সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় হল লোহার পিলার নামে হলেও এর নির্মাণে কোন ধরনের ধাতু ব্যবহার হয়েছিল তা এখনও গবেষণার বিষয় কারণ এ পিলারের রং কালচে হয়ে গেলেও তেমন কোন মরিচা (Rust) পড়েনি। অথচ হাজার বছর ধরে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আছে রোদ আর বৃষ্টির মধ্যে। এ পিলারকে ঘিরে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে পিলারে পিঠ ঠেকিয়ে পেছন দিকে দু'হাত দিয়ে পিলারকে বাহু বেষ্টনীতে আনতে পারলে মনো বাসনা পূরণ হয়। হাজার হাজার দর্শনার্থী বহু বছর এখানেই এই এক উদ্দেশ্যেই আসতেন। শুরু হয়েছিল পূজা-অর্চনা। বেশ কিছু বছর আগে এখানে পায়ে পিষ্ট হয়ে কয়েকজন অনুরাগী মারা গেলে সরকার কুতুব মিনার বন্ধ রেখেছিলেন। একই সাথে পিলারের পাদদেশে বড় করে লোহার বেষ্টনী তুলে দেয়া হয়েছে যাতে হাত দিয়ে সহজে ধরতে না পারা যায়। শরীরে ঘামে যাতে নষ্ট না হয় সে কারণেও এ বেষ্টনী, এমনটাই আমাকে খাবারের টেবিলে আলোচনাকালে জানিয়েছিলেন দোহা সাহেব।

লোহার পিলারটি ৭ মিটার উঁচু। এর গায়ে সংস্কৃত আর খ্রিস্টপূর্ব ৩ শত শতাব্দী পুরাতন ব্রাহ্মণদের ভাষা 'ব্রাহমীতে' বিষ্ণুর জয়গাঁথা লেখা রয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, এই লোহার পিলারের সাথে দিল্লীর ইতিহাস জড়িত। তবে এই ৬ টন ওজনের পিলার চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) বিক্রমাদিত্য-এর সময়, ৩৭৫-৪১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এখানকার জৈন মন্দিরের সামনে স্থাপিত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) ছিলেন গুপ্ত বংশের অন্যতম শাসক। (পাঠকগণ, এই চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য আর পূর্বে আলোচিত

www.pathagar.com

সম্রাট অশোকের পিতামহ চন্দ্র গুপ্ত মৌর্য্য এক ব্যক্তি নন)। এই চন্দ্র গুপ্তের পিতা ছিলেন ইতিহাস খ্যাত সমুদ্র গুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত-১ এর পুত্র সমুদ্রগুপ্তের সামরিক বিদ্যা ও কৌশলের জন্যে বর্তমান ঐতিহাসিকরা তাকে পুরাতন ভারতবর্ষের নেপোলিয়ন আখ্যা দিয়েছেন।

আগেই আলোচনা করেছি যে, অনেক হিন্দুবাদী ঐতিহাসিকদের মতে হিন্দুস্থানে মুসলমানদের রাজত্ব শুরুর সময়েই কুতুবউদ্দিন আইবক লালকোটের এ অঞ্চলের ২৭টি হিন্দু জৈন মন্দির ধ্বংস করে মন্দিরের ব্যবহার্য ইট পাথর দিয়ে 'কুয়াত-ই-ইসলাম' নামক মসজিদ চত্বর (Complex) তৈরি করেন। অনেকের মতে মসজিদ চত্বরে প্রবেশের পথে মাটির নিচে দেবদেবীর মূর্তি পুঁতে রাখা হয়েছে।

আমি লোহার পিলার চত্বরের সামনে কথিত মন্দিরের পিলারগুলো দেখছিলাম। তখন আমার পেছনে পেছনে এসে কথিত মন্দির চত্বরে উঠেছিলেন মিসেস সমস্বের আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন "দেখুন পিলারগুলো মন্দিরের এবং প্রতিটি পিলারের মাথার ছাদের নিচের অংশে দেব-দেবীদের মুখ আর স্তন বিনষ্ট করা।" আমিও তাই দেখলাম। মিসেস সমস্বের ঘোষকে বেশ ব্যথিত মনে হল।

আমি তাঁকে প্রতি উত্তরে বললাম, "সন্দেহ নেই যে এগুলো মন্দিরের পিলার। তবে জৈন মন্দিরের উপরে মসজিদ তৈরি করলে এ পিলারগুলো থাকার কথা নয়। কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ সমস্ত এলাকাটারই নাম। তাছাড়া এগুলো ধ্বংস করলে এতটুকুও কি দাঁড়িয়ে থাকত? প্রায় হাজার বছর পরে এর সঠিক চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়।"

আমি কিছুটা যুক্তি দিয়ে পুনরায় বললাম, "তবে ইতিহাস বলে জৈনদের সাথে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহাসিক বিরোধ এমন তুঙ্গে উঠেছিল যে, বৌদ্ধ ধর্ম ভারতের বাইরে ব্যাপক প্রচার হলেও জৈন ধর্ম অবশিষ্ট থেকেছে মূলত ভারতের কয়েকটি রাজ্যে।"

আমি মিসেস সমস্বেরের দিকে তাকিয়ে বললাম," দিদি আপনি কি জানেন যে হালে ভারতীয় উচ্চ আদালতকে নির্ণয় করতে হয়েছিল জৈন ধর্ম আর হিন্দু ধর্ম দু'টি আলাদা, হিন্দু ধর্মের কোন বিকৃত রূপ নয়, যেমনটা হিন্দু ব্রাহ্মণরা দাবি করেন" মনে হল তিনি আমার ব্যাখ্যার অন্তরনিহিত মর্ম বুঝতে পারবার চেষ্টা করেছেন বা মোটেও করেননি।

বাস্তবতা হল এই যে, হিন্দু আর জৈন ধর্মের সংঘাত ঐ ধর্মের জন্মলগ্ন থেকেই। কাজেই এই সব মন্দির ঘোরীদের বা মামলুকদের হাতেই ধ্বংস হয়েছে তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া দুঃসাধ্য।

www.pathagar.com

আমি মিসেস সমস্বরকে ধন্যবাদ এবং এই সুদূরে একজন বাংলা ভাষাভাষী পেয়ে যে খুশি হয়েছি জানিয়ে অন্যপথ ধরে বললাম "আমরা ইতিহাসের বিতর্কটা ঐতিহাসিকদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে বরং চলুন এ অবিশ্বাস্য কীর্তিটিই দেখি।"

মিসেস সমস্বরকে বিদায় দিয়ে আমি পুনরায় কথিত মন্দিরের পিলারগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। এখানে যে মন্দির ছিল তার চিহ্ন প্রায় এক হাজার বছর ধরে এখনও আছে। লোহার পিলার সংলগ্ন পাথর আর ইটের তৈরি একটি মন্দিরের অবকাঠামো এখনও ছাদসহ দাঁড়িয়ে। পিলারের বা স্তম্ভগুলোর মাথায়, ছাদের নিচে, বহির্মুখী পরী অথবা বহু দেবীদের মুখমণ্ডল এবং অনাবৃত স্তন ভাঙ্গা অবস্থায় দেখলাম। কাজেই মন্দিরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকবার কোন অবকাশ নেই। তবে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে গবেষকদের জন্য। আমি গবেষণা করতে আসিনি কাজেই সে প্রসঙ্গ বাদ দিলাম। তবে মন্দিরটির গড়ন জৈন ধর্মের মন্দিরের আদলে তৈরি।

জৈন ধর্ম সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় ধর্ম। মনে করা হয় বৌদ্ধ ধর্মের পূর্বেই এ ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে ২০০০ হতে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব সময়ে সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক সময়ে এ ধর্মের আবির্ভাব। এর নিদর্শনও পাওয়া যায়। বেদ-এ জৈন ধর্মের তির্থঙ্করদের কথা বলা আছে। জৈন ধর্মমতে যারা ধর্মকে পুনরুদ্ধার করেছেন তাদেরকেই 'তির্থঙ্কর' বলা হয়ে থাকে। জৈন ধর্মের সাধারণ বিবরণে এ ধর্মকে হিন্দুধর্মের কঠিন ধারার রূপ বলে মনে করা হয়। এ ধর্মের অনুসারীরা ভারতের মধ্যেই বেশি সীমাবদ্ধ থাকলেও হালে কিছু কিছু ধর্মাবলম্বীকে আমেরিকা এবং ইউরোপেও দেখা যায়। এদের জীবনযাপন অত্যন্ত কঠিন। কৃত্রিম জিনিসের ব্যবহার একেবারেই করে না বললেই চলে। কোন জীবন্ত প্রাণীর, যে কোন কারণেই হোক, প্রাণনাশ এ ধর্মে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইতিহাস বিশ্লেষণে পাওয়া যায় উচ্চবর্ণের হিন্দু ধর্মাবলম্বী, বিশেষ করে, ব্রাহ্মণদের সাথে জৈন ধর্মাবলম্বীদের বনিবনা হতনা কারণ হিন্দুরা কখনই জৈন ধর্মকে আলাদা ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। এ বিবাদ এখনও শেষ হয়নি। অতীতে যথেষ্ট সংঘর্ষও হয়েছিল। স্মরণযোগ্য যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শেষ জীবনে রাজত্ব ছেড়ে জৈন ধর্মাবলম্বী হয়ে প্রচারে বের হয়েছিলেন।

জৈন ধর্ম হিন্দু ধর্মের অংশ না আলাদা ধর্ম এই বিবাদ চলে আসছে বহুদিন ধরে।[৩] এ বিবাদ ইতিহাসের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। হালে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। আদালতে বিচার্য ছিল জৈন ধর্মাবলম্বীরা ভারতীয় সংবিধানের আলোকে সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত হবে কিনা? অথচ এ প্রশ্ন বহু আগেই শেষ হবার কথা ছিল, যদি ভারতের হিন্দুবাদীরা জওহরলাল নেহেরুর এলাহাবাদের

৩. *Larson, Geral James, "India's Agony over Religion" Sunny Press (1995) ISBN 07142412X*

www.pathagar.com

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ভাষণের উপর গুরুত্ব দিতেন।[৪] ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে শেষবারের মত ভারতীয় সুপ্রীমকোর্ট এক রায়ে জৈন ধর্মকে "সন্দেহাতীতভাবে" হিন্দু ধর্ম হতে আলাদা ধর্ম বলে রায় দিয়ে সংখ্যালঘু ঘোষণা করে। ওই রায়ে বর্তমানে ভারতের পাঁচটি রাজ্যে জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যালঘু আখ্যা দেয়া হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে এ ধর্মাবলম্বীদের অবস্থান কি হবে তা রাজ্য নির্ণয় করবে বলে আদালত মতামত দিয়েছিল।[৫]

আমি জৈন ধর্মের যৎসামান্য বিবরণ এখানে উল্লেখ করলাম এ কারণে যে কুতুব মিনারের ইতিহাস নিয়ে আমার মতে আরও গবেষণা হতে পারে এবং বর্তমানে এ মিনার আর 'কুয়াতুল ইসলাম' মসজিদ নিয়ে যে বিতর্ক হালে উঠেছে তার প্রেক্ষিতে। কুতুব মিনার শুধু দিল্লীর প্রথম সালতানাত-এর নিদর্শন নয় হিন্দুস্থানে মুসলিম রাজত্বের প্রথম নিদর্শন। মেহেরুলী এবং কুতুব মিনার হিন্দুস্থানের ইতিহাসে যে পরিবর্তন এনেছে তা শুধু রাজত্বের উত্থান আর পতনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আমূল পরিবর্তন এনেছে জীবনধারায় এবং সমগ্র হিন্দুস্থানের বিভিন্ন সমাজে। এর জের আজও দৃশ্যমান।

আমি কথিত জৈন মন্দির থেকে দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত ইমামজাম-এর সমাধির সামনে রক্ষিত ফলকের তথ্য পড়লাম। ইমামজাম ছিলেন তুর্কিস্তান হতে আগত একজন সাধক। যিনি বোধ করি ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি এখানেই সমাধিস্থ হন। ইমামজাম-এর মাজারের পশ্চিমে দেয়াল সংলগ্ন আলাউদ্দিন মাদ্‌রাসাটি তৈরি হয়েছিল ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে। মাদ্‌রাসার পাশে ছাত্রদের থাকবার জন্য লম্বা কয়েকটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। মাদ্‌রাসার ভেতরেই রয়েছে নাম না জানা একটি কবর।

কুতুব মিনার, লোহার পিলার আর মন্দিরের অংশ নিয়ে কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ ছিল। মসজিদের উত্তরে কুতুবউদ্দিন আইবকের জামাতা দাশ বংশের অন্যতম সুলতান ইলতুতমিশ-এর সমাধি রয়েছে। তার পাশে দিয়ে হেঁটে আরেকটু এগুলে চোখে পড়বে আরেকটি বড় আয়তনের মিনারের প্রথম ধাপ। এ অসমাপ্ত মিনারের নাম 'আলাই মিনার'।

আলাই মিনারের প্রথম ধাপের সামনের ফলকে ছোট ইতিহাস লেখা রয়েছে। বড় বড় পাথরের এ অসমাপ্ত মিনারের উচ্চতা ২৪.৫ মিটার। এটা তৈরিতে হাত দিয়েছিলেন খিলজি বংশের দ্বিতীয় সুলতান, আলাউদ্দিন খিলজি। তিনি এ মিনারকে কুতুব মিনার হতে আরও উঁচু এবং সর্ববৃহৎ মিনার বানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাকে সে সুযোগ দেয়নি। আলাউদ্দিন খিলজির মৃত্যুর পর আলাই মিনারের নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে এ পর্যায়েই রয়ে গিয়েছিল।

---

৪. *The Statement; September 5. 1944*

৫. *http: Judes. nic in/supremecourt/qrydisp. asp? tfnm-27098*

www.pathagar.com

ইতিহাসে আলাউদ্দিন খিলজির জীবনের কালো অধ্যায়ের বর্ণনা রয়েছে। তাঁর যৌন জীবন ছিল বিচিত্র। এই বিচিত্র জীবনের মাসুল দিতে হয়েছিল নিজেকে এবং তাঁর দুই পুত্রকে। আলাউদ্দিন খিলজির সাথে তার প্রধান হিজড়া, পরে সেনাদের কমান্ডার, মালেক কাফুর-এর দৈহিক সম্পর্ক নিয়ে অধ্যায়ের এক অধ্যায় রচিত রয়েছে।[৬] অপরদিকে আলাউদ্দিন খিলজি আর রাজপুতনার (রাজস্থান) চিতোর-এর রাজা রাওয়াল রতন সিং-এর অপূর্ব সুন্দরী রাণী পদ্মিনীকে নিয়ে যে উপাখ্যান ইতিহাসে রচিত হয়েছে তা হিন্দুস্থানের ইতিহাসে মহিলাদের মানসম্ভ্রম রক্ষার এক অভূতপূর্ব উদাহরণ হয়ে আছে।[৭] এ কাহিনী নিয়ে বহু কবিতা, নভেল এমনকি চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে এ কাহিনীর উপর মালিক মোহাম্মদ জায়সী মহাকাব্য 'পদুমাবত' রচনা করেছিলেন।

চিতোরগড়, রাজপুতনার (বর্তমান রাজস্থান) রাজা রাওয়াল রতন সিং-এর পরমা সুন্দরী, বুদ্ধিমতী স্ত্রী রাণী পদ্মিনীর উপাখ্যান রূপকথার উপাখ্যানের চাইতে কোন অংশে কম নয়। এ উপাখ্যান একদিকে যেমন বীরের গাঁথা, অপরদিকে তেমনি হৃদয় বিদারক। এ উপাখ্যান নারীর প্রকৃত ভালবাসা আর সম্ভ্রম রক্ষার এক অবিশ্বাস্য ঘটনা এবং আত্মত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ।

চিতোরের রাণী পদ্মিনীর বুদ্ধিমত্তা আর সৌন্দর্যের চর্চা শুধুমাত্র রাজপুতনার অন্যান্য রাজ্যগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং এ খবর পৌঁছেছিল দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির কানেও। হিজড়া প্রধান মালিক কাফুরের সাথে অনৈতিক সম্পর্ক থাকলেও সুন্দরী নারীর প্রতি ছিল তাঁর দুর্বলতা। আলাউদ্দিন খিলজি চিতোরের রাণীকে তার হেরেমের শোভা বানাবার অভিপ্রায়ে চিতোরগড় আক্রমণের পাঁয়তারা করছিলেন।

চিতোরগড়ের রাজা রতন সিং একদিকে যেমন ছিলেন প্রজাবৎসল ও অমায়িক তেমনি ছিলেন শিল্পকলার অনুরাগী। অনেকটা সম্রাট আকবরের নবরত্নের মতই রতন সিং এর দরবারেও ছিল শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ আর সাহিত্যিকদের সমারোহ। এমনিই একজন ছিলেন রাঘব চেতন।

রাঘব চেতন একদিকে যেমন ছিলেন সংগীত শিল্পের প্রতিটি কলায় পারঙ্গম এক ব্যক্তি, তেমনি ছিলেন ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী। রাঘব চেতনের সুপ্ত বাসনায় ছিল রাণী পদ্মিনীকে পাবার অভিলাষ। রাঘব চেতন তার কু-মতলব হাসিল করার জন্য আশ্রয় নেন ইন্দ্রজাল বিদ্যার। বিভিন্ন কৌশলে পদ্মিনীর সান্নিধ্যের প্রয়াসী রাঘব একবার রাণী পদ্মিনী অসুস্থ হলে ইন্দ্রজাল প্রয়োগ করে সারিয়ে তোলবার বাহানায় কু-মতলবে

৬. *Stenley A. Wolpart "A New History of India" ISBN 0-19-516678-1*

৭. *Mayer, William, Stevenson, Burni, Richard cotton, James Sulhesland Resisly Herbert Hope, "Vernacular Litarature" The Imperial gazzette India.*

www.pathagar.com

অশালীন আচরণ করতে গিয়ে ধরা পড়েন। বিষয়টি রতন সিং-এর গোচরীভূত হলে রাঘব চেতনের মুখে চুনকালি দিয়ে রাজ্যের বাইরে বের করে দিলে অপমানে দুঃখে প্রতিশোধের স্পৃহায় রাঘব চেতন আলাউদ্দিনের মনোযোগ আকর্ষণের অপেক্ষায় সুলতানের শিকারগাহে অবস্থান নেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে রাঘব চেতন সুযোগ পান সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষিত করতে। কোন একদিন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি পারিষদ সহকারে শিকারে বের হলে রাঘব চেতন তার মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করেন। চেতন বাঁশিতে মধুর সুর তুলে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আলাউদ্দিন খিলজি রাঘব চেতনের বাঁশির সূরে বিমোহিত হয়ে বাঁশি বাদককে দরবারে নিয়ে আনতে বললে রাঘব চেতন তার মনোবাঞ্ছনা পূরণ আর অপমানের প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনার প্রথম ধাপে পৌঁছেন। রাঘব চেতনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া এবং চিতোরের রাণী পদ্মিনী এবং রাজা রতন সিং-কে উচিৎ শিক্ষা দেয়া। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি রাঘব চেতনের সংগীত এবং ব্যক্তিগত পরিচয় জানতে চাইলে তিনি চিতোর সম্বন্ধে বিস্তারিত সুলতানকে জানিয়ে বলেন যে, তার (রাঘবের) সংগীত প্রেরণা রাণী পদ্মিনীর রূপ; কাজেই সুলতান ইচ্ছা করলে সহজেই চিতোর জয় করে পদ্মিনীকে সুলতানের হেরেমের অমূল্য অলংকার বানাতে পারেন। একই সাথে সুলতানকে রাজা রতন সিং-এর বিরুদ্ধে অসত্য তথ্য দিয়ে উস্কিয়ে দেন। অতঃপর আলাউদ্দিন খিলজি চিতোর আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে দুর্গের সামনে পৌঁছলেও দুর্গের অবস্থান দেখে সহসা আক্রমণ না করে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলেন। চিতোরের দুর্গটি এমন ভাবে তৈরি যে এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে পুরোপুরি না জানলে আক্রমণ করে সহজে দখল করা সম্ভব হতনা। তৎকালীন হিন্দুস্থানে সবচাইতে বৃহৎ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী এ দুর্গ আজও পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ ।

যাই হোক, কুটবুদ্ধিতে পারঙ্গম আলাউদ্দিন খিলজি তার সেনা ছাউনি হতে দূত মারফত রাণী পদ্মিনীর সাথে সামনাসামনি দেখা করে ভাই-বোনের সম্পর্ক গড়বার প্রস্তাব দিয়ে রাজা রতন সিং-এর নিকট পাঠালে রতন সিং সুলতানের প্রস্তাব সমর্থন করে দুর্গে আমন্ত্রণে রাজি হয়ে যান। রতন সিং আলাউদ্দিনের চাল বুঝতে না পারলেও রাণী পদ্মিনী দিল্লীর সুলতানের অভিপ্রায় আঁচ করতে পেরেছিলেন। তবে স্বামীর এবং চিতোরের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শর্ত সাপেক্ষে রাজি হলেন। শর্ত ছিল যে তিনি (রাণী) আলাউদ্দিনের সামনে সরাসরি হাজির হবেন না– আয়নার মাধ্যমে পদ্মিনীর প্রতিবিম্বের সাথে সুলতান কথা বলতে চাইলে তাঁকে দুর্গে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই প্রস্তাবে আলাউদ্দিন খিলজি রাজি হলেন। দুর্গের রাজ প্রাসাদের বিশাল আয়নায় পদ্মিনীর প্রতিবিম্বে ফুটে উঠা রূপের ছটায় সুলতান রাণীর প্রতি প্রচণ্ডভাবে আসক্ত হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

এ অদ্ভুত সাক্ষাতের পর আলাউদ্দিন খিলজী দুর্গ ত্যাগের সময়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আর রসদের মজুদ এবং সরবরাহের পথ সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে ছাউনিতে ফিরে আসার উদ্যোগ নেন। এসময় রাজা রতন সিং মেহমানকে পাহাড়া দিয়ে সেনা ছাউনির সন্নিকটে নিয়ে আসলে আলাউদ্দিন খিলজি চিতোরের রাজাকে বন্দি করেন। রাণী পদ্মিনীর কাছে সংবাদ পাঠানো হয় যে রাণী সুলতানের কাছে আত্মসমর্পণ করলে তাঁর বিনিময়ে স্বামীকে জীবন্ত মুক্ত করা হবে। পদ্মিনী যেন এমনই একটি দুঃসংবাদের অপেক্ষায় ছিলেন।

এ দুঃসংবাদে অসহায়ত্ব বোধ করলেও পদ্মিনী সাহস হারাননি। স্বামীর অবর্তমানে তিনি সেনাপতিদের সাথে আলোচনা করে সুলতানের চালেই বাজিমাৎ করবার পরিকল্পনা নিলেন। নির্ধারিত হল স্বামীকে মুক্ত করে আনার কৌশল। পরিকল্পনা মোতাবেক পরের দিন ভোরে চিতোর দুর্গ থেকে মনোরম সাজে সজ্জিত একশত পালকির বহর আলাউদ্দিন খিলজির সেনা ছাউনিতে, যেখানে রতন সিংকে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল, সেই তাঁবুর সামনে গিয়ে থামল। উল্লেখ্য, এ ধরনের রাজকীয় পালকির বহর শুধুমাত্র রাজপুরীর মহিলাদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হতো। পালকির বহর আর সাজ-সজ্জা দেখে রাজা রতন সিং প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারাবার বেদনায় মর্মাহত হলেন। কিন্তু অন্যদের মত তিনিও অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই এক অভাবনীয় নাটক ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝতে পারেননি। বুঝতে পারেন নি যে যা ঘটতে যাচ্ছে তা এক অভাবনীয় উদ্ধার অভিযান, অনেকটা ট্রয় নগরীর রাণী হেলেন-এর উদ্ধারের মতো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই একশত পালকি হতে বের হল রতন সিং-এর সেনারা। কেউ বুঝে উঠবার আগেই সেনারা আঁস্তাবল দখল এবং রতন সিংকে মুক্ত করে চিতোরের দুর্গে নিয়ে আসে।

ঘটনার আকস্মিকতায় এবং পদ্মিনীর কৌশলে হতবিহ্বল সুলতান ক্রোধে ফেটে পড়লেন। প্রতি উত্তরে আলাউদ্দিন খিলজির বাহিনী দুর্গ অবরোধ করে পরিবারসহ সম্পূর্ণ দুর্গবাসীকে আত্মসমর্পণের আহবান জানিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে চিতোরের দুর্গে সকল ধরনের আগমন নির্গমন বন্ধ করে দিলেন। বেশ কয়েক দিনের অবরোধে চিতোরের দুর্গের শক্তি কমতে থাকলে রতন সিং আমরণ যুদ্ধের ব্রত নিয়ে দুর্গের প্রবেশদ্বার খুলতে বললেন। শুরু হয় অসম যুদ্ধ।

যুদ্ধের শুরুতেই পদ্মিনী বুঝতে পারলেন যে, এ যুদ্ধে চিতোরের জয়ের সম্ভাবনা নেই। একই সাথে উপলব্ধি করলেন পরাজয়ের ভীষণ পরিণতি। আমরণ যুদ্ধে পুরুষদের অদম্য স্পৃহা বাড়াতে এবং নারীদের সম্ভ্রম বাঁচাতে পদ্মিনীর নেতৃত্বে দুর্গের কন্যা সন্তানসহ নারীরা বেছে নিলেন আত্মাহুতির পথ। বাইরে যুদ্ধ আর অন্তঃপুরে আত্মাহুতির প্রস্তুতি। অগ্রভাগে পদ্মিনী পরে অন্যান্য মহিলারা প্রথমে বিষপান করে পরে

www.pathagar.com

বিশাল অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিলেন। ওই অসম যুদ্ধে রাজা রতন সিংকে হত্যা করে আলাউদ্দিন খিলজি যখন দুর্গ দখল করলেন, তখন দুর্গের কোন মহিলা বেঁচে নেই।

বিজয়ী আলাউদ্দিন খিলজি রক্তের নদী পার হয়ে যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন তখনও আগুনের লেলিহান কুণ্ডুলি জ্বলছিল। জ্বলছিল চিতোরের রাণীর পার্থিব শরীর। আলাউদ্দিন খিলজি রাণী পদ্মিনীর জ্বলন্ত শরীর খুঁজেও পাননি। আলাউদ্দিন খিলজি যে রমণীর জন্য এত রক্ত ঝরালেন সে রমণী তখন সকলের ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক পবিত্র আত্মায় রূপান্তরিত হলেন।

চিতোরের এ কাহিনী অমর হয়ে রয়েছে। এখানকার মহিলারা আত্মাহুতির মাধ্যমে নিজেদের সম্ভ্রমই শুধু বাঁচায়নি, রেখে গেছেন সাথীদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন।

এ কাহিনী মালিক মোহাম্মদ জায়সী তার ফারসী উপাখ্যান 'পদুমাবত' -এ একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। রাণী পদ্মিনীর কাহিনী নিয়ে উপমহাদেশে একাধিক চলচ্চিত্র হয়েছে। মে ২৫, ২০০৯ হতে ৬ মাসে, একাধিক কিস্তিতে, এ কাহিনীর চিত্ররূপ ভারতীয় টিভি চ্যানেল সনি (Sony) প্রচার করছে।

যাই হোক, পদ্মিনীর উপাখ্যানের উপর দ্বিমত রয়েছে বহু ঐতিহাসিকের যার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় একটু পরে আসছি।

চিতোর দুর্গের বা চিতোর গড়ের রাজ পরিবারের মহিলাদের আত্মাহুতির কাহিনী এখানেই শেষ হয়নি। রাণী পদ্মিনীর পথ অনুসরণ করে প্রায় দুইশত বত্রিশ বছর পর একই দুর্গে আরেক রাণী তার সংগী-সাথীদের নিয়ে একইভাবে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মেওয়ার রাজ্যের রাজা সংগ্রাম সিং-এর বিধবা স্ত্রী রাণী কামাভাতি। রাণী কামাভাতি গুজরাটের শাসক বাহাদুর শাহের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাঁর পাতানো ভাই সম্রাট হুমায়ুনের কাছে ভাই বন্ধন (রাখি) পাঠিয়ে সাহায্য কামনা করেন। হুমায়ুনের আগমনের পূর্বেই পরাজয় অবধারিত জেনে মার্চ ৮,১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে রাণী কামাভাতি তাঁর মহিলা সংগীদের নিয়ে একই দুর্গে প্রায় একই জায়গায় বিষ পান করে অগ্নিতে আত্মাহুতি দেন। অবশ্য হুমায়ুন তার বোনকে বাঁচাতে না পারায় ব্যথিত ছিলেন বহু দিন। পাতানো বোনকে বাঁচাতে না পারলেও হুমায়ুনের প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভাই-বোনের সম্পর্ককে দৃঢ় করতে সেই সময় হতে সমগ্র হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে পড়ে 'রাখি' বন্ধনের উৎসব।

চিতোরের দুর্গে এ দুই ঘটনায় প্রায় ১৩০০ মহিলা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। এদের স্মৃতি আজও চিতোরের অম্লান স্মৃতি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। উপমহাদেশের সবচাইতে বড় এ দুর্গে 'পদ্মিনী মহল' আজও হাজারো পর্যটকের সমাগমে মহামিলন

www.pathagar.com

স্থানে পরিণত হয়। আজও গড়ের জনগণ এ দুই নারীকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। রাণী পদ্মিনী আর কামাভাতের স্মরণে প্রতি বছর রাজস্থানে 'বিষ' বা 'জহর' দিবস উৎসব আকারে পালন করা হয়।

চিতোর গড়ের উপাখ্যান বিভিন্ন ভাবে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে পাওয়া যায়। যেমন আমি 'পদুমাবত'-এর উদ্ধৃতি দিলাম। অপরদিকে জন ব্রিগ কর্তৃক উনবিংশ শতাব্দীতে অনূদিত এবং ষোড়শ শতাব্দীতে মোহাম্মদ কাসেম শাহ ফেরেশতা রচিত "History of the Rise of the Mohomedan powers in India" Vol-1 এ ভিন্নভাবে উল্লেখিত রয়েছে।

আলাউদ্দিন খিলজির দরবারের রোজনামচার সূত্র উল্লেখ করে কাসেম ফেরেশতা চিতোরের রাজা রাও (রাওয়াল) রতন সিং-এর বন্দি দশা থেকে পালিয়ে যাবার যে বিবরণ দেন তার সাথে বর্ণিত কাহিনীর মিল থাকলেও কয়েকটি বিষয়ে তফাৎ রয়েছে। ওই বিবরণে রতন সিং-এর দুই সুন্দরী কন্যার একজনের কথা বলা হয়েছে, স্ত্রীর কথা নয় যার বিনিময়ে রাজা রতন সিংকে মুক্তি দেবার শর্ত আরোপ করেছিলেন আলাউদ্দিন খিলজি। দ্বিতীয় তফাৎটি হল পদ্মিনীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। তৃতীয়ত রাজস্থানে নয় রাজাকে মুক্ত করবার ঘটনাটি দিল্লীতে ঘটেছে বলে কাসেম ফেরেসতা উল্লেখ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, দিল্লী থেকে চিতোর গড়ের দূরত্ব প্রায় ৪০০ কিঃ মিঃ। এর পরের ঘটনার বিবরণ নেই। শুধু উল্লেখ করা হয়েছে যে, চিতোর দখল করবার পর রাজা রতন সিং-এর এক ভাতিজাকে মূল্যবান উপঢৌকন, ৫০০ ঘোড়া এবং ১০,০০০ রাজপুত সৈনিকদের বিনিময়ে চিতোরগড়ের রাজার স্থলাভিষিক্ত করেন দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি।

কাসেম ফেরেশতার বিবরণে জানা যায় যে চিতোর গড়ের যুদ্ধে আলাউদ্দিন খিলজি নিজে নয় এর নেতৃত্বে দিয়েছিলেন আইন-উল-মূলক, খিলজির অন্যতম সিপাহসালার। তবে খিলজি যে চিতোর গড়ের 'রাজকুমারীকে' পিতার মুক্তির বিনিময়ে হেরেমের রক্ষিতা করতে চেয়েছিলেন, সে বিষয়ে ফেরেশতার বিবরণীতে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া রাজাকে মুক্ত করবার কৌশল পূর্ব বিবরণের রাণী পদ্মিনীর কথিত কৌশলের অনুরূপ।[৮]

আলাউদ্দিন খিলজির ব্যভিচার এমনই তুঙ্গে উঠেছিল যে, কথিত আছে ওই সময়ে গিয়াসপুরের আউলিয়া হযরত নিজামউদ্দিন (রঃ) সুলতানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি তাঁর সাথে দেখা করতে চাইলে তিনি দেখা করতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আলাউদ্দিন খিলজি

৮ *John Briggs (Translation) "History of the Rise of Mohomedan Power in India" Vol-I PP.206-207 Atlantic Publishers & Distributors, Darya Ganj -New Delhi-110002 (1998).*

www.pathagar.com

অপঘাতে মারা যান যেমনটা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অপঘাতের মুখ্য কারণ ছিল আলাউদ্দিন খিলজি আর হিজড়া মালিক কাফুরের অনৈতিক সম্পর্ক।

খিলজিদের দিল্লী সালতানাত বেশিদিন টেকেনি। আলাউদ্দিন খিলজি জীবৎকালেই তাঁর ৬ (ছয়) বছর বয়সের পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে বড়ভাই ১৮ বছরের পুত্র কুতুবউদ্দিনকে, ইতিহাসে কুতুবউদ্দিন মোবারক শাহ্ নামে পরিচিত, ছোট ভাইয়ের রাজ-অভিভাবক নিয়োগ দিয়েছিলেন। কিন্তু আলাউদ্দিন খিলজির মৃত্যুর দুই মাসের মাথায় ছোট ভাইয়ের চোখ উপরের অন্ধ করে নিজেই দিল্লীর সুলতান পদে আসীন হন। কুতুবউদ্দিন মোবারক শাহ বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করে খসরু খানের সাথে কথিত অনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সুলতান হবার চার বছরের মাথায় খসরু খান খিলজি বংশের উপরে প্রতিশোধ নেবার অভিপ্রায়ে কুতুবউদ্দিন মোবারক শাহকে ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে হত্যা করেন। কুতুবউদ্দিন মোবারক শাহের মৃত্যুর সাথেই সমাপ্ত হয় ৩০ বছরের খিলজিদের দিল্লী সালতানাত।

খসরু খানের উপাখ্যান অত্যন্ত চমকপ্রদ। খসরু খান হিন্দু থেকে মুসলমান হয়ে ক্রীতদাস হিসেবে আলাউদ্দিন খিলজির অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহচর হয়ে উঠেছিলেন। কুতুবউদ্দিন মোবারক শাহকে হত্যা করে খসরু খান নিজেই চার মাসের জন্য দিল্লীর সুলতান হয়েছিলেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে খসরু খান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের হাতে পরাজিত হন। কথিত আছে খসরু খানকে হত্যা করে তার মরদেহকে পাহাড়ের উপর হতে নিচে ফেলে দেয়া হয়েছিল।

খসরু খানের আসল নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই, তবে তার নিবাস ছিল গুজরাটের সোমনাথ-এ।[৯] খসরু খানের গুজরাটি জ্ঞাতীরা 'বানওয়ারী' নামে আজও পরিচিত।

এসব ঘটনা ঘটেছিল দিল্লীর গিয়াসপুরে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার (রঃ) জীবদ্দশায়। অনেক ঐতিহাসিক এবং হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার (রঃ) জীবনী লেখক এবং ভক্তরা মনে করেন ইতিহাসের এ ভবিষ্যত সম্বন্ধে আউলিয়া আঁচ করতে পেরেছিলেন। কারণ, তিনি মোবারক শাহ আর খসরু খানের অবৈধ সম্পর্কে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন।

আমি অনেকক্ষণ আলাই মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ফলকটি পড়ছিলাম আর ইতিহাসের কালো অধ্যায়ে টাইম মেশিনে সফরের মত সফর করে যখন ফিরলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। একে গরম তার এর পেটে খিদেও লেগেছে। আমাদের কথা ছিল আমরা তিনজনে বাসায় না ফিরে নিজামউদ্দিন দরগাহর কাছে 'করিমস্' রেস্তোরাঁতে

৯. *http: // en. wakipedia.org wiki/khusro-khan*

www.pathagar.com

দুপুরের খাবার খেয়ে সম্রাট হুমায়ুন সমাধি সৌধ দেখে বাসায় ফিরব। মিনহাজ আর আমার সহধর্মিণী ডাঃ রেহানা খানম মনে হয় ততক্ষণে ক্লান্তি আর খিদেয় কুতুব মিনার চত্বরের দর্শনে কিছুটা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। মিনহাজকে ইতিহাস নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে দেখিনি, তবে আমার সহধর্মিণীর কিছুটা আগ্রহ থাকলেও এ কয়দিনের সফর আর গরম সে আগ্রহে নিঃসন্দেহে কিছুটা হলেও ভাটা পড়া স্বাভাবিক। আমি কুতুব মিনার চত্বর হতে বের হবার পথে আরও দু'একটি ঐতিহাসিক জায়গা অল্প সময়ের মধ্যে দেখা শেষ করব বলে আলাই-মিনার হতে বের হয়ে বাইরে যাবার পথে পা বাড়ালাম।

বের হবার পথে মেজর আর স্মিথের (Major R. Smith) দোচালাটি দেখলাম। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর ব্রিটিশ রাজের রয়েল কোর অব ইঞ্জিনিয়ারস্-এর মেজর আর স্মিথ কুতুব মিনারের উপরে, বাংলাদেশে সচরাচর দৃশ্যমান, দোচালা ঘরের চালসদৃশ্য ছাতা লাগিয়েছিলেন। পরে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ পরিদর্শনে আসলে তিনি কুতুব মিনারের সাথে এ অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচ্ছাদন নামিয়ে ফেলেন। সেই থেকে এ আচ্ছাদন এখানে রয়েছে। এখানে ছোট একটি ফলকে সময়ের উল্লেখ করে লেখা হয়েছে 'স্মিথস্ কপোলা' বা 'স্মিথের আচ্ছাদন'। আসলে এটি ছিল স্মিথ নামক এক ইংরেজ মেজরের হিন্দুস্থানের স্থাপত্যের বিষয়ে অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ আর এ জন্য এ জায়গাকে স্মিথস্ ফলি বা 'স্মিথের মূর্খতা'ও বলা হয়ে থাকে।

আমরা কুতুব মিনার চত্বর থেকে বের হয়ে মেহেরুলীর আর কোথাও না থেমে নিজামউদ্দিনের দিকে রওয়ানা হলাম। মেহেরুলীতে বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন রয়েছে যার প্রতিটি নিয়ে এক একটি উপাখ্যান রচিত হতে পারে। হাতে সময়ের স্বল্পতায় সব দেখা সম্ভব হয়নি। তবে চলমান গাড়ি হতে দেখার উদ্দেশ্যে মেহেরুলীর পথ ধরে যেতে বললাম। কিন্তু অনেক ভেতরে বলে হযরত কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি (রাঃ) এর মাজারে যেতে পারলাম না। কাকি (রঃ) মাজারের আশেপাশে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সন্তানসহ পরবর্তী সম্রাট এবং শাহজাদাদের সমাধি রয়েছে। ওই স্থানেই একটি সমাধির জন্য নির্দিষ্ট জায়গা খালি রয়েছে। কথিত আছে যে, যাকে কেন্দ্র করে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু-মুসলমান সিপাহীরা একত্র হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলদারিত্ব হতে হিন্দুস্থানকে মুক্ত করতে এবং যাকে সামনে রেখে প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছিলেন সেই শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর নিজে ওই জায়গা বেছে নিয়েছিলেন তার সমাধির জন্য। বাহাদুর শাহ জাফরের সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। দুঃখ করে তিনি লিখেছিলেন "এতনা হায় বদনসিব জাফর দোয়ে ইয়ার মে, দোগজ জমি না মিলি দাফনকে লিয়ে" (এমন বদনসিব জাফর দুই জাহানে, দাফনের জন্য দুই গজ জমিও

www.pathagar.com

পাওয়া যায়নি)। মেহেরুলীতে আরও আছে জামালী কামালীর দরগাহ, ভুল ভুলাইয়া প্রাসাদ এবং হাউজ কাজী।

মেহেরুলীতে আছে আদম খানের সমাধি যাকে শাস্তি দিয়েছিলেন সম্রাট আকবর। আকবরের বিচারে তাকে আগ্রার দুর্গ হতে নিচে ফেলে দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। আদম খানের সাথে মালওয়ার এর সুন্দরী গায়িকা, পরে রাণী রূপমতী, আর বাজ বাহাদুরের প্রেম উপাখ্যানের করুণ পরিণতির সম্পর্ক রয়েছে।[১০] এছাড়াও আরও বহু অপকীর্তির কারণে সম্রাট আকবর তার দুধ ভাই আদম খানকে শাস্তি দিয়েছিলেন।[১১]

আদম খান ছিলেন আকবরের ধাত্রীমাতা মাহাম আংগার পুত্র। মায়ের কারণে আদম খান আকবরের অন্যতম জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন। আর আদম খানের মাতা মাহাম আংগা হয়ে উঠেন কিচেন কেবিনেটের অন্যতম সদস্য। যখন মান্ডু-এর মুসলিম শাসক (বর্তমানে মধ্যপ্রদেশ) বাজ বাহাদুর এক অতি সাধারণ হিন্দু রাজপুত ঘরের অসামান্য সুন্দরী গায়িকা রূপমতীকে হিন্দু এবং মুসলিম শাস্ত্র মতে বিয়ে করেন, তখন থেকেই আদম খান রূপমতীকে পাবার বাসনায় মত্ত হয়ে উঠেন। আদম খান পীর মোহাম্মদ খানকে নিয়ে মান্ডু আক্রমণ করে রাজা বাজ বাহাদুরকে পরাজিত করেন। বাজ বাহাদুরের পরাজয় এবং আসন্ন বিপদের আঁচ পেয়ে রূপমতী বিষপানে আত্মহত্যা করেন। রূপমতীকে না পেয়ে আদম খান মাণ্ডু-এর যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকসহ সাধারণ নাগরিকদের পরিবারসহ অনেককে নির্দয়ভাবে হত্যা করে রাজকোষসহ জনগণের সম্পত্তি লুট করেন। হাজার খানেক হাতি, কয়েক মণ স্বর্ণ রাজকোষ থেকে লুট করলেও সম্রাট আকবরকে যৎসামান্য মালে গণিমত হিসেবে পাঠিয়ে প্রকৃত ঘটনা চেপে যান। সম্রাট আকবরের কাছে রূপমতীর দুঃখজনক প্রাণ সংহার এবং আদম খানের নৃশংসতার সংবাদ পৌঁছলে তিনি মোহাম্মদ খানকে আদম খানের স্থলাভিষিক্ত করে তাকে আগ্রায় ডেকে পাঠান এবং তাকে দেয় সকল সুযোগ-সুবিধা অন্যায় অপরাধের জন্যে প্রত্যাহার করেন।

১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে মোনায়েম খানের জায়গায় সম্রাট আকবর কর্তৃক মোহাম্মদ আতগা খানকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করাকে ধাত্রী মাতা মাহাম আংগা সহজে গ্রহণ করতে পারেননি। আতগা খান ছিলেন সম্রাট আকবরের আরেক ধাত্রী মাতা জি জি আংগার স্বামী। কথিত আছে মাহাম আংগার নীরব সম্মতিতে আদম খান তার কিছু বিদ্রোহী সঙ্গীদের নিয়ে মে ১৬, ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে আগ্রা দুর্গের দিওয়ান-ই-আম-এ অতর্কিতে

১০. *Kher M.D. (ed) 1981; 'Malwa through' Ages, Bhoopla Directorate of Archelogy and Museums.*

১১. *Ain-E-Akbari-opcit*

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আতগা খানকে (সম্রাট আকবরের প্রধানমন্ত্রী), হত্যা করে খোদ আকবরকে হত্যা করতে তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন। হট্টগোল শুনে আকবরের হেরেমের প্রধান হিজড়া নিমাত দরজা বন্ধ করে দিলে সে যাত্রা সম্রাট আকবর রক্ষা পান। পরে আকবর আদম খানকে আগ্রার দুর্গের সুউচ্চ স্থান হতে নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেন। আদম খানকে দুর্গের ৪০ ফিট উপর হতে দু'বার নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। আদম খানের অপকর্ম, তার শাস্তি মৃত্যু এবং মাহাম আংগার সম্পৃক্ততার কথা সম্রাট আকবর নিজে তাঁর এই ধাত্রী মাতাকে জানালে আকবরকে "ভাল করেছেন" বললেও ভগ্ন হৃদয়ে মাহাম আংগা পুত্রের মৃত্যুর ৪০ দিনের মাথায় মৃত্যুবরণ করেন। সম্রাট আকবর কোনভাবেই তার পালিত ভাইয়ের অপকর্ম, দুর্নীতি এবং স্বেচ্ছাচারিতাকে মেনে নিতে পারেননি।[১২]

আকবর তার পালিত ভাইকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও তার মরদেহকে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে দিল্লীতে দাফনের জন্য পাঠিয়ে দেন। মেহেরুলীতে আদম খান এবং সম্রাট আকবরের ধাত্রী মাতা মাহাম আংগার সমাধিতে সৌধ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই সমাধি সৌধকেই মেহেরুলী তথা দিল্লীর 'ভুল ভুলাইয়া' বলা হয়। এ সমাধি লালকোর্টের দেয়াল ঘেঁষা কুতুব মিনারের উত্তরে অবস্থিত।[১৩]

আমার বহু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আকবরের এই স্মরণীয় বিচারের তাঁর ন্যায়পরায়ণতা এবং স্বজনপ্রীতির উর্ধ্বে উঠে রাজকার্য পরিচালনা করবার যে উদাহরণ তিনি আদম খানের বিচারের মধ্য দিয়ে রেখেছেন, তার নিদর্শন আদম খানের সমাধি সৌধ বিস্তারিতভাবে দেখতে পারলাম না বলে দুঃখ থেকে গেল তবে চলন্ত গাড়ি হতে যতটুকু দেখা যায় তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছি। সম্রাট আকবর এমনিতেই মহান হননি। তিনি মহান মোগল ছিলেন।

'ভুল ভুলাইয়া' এমনভাবে তৈরি যে একবার ভেতরে প্রবেশের পর সহজে বের হবার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। এক প্রকার পথ হারিয়ে যাওয়ার খেলা।

---

১২. *Majumdar RC (ed) 2007: 'The Mughaul Empire' Mumbai, Bhartiya Bhaban ISBN 91-7276-407-1*

১৩. *Ibid*

www.pathagar.com

পনের

হুমায়ুন-এর সমাধিতে

সময় প্রায় ৩টা। আমরা মেহেরুলী ছেড়ে অরবিন্দ মার্গ হয়ে লোদী রোডের দিল্লী গলফ কোর্সকে বাঁ দিকে রেখে লালা লাজপৎ রোড দিয়ে মথুরা রোডে উঠলাম। সোজা গিয়ে হাজির হলাম হযরত খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার সংলগ্ন রাস্তায়। অপর পাশেই সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি সৌধ। আমরা এখানে করিমস্-এ দুপুরের খাবার খেতে এসেছিলাম। আমাদের আজকের প্রোগ্রাম মত দুপুরের আহারের পর মোগলদের দ্বিতীয় সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি সৌধ দেখতে যাব। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আজ সোমবার এবং গত সোমবারেও আমরা হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার (রঃ) দরগাহে এসে 'করিমস্' বন্ধ পেয়েছিলাম। এর আগের বার আমরা জামে মসজিদের সামনে প্রধান ব্রাঞ্চে গিয়েছিলাম। এবার আমাদের হাতে সে সময় না থাকায় ওই গলিতেই আরেকটি রেস্তোরাঁয় বসে গেলাম। জায়গাটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার (রঃ) জীবদ্দশায় এ জায়গায় ছিল তার আস্তানার একাংশ। গিয়াসপুরেই ছিল তাঁর প্রধান আস্তানা। বর্তমানে নিজামউদ্দিনের সন্নিকটে এ নামে একটি ট্রেন এবং মেট্রো স্টেশন রয়েছে।

আমরা 'করিমস্'-এ খেতে না পেরে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাতে বাংলাওয়ালি মসজিদ-এর উল্টোদিকে অন্য একটি রেস্তোরাঁয় খেতে বসলাম। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে ঘ্রাণে গন্ধে 'করিমস্'-এর ধারে কাছেও হয়ত হবে না। বাংলাওয়ালি মসজিদ-এর ইতিহাস তেমন জানা যায়নি, তবে এটা দিল্লীর তাবলিগ জামাতের প্রধান ঠিকানা। আমরা পশ্চিম নিজামউদ্দিনের এক রেস্তোরাঁয়। সামনে মাজারের রাস্তায় প্রচুর ভক্তদের আনাগোনা। এ সময়ে প্রতিটি রেস্তোরাঁ খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। আমরা যে রেস্তোরাঁতে বসেছি সেখানকার ওয়েটারদেরও বিশ্রাম নেই। বয়স্ক একজন ওয়েটার, নাম বাব্বন মিয়া বললেন, "এখানের খাবারও 'করিমস্' থেকে কম সুস্বাদু হবে না।" তার কথায় আমি তেমন আশ্বস্ত হলাম না। তবুও স্মিত হাসি দিলাম যাতে তার মনে কষ্ট না হয়। আমি নিচের তলায় হাতমুখ ধুয়ে উপরে উঠতে গিয়ে আবার বাব্বন মিয়াকে তাড়াতাড়ি করতে তাড়া দিলাম। বাব্বন মিয়া আমাদের পরিচয় জানতে চাইলে আমি বাংলাদেশি বলাতে হৈ হৈ করে উঠে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল যে সামনে বাংলাওয়ালী মসজিদ-এ

www.pathagar.com

প্রচুর বাংলাদেশি মুসল্লি আসেন এবং এ রেস্তোরাঁ তাদের প্রিয় জায়গা। তবে সবাই এখানে খান না কারণ, মসজিদে থাকা ও খাবার জায়গা রয়েছে। বাব্বন মিয়া জানালেন, তাঁদের চৌদ্দ পুরুষ থেকে নিজামউদ্দিনের সন্নিকটে 'বারাখাম্বা', মানে বারোখাম্বা, এলাকায় থাকেন। বর্তমানে তাঁদের পুরাতন 'হাভেলী' (?) নতুন করে তৈরি হচ্ছে।

'বারাখাম্বা', সৌধ সুদৃশ্য। লোধীদের সময় নির্মিত তবে কার সমাধি এখানে আছে কেউ বলতে পারে না। বাব্বন মিয়া বেশ মিশুক মানুষ বুঝতে পারলাম তবে প্রচণ্ড ব্যস্ত। তবুও তার ব্যস্ততার মাঝেও টুকিটাকি আলাপ হচ্ছিল। বাব্বন মিয়া বললেন তাবলীগে যারা আসেন তাদের বেশির ভাগ মুসল্লি মাজারমুখী হন না তবে বাংলাদেশি বহু ভক্ত এখানে বছরের প্রায় দিনই এসে থাকেন।

বাংলাওয়ালী মসজিদ পশ্চিম নিজামউদ্দিনে তাবলিগ জামাতের প্রথমদিকের প্রধান কেন্দ্র। তাবলিগ আন্দোলন শুরুই হয়েছিল তখনকার বস্তি নিজামউদ্দিন থেকে। আন্দোলন শুরু হয় ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে। উদ্যোক্তা ছিলেন মওলানা আহাম্মদ ইলিয়াস। প্রায় পনের বছর পূর্বে এ কেন্দ্রটি পাঁচতলা করা হয়। সূফি ইসলামের সাথে তাবলিগ জামাতের এখন পর্যন্ত তেমন সংঘর্ষ না হলেও তবলিগ জামাত সূফী ইজম-এর তেমন পক্ষেও নয়। অথচ হিন্দুস্থানে আউলিয়ারা সূফি মতবাদের প্রচার করেছেন যার মধ্যে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া অন্যতম।

হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া (রঃ) তাঁর সময়ে বহুবার সূফী বিরোধী কট্টরপন্থী'ওলেমা'দের রোষানলে পড়েছিলেন। অবশ্য প্রথম দিকে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়াকে তৎকালীন শাসকদের কাছে সময় সময় হেনস্থা হতে হয়েছে।

প্রথম জীবনেই প্রায় মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেয়েছিলেন এই সাধক। সময়টা ছিল দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সালতানাতের। গিয়াসউদ্দিন বলবন ছিলেন তুর্কী বংশোদ্ভূত ইলবারি সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য। শৈশবে মঙ্গোলিয়ান হামলাকারীরা মালে গণিমত হিসেবে তাকে গজনীর বাজারে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে। পরে ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিন বলবনকে দিল্লীর সুলতান ইলতুতমিশ খরিদ করেন। তবে পরে তাঁর (ইলতুতমিশের) শ্বশুর কুতুবউদ্দিন আইবকের আদেশে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। সুলতান ইলতুতমিশ এর কন্যা রাজিয়া সুলতানার মৃত্যুর পর বলবন দ্রুত ক্ষমতার শিখরে উঠতে থাকেন। প্রথমে দিল্লী সালতানাতের প্রধানমন্ত্রী পরে সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদের মৃত্যুর পর নিজে দিল্লীর সুলতান পদে আসীন হন। সুলতান নাসিরউদ্দিন ছিলেন গিয়াসউদ্দিন বলবনের জামাতা। গিয়াসউদ্দিন বলবন ১২৬৬ হতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত (১২৮৭) দিল্লীর শাসক ছিলেন।

গিয়াস উদ্দিন বলবনের জীবন কাহিনী অত্যন্ত বিচিত্র। গিয়াস উদ্দিন মামলুক

www.pathagar.com

বংশোদ্ভূত ভাগ্যহত যুবক হিসেবে মঙ্গোলদের হাতে ধরা পড়বার পূর্বে তারই এক স্বগোত্রীয় সাধকের সাথে বোখারাতে দেখা হয়। ছোট খাটো নাদুস নুদুস শরীরের দেখতে কোন ভাবেই আকর্ষণীয় নয়, এমন মানুষ গিয়াস উদ্দিনকে দেখে সাধক ঠাট্টাছলে বললেন,"ইয়া তুর্কিক"। ওই সময়ে এ ধরনের সম্বোধন কোন ব্যক্তিকে হেয় করবার জন্যে করা হত।

এই অপমানজনক সম্বোধনের উত্তরে যুবক গিয়াসউদ্দিন বলবন যথেষ্ট সমীহ করে সাধককে বললেন,"আপনার খেদমতে হাজির খোদাওয়ান্দ।" যুবকের উত্তরে সাধক খুশি হয়ে বাজারে ফল বিক্রেতার দিকে তাকিয়ে বললেন "আমাকে আপনি একটা আনার কিনে দেবেন, আমি ভাবছিলাম পেলে খেতাম কিন্তু জনাব আমার কাছে পয়সা নেই।"

"নিশ্চয়ই" বললেন গিয়াস উদ্দিন বলবন। তিনি তার পকেটে যে কয়টা পয়সা ছিল তা দিয়ে কয়েকটা আনার কিনে সাধককে দিলে সাধক সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আপনার বদান্যতার পরিবর্তে আমার দেবার কিছুই নেই তবে আপনাকে হিন্দুস্থান এর রাজত্ব দিলাম।"

বলবন নিজের হাতে চুমো দিয়ে বললেন,"আমি আপনার বর অত্যন্ত সানন্দে গ্রহণ করলাম"। বলবন তখনও জানতেন না যে অচিরেই তিনি হিন্দুস্থান এর মাটিতে পা রাখতে যাচ্ছেন। ওই সময়ে কুতুবউদ্দিন আইবক-এর জামাতা সামশউদ্দিন ইলতুতমিশের জন্যে অনেক মামুলক ক্রীতদাসের সাথে গিয়াস উদ্দিন বলবনকেও খরিদ করা হয়। তবে গিয়াসউদ্দিনকে সঠিক কোন বাজার হতে কেনা হয় সেটা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা মতদ্বন্দ্ব রয়েছে।

আরও পরে ইলতুতমিশ ১২১১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সুলতান হবার পর বিভিন্ন কাজে প্রাক্তন মামলুক দাসদের নিয়োগ করলেও চেহারা ও আকারের কারণে যুবক গিয়াস উদ্দিনকে তাঁর ব্যক্তিগত কাজে নিযুক্ত করতে চাননি। সুলতানের সামনে সব মামলুকদের নিয়ে আসলে তিনি গিয়াস উদ্দিন বলবনকে বাদ দিয়ে বাকি সকলকে প্রাসাদের কাজে নিয়োগ দিলে গিয়াসউদ্দিন বলবন হাত জোড় করে বললেন, "হুজুর আপনি আমাকেও আপনার জন্য খরিদ করেছিলেন। দয়া করে আমাকে আপনার কাজে নিয়োজিত করুন জাঁহাপনা। আমি আপনার গোলাম।" ইলতুতমিশ গিয়াসউদ্দিনের আরজি মঞ্জুর করে তাকে ভিস্তিওয়ালাদের ('মশক-এ পানি বহনকারী)✦ দলে নিয়োগ দিতে হুকুম দিলেন। গিয়াস উদ্দিন বলবন সাধকের কথা মনে রেখেছিলেন। তিনি ওই কথা মনে রেখেই এ পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের উপর নিজেকে সঁপে দিলেন।

✦ *মশক-এক ধরনের বৃহদাকারের পানি বহনকারী চামড়ার থলি।*

www.pathagar.com

হিন্দুস্থানে মুসলমানদের শাসন কায়েম হলেও ক্রমেই শাসকরা স্থানীয় রীতিনীতির বহু কিছুই মেনে চলতে শুরু করেছিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল জ্যোতিষবিদ্যা। হিন্দুস্থানের জোতিষীরা ক্রমেই দরবারের যথেষ্ট প্রভাবশালীদের মধ্যে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুলতান ইলতুতমিশ-এর দরবারেও ছিল বহু জ্যোতিষী। সুলতান নিজেও জ্যোতিষীদের সাথে পরামর্শ করতেন। এক পর্যায়ে জ্যোতিষীরা সুলতানকে বললেন যে, তাঁর মামলুক ভৃত্যদের মধ্যে কোন একজন তার ছেলেদের হাত থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষমতা দখল করবে। যতবারই জ্যোতিষীরা সুলতানকে এ ধরনের ভবিষ্যত বাণীর কথা বলেছে ততবারই সুলতান এসব কথায় কর্ণপাত করেননি। অবশেষে জ্যোতিষীরা সুলতানদের বড় বেগম ইলতুতমিশ এর সন্তানদের মায়ের কাছে তাঁদের ভবিষ্যত বাণী তুলে ধরলে বেগমের চাপে সুলতান জ্যোতিষীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে দরবারের শত শত মামুলকদের মধ্যে একজনকে কিভাবে তারা শনাক্ত করবেন। উওরে জ্যোতিষীদের গুরু বললেন,"নিশ্চয়ই জাঁহাপনা আমাদের কাছে যে ধরনের চিহ্ন এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের' মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্যন্য প্রমাণাদির মাধ্যমে আমরা শনাক্ত করতে পারব।" অতঃপর সুলতান রাজি হলেন। শুরু হল শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া।

শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া দিনের শুরুতে আরম্ভ হলেও ভিস্তিওয়ালাদের সময় আসতে আসতে দুপুর গড়াতে লাগল। অভুক্ত ভিস্তিওয়ালারা দলের সর্দারদের হুকুম নিয়ে গোবেচারা সাদৃশ্য বলবন-এর সাথে রাখা পানি বহনকারী 'মশক' নিজেদের কাছে রেখে বলবনকে বাজারে পাঠালেন খাবার কিনে আনতে। বলবন প্রথম বাজারে খাবার না পেয়ে অন্যবাজারে যাওয়াতে সহজে ফিরতে পারলেন না। এতক্ষণে জোতিষীদের কাছে ডাক পড়ল ভিস্তিওয়ালাদের; তখনও গিয়াস উদ্দিন বলবন খাবার নিয়ে ফিরে আসেননি। বলবনের অনুপস্থিতিতে প্রমাদ গুনলেন ভিস্তিওয়ালারা। একজন অনুপস্থিত মানে তাদের গর্দান রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়বে। অগত্যা বলবন সদৃশ আরেক যুবককে 'মশক' দিয়ে বলবনের জায়গায় দাঁড় করিয়ে জ্যোতিষীদের সামনে আনা হল। জ্যোতিষীরা মামুলকদের প্রত্যেককেই যে ভাবে পরখ করেছে সেভাবেই সবাইকে পরখ শেষ করে কথিত বলবনের মধ্যে জ্যোতিষবিদ্যার ছকে আঁকা কোন চিহ্ন না পেয়ে সুলতানকে জানালেন যে বর্তমানে দরবারের মামুলকদের মধ্যে এমন কাউকেই তারা শনাক্ত করতে পারেননি।

গিয়াসউদ্দিন বলবন সে যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিলেন এবং পরে সত্যিই দিল্লীর সুলতান হয়েছিলেন। তিনি তার জামাতা সুলতান নাছির উদ্দিন মাহমুদকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। এমনকি ইবনে বতুতাও

www.pathagar.com

তেমনটাই লিখেছেন।[১]

গিয়াস উদ্দিন বলবন এর উত্থান আর স্বল্প পরিচিত বুখারার সাধকের ভবিষ্যদ্বাণী কাকতালীয় বলে অনেকের কাছে মনে হলেও গিয়াসউদ্দিন বলবন হিন্দুস্থানের মাটিতে পা দেবার পর তার ভাগ্য তাকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়েছিল।

বলবন যখন সুলতান হন তখন নিজামউদ্দিন আউলিয়া যুবক বয়সের একজন সূফী সাধক বা দরবেশ হিসেবে গিয়াসপুরে খ্যাতি পেতে থাকেন। ক্রমেই ভক্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার চিশতিয়া সূফীবাদের প্রতি সব ধর্মের মানুষ আকৃষ্ট হতে থাকলে সুলতানের দরবারের কট্টরপন্থী ওলামারা প্রমাদ গুণতে থাকেন। সুলতানের দরবারের ওলামাদের প্ররোচনায় নিজামউদ্দিন আউলিয়া (রঃ)-কে গুটিকয়েক অনুরক্তসহ বন্দি করে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন নিজামউদ্দিনকে 'নিজেকে দরবেশ এবং বিধর্মীদের সাথে মুসলমানদের একত্র করবার' কথা মনে করিয়ে দিয়ে 'নিজেকে আল্লাহর মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে জাহির করছেন' বলে অভিযোগ করেন। তিনি আরও বলেন যে ওলামাদের অভিযোগ, আপনি মসজিদ চত্বরে গান-বাজনার মাধ্যমে সব ধর্মের মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছে সমান বলে প্রচার করছেন যা ওলামাদের মতে ইসলাম বিরোধী।" সুলতান নিজামউদ্দিনকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন, "দরবেশ ওলামাদের অভিযোগের উত্তরে আপনি কি বলবেন?"

হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া সুলতানকে বলেন যে একথা সত্য যে তিনি হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কে আল্লাহর বান্দা বলে সমান মনে করেন। ওলামারা আল্লাহ এবং তার রসূলের নামে বিধর্মী আখ্যায়িতদের হত্যা আর উপাসনালয় ভাঙবার যে আহ্বান জানান সেটাকে তিনি সঠিক মনে করেন না। আরও বলেন যে তিনি আল্লাহর পবিত্র বাণীকে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করেন যা ওলামাদের বিশ্লেষণ থেকে ভিন্নতর। তিনি মনে করেন আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে হলে তার বান্দাদের প্রতি ভালবাসাই একমাত্র পথ।

নিজামউদ্দিন আউলিয়া নির্ভীকচিত্তে দ্বিতীয় অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন যে তিনি তাঁর দোষ স্বীকার করছেন। তাঁর মধ্যবর্তী অবস্থানের ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের পয়গম্বর রসূলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "যে ব্যক্তি একজন পথ প্রদর্শক ছাড়া মারা যান তিনি অবিশ্বাসী হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন।" আরও বলেন যে, সূফীবাদের বিশ্বাসী হিসেবে তিনি মনে করেন পথপ্রদর্শক ছাড়া একজন মানুষ ধর্মহীন ব্যক্তি। তিনি বলেন যে আল্লাহ যে তার বান্দাদের মধ্যেই থাকেন তা ওলামারা জানেন না। আল্লাহকে জানতে হলে শুধু কিতাব আর যুক্তিই যথেষ্ট নয়। হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া আরও

১। *HAR Gibbs (Translated) The Travels of Ibn Battua-vol III, P 630-631. Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd, Delhi, India.*

www.pathagar.com

বলেছিলেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে বলেছেন যে আল্লাহ জানবার বিষয় নয় উপলব্ধি করবার বিষয়।' এ পর্যায়ে উপস্থিত ওলামারা সুলতানকে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার বক্তব্য না মেনে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জোর সুপারিশ করলে নিজামউদ্দিন আউলিয়া আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার অনেক উদাহরণ দিয়ে সূফীবাদের পক্ষে জোর বক্তব্য তুলে ধরলে সুলতানের দরবারে উপস্থিত পারিষদ অভিভূত হয়ে পড়েন। প্রথম ও দ্বিতীয় অভিযোগ ওলামারা সুলতানের সামনে যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারলেন না।

এবার সুলতান তৃতীয় অভিযোগ গান-বাজনার মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকা শিরক কিনা সে প্রশ্ন তুললে দরবেশ নিজামউদ্দিন সে অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন যে, রাসূলের সময় আল্লাহর প্রেমের গান এবং এক ধরনের নৃত্যের চল ছিল বলে কথিত আছে। তিনি আরও বলেন, একজন বান্দা যখন তার নিজের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করে মাত্র তখনই গান এবং নৃত্যের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন। নিজামউদ্দিন আউলিয়ার যুক্তি-তর্ক শুনে গিয়াসউদ্দিন বলবন তাঁর (নিজামউদ্দিন) বিরুদ্ধে আনীত ওলামাদের সব অভিযোগ থেকে রেহাই দেন। এ ঘটনার পর হতে নিজামউদ্দিন আউলিয়ার খ্যাতি দিল্লী ছাড়িয়ে হিন্দুস্থানের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। কথিত আছে যে, এ ঘটনার পর হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া তার জীবদ্দশায় দিল্লীর কোন শাসকের মুখোমুখি হননি এমনকি তাঁর আস্তানায় (খানকা) কোন শাসককে স্বাগতমও জানাননি। তার সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্য শাসকদের অনুরোধে তিনি কখনও সাড়া দেননি। এরপরের বহু শতক, বহু যুগ ধরে ওলামাদের সাথে সূফীবাদের টানাপোড়েনে ছিল। বর্তমানে টানাপোড়েন এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছেঃ বিতর্ক হচ্ছে সূফীবাদ বনাম ওয়াহাবীবাদ নিয়ে।

আমি বাব্বন মিয়ার কথা বলতে গিয়ে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া আর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন-এর দরবারের ওলামাদের প্রসঙ্গ এ জন্য টানলাম যে কারণে তা হল বর্তমান বিশ্বের অস্থিরতার পেছনে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সংঘাত যেমন একটি কারণ, তেমনি ধর্মের অন্তর্দ্বন্দ্বও একটি প্রধান কারণ হিসেবে ধরা হচ্ছে। এ সব সমস্যা ঐতিহাসিক তবে বর্তমানে যত প্রকট হয়ে উঠেছে অতীতে তেমনটা ছিল না। সূফীদের কারণে উপমহাদেশে বহু শতাব্দীব্যাপী, তুলনামূলকভাবে, আন্তঃধর্ম সম্প্রীতি আজকের তুলনায় বেশি মাত্রায় ছিল বলে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায়।

এতক্ষণে আমাদের খিদে আরও বাড়ছিল। কিছুক্ষণ পর বাব্বন মিয়া আমাদের খাবার পরিবেশন করে গেলেন। খাবারের স্বাদ কোনভাবেই করিমস্-এর সাথে তুলনীয় নয়। খাবার শেষে রেস্তোরাঁ থেকে বের হবার পথে বাব্বন মিয়াকে বখশিসসহকারে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা নিজামউদ্দিন ছেড়ে মোগল সম্রাট হুমায়ুন-এর সমাধি সৌধের

www.pathagar.com

পথে রওনা হলাম। রওনা হবার পূর্বে দিল্লীর পান খেতে ভুললাম না।

মথুরা রোডে সম্রাট জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা বলে পরিচিত, আব্দুর রহিম খানের নীলা গম্বুজ নামে পরিচিত সমাধি সৌধ মথুরা রোডের সংযোগস্থলের গোলচত্বরের শোভাবর্ধক হিসেবে রক্ষিত রয়েছে।

আব্দুর রহমান খানের সমাধি সৌধটির চত্বর আরও বড় এবং দেয়াল ঘেরা ছিল, কিন্তু মথুরা রোড সম্প্রসারণের সময় শুধু সমাধি সৌধটি গোল চত্বরে রাখা হয়। মথুরা রোডের বহুদূর হতে এই সুদৃশ্য নীল গম্বুজের সৌধটি চোখে পড়ে। গোল চত্বরের উল্টোদিকে ডিস্ট্রিক কোর্টের অবস্থান। এ সময়ে বেশ ব্যস্ত থাকে মথুরা রোড তবে কখনই তেমন যানজট হয় না। দিল্লী শহরে কদাচিৎ যানজট হয়। কারণ প্রচুর রাস্তা, ফ্লাইওভার এবং অত্যন্ত ভাল ট্রাফিক ব্যবস্থা। এ ছাড়াও দিল্লীর মেট্রো ব্যবস্থার কারণেও রাস্তায় যানজট কম হয়।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সম্রাট হুমায়ুনের সুদৃশ্য এবং সুরক্ষিত, শাহজাহান পূর্ব মোগল স্থাপত্যের নিদর্শন, সমাধি সৌধের বাইরের দেয়ালের প্রবেশ পথের টিকেট কাউন্টারে এসে পৌঁছলাম। সময় বিকেল প্রায় ৪টা। হাতে সময় এক ঘণ্টা। মোগল সম্রাটদের প্রথম সমাধি সৌধ হিসেবে হুমায়ুনের সমাধি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ সৌধটির নির্মাণ কাল ১৫৬২-১৫৭২। এ সৌধ নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধানে ছিলেন সম্রাট হুমায়ুনের বিধবা পত্নী হামিদা বানু বেগম। স্থপতি ছিলেন মালিক মীর্জা গিয়াস। এ সৌধ নির্মাণের সময় সার্বক্ষণিক তদারকির সুবিধার্থে মালিক মীর্জা গিয়াস এবং তার সহযোগীদের জন্য আলাদা বাসস্থান সৌধের চৌহদ্দির মধ্যেই তৈরি করা হয়েছিল। ওই স্থাপনাগুলো এখনও দর্শনীয় স্থান হিসেবে সংরক্ষিত রয়েছে। ওই স্থানটি চৌহদ্দির প্রধান প্রবেশপথের ডানদিকে চিহ্নিত রয়েছে। বর্তমানে UNESCO এর World heritage site হিসেবে চিহ্নিত।

সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি সৌধে অনেকের কবর রয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে হুমায়ুনের পত্নী হামিদা বানু বেগমের, তিনি সম্রাট আকবরের মাতা, কবর রয়েছে সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারশিকোর যাকে শাহজাহানের উত্তরসূরি মনে করা হতো। অনেক ঐতিহাসিক বিশ্লেষক ও গবেষকরা মনে করেন দারাশিকো শাহজাহানের উত্তরসূরি হিসেবে মোগল সম্রাটের পদে আসীন হতে পারলে হয়ত হিন্দুস্থানের সবচাইতে প্রভাবশালী মোগল সাম্রাজ্য এত সহজে ধ্বংস হতো না। এটা গবেষকদের কথা। হলে কি হতো ইতিহাস কোন পথে মোড় নিত তা এখন গবেষণার বিষয় হলেও নিশ্চিত করে এখন বলা সম্ভব কি? তবে ছোট ভাই আওরঙ্গজেবের হাতে দারাশিকোর নির্মম হত্যা অত্যন্ত দুঃখজনক। দারাশিকোকে হত্যার পর তাঁর মাথা ধর হতে আলাদা করে বন্দি বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানের নিকট আগ্রায় প্রমাণ হিসেবে পাঠানো হয়েছিল।

www.pathagar.com

এখানে আরও শায়িত আছেন পরবর্তী কয়েকজন মোগল সম্রাট। রয়েছেন সম্রাট জাহান্দার শাহ, ফররুখ শিয়ার, রফিউল দৌলাত এবং দ্বিতীয় আলমগীর এঁদের মধ্যে জাহান্দার শাহ এগারো মাসের মত শাসন করেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রেম আর করুণ পরিণতির কথায় পরে আসব।

আমরা ভেতরের দেয়ালের প্রধান ফটকের সামনে পৌছলে ফটকের মাঝেই ফুটে উঠল উপমহাদেশের প্রথম সমাধি সৌধ বাগান 'চারবাগ' (চার বাগান)। মোগল বাগানের প্রধান আকর্ষণ পানির নহর দ্বারা সমকোণে চারভাগ এবং মাঝখানে পানির বিশাল চৌবাচ্চা অথবা সমাধি সৌধের স্থাপনা। এর ব্যাখ্যায় বলা হয় যে এ নক্সার ধারণা নেয়া হয়েছে পবিত্র কোরআনে বেহেশতের বর্ণনা হতে। এটা ছিল মোগলদের বাগানের নক্সা যা সম্রাট বাবর আগ্রাতে প্রথম 'চার বাগান' বানাতে ব্যবহার করেন। এরপর হতে এটি চালু ছিল মোগলদের শাসনকালে। একই কায়দায় চারবাগান তৈরি হয়েছিল আকবরের সমাধিতেও। তবে হুমায়ুনের সৌধের চৌহদ্দি আকবরের সমাধির চৌহদ্দি হতে বড়।

চারবাগকে অতি সুন্দরভাবে রাখা হয়েছে। এর বিভক্তিও আকবরের সমাধির অনুরূপ। পানির নহর দিয়ে সৌধকে মাঝে রেখে বাগানকে চারভাগ করা হয়েছে এবং এই চারভাগের নামেই বাগানের নাম 'চারবাগ'। চারভাগকে মোট ৩৬টি বর্গক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। এখানে বেহেশতের বাগানের চার নদীর কল্পিত নক্সা অনুসরণ করা হয়েছে যেমন আমরা আকবরের সমাধিতে প্রত্যক্ষ করেছি। চারবাগ কনসেপ্ট (ধারণা)-এর ধারাবাহিকতা মোগলদের তৈরি সব বাগানে দৃশ্যমান। এমনকি কাবুলে বাবরের সমাধিতেও একই ধরণ পরিলক্ষিত হয়।

হুমায়ুনের সমাধি সৌধের চারবাগে নির্ভয়ে কয়েক শত চিত্রা হরিণ বিচরণ করতে দেখেছি। দেখেছি বিচিত্র ধরনের পাখির অভয়াশ্রম। দেখেছি অসংখ্য ময়ুর।

সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিটি নিচে বেসমেন্টে হলেও সমাধির সৌধটি ৮ মিটার উঁচুতে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। সমাধি সৌধের ক্ষেত্র মোট ১২০০০ বর্গমিটার। এ সৌধে রয়েছে ৪৬টি কক্ষ এবং কবর রয়েছে ১০০টির উপরে। সবই সাদা মার্বেলের তৈরি। অনেকগুলোতে ফার্সি ভাষায় নাম লেখা, অন্যগুলোতে নাম নেই। ধারণা করলাম যে, এ সৌধের সব কবরই মোগল সম্রাটদের অতি নিকটজনের হবে।

সম্রাট হুমায়ুনের কবরটি মধ্যের প্রকোষ্ঠে যার নির্মাণ শৈলী অভূতপূর্ব। কবরের পশ্চিম দিকে একট মেহরাব রয়েছে। মেহরাবটি মার্বেল পাথরের জালি বা জাফরি দিয়ে ঘেরা এবং কাবা শরিফের দিকে মুখ করা। মনে হয় এখানে দাঁড়িয়ে নামাজ অথবা ফাতেহা পাঠের জন্য তৈরি করা। পাশের রুমে তিনটি কবর যার মাঝখানেরটা হুমায়ুন পত্নী হামিদা বানু বেগমের এবং এর পাশে তাঁদের ঔরসের বংশধর দারাশিকো এবং

www.pathagar.com

বোধকরি ফররুখ শিয়ারের করব। সবক'টির উপরে বোধ করি ফারসীতে নাম লেখা রয়েছে।

হুমায়ুনের কবরের পাশে মেহরাবে পবিত্র কোরআন শরীফের ২৪তম সূরা "আননূর' মার্বেলের উপরে খোদাই করা রয়েছে। এখানেই ১৮৫৭ এ শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর তার তিন পুত্রকে নিয়ে মেজর হাডসনের কাছে আত্মসমর্পণের পূর্বে তিন রাত কাটিয়েছিলেন। সম্রাট বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের কবর কক্ষে জীবনের সবচাইতে দুঃসময়ের কয়েকটি রাত্রি যাপন করেছিলেন।

দ্বিতীয় মোগল সম্রাট, আল-সুলতান-আল-আযম ওয়াল খাকান, আল-মোকাররম, জাম-ই-সালতানাতা-ই- হাকিকি ওয়া মাজাজি, সৈয়দ আল সালাতিন, আবু মোজাফফর নাসিরউদ্দিন মোহাম্মদ হুমায়ুন বাদশাহ গাজী, জিল্লুল্লাহ; দুই কিস্তিতে হিন্দুস্থান শাসন করেন। মাঝের পাঁচ বছর তিনি শেরশাহ সূরীর নিকট রাজত্ব হারিয়ে দেশান্তরি হয়েছিলেন। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর পুরান কেল্লা নামক দুর্গে নিজের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরির সিঁড়িতে পা পিছলিয়ে পড়ে গিয়ে আঘাতজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন মোগল সামাজ্যের দ্বিতীয় সম্রাট হুমায়ুন। আছরের আজান শুনে নামাজের উদ্দেশ্যে হাত ভর্তি বই নিয়ে হুমায়ুন মসজিদে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হন। হুমায়ুন যে দ্বীতল গোল দালানকে নিজস্ব লাইব্রেরি বানিয়ে ছিলেন সেটি শেরশাহ্ তাঁর সময়ে 'শেরমন্ডল' নামে বিশ্রামগাহ হিসেবে তৈরি করেছিলেন। হুমায়ুনের দুর্ঘটনার স্থানটি সৌধ হতে কয়েক কিলোমিটার দূরে। আমরা পরের দিন মে, ১২, ২০০৯ এ হুমায়ুনের তৈরি 'পুরানা কেল্লা' দেখতে যাব বলে আগেই মনস্থ করে রেখেছিলাম। পুরানা কেল্লাতেই শেরমন্ডল বা হুমায়ুনের লাইব্রেরি সংরক্ষিত আছে।

হুমায়ুন তার পিতা, হিন্দুস্থানে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, বাবরের উত্তরসূরি হয়ে তৎকালীন হিন্দুস্থানের মোগল সাম্রাজ্যের বেশিরভাগের সম্রাট হলেও তিনি সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যের নিরঙ্কুশ সম্রাট ছিলেন না। বাবরের স্ত্রীর পূর্বের পুত্র হুমায়ুনের বৈ-পৈত্রেয় ভাই কামরান মির্জার সাথে পিতার ইচ্ছায় মোগল সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করে একভাগের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আগ্রার রাজধানীতে সিংহাসনে আসীন হলেও কামরান মির্জা কাবুল আর লাহোরসহ উত্তরাংশের রাজত্ব পান। কামরান মির্জা হুমায়ুনকে খুব একটা পছন্দ করতেন না যা বাবর-এর অজানা ছিল না। আকবরের জীবননামা লেখক আবুল ফজল বাবরকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুকালে বাবর পুত্র হুমায়ুনকে বলেছিলেন, "তোমার ভাইদের বিরুদ্ধে কিছুই করো না যদিও তারা অবহেলার পাত্র।" হুমায়ুনের আরেক বৈ-পৈত্রেয় ভাই, মির্জা কামরানের আপন ছোট ভাই, আসকারিও

www.pathagar.com

বহুভাবে হুমায়ুনকে ক্ষতি করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

পিতার কথায় পুত্র হুমায়ুন বৈ-পৈত্রেয় ভাইদের নিজের ছোট বৈমাত্রেয় ভাই হিন্দেলের মতই দেখতেন। কিন্তু রাজা আর রাজত্বের ইতিহাস যুগে যুগে নির্মম বলে প্রমাণিত হয়েছে। ক্ষমতার মোহ রক্তের টানের চাইতে বড় মোহ বলে যুগ-যুগান্তরে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান যুগেও হচ্ছে।

মির্জা কামরান লাহোর আর কাবুল নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি হুমায়ুনের অবর্তমানে আগ্রার উদ্দেশ্যে তাঁর সেনা নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করেন। হুমায়ুন, তখন নিজে বাংলায় বিদ্রোহ দমনে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। আর বৈমাত্রেয় ভাই হিন্দেল এ সুযোগে জুমা নামাজে হুমায়ুনের পরিবর্তে নিজের নামে খুৎবা দিতে চাপ প্রয়োগ করে বিদ্রোহের জন্ম দিচ্ছিলেন। ১২,০০০ সৈন্য নিয়ে কামরান হুমায়ুনের সপক্ষে হিন্দেলকে শায়েস্তা করবার উছিলায় হিন্দুস্থানের রাজধানীর সন্নিকটে পৌছেন। হুমায়ুন তখন চৌশার যুদ্ধে বিপর্যস্ত। ভাইয়ের কথিত সমর্থনে আগমনের সংবাদে হুমায়ুন আনুষ্ঠানিক ভাবে চৌশার বিপর্যয় এড়াতে মির্জা কামরানের সাহায্য চেয়ে বিফল হন। হুমায়ুন চৌশার যুদ্ধে পরাজিত হন। কামরান হুমায়ুনকে পর্যুদস্ত অবস্থায় রেখে লাহোরে ফিরে যান। হুমায়ুন দেরিতে হলেও তাঁর বৈপৈত্রেয় ভাইয়ের মতলব বুঝতে পেরেও কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেননি।

একদিকে হুমায়ুনের বিপর্যস্ত অবস্থা অপরদিকে আফগান সেনাপতি শেরশাহ সূরীর হিন্দুস্থান আক্রমণ, কামরান মির্জাকে অতি উৎসাহিত করে তোলে। অবশেষে হুমায়ুন আগ্রার নিকটবর্তী যুদ্ধের ময়দান কৌনুজে মে, ১৭, ১৫৪০-এ হেরে গেলে শেরশাহ দুই ভাই হিন্দেল আর আসকারিসহ হুমায়ুনকে কাবুলে নির্বাসনে চলে যেতে বললে হুমায়ুন দু'ভাইকে নিয়ে লাহোরে চলে আসেন। পরে অবশ্য কামরান মির্জা ভাইয়ের সহায়তায় অন্য ভাইদেরও একত্রিত করে শেরশাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী একতায় বাদ সাধে শেরশাহের লাহোরমুখী অভিযানের সংবাদ। হুমায়ুন শেরশাহের সাথে চুক্তির আগ্রহ প্রকাশ করে হিন্দুস্থানের অন্য অংশ নিয়ে লাহোর বাদ দিতে বলেন এবং সিরহিন্দ নামক জায়গা বরাবর শেরশাহ ও হুমায়ুনের মধ্যে সীমানা নির্ধারণের প্রস্তাব দেন। হুমায়ুনের প্রস্তাবের পেছনে সামরিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ছিল তা শেরশাহ বুঝতে পেরেছিলেন। শেরশাহ হুমায়ুনর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাকে কাবুলে চলে যেতে পুনরায় বললে কামরান মির্জা হুমায়ুনকে তার রাজত্বের অংশীদার বানাতে রাজি না হয়ে শেরশাহের নিকট উল্টো প্রস্তাব পাঠান।

প্রস্তাব ছিল যে শেরশাহ পাঞ্জাব কামরানের হাতে ছেড়ে দিলে শেরশাহের সপক্ষে ভাই হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত। এ খবর লাহোরে ভাগ্যাহত হুমায়ুনের কাছে পৌছলে হুমায়ুন সপক্ষের পারিষদরা কামরান মির্জাকে হত্যা করবার পরামর্শ

www.pathagar.com

দিলে হুমায়ুন এ ধরনের ঘৃণ্য প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সম্রাট হুমায়ুন তার পিতার শেষ অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।[২★] হুমায়ুন পরে যখন সিন্ধু হয়ে পশ্চাৎপর ছিলেন তখন তার ভাইদের মধ্যে আপন ভাইয়ের মত স্নেহাস্পদ আরেক বৈমাত্রেয় ভাই হিন্দেলও তাঁর সাথে ছিলেন না। দুই বৈ-পৈত্রেয় ভাই মির্জা কামরান আর আসকারি কাবুলে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন বেছে নিলেন। কিন্তু ভাইদের দুর্দিনে কোন ধরনের সহায়তায় আসেন নি। হুমায়ুন সিন্ধুতে যখন পর্যুদস্ত অবস্থায় রাজত্ব উদ্ধার করতেও সাহায্য পাচ্ছিলেন না ওই সময়েই তিনি আগস্ট ২১, ১৫৪১ হামিদা বানু বেগমকে বিয়ে করেন। কথিত আছে যে হুমায়ুন জ্যোতিষবিজ্ঞানে বিশ্বাস করতেন এবং নক্ষত্রের অবস্থান দেখে তাঁর বিয়ের তারিখ ঠিক করেছিলেন। বিয়ের এগারো মাস পরে হামিদা বানু বেগম সিন্ধুর অমরকোটের (বর্তমানে পাকিস্তানে) দুর্গে নভেম্বর, ২৩, ১৫৪২-এ হিন্দুস্থানের ভবিষৎ সম্রাট জালালউদ্দিন মোহাম্মদ আকবর, পরে মহান আকবর (The great), কে জন্ম দেন। আকবরই প্রথম মোগল সম্রাট যিনি হিন্দুস্থানের 'সরজমিনে' (মাটিতে) জন্মগ্রহণ করেন। হুমায়ুন ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুস্থানের মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। দ্বিতীয় দফা রাজত্বের এক বছরের মাথায় মাত্র ৪৮ বছর বয়সে দুর্ঘটনায় দ্বিতীয় মোগল সম্রাটের মৃত্যু হয়।

হুমায়ুনের জীবন ছিল প্রকৃতপক্ষে সংগ্রামী জীবন। পিতার অনুরোধের প্রতি অবিচল থেকে হুমায়ুন যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তা সংঘাতময় ইতিহাসে বিরল। হুমায়ুন পুনরায় রাজ্য উদ্ধারের পর এক বছরের মাথায় মোগল সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পেরেছিলেন। যার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিলেন তার পুত্র, সম্রাট আকবর দি গ্রেট।

অমরকোট দুর্গে তখন হুমায়ুনকে আশ্রয় দিয়েছিলেন অমরকোটের মহারাজা রানা বিরসাল। আজও অমরকোটের 'পাট্ট' (Patt) নামক গ্রামের মানুষ হুমায়ুনের বিবাহ আর আকবরের জন্মদিনে বিশাল মেলার আয়োজন করে। এ মেলা দেখবার মত।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সিন্ধু প্রদেশে (পাকিস্তান) আকবরের জন্মস্থান অমরকোট দুর্গ দেখার। আমি তখন স্কুলের ছাত্র।

হুমায়ুনের সমাধির মূল প্রকোষ্ঠের দু'পাশের অন্যান্য প্রকোষ্ঠগুলোতে আওরঙ্গজেব এর পরের যে কয়েকজন মোগল সম্রাটের কবর রয়েছে তা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। তাদের প্রত্যেকের জীবন কাহিনী বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা, ষড়যন্ত্র আর রূপকাহিনীতে ভরা। এঁদের কেউই তাদের বংশের পূর্বসূরি মহান মোগলদের মত ইতিহাস তৈরি করে যেতে পারেনি। বরং অত্যধিক বিলাসবহুল জীবন-যাপন আর খাম-

---

২। *আবুল ফজল, আকবরনামা।*

★ *বাবরের তিন বেগমের চারপুত্র সন্তানের মধ্যে ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ না করতে মৃত্যু শয্যায় সম্রাট বাবর হুমায়ুনকে অনুরোধ করেছিলেন। হুমায়ুন সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।*

www.pathagar.com

খেয়ালীপনার জন্যে ক্রমেই হিন্দুস্থান হাতছাড়া হয়ে দুশত বছর বিদেশিদের শাসনে চলে গিয়েছিল। মোগলদের পতনের আরেক কারণ ছিল হেরেম।

মোগল হেরেম ছিল তৎকালীন বিশ্বে সৌন্দর্য, প্রেম, ললিতকলা, সুন্দরী-নর্তকী ও গায়িকাদের জন্য পরিচিত। এদের অনেকের নাম উপমহাদেশ তথা বিশ্বে খ্যাত হয়েছে। অনেকের গল্প নিয়ে উপমহাদেশে একাধিক ছায়াছবি নির্মিত হয়েছে। হেরেমের সুন্দরী রক্ষিতা, নর্তকী আর মোগল শাহজাদাদের প্রেমের, কোন কোন ক্ষেত্রে বিয়ে, পটভূমিতে রচিত হয়েছে বহু উপন্যাস আর উপাখ্যান। এ সব রক্ষিতা, নর্তকী এবং গায়িকাদের অনেকে বেগমের মর্যাদাও পেয়েছিলেন। শাহজাদা সেলিম আর কথিত আনারকলির প্রেমের উপাখ্যান অত্যধিক আলোচিত হয়েছিল। মোগল শাহজাদা, ভাবী সম্রাটরাও আসক্ত হতেন হেরেমের সুন্দরীদের প্রতি। এমনকি আওরঙ্গজেব- এর মত গোঁড়াপন্থী সম্রাট যৌবনকালে অতীব সুন্দরী গায়িকা জায়নাবাদীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। জায়নাবাদীর আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুর কারণে সে প্রণয় বেশি দূর এগোয়নি। তবে ওই প্রেমকাহিনীও লোক সংস্কৃতির অংশ হয়ে আছে। পরে অবশ্য হেরেমেরই একজনকে আওরঙ্গজেব বিয়ে করেন যার নাম দিয়েছিলেন বেগম উদয়পুরী মহল। আওরঙ্গজেবের বড় ভাই দারাশিকো বিয়ে করেছিলেন একজন নর্তকী যার নাম ছিল রানোদিল। এছাড়াও আরও বহু উপাখ্যান রয়েছে অন্যান্য শাহজাদা আর মোগল হেরেমের সুন্দরীদের অন্তরঙ্গতার।

এসব নর্তকী আর গায়িকাদের অনেকেই হয়ে উঠেছিলেন অত্যধিক প্রতিপত্তি আর ক্ষমতাধর মহিলা। আবার অনেকে পূর্ণ বেগমের মর্যাদা না পাওয়ার কারণে তেমন ভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেনি এবং হারিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা হতে। হেরেমের সুন্দরী রক্ষিতাদের মধ্যে যারা সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সম্রাট জাহান্দার শাহ্-এর প্রণয়নী ও পরে বেগম, লাল কুনাওয়ার। লাল কুনাওয়ার ছিলেন ওই সময়কার মোগল হেরেমের সবচাইতে সুন্দরী নর্তকী এবং সুরেলা কণ্ঠের গায়িকা। লাল কুনাওয়ার-এর রূপের চর্চা ছিল দিল্লী ছাপিয়ে সমগ্র হিন্দুস্থানে। আমি জাহান্দার শাহ্ আর লাল কুনাওয়ার-এর প্রেম উপাখ্যানের কিয়দংশ পড়েছিলাম বলেই জাহান্দার শাহ্-এর কবরটি চিনতে চেষ্টা করছিলাম।

আমি খুঁজতে খুঁজতে স্থানীয় একজোড়া তরুণ-তরুণীকে হুমায়ুনের সমাধির অন্যান্য কবর চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে বলাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কয়েকজনের কবর দেখিয়ে আওরঙ্গজেব-এর পৌত্র এবং সম্রাট বাহাদুর শাহ্ আলমের পুত্র জাহান্দার শাহ্-এর কবরের সামনে গিয়ে আমাকে দেখালো। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা ফারসী পড়তে পারে কিনা। না সূচক জবাব দিয়ে বলেছিল তারা প্রায়শই এখানে সময় কাটতে আসে বলে সব কবরের নাম মুখস্থ এবং জাহান্দার শাহ আর লাল

www.pathagar.com

কুনাওয়ারের প্রেম কাহিনী তারা জানে। ইতিহাস নিয়ে এখনকার তরুণরা তেমন সচেতন বলে মনে হ'ল না। তবে ইতিহাসের চটকদার এবং রঙিন অংশ নিয়ে বাজারে এন্তার বই আর গল্পের ছড়াছড়ির কারণেই এসব বিষয়ে কিছুটা খোঁজ-খবর রাখে।

আমি জাহান্দার শাহ্-এর কবরের সামনে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে হুমায়ুনের সমাধি হতে মূল ফটক পর্যন্ত আসতে আসতে মাত্র এগারো মাস স্থায়ী রাজত্বের এ মোগল সম্রাটের প্রেম কাহিনী এবং তার করুণ পরিণতির কথা ভাবতে গিয়ে ইতিহাসে ফিরে গেলাম।

আওরঙ্গজেব এর পুত্র সম্রাট বাহাদুর শাহ-১-এর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার প্রশ্নে জাহান্দার শাহ আর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তৎকালীন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার গভর্নর আজিমউস সান এর মধ্যে সংকটের সৃষ্টি হলে এক পর্যায়ে আজিমউস সানকে রাভী নদীর পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করে জাহান্দার শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল এগারো মাসের (১৭৭২-৭৩) মাত্র। এগার মাসের মাথায় আজিমউস সান-এর পুত্র ফররুখ-শিয়ার চাচার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ করে মসনদ দখল করে জাহান্দার শাহ্কে বন্দি করেন। বন্দি থাকা অবস্থাতেই তাঁকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়।

ফররুখ-শিয়ার জাহান্দার শাহকে যুদ্ধে পরাস্ত করে সিংহাসন দখল করে (১৭১৩-১৭১৯) প্রায় দু'বছর রাজত্ব করেন। তাঁর নিজের দুর্বলতার কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যের এবং কোম্পানির নিরাপত্তার জন্যে নিজস্ব বাহিনী গঠনের অনুমতিও দিয়েছিলেন।

যাই হোক, আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছিলাম জাহান্দার শাহ্-এর জীবনগাঁথা নিয়ে। জাহান্দার শাহ যখন দিল্লীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন তখন থেকেই প্রেমিকা লাল কুনাওয়ার ক্ষমতা আর প্রতিপত্তির শিখরে উঠতে শুরু করেন। জাহান্দার শাহ লাল কুনাওয়ার-এর প্রেমে এমনই হাবুডুবু খাচ্ছিলেন যে, কুনাওয়ার-এর বাইরে তিনি কিছুই ভাবতে পারতেন না। এক কথায় জাহান্দার শাহ্ প্রথমে প্রেমিকা থেকে বেগম হওয়া কুনাওয়ার-এর মর্জি ছাড়া কিছুই করতেন না।

লাল কুনাওয়ার ছিলেন সম্রাট আকবর-এর নবরত্নের অন্যতম সঙ্গিতজ্ঞ মিয়া তানসেন-এর বংশধর। কুনাওয়ার-এর সুরেলা কণ্ঠ এবং নাচের প্রতিটি মুদ্রা ছিল ওই সময়ের হিন্দুস্থানের ললিতকলা চর্চার বিষয় এবং কবি-সাহিত্যিকদের প্রেরণার উৎস। লাল কুনাওয়ারকে উদ্দেশ্য করে সে সময়কার এক কবি ফারসী ভাষায় লিখেছিলেন;

"বা খুবি লাল কুনাওয়ার নাম-ই-উ-বাদ
সাক্কার গুফতার সিন-আন্দাম-ই-উ-বাদ"

(লাল কুনাওয়ার নামটি যর্থাথই। তাঁর শরীর রূপার মত সাদা, কণ্ঠে মিষ্টি ঝরে)।

www.pathagar.com

লাল কুনাওয়ার জাহান্দার শাহ-এর রক্ষিতা থেকেই উঠে আসলেন মসনদের এত সন্নিকটে যে ক্রমেই জাহান্দার শাহ তার হাতের পুতুল হয়ে পড়লেন। লাল কুনাওয়ারকে প্রথমে পাঁচশত প্রহরীর নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল। বিয়ের পর সম্রাজ্ঞীর আসনে বসিয়ে 'ইমতিয়াজ মহল' টাইটেল দেয়া হল। তাঁকে, অনেকটা সম্রাজ্ঞী নূরজাহান-এর আদলে, রাজকীয় মোহর (সিল) এবং আলাদা পতাকা দেয়া হয়েছিল। তাঁর সমগ্র পরিবারকে দরবারে উচ্চ আসনে বসিয়ে বহু জমিদারিও দেয়া হয়েছিল। শাহজাহানাবাদ-এর বহু হাভেলী হতে প্রকৃত মালিকদের উৎখাত করে বেগম কুনাওয়ার নিজের আত্মীয়-স্বজনের নামে বরাদ্দ নিয়েছিলেন। দরবারে স্থান দেয়া হল কুনাওয়ার-এর পরিবারের বহু সদস্যকে। এক কথায় দিল্লীর মোগল দরবার কুনাওয়ার-এর পরিবারতন্ত্রের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল।

ওই সময় নামেমাত্র সম্রাট জাহান্দার শাহ্ মোগল দরবারে রাজকার্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার খানের হাতে ছেড়ে দিয়ে গান, বাজনা, নৃত্য আর ললিতকলা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকলেন। ক্রমেই দিল্লীর দরবার হয়ে উঠল আমোদ-ফুর্তির কেন্দ্রবিন্দু। সম্রাটের এহেন কার্যকলাপের কারণে জাহান্দার আর প্রধানমন্ত্রীর সাথে দূরত্ব বাড়তে লাগল। অন্যান্য আমির, ওমরাহ এমনকি প্রাদেশিক গভর্নররাও এ অরাজকতা আর লাল কুনাওয়ার-এর ক্ষমতার উলঙ্গ প্রদর্শন পছন্দ করতেন না। কথিত আছে যে লাল কুনাওয়ার-এর এক জ্ঞাতি ভাইকে আগ্রার সুবেদার (গভর্নর) নিযুক্ত করা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে জাহান্দার শাহ-এর দূরত্ব আরও বাড়ে–এমনকি এক পর্যায়ে সংকটের সৃষ্টি হয়। কুনাওয়ার-এর অভিযোগ ছিল যে, জুলফিকার খান তাঁর (কুনাওয়ার) ভাইয়ের নিযুক্তির শাহী ফরমান জারি করতে ১০০০'সারেঙ্গী' চেয়েছেন। এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে সম্রাট তার প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি এতগুলো সারেঙ্গী নিয়ে কি করবেন? জুলফিকার খান জবাব দিলেন যে, যেহেতু মোগল দরবারে এখন সারেঙ্গী বাদকদের দাম অন্যান্য ওমরাহ এবং পারিষদ থেকে বেশি সে কারণে তিনি (জুলফিকার) সকল ওমরাহদের সারেঙ্গী বাদক বানাতে এ সব সারেঙ্গী ব্যবহার করবেন। জাহান্দার শাহ প্রধানমন্ত্রীর উত্তরে লজ্জা পেয়ে ওই নিয়োগ বাতিল করেছিলেন।

জাহান্দার শাহ কুনাওয়ার-এর মন রক্ষার্থে এমনও কাজ করতেন যা একজন সম্রাট-এর পক্ষে শোভনীয় ছিল না। বেগমের মন রক্ষার্থে চাঁদনী চক-এর বিভিন্ন পানশালায় উপস্থিতি, এবং সম্রাটসহ লাল কুনাওয়ার-এর মাতাল হয়ে যাওয়ার বহু কথিত গল্প রয়েছে। এমনি বহু মুখরোচক গল্প রয়েছে লাল কুনাওয়ার আর জাহান্দার শাহকে ঘিরে। জাহান্দার শাহ্ যখন আমোদ-ফুর্তিতে ব্যস্ত সে সময় প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার খান ফররুখশিয়ারের সাথে জাহান্দার শাহ-কে উৎখাতের পরিকল্পনা

www.pathagar.com

আঁটছিলেন। উল্লেখ্য যে, লাল-কুনাওয়ার-এর ঔরসে জাহান্দার শাহ্-এর কোন সন্তান না থাকায় ফররুখ শিয়ার হিন্দুস্থানের মসনদের দাবিদার হলেন। এ দাবি সমর্থন করলেন প্রধানমন্ত্রী।

বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন ফররুশিয়ার। যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। যুদ্ধ ক্ষেত্রে জাহান্দার পরাজিত হলে কুনাওয়ার-এর সাহায্যে গোপন পথে জাহান্দার শাহ দিল্লীর বাইরে চলে গিয়ে পুনরায় রাতের অন্ধকারে দিল্লীতে ফিরলে জুলফিকার খান তাঁকে গ্রেফতার করে লাল কেল্লায় বন্দি করে ফররুখশিয়ার-এর হাতে তুলে দেন। বন্দি থাকা অবস্থায় জাহান্দার শাহ লাল কুনাওয়ারকে তার সাথে থাকতে অনুমতি দিতে অনুরোধ জানালেন দিল্লীর নতুন সম্রাটের কাছে। ফররুখশিয়ার চাচার অনুরোধ রেখেছিলেন। যে দিন দু'জনকে আলাদা করে জাহান্দার শাহ-কে সম্রাটের আদেশে ঘাতকের হাতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করার জন্য তুলে দেয়া হয় সেদিন লাল কুনাওয়ার তার প্রেমিকের সঙ্গেই ছিলেন। ফররুখশিয়ার তাঁর বাবা আজিম-উস-সান-এর মৃত্যুর যন্ত্রণার কথা ভুলতে পারেননি। একই মৃত্যুর যন্ত্রণা দিতে চেয়েছিলেন চাচা জাহান্দারশাহ্-কে। প্রেমিকা লাল কুনাওয়ার প্রেমিকের অন্তিম পরিণতির কথা ভেবে চিৎকার করে জাহান্দার শাহ-এ গলা শক্ত করে জড়িয়ে ঘাতকের কাছে শুধুমাত্র প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে বলেন,"প্রাণের বিনিময়ে মসনদের দাবিসহ সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেব। আমার শুধু জাহান্দার চাই। জীবন ভিক্ষা চাই।" কিন্তু মোগল প্রাসাদের ষড়যন্ত্র যে ছক চলে এসেছে সেই ছকে পরিবর্তন হবার নয়। জোর করে দু'জনকে আলাদা করবার পর জাহান্দার শাহকে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করা হল দিল্লীর লাল কেল্লার পাতালের বন্দি খানায়। জাহান্দার শাহ্-এর মৃত্যুর সাথে শেষ হয়েছিল লাল-কুনাওয়ার -এর প্রেমের আর উচ্চভিলাষের উপাখ্যান।

জাহান্দার শাহ-এর মৃত্যুর পর লাল কুনাওয়ার মোগল হারেমের বিধবাদের নিবাস সোহাগপুরীতে বহু বছর বেঁচে ছিলেন। জাহান্দার শাহ-কে হুমায়ুনের সমাধিতে সমাধিস্থ করা হলেও লাল কুনাওয়ারকে সমাধিস্থ করা হয় অদূরেই দিল্লী গলফ ক্লাবের সন্নিকটে লাল বাংলা নামক সমাধিতে। নিয়তির কি পরিহাস হুমায়ুনের সমাধি সৌধে পাশাপাশি কক্ষে রয়েছে জাহান্দার শাহ আর ফররুখ শিয়ার-এর কবর। হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম মোগল ইতিহাসের বৈচিত্র আর নির্মম অধ্যায়গুলো নিয়ে।

হুমায়ুনের সমাধির পাশ দিয়ে এক সময় বয়ে যেত যমুনা নদী, যে নদী সাক্ষী হয়ে আছে উপমহাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের। নিজের বক্ষের পানি দিয়ে যেমন প্রস্ফুটিত করেছে মোগল বাগানের সুগন্ধি ফুল তেমনি ধুয়েছে মোগল দরবারসহ অন্যান্য সাম্রাজ্যের কলঙ্কময় অধ্যায়গুলো।

সমাধি সৌধ থেকে বের হবার পথে ভাবছিলাম ক্ষমতার মোহ মানুষকে কতখানি নির্মম করতে পারে।

www.pathagar.com

আমরা হুমায়ুনের সমাধি সৌধ হতে বের হবার পথে শেরশাহ সূরীর অন্যতম সহযোগী ঈশা খাঁ নিয়াজীর সমাধির সৌধ দেখতে যাই। ঈশা খাঁ নিয়াজীর সমাধি সৌধ নির্মিত হয়েছিল হুমায়ুনের সৌধ নির্মাণের প্রায় ২০ বছর পূর্বে ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে। সৌধটির গায়ের ফলক পাঠে জানা যায় ঈশা খাঁ নিয়াজী তার জীবদ্দশায় এ সৌধ তৈরি করেছিলেন। এখানে তাঁর পরিবারের বহু সদস্য সমাহিত রয়েছেন। জীবদ্দশায় মোগলদের বিরুদ্ধে থাকলেও মরণে তিনি মোগল সম্রাটের চত্বরেই সমাহিত রয়েছেন। ঈশা খাঁ নিয়াজী মোগলদের বিরুদ্ধে শেরশাহের হয়ে বহু যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। মরণে তিনি মোগল সম্রাটের চত্বরেই সমাহিত হয়েছিলেন হুমায়ুনের জীবদ্দশাতেই। আক্রোশের বসে মোগলরা এ সমাধির কোন ক্ষতি করেন নি বরং সংস্কার করে রেখেছিলেন। এ সব নজির অনেক সময় আমাদের ভাবতে বাধ্য করে যে আমাদের পূর্ব পুরুষরা বহু বিষয়ে আমাদের থেকে অধিক মহান ছিলেন।

যাই হোক, কয়েক বছর পূর্বে আগা খান ফাউন্ডেশন হুমায়ুনের সমাধি সৌধের আরও সংস্কার করেছেন। এখানে আধুনিক স্থাপত্যের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হয়েছিল যার উদ্যোক্তা ছিল আগা খান ফাউন্ডেশন। এ তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে প্রবেশপথের একপ্রান্তে।

আমরা দিল্লীর তথা হিন্দুস্থানের ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখার আজকের পর্ব শেষ করে যখন বসন্ত বিহারে শম্পার বাসায় ফিরলাম তখন প্রায় মাগরিবের সময়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পরে চায়ের টেবিলে শম্পা আর দোহা সাহেবের সাথে আমাদের দিনের অভিজ্ঞতার আলোচনায় প্রাধান্য পেল চিতোরের রাণী পদ্মিনী এবং মালওয়া (মান্ডু)-এর রাণী রূপমতী আর বাজ বাহাদুরের উপাখ্যান।

www.pathagar.com

ষোল

পুরানা কেল্লা

অফিস থেকে বাসায় ফিরতে শম্পার প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। আমরা শম্পার অপেক্ষায় চায়ের টেবিলে দোহা সাহেবের কাছে 'ভুল ভুলাইয়া'তে না যেতে পারার দুঃখটাও জানালাম। যেহেতু আমাদের হাতে দু'দিন সময় তার মধ্যে একদিন কাটবে বাকি কয়েকটি ঐতিহাসিক স্থান দেখতে যার মধ্যে 'পুরানা কেল্লা' আর 'দিল্লীর লাল কেল্লা' বা রেড ফোর্ট রয়েছে। সময় পেলে যাদুঘরে যাবার ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হবে বলে মনে হয় নি। দেশে ফেরবার আগের দিন 'চাঁদনী চক' হয়ে 'ইন্ডিয়া গেট' ও রাষ্ট্রপতি ভবন এলাকাটা দেখে আসবো বলে শম্পা ও দোহা সাহেবকে জানালাম চায়ের টেবিলে। আমি প্রসঙ্গ তুললাম আদম খান এবং রাণী রূপমতির। একই সাথে কুতুব মিনার চত্বরের সন্নিকটে আলাউদ্দিন খিলজির সমাধির সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় রাণী পদ্মিনীর শোকগাঁথার উপাখ্যানটি মনে পড়বার কথাও পাড়লাম। এ দুবিষয়েই আলোচনায় জমে উঠেছিল। এতগুলো বছর পার হলেও আমাকে স্বীকার করতেই হবে দোহা সাহেবের স্মরণশক্তিতে এতখানি কমতি ছিল না। ইতিহাসের উপরে তাঁর দখলের পরিচয় আমি আগেও বহুবার পেয়েছি। এবার পেলাম যখন তিনি দু'টি বিষয়ের উপরেই বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করলেন তাঁর স্মরণশক্তির আরও পরিচয় পেলাম যখন তিনি আমাকে বললেন যে লাহোরে আমার কাছ থেকে নিয়ে সামরিক ইতিহাসের বই ফিল্ড মার্শাল স্লীম রচিত 'ডিফিট ইন টু ভিক্টরি' (Defeat into Victory) পড়েছিলেন এবং ওটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম সামরিক ইতিহাস পাঠ। সে কথা তিনি আজও মনে রেখেছেন অথচ আমার মনে করতে সময় লেগেছিল।

আমাদের আলোচনায় উঠে আসা এ দু'টি উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে না ধরলে আমার এ ভ্রমণ কাহিনী পূর্ণাঙ্গতা পেত না বলে মনে হবার কারণেই ইতোপূর্বে এ দুই উপখ্যান নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। চিতোরের পদ্মিনী আর মান্ডুর রাণী রূপমতীর উপাখ্যান নিয়ে ভারতে, এমনকি পাকিস্তানেও, বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে।

আমাদের আড্ডা আর ঐতিহাসিক পটভূমির গল্পে বহু সময় কেটে গিয়েছিল। পরের দিনের ঐতিহাসিক দিল্লী দর্শনের বিষয়টি আমাদের গাইড, শম্পার স্বামী, স্থপতি

www.pathagar.com

মিনহাজের সাথে আলোচনা করে সাব্যস্ত করা হল যে, প্রথম প্রহরে আমরা 'পুরানা কেল্লা' (Purana Qila)✦ এবং দুপুরের আহারের পর দিল্লীর লাল কেল্লা দেখে বাসায় ফিরব। দিল্লীর পথে ঘাটে কোথাও দুপুরের খাবার খেয়ে নেব।

পরের দিন মে ১২, ২০০৯, আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম দিল্লীর 'পুরানা কেল্লা' (পুরাতন কেল্লা) দেখতে। বসন্ত বিহার হতে বের হয়ে আমরা সুব্রমনিয়াম ভারতী মার্গ হয়ে 'মসজিদ খারুল মনজিল' পার হয়ে মথুরা রোডে উঠলাম। কয়েক কিলোমিটার যেতেই হাতের বাঁয়ে 'শেরশাহ সূরী গেট' পার হয়ে 'পুরানা কেল্লা'-এর রাস্তা দিয়ে এ বিশাল দুর্গের টিকেট কাউন্টারের সামনে এসে গাড়ি থেকে নামলাম। হাতের ডানে দিল্লীর চিড়িয়াখানার প্রবেশ পথ। একসময় চিড়িয়াখানার জায়গাটিও পুরানা কেল্লার অংশ ছিল। বিশাল এ চিড়িয়াখানা। হয়ত আবহাওয়াজনিত কারণেই চিড়িয়াখানায় ভিড় কম মনে হল। তার চাইতে কম ভিড় ছিল পুরানা কেল্লা'য়। দুপুরের রোদ ক্রমেই ঝাঁঝালো হয়ে উঠছিল। তিনটি টিকেট কেটে প্রধান ফটকের দিকে রওয়ানা হলাম। দুর্গটি খানিকটা উঁচু ভূমিতে তৈরি হয়েছিল। পাথরের তৈরি বাইরের দেয়াল। হাতের ডানে দুর্গের প্রতিরক্ষা পরিখার বেশিরভাগ অংশ ভরাট হয়ে গেছে তবে গাছপালা ছাড়া কোন স্থাপনা নেই। তবে দুর্গে ঢুকতে হাতের বাঁয়ের পরিখার কিছু অংশ একটি লেকের আকারে সংরক্ষিত আছে। লেকের ধারে পার্ক আর লেকে (হ্রদ) ভ্রমণকারীদের জন্য ছোট ছোট ফাইবার গ্লাসের নৌকা রয়েছে। সবুজের সমারোহ সুন্দরভাবে সংরক্ষিত। বস্তুতপক্ষে নতুন দিল্লীর বেশির ভাগ অংশ বিশেষ করে মথুরা রোডের দু'পাশে রয়েছে অত্যন্ত নয়নাভিরাম সবুজের সমারোহ।

'পুরানা কেল্লা'-এর প্রধান ফটকের উত্তর পাশে রয়েছে আরেকটি ফটক যার নাম 'তালাকি দরওয়াজা'। এছাড়া আরও দুটি ফটক রয়েছে। একটি 'হুমায়ুন দরওয়াজা' আর একটির নাম 'বড়া দরওয়াজা' (বড় দরওয়াজা)। দুর্গের দেয়ালের উচ্চতা প্রায় ১৮ মিটার, দৈর্ঘ দুই কিলোমিটার। তিনটি দরওয়াজার দু'টি ব্যবহার হত। 'তালাকি দরওয়াজা' সর্বসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে বড়া দরওয়াজাই দর্শনার্থীদের প্রবেশ ও বহির্গমনের পথ।

আমরা 'বড়া দরওয়াজা' এর সামনে এসে এ বিশাল আকারের দরওয়াজা দেখতে কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। দ্বিতল বিশিষ্ট এ দরওয়াজা এমনভাবে তৈরি যাতে তিনটি হাতি পাশাপাশি চলতে পারে। বেশ প্রশস্ত। বর্তমানে পিচঢালা পথ ভিতরে প্রবেশ করেছে। গেটের সাথে কাঠের দু'পাটের বিশাল দরওয়াজা মনে করিয়ে দেয় এর অতীত গৌরব। যে সময় এ দুর্গ তৈরি হয়েছে এবং ব্যবহৃত হত হয়ত তখন সামনে 'উঠানো সেতু'

✦ *'পুরানা কেল্লা- দিল্লীর ষষ্ঠ শহর হিসাবে আখ্যায়িত, অপরদিকে 'ইন্দরপ্রস্থ' দিল্লীর প্রথম শহর বলে হিন্দু ঐতিহাসিকরা দাবি করছেন।*

www.pathagar.com

(Drawbridge) ছিল। এখন পুরাতন সেতু এলাকার পরিখা ভরাট হয়ে গেছে। ভেতরে প্রবেশ করবার পর সামনে বিস্তীর্ণ এলাকা চোখে পড়ল। বিশাল আয়তনের বাগান। খুব একটা পরিপাটি করে রক্ষিত নয়। আরেকটু এগুতেই একেবারে সুরক্ষিত এলাকায় প্রবেশের পথ। 'বড়া দরওয়াজা' দিয়ে প্রবেশের পর হতে শুরু হয় দুর্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। তবে উত্তরের দিকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারীদের জন্য নির্মিত ছোটখাটো একটি কলোনি রয়েছে। এ দুর্গের বহু জায়গায় মাঝে মধ্যে খনন কাজ চলে পুরানা নিদর্শন আবিষ্কারের জন্য। পাশে রয়েছে ছোট একটি যাদুঘর, 'ইন্দরপ্রস্থ' জাদুঘর নামে পরিচিত।

এ দুর্গটির পুরানা নাম ছিল 'দীনাপানাহ'। দুর্গটি দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ুন দিল্লীর নতুন শহর হিসেবে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ কাজ শুরু করেন। হুমায়ুন নতুন শহরের স্থাপনা করলেও শহরটি নিজের নামে নামকরণ করেননি যেমনটা পরবর্তী সম্রাট এবং পূর্ববর্তী সুলতানদের অনেকে করেছিলেন। অনেকেই মনে করেন শেরশাহ এ নগরীর স্থাপনা করেছিলেন কিন্তু সে ধারণা বোধহয় সঠিক নয়। শেরশাহ তৈরি করেছিলেন 'শেরগড়' এবং শেরশাহের গেট বলে যে স্থাপনাটি রয়েছে তা বর্তমানে মথুরা রোডের পশ্চিমে 'পুরানা কেল্লা'-এর ৩ হতে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে।

হুমায়ুন কেল্লা তৈরি করলেও পরবর্তীতে শেরশাহ সূরী এর পরিবর্ধন করে কিছু স্থাপনা তৈরি করেন। এর মধ্যে দর্শনীয় যা এখনও রয়েছে, সেটি হল 'কেল্লা কুনা মসজিদ'। মসজিদটি বর্তমানে পরিত্যক্ত। শের শাহ আরও তৈরি করেছিলেন আকর্ষণীয় দ্বিতল গোল বুরুজ, শেরমণ্ডল, যা পরে সম্রাট হুমায়ুন লাইব্রেরিতে পরিণত করেছিলেন। এখানেই হুমায়ুন সিঁড়ি হতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সে বিষয়ে আমি আগেই আলোচনা করেছি।

'পুরানা কেল্লা'র ইতিহাসে কিছু জটিলতা রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে উচ্চভূমিতে হুমায়ুন এ দুর্গ তৈরি করেছেন সে জায়গায় মহাভারতে বর্ণিত, ১০০০ খ্রিস্টপূর্বের 'ইন্দরপ্রস্থ' অবস্থিত ছিল। হালে খনন কার্য চালিয়ে কয়েক হাজার বছরের পুরাতন যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তাতে ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদরা 'ইন্দরপ্রস্থ'-এর অস্তিত্বের বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন বলে মনে করেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে 'পাণ্ডব'দের সময় 'ইন্দরপ্রস্থ' শহরের স্থাপনা হয়েছিল। মহাভারতে আরও বর্ণিত আছে যে 'পাণ্ডবরা' যমুনা নদীর তীরে তাদের রাজধানী 'ইন্দরপ্রস্থ' তৈরি করেছিলেন। এর উপর ভিত্তি করেই ঐতিহাসিকরা মনে করেন মহাভারতে যে জায়গার বর্ণনা দেয়া আছে তা দিল্লীর এই 'পুরানা কেল্লা' এলাকা।

যাই হোক, বিশাল এলাকায় ঢুকে যে কয়েকটি স্থাপনা এখনও অক্ষত অবস্থায় চোখে পড়েছে তার মধ্যে একটি হল, পরিত্যক্ত, কিন্তু, অপূর্ব সুন্দর মসজিদ যার নাম

www.pathagar.com

'কেল্লা কুনা মসজিদ'। এ মসজিদটি তৈরি করেছিলেন শেরশাহ সূরী ১৫৪১ খৃস্টাব্দে। এ মসজিদটি 'শেরশাহ মসজিদ' নামেও বহুল পরিচিত। মসজিদটির নির্মাণশৈলী এবং নমুনা প্রাক-মোগল আমলের। মসজিদে পাঁচটি খিলান (Arch) রয়েছে আর রয়েছে সাদা মার্বেলের মেহরাব। প্রতি খিলানের উপর ক্যালিওগ্রাফি করা পবিত্র কোরআনের আয়াত ক্ষোদিত রয়েছে। মসজিদটির ভেতরটি দ্বিতল। উপরের তলায় মহিলাদের নামাজ পড়বার স্থান চিহ্নিত ছিল। এর দক্ষিণ পাশের একাংশ সদৃশ্য 'ঝোরোকো' (জালি দ্বারা বিভাজিত) দ্বারা আলাদা করা। ধারণা করা হয় এ জায়গাটি নির্দিষ্ট ছিল রাজ পরিবারদের জন্য। মসজিদটির পূর্বদিকে ছোটখাটো চত্বর। চত্বরের মাঝে একটি চৌবাচ্চাসহ ফোয়ারা যা এখন পরিত্যক্ত। সম্ভবত এ জায়গাটি ছিল মুসল্লিদের অজু করবার স্থান।

আমি মসজিদ চত্বরের উত্তর প্রান্তে দাঁড়িয়ে সামনে বেশ দূরে সবুজের সমারোহের মধ্য দিয়ে মৃতপ্রায় যমুনা নদীর দৃশ্য দেখছিলাম। ভাবছিলাম আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশত বছর পূর্বে যমুনা নদী দুর্গের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো। আর আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে ছিল প্রাণচাঞ্চল্য। সন্ধ্যায় পিদিম জ্বলে উঠলে দূর-দূরান্ত থেকে শোনা যেত এ মসজিদ হতে মোয়াজ্জিনের সুরেলা কণ্ঠের আজান। মসজিদটি মুসল্লিতে ভরে যেত। চারদিক থাকত রাতের স্তব্ধতা; শুধুমাত্র ঝিঁ ঝিঁ পোকার আওয়াজ আর শেয়ালের ডাক অন্ধকারের নিস্তব্ধতা ভাঙত। বাইরে নিস্তব্ধতা থাকলেও কেল্লার ভেতরে প্রাণচাঞ্চল্য থাকত। থাকত সৈনিকদের হাঁকডাক। আজ সবই অতীত ইতিহাস।

আমি মসজিদটি ছেড়ে ফুলের বাগান অতিক্রম করে সবুজ লনের মাঝ দিয়ে ইট বিছানো রাস্তা ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমে স্যান্ডস্টোনের তৈরি শেরমণ্ডলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সিঁড়ি ঘরটি বন্ধ। উপরে উঠবার আর কোন পথ নেই। পাশের মাঠে শেরমণ্ডল ছায়ায় বহু তরুণ-তরুণী, প্রেমিক-প্রেমিকা, আমাকে দেখে একটু নড়েচড়ে বসে সিঁড়ি ঘরের সামনের জায়গাটি ছেড়ে দিল। এদের দেখে মনে হল নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে-মেয়ে স্কুল অথবা কলেজের নামে এসব জায়গায় আসে কিছু সময় কাটাতে। এ রকম জোড়ায় জোড়ায় বসা দেখলাম বহু জায়গায়। দেখে মনে হল এ কোন নতুন বিষয় নয়; ঢাকাতে প্রকাশ্যে রাস্তার ধারে না হয় রমনা অথবা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এ রকম দৃশ্য দেখা যায়। আমি যেখানে সকালে হাঁটতে যাই সে অভিজাত এলাকা গুলশান লেক পার্কে বিকেলে প্রেমিক যুগলের জন্য নাকি হাঁটতেও অসুবিধে হয়। বহু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে। তবুও বয়স্করা দেখেও না দেখার ভান করে। সত্যই যুগ পাল্টেছে। এ ধরনের কোন কিছু আমরা আমাদের সময়ে ভাবতেও পারতাম না। কালে-ভদ্রে কখনও কোন মেয়ের সাথে কথা হলে অনেককে বর্তে যেতে শুনতাম! ওইটুকুই। আজকাল মোবাইল, এসএমএস আর এফএন্ডএফ এর যুগ। দিন বদলেছে। অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

www.pathagar.com

যাই হোক, আমি দুই জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকার বিরক্তির কারণ না হয়ে কোন রকমে পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি ঘরের মূল দরওয়াজা পর্যন্ত পৌঁছলাম। গরমের তেজ তখন বেড়েই চলছিল। ব্যাগের পানির বোতল প্রায় খালি। আরও কয়েকটি বোতল কিনে রাখতে হবে।

বন্ধ সিঁড়ি দরওয়াজার ফাঁক দিয়ে উপরে উঠার সিঁড়ি দেখতে চাইলাম। খুব একটা পরিষ্কার দেখতে না পারলেও মনে হল সিঁড়িটির সংস্কার করা হয়েছে। এটি আদি সিঁড়ি নয়।

এই দ্বিতল গোলঘর শেরশাহ বিশ্রামাগার হিসেবে ব্যবহার করতেন বলে এর নাম হয়েছিল 'শেরমন্ডল'। হুমায়ুন যখন শের শাহ-এর কাছ থেকে সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন তারপরেই তিনি এখানে নিজস্ব লাইব্রেরি তৈরি করেন। উপরের কোঠায় স্যান্ডস্টোনের তৈরি বই রাখার নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। হুমায়ুন একজন জ্ঞান সাধক এবং উদার মনের শাসক হিসেবে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তিনি অভ্যাসমত অনেক সময় তার লাইব্রেরিতে কাটাতেন। ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে আজানের পরপরই তিনি নামাজ আদায় করতেন। জানুয়ারি ২৪,১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের অপরাহ্নে সম্রাট হুমায়ুন শেষবারের মত তার প্রিয় লাইব্রেরিতে আসেন। মুয়াজ্জিনের আযানের সাথে সাথে সম্রাট হাতে বেশ কিছু বই নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামবার পথে পা পিছলে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হন। তিনি মাথায় গুরুতর আঘাতের কারণে কয়েক দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ওই সময় তার উত্তরাধিকারী সম্রাট আকবর নেহাত ১৪ বছরের নাবালক। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী হামিদা বানু বেগম 'পুরানা কেল্লা', 'দীনা পানাহ',– থেকে কয়েক কিলোমিটার উত্তরে এ মহান সম্রাটকে সমাহিত করেন যার বিবরণ আমি আগেই দিয়েছি।

শেরমণ্ডল থেকে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে ফিরবার উদ্যোগ নিলাম।

ফিরে যাবার পথে আমি 'ইন্দরপ্রস্থ' যাদুঘরে প্রবেশ করে 'পুরানা কেল্লার' বিভিন্ন জায়গা খনন করে যে সব ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল সেগুলো দেখলাম। অল্প কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন আর তার সাথে রক্ষিত ইতিহাস পড়লাম। প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করেন এখানে মাটির নিচে যে শহরের অস্তিত্ব রয়েছে তা কয়েক হাজার বছরের পুরাতন 'ইন্দরপ্রস্থ' বলে নিশ্চিতভাবে দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিছু কিছু প্রদর্শিত বস্তুর সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার বছরের ঘরবাড়ির গাঁথুনি এবং গৃহস্থালির সরঞ্জাম হিসেবে চিহ্নিত করে জাদুঘরে স্থান পেয়েছে। ছোট যাদুঘর দেখতে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি।

'পুরনো কেল্লায়' প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় কাটিয়ে আমরা দিল্লীর অন্যতম পরিচিত ঐতিহাসিক নিদর্শন দিল্লীর 'লাল কেল্লা' বা রেডফোর্ট দেখতে রওয়ানা হবার পথে জামে মসজিদের পাশে 'করিমস্' এ দুপুরের খাবার খেতে রওয়ানা হলাম। প্রসঙ্গত:

www.pathagar.com

দিল্লীর জামে মসজিদ আর 'লাল কেল্লা' বা 'রেডফোর্ট' (Redfort) এর মধ্যে বেশি দূরত্ব নেই। দিল্লীর 'লালকেল্লা' বা দুর্গ এর প্রধান ফটক-এর পাশের সুউচ্চ দেয়ালের সামনে দুর্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছোট একটি পাকা মঞ্চ বানানো রয়েছে, যেখান থেকে ভারত স্বাধীন হবার পর হতেই প্রতি ১৫ই আগস্ট, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। এ ধারাবাহিকতা চলে আসছে আগস্ট ১৫, ১৯৪৭ থেকে। এ মঞ্চের উপরই পতপত করে উড়ছে স্বাধীন ভারতের পতাকা। এখান হতেই ১৬ই আগস্টের প্রথম প্রহরে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের নব্বই বছর পর, দিল্লীর লাল কেল্লায় স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন আর একশত নব্বই বছর পর উপমহাদেশ হতে ব্রিটিশ রাজের সমাপ্তি হয়। দিল্লীর লাল কেল্লার শেষ বাসিন্দা সম্রাট বাহাদুর শাহ হিন্দুস্থানের শেষ কিছুদিনে এখানেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে বন্দি ছিলেন।

আমরা আরেকবার মোগলদের রেখে যাওয়া অবদান মোগল রন্ধন প্রক্রিয়ায় তৈরি খাবারের অন্যতম পরিবেশক, এশিয়াখ্যাত রেস্তোরাঁ করিমস্-এ এসে পৌছলাম। পেটে যথেষ্ট খিদে তার উপরে চামড়া পোড়ানো তাপ। কিছুক্ষণ বসে শরীর ঠাণ্ডা করবার পর ওয়েটারকে ডেকে 'মাটন বুররা' (Mutton Burra), গরম তন্দুরী রুটি, সবজি সাথে মটন শিখ কাবাব-আনতে আদেশ দিলাম। প্রতিটি আইটেম ছিল অত্যন্ত সুস্বাদু। দুপুরের আহার সেরে আমরা দিল্লীর 'লাল কেল্লা' বা রেডফোর্টের প্রধান গেটের সামনে উপস্থিত। বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় ৩টা কিন্তু তাপদাহ কোনভাবেই কমেনি।

নির্দিষ্ট স্থান থেকে তিনটা টিকেট কিনতে একটু সময় লাগল। কারণ, 'লাল কেল্লার' বা দিল্লীর দুর্গ থেকে বেশ দূরে গাড়ি নেতাজী সুভাষ মার্গ-এর উপর রাখতে হয়েছে। হাটতে হয়েছে অনেকটা পথ। দুর্গের প্রধান ফটক 'লাহোরী দরওয়াজা' (গেট) হতে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে গাড়ি রাখাতে এতটা পথ আমাদের হাঁটতে হয়েছে। এ দুর্গে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে লস্কর-ই-তৈয়েবা কর্তৃক সন্ত্রাসী হামলার পর হতে ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে। ওই হামলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুই জওয়ানসহ তিন ব্যক্তির মৃত্যু হয়। দুর্গের ক্ষতি তেমন না হলেও সন্ত্রাসী হামলা বেশ প্রচার পায়। সে কারণে পরের কয়েক বছর ভারতের, বিশেষ করে দিল্লীর, পর্যটন শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর হতে ইলেকট্রনিক ডিটেকশন এবং শরীর তল্লাশি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নিরাপত্তা তল্লাশি সেরে আমাদেরকে 'লাহোরী দরওয়াজা' পার হয়ে মূল দুর্গে প্রবেশের পথে সুড়ঙ্গপথ দিয়ে এগুতে হল। এককালে এ সুরঙ্গ পথের দু'ধারে অন্তপুরের জেনানাদের (মহিলাদের) জন্য মীনা বাজার বসত। এ কারণে এ জায়গার নাম 'মীনা বাজার'। এ বাজারে দোকানি এবং খরিদদারনি উভয়েই হতেন মহিলা। বাজারে খরিদদার হয়ে আসতেন শাহী বংশের অন্তপুরবাসিনী মহিলারা। তাদের সাথে থাকত

www.pathagar.com

হিজড়া পাহারাদার আর মহিলা পারিষদ। দোকানীরা সামনের 'চাঁদনী চক' হতে রকমারি বাহারের দ্রব্যাদি নিয়ে আসতেন। নিয়ে আসতেন ইরানের আতর, গোলাপ আরও অনেক সুগন্ধী। সমরখন্দ-বোখারার কার্পেট, বাংলার মসলিন আর কাবুল কান্দাহারের ফল আসত এখানে। এখানে পাওয়া যেত হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলের হস্তশিল্পের শৌখিন দ্রব্যাদি। কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠত 'মীনা বাজার'। অন্তপুরীর মহিলারা ছাড়াও শাহজাহানবাদ থেকে আসতেন মোগল পারিষদের আমীর-ওমরাহদের মহিলারা।

আজ হয়ত সে কলকাকলী নেই, তবে আছে সুদৃশ্য দোকান আর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আনা শৌখিন দ্রব্যাদি। এখানে এখন দুর্গের ভেতর থেকে নয়, বিশ্বের বহু দেশের পর্যটকরা আসেন ইতিহাসের খোঁজে। মুখরিত হয় বর্তমান হস্তশিল্পের বাজার। পর্যটকদের পদচারণায় বর্তমানে 'মীনা বাজার' বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে অতীতের দেয়ালে প্রতিধ্বনি হয়ে কানে বাজে সে শব্দগুলো।

'লাহোরী দরওয়াজা' দুর্গের রাজকীয় দরওয়াজা ছিল না। দুর্গের প্রধান প্রবেশ পথ ছিল বর্তমানে দক্ষিণের দরওয়াজা যেটা অতীতে সব সময়েই সাধারণের জন্য বন্ধ ছিল আজও যেমন রয়েছে। বর্তমানে দুর্গের ভেতরের সেনাছাউনীর জন্য এ দরওয়াজা ব্যবহার হয়ে থাকে যেমন হয়েছিল ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর জন্য ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর হতে। সম্পূর্ণ দুর্গে ভারতীয় বাহিনীর উপস্থিতি থাকলেও ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর 'লাল কেল্লা'র একাংশ পর্যটকদের জন্য খুলে দেয়া হয়। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর 'লাল কেল্লা'কে UNESCO World Heritage Site হিসেবে ঘোষণা করে।

এ দুর্গের নির্মাণ কাজ সম্রাট শাহজাহান শুরু করেন ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে। অনেকে মনে করেন দুর্গের কাজ ১৬৩৮-এ নয় শুরু হয়েছিল ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু কিছু কিছু পেইন্টিংয়ে ১৬৩৮ সাল উল্লেখিত হয়েছে। যখনই তৈরি হোক না কেন বর্তমানে এটি স্বাধীন ভারতের সার্বভৌমত্বের অন্যতম প্রতীক।

সম্রাট শাহজাহান আগ্রা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরের প্রস্তুতি হিসেবে যে শহরের গোড়াপত্তন করেছিলেন, তার নাম তিনি রেখেছিলেন 'শাহজাহানবাদ' যা আজকের পুরাতন দিল্লী বা দেয়াল শহর (walled city)। দিল্লীর 'লালকেল্লা' এবং জামে মসজিদ এ শহরের অন্যতম অংশ ছিল। লালকেল্লার সন্নিকটে রয়েছে আরেকটি দুর্গ যার নাম 'সলিমগড়'। এটা তৈরি করেছিলেন শেরশাহ সূরীর পুত্র সেলিম শাহ সূরী। পরে এখান থেকেই হুমায়ুন দিল্লীর উপরে শেষ আক্রমণ পরিচালনা করেন। একদা সেলিমগড় দুর্গ যমুনা নদীর মাঝে একটি দ্বীপে ছিল; এখন আর তেমন নেই। সলিমগড় থেকেই শাহজাহান তার শহর এবং দিল্লীর দুর্গ তৈরি তদারকী ও রাজকার্য চালিয়েছেন বেশ কিছু বছর। পরে সেলিমগড় লালা কেল্লা-এর অংশে পরিণত হয়। সম্রাট

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেব 'সেলিমগড় দুর্গ'কে বন্দিশালা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ব্রিটিশরাজও এটাকে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের বিচার কার্যের স্থান ও বন্দিশালা হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এখানে নেতাজী সুভাষ বোসের তিন সহযোগীর কোর্ট মার্শাল হয়েছিল। বর্তমানে 'সেলিমগড় দুর্গ' যাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

দিল্লীর 'লাল কেল্লা' আগ্রার দুর্গের চাইতে বড় না হলেও আওরঙ্গজেব তাঁর রাজধানী স্থানান্তর না করা পর্যন্ত এবং পরের মোগল বাদশাহদের সময় হতে দিল্লী হিন্দুস্থানের একক রাজধানী হলে এ দুর্গের গুরুত্ব বেড়ে যায়। এ দুর্গই এক সময়ে হয়ে উঠেছিল হিন্দুস্থানের সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

দুর্গটি শাহজাহান তৈরি করলেও এর বহুলাংশ আওরঙ্গজেব সংযোজন করিয়েছেন। দক্ষিণের দরওয়াজাতে কুদশিয়া মসজিদ এবং দেওয়ানে খাসের পাশে আওরঙ্গজেবের তৈরি মতি মসজিদ আজও মোগল স্থাপত্যের ধারাবাহিকতার প্রমাণ দেয়। আওরঙ্গজেবের পরে তার বংশধরেররা নিজেদের বাসস্থানের পরিধি বাড়ান। দুর্গটি মোগলদের দখলে ছিল ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। শুধুমাত্র ১৭৮৩ সালে কিছু সময়ে শিখদের দখলে ছিল। দুর্গটির পূর্ব দেয়ালের পাশে দিয়ে এক সময়, আগ্রার দুর্গের মত, বয়ে যেত প্রমত্তা যমুনা নদী তবে বর্তমানে যমুনা নদী সেই যৌবন হারিয়ে আরও পূর্বে সরে গিয়েছে। ওই সময় যমুনা নদীর পানি শুধু দুর্গের প্রতিরক্ষায় নির্মিত পরিখার পানি সরবরাহ করত না, সরবরাহ করত দুর্গের তিন হাজার বাসিন্দা আর অজস্র পানির 'নহর (খাল) এবং ফোয়ারাকে। মহলগুলো বা বাসগৃহগুলো ঠাণ্ডা রাখার কাজে ব্যবহার হতো যমুনা নদীর পানি।

যেমনটা আগেই বলেছি, এ দুর্গের শেষ মোগল সম্রাট ছিলেন বাহাদুর শাহ জাফর যিনি শেষবারের মত রাজকীয় কাফেলা নিয়ে বের হয়েছিলেন ১৮৫৭-এর রোজায় জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য। এর পরে তাঁকে বন্দি হিসেবে বের করে বার্মায় নির্বাসনে পাঠানো হল জানুয়ারি ২৭, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিপ্লবীরা বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ জাফরের নেতৃত্বের অভাবে এত সুরক্ষিত দুর্গকে ব্যবহার করতে পারেননি বলেই কোম্পানি বাহিনীর কাছে এত সহজে দিল্লী হারাতে হয়েছিল। দিল্লীর দুর্গ দখলের পরই হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিফল অবসান হয়। আমরা এ বিষয়ে পরে আলোচনা করব। দুর্গ দখলের পর ইংরেজ শাসকরা ভেতরের ব্যবস্থাপনার ব্যাপক ক্ষতি করে। তৈরি হয় ইংরেজ বাহিনীর গোড়াপত্তনের জন্যে সৈনিক ব্যারাক আর সামরিক সদর দপ্তর।

আমরা দ্বিতল মীনাবাজার পার হয়ে বর্তমান সৈনিক ব্যারাকের একাংশকে হাতের বাঁয়ে রেখে দুর্গের এক সময়কার সুরক্ষিত অংশে প্রবেশের জন্য বাইরের মহল আর নহবতখানা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। বাইরের উন্মুক্ত মহল পার হতেই সামনে

www.pathagar.com

দেখা গেল বেশ বড় বাগান যার মাঝ দিয়ে লাল ইটের পায়ে চলা পথ। পথের শেষ প্রান্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো দিয়ান-ই-আম। মোগলদের অন্যান্য দুর্গের মতই দিয়ান-ই-আম ব্যবহার হতো সম্রাটের সাধারণ দরবার হিসেবে। এখানে হিন্দুস্থানের মোগল সম্রাটরা দেখা করতেন সাধারণ জনগণের সাথে। দিল্লীর দিওয়ান-ই-আম-এর পূর্বদিকের দেয়ালের মাঝখানে বিশেষ জাফরি (জালি) দেয়া ছোট বেলকনির মত। এখানে ছিল শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসন। সাদা মার্বেলের তৈরি অপূর্ব সুন্দর শৈলীর নিদর্শন সিংহাসনের স্থান। সিংহাসনের ঠিক নিচে একটি ছোট মঞ্চ যেখানে বসতেন সম্রাটের প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর দু'পাশে বসতেন আমীর ওমরাহ আর সিপাহসালার। সিংহাসনের পেছনের জাফরির পেছনে ছিল সম্রাজ্ঞীর বসবার স্থান। বলা হয়ে থাকে মমতাজ মহলের মৃত্যুর পর কন্যা জাহানারা শাহজাহানের পেছনে এখানেই বসতেন। দেয়ালের পূর্বে অপর প্রান্তে আছে অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ, জানানা মহল (মহিলাদের মহল)। মহলগুলো যমুনা নদীর দিকে খোলা থাকায় এসব প্রকোষ্ঠ থেকে যমুনা নদীর দৃশ্য অবলোকন করা যেত।

আমরা দিওয়ান-ই-আম-এ বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ভাবছিলাম প্রায় তিনশত বছর পূর্বে শাহজাহানের দিওয়ান-ই-আম কত রমরমা ছিল। উজির-নাজিরের ভিড় আর শাহেনশাহ-এর আগমন বার্তায় নহবতের আওয়াজ। দরবারের নাজির উচ্চস্বরে সম্রাট শাহজাহানের আগমন বার্তায় জানাতেন, "আল সুলতান আল আজম-ওয়াল খাকান আল মোকাররম, আবুল মোজাফফর শিহাবউদ্দিন মোহাম্মদ, সিহাব-ই-কিরান-সানি, শাহজাহান-১ বাদশাহ গাজী, জিল্লে ইলাহী জলোয়াফোরোষ হো রাহে হ্যায়।" দরবারের সবাই সম্রাটের আগমনে কুর্নিশ করতেন। এমনিভাবে আগমন বার্তা জানাবার রেওয়াজ ছিল শেষ মোগল সম্রাটের সময় পর্যন্ত। ছিল বড় বড় টাইটেল। সে ধারাবাহিকতা ইংরেজরা তাদের ভাইসরয়ের জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে রেখেছিল। আমরাও মোগলদের মত না হলেও ইংরেজদের প্রথামত রাষ্ট্রপতির দরবারে আগমনের বার্তা শুনি। কেমন যেন রাজকীয় গন্ধ রয়ে গেছে একবিংশ শতাব্দীতেও।

দিওয়ান-ই-আম ছেড়ে বাগান পার হয়ে জানানা মহলের দক্ষিণের বড় মহলটির দিকে আসলাম। এ মহল তৈরি করা হয়েছিল সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের আবাসের জন্য। বর্তমানে এ মহল ব্যবহার হচ্ছে দুর্গের যাদুঘর হিসেবে। যাদুঘরে রক্ষিত রয়েছে শাহজাহান আর তার সময়ের ব্যবহৃত বহু দ্রব্যাদি। রক্ষিত আছে সম্রাট আওরঙ্গজেবের হাতে লেখা পবিত্র কোরআন শরিফের নকল। ইতিহাসে উল্লেখ আছে সম্রাট আওরঙ্গজেব, যাকে মুসলিম ওলামারা নাম দিয়েছিলেন, 'জিন্দা পীর' (জীবন্ত পীর), তিনি কোরআন নকল করে আর টুপি সেলাই করে নিজস্ব খরচ চালাতেন।

যাদুঘর বা সম্রাজ্ঞীর মহলের সাথে লাগোয়া 'রং মহল'। রং মহলটি মার্বেলের তৈরি

www.pathagar.com

নক্সা কাটা ছাদ আর মার্বেল পিলার দিয়ে তৈরি। মাঝে রয়েছে পানির চৌবাচ্চা, ছোটখাট সুইমিংপুল। এ চৌবাচ্চায় সব সময় যমুনার পানি প্রবাহিত হত।

আমরা জাদুঘর থেকে বের হয়ে উত্তর দিকে 'হায়াত বখস্ বাগ' (জীবন দান বাগান)-এর পূর্ব পাশ দিয়ে প্রথমে 'জোনানা মহল' হয়ে পরে দেওয়ান-ই-খাস-এর সামনে এসে দাঁড়ালাম। 'হায়াত বখস্ বাগ'-এর মধ্য দিয়ে উত্তর-দক্ষিণ আর পূর্ব পশ্চিমে প্রবাহিত নহর ছিল যা আজও আছে। দু'পাশে দু'টি পটমন্ডপ (Pavillion) রয়েছে। পরে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে দু'টি নহরের সংযোগস্থলে, আরেকটি পটমন্ডপ তৈরি করেন বাহাদুর শাহ জাফর।

'হায়াত বখস বাগ'-এর উত্তর পূর্বে 'জানানা মহলের' পাশ দিয়ে দিওয়ান-ই-খাস। সম্পূর্ণ সাদা মার্বেলের তৈরি। মাঝখানে পানির চৌবাচ্চা আর চৌবাচ্চার পূর্ব দিকে ছোট একটি মন্ডপ যেটা ব্যবহার করতেন সম্রাট তার সিংহাসন হিসেবে। আগ্রা অথবা লাহোর দুর্গের মতই দিওয়ান-ই-খাস ব্যবহার হত শুধুমাত্র সম্রাটের অতি সন্নিকটের ব্যক্তি, বিদেশি মেহমান এবং কূটনীতিবিদদের সাথে দেখা করবার জন্য। 'দিওয়ান-ই-খাস'-এর সামনের সবুজ চত্বরের (lawn) পশ্চিম প্রান্তে গ্যালারির মত বসবার বেঞ্চ তৈরি করা হয়েছে ভারতের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে। এখানে সোমবার ছাড়া প্রতি রাতে 'দিওয়ান-ই-খাস'-এর প্রেক্ষাপট ব্যবহার করে সপ্তাহের রাত ৯টা হতে পর্যটকদের জন্য এক ঘন্টার 'লাইট এন্ড সাউন্ড' (আলোর রশ্মি এবং শব্দ) শো হয়। ওই শোতে এ দুর্গের মোগল আমল হতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বা হিন্দুস্থানের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত সময় দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয় আলো আর শব্দের সাহায্যে। এ শো দেখবার জন্য আলাদা টিকেট করতে হয়। সময়ের অভাবে এ দর্শনীয় শোটি দেখা সম্ভব হয়নি। তবে শম্পার বিবরণে শুনেছি এটি অতীব দর্শনীয় একটি অনুষ্ঠান। অত্যন্ত চমৎকার করে ফুটিয়ে তোলা হয় উল্লেখিত সময়ের ইতিহাসের পাতা।

ইতিমধ্যেই সূর্যের তাপ অনেকটা কমে এসেছে। দুর্গ বন্ধ হবার সময় হয়ে এসেছে প্রায়। ফিরবার পালা। দিওয়ান-ই-খাস-এর সংলগ্ন সম্রাটের ব্যক্তিগত বাসস্থানের পাশের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট ছোট অথচ স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন 'মতি মসজিদ' ভেতর থেকে দেখা সম্ভব হয়নি। কারণ, মসজিদটি দর্শন স্থান থেকে আলাদা করে রাখা, বর্তমানে সংরক্ষিত সেনা ছাউনির অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছোট মসজিদটি নিজস্ব তদারকিতে ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব তৈরি করেছিলেন তাঁর নিজের নামাজ আদায় ও ইবাদতের জন্য। বলা হয়ে থাকে তিনি ওয়াক্তিয়া নামাজ ছাড়াও তাহাজ্জতের নামাজ সচরাচর এখানেই আদায় করতেন। জনশ্রুতি আছে সম্রাট আওরঙ্গজেব, আলমগীর নামেও পরিচিত, জীবনে তাহাজ্জত নামাজ কখনই বাদ

www.pathagar.com

দেননি। তবে তিনি কোন বয়স থেকে তাহাজ্জতের নামাজ শুরু করেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় সঠিকভাবে লিখিত নাই।

আমরা ফিরতি পথে জানানা মহলের পূর্ব প্রান্তের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দূরে বর্তমানের যমুনা নদীর অবস্থান দেখলাম। যমুনা নদী এখন দুর্গ হতে বহুদূর সরে গিয়েছে। বর্তমানে দুর্গের পূর্ব দেয়াল বরাবর দিল্লীর অন্যতম ব্যস্ত সড়ক, মহাত্মা গান্ধী মার্গ নির্মিত হয়েছে। এটি এখন দিল্লীর অন্যতম ব্যস্ততম সড়ক।

আমরা দিল্লীর দুর্গ 'লালকেল্লা' ছেড়ে একই পথে 'লাহোরী দরওয়াজা' পার হয়ে গাড়ির দিকে যখন রওনা হলাম তখন দুর্গের অদূরে জামে মসজিদের মাইকে আছরের আযানের সুর ভেসে আসছিল। বিগত তিনশ' বছরের উপর হতে দাঁড়িয়ে আছে জামে মসজিদ, যেটাকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল মেজর হাডসনের বাহিনী। পরে কিছু সময়ের জন্য মসজিদ চত্বর ব্যবহার হয়েছিল কোম্পানি বাহিনীর আঁস্তাবল হিসেবে আর মসজিদ ইমারতটি ব্যবহার হয়েছিল সিপাহীদের ব্যারাক হিসেবে।[১]

দিল্লী দুর্গের সামনে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র মার্গ এবং চাঁদনী চকের সংযোগ সড়কের পাশে রাখা গাড়ি নিয়ে পুরাতন দিল্লীর এ অংশ ছেড়ে নতুন দিল্লীর সবচাইতে দর্শনীয় 'জনপথ' হয়ে যখন শম্পার বাসায় পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। মুখ হাত ধুয়ে চা খেতে খেতে সিদ্ধান্ত নিলাম সবাই মিলে রাতের খাবার বাইরে খাব। সিদ্ধান্ত হল ধারে কাছেই আছে 'দিল্লী হাট' (Delhi Hat)। সেখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের খাবারের দোকান রয়েছে। কাজেই যে কোন ধরনের খাবার খেতে কোন সমস্যাই হবে না। সব রেস্তোরাঁই পাওয়া যাবে একই চত্বরে।

'দিল্লী হাট' শুধু খাবারের দোকানই নয়, এটি ভারতীয় কুটির শিল্প অথরিটি এবং পর্যটন সংস্থা কর্তৃক যৌথ উদ্যোগে নির্মিত স্থায়ী প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র। এখানে ভারতের প্রতিটি রাজ্যের খাবারের এবং কুটির শিল্প হিসেবে বিবেচিত কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির দোকান স্থায়ীভাবে তৈরি হয়েছে। প্রতিটি রাজ্য এবং ইউনিয়ন টেরিটোরি প্রতি মাস অন্তর কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'দিল্লী হাট'-এ পাঠিয়ে থাকে। অনুরূপভাবে রাজ্যের প্রসিদ্ধ খাবারের দোকানগুলোকেও ঐ রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী খাবার পরিবেশনের জন্য নির্বাচিত করে পাঠায়। খাবারের দোকানগুলোও মাস অন্তর পরিবর্তিত হয়। 'দিল্লী হাট' দেশি ও বিদেশি পর্যটকদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে।

আমরা রাত আটটায় দোহা সাহেবকে সাথে নিয়ে 'দিল্লী হাট'-এর দিকে রওয়ানা হলাম। শম্পা জানালো আজকের রাতের খাবারের মেজবান দোহা সাহেব নিজে এবং তিনি বহু দিন পরে বাইরে খেতে যাচ্ছেন। আমার জানা মতে, এমনিতেই দোহা সাহেব

১. *Khushwant Singh, "Delhi-a Novel" p.309. Perune Book*

www.pathagar.com

বাইরের খাবার তেমন পছন্দ করেন না। তার উপর তাঁর বহু বছরের সঙ্গী প্রিয় স্ত্রীর মৃত্যুর পর তেমন বের হতেন না। আমাদের সাথে তাঁর পিতা বের হতে সহজেই রাজি হলেন বলে শম্পা বেশ আনন্দিত বোধ করছিলেন।

আমরা 'দিল্লী হাট'-এ পৌঁছে ভেতরে প্রবেশের জন্য টিকেট নিয়ে নিরাপত্তা তল্লাশির পর প্রবেশ করলাম। রাত ন'টায় খাবারের দোকান ছাড়া অন্যান্য দোকান বন্ধ হয়ে যায়। খুব তাড়াতাড়ি বিভিন্ন রাজ্যের হস্তশিল্পের দোকানগুলো দেখে খাবারের দোকানগুলো থেকে পছন্দ করে উত্তর প্রদেশের একটি দোকানে খাবারের অর্ডার দিলাম। উত্তর প্রদেশের খাবার বেশ মোগলাই মেজাজের। লক্ষ্মৌ এর বিখ্যাত রেস্তোরাঁ এবার এসেছে 'দিল্লীহাট'-এ। কাজেই আমাদের কাছে পছন্দনীয় হবারই কথা। সবাই মিলে বিরিয়ানীর অর্ডার দিয়ে বসে দোহা সাহেবের সাথে দিল্লী শহর এর অতীত আর বর্তমান নিয়ে আলোচনা বেশ জমে উঠল। মিঃ শামসুদ্দোহা জীবনে বহুবার দিল্লী এসেছেন, তবে এবারই তিনি মেয়ের বাড়িতে এক নাগাড়ে তিন বছর কাটাচ্ছেন। এখানেই তাঁর পত্নী বিয়োগ হওয়াতে বসন্ত বিহারের বাড়িটির মায়া ত্যাগ করতে পারবেন বলে তিনি মনে করেন না, যদিও শম্পার বদলির চাকরি।

দিল্লী এখন এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম আন্তর্জাতিক 'মেট্রোপলিস'। জানা মতে আটশ বছরের পুরনো শহর দিল্লী, অবশ্য মহাভারতের সময় ধরলে এ অঞ্চলের শহর গড়ে উঠে সিন্ধু সভ্যতার সময় হতে। মহাভারতের কাহিনীতে এ অঞ্চলের শাসক হিসেবে হিন্দু সম্রাট 'দিল্লী'-এর নাম উল্লেখ আছে। মহাভারতের গবেষকরা মনে করেন এ সম্রাটের নামেই দিল্লী শহরের নামকরণ করা হয়েছে। তবে কে কবে এ নাম রেখেছেন তা স্পষ্ট নয়। যাহোক, পৃথ্বীরাজ চৌহানের সময় থেকেই দিল্লী সময়ে সময়ে রাজধানীর মর্যাদা পেলেও রাজধানীর নামে বিভিন্ন শহর তৈরি হতে থাকে। মধ্য যুগে সাতটি শহর নিয়ে ছিল দিল্লী। তবে দিল্লীর মুসলিম সুলতানগণ যে সব শহর গড়ে তুলেছিলেন তার বেশিরভাগ নষ্ট হয় মধ্য এশিয়ার তুর্কী বংশোদ্ভূত তৈমুরের (১৩৯৮-১৩৯৯) হিন্দুস্থানে অভিযানের সময়। আরও পরে মোগল সম্রাট বাবরের সাম্রাজ্য পত্তনের পর দিল্লী অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়ে। বর্তমান দিল্লীর রূপকার সম্রাট শাহজাহানকে বলা যেতে পারে যিনি ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর প্রাচীরঘেরা শহর শাহজাহানবাদ-এর গোড়াপত্তন করেন। সে শহর বর্তমানে পুরাতন দিল্লী বলে পরিচিত। পুরাতন দিল্লীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে নতুন শহর।

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোগলদের হাত থেকে পুরাতন দিল্লীর সীমানার বাইরের এলাকা দখল করে নেয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি দিল্লীতে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ১৯১১ হতে ১৯৩১ পর্যন্ত দিল্লী ব্রিটিশ-ভারতের অস্থায়ী রাজধানী ছিল। পরে নতুন দিল্লী তৈরি হলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী

www.pathagar.com

হিসেবে গড়ে উঠে 'নতুন দিল্লী'। দিল্লী শহর কলেবরে বর্ধিত হতে থাকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতার পর হতে। এখনও নতুন দিল্লী সম্প্রসারিত হচ্ছে দ্রুত গতিতে। যদিও দিল্লী ভারতের রাজনৈতিক রাজধানী– অর্থনৈতিক রাজধানী নয়, তবুও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব কম নয়। আগামী ২০১০ (এ বইয়ের রচনা কাল ২০০৯) খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে কমনওয়েলথ গেমস। এ কারণেই দিল্লী নতুন সাজে সজ্জিত হচ্ছে। পাতাল রেলের ব্যাপ্তি হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে কয়েক ডজন ফ্লাইওভার। অচিরেই দিল্লী দক্ষিণ এশিয়ার 'ফ্লাই ওভার'-এর সবচেয়ে বড় শহরে পরিণত হবে। এত কিছুর পরেও আজও দিল্লীর প্রাণকেন্দ্র পুরাতন দিল্লী আর 'চাঁদনী চক'। দিল্লীর বর্তমান জনসংখ্যা (২০০১ এর আদমশুমারি অনুযায়ী) ১২,৭৯১,৪৫৮।

দিল্লী শুধু সাম্রাজ্য, সম্রাট, সুলতান, বাদশাহ আর নবাবদের উত্থান-পতনের শহরই নয় দিল্লী বহুবিধ সংস্কৃতি আর কৃষ্টির মিলন কেন্দ্রেও বটে। দিল্লীতে যেমন রক্তপাত হয়েছে তেমনি এ শহরের বাসিন্দারা পেয়েছে বহু মহামানব, সূফী সাধকদের পরিচয়। আমার মতে দিল্লীতে একদিকে যেমন রাজা-বাদশাহদের উত্থান পতনের স্মৃতি রয়েছে তেমনি আজও সাধারণ মানুষের মনের কোঠায় ভক্তি আর শ্রদ্ধায় জাগ্রত রয়েছেন বহু সূফী সাধক যারা সুলতান আর সম্রাটদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মানুষে মানুষে আর ধর্মের ভেদাভেদকে ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র 'আশরাফুল মখলুকাত' হিসেবে মানুষকে ভালোবেসেছিলেন। যুগে যুগে তাদের মর্যাদার কাছে ম্লান হয়ে গেছে বহু ক্ষমতাধর শাসকের স্মৃতি।

মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তনের বহু আগে এবং পর হতেই সূফী-সাধকরা এসেছেন মানুষকে আল্লাহর মহিমায় সিক্ত করে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে ভালবাসা শিখাতে। তাঁরা বহু ভাবে শিকার হয়েছিলেন শাসকের নির্যাতনের। তবুও মানুষের প্রতি তাঁদের ভালবাসা কখনই কমেনি। তাই তাঁদের জীবনগাঁথা আজ শুধু ইতিহাসেই নয় জনমুখেও শ্বাশত হয়ে আছে যুগে যুগে।

বহু শাসকের হাতে সূফী, ফকির আর দরবেশদের নাজেহাল এবং নির্যাতিত হবার কথা দিল্লীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমনি এক ঘটনা ঘটেছিল সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি আর দরবেশ সিদ্দি মওলার (Siddi Maula) মধ্যে। যদিও অনেকেই সিদ্দি মওলাকে উচ্চস্তরের সূফী সাধক মনে করেন না, তথাপি সিদ্দি মওলা নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন তিনি অসাধারণ ছিলেন।

জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি ১২৯০ হতে ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সুলতান ছিলেন। তিনি ছিলেন ৩০ বছরের খিলজিদের শাসনের গোড়াপত্তনকারী। জালালউদ্দিন যখন দিল্লীর সুলতান তখন দিল্লীর গিয়াসপুরের হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া দিল্লীর বাইরে সফররত ছিলেন। ওই সময়ে দিল্লীতে সিদ্দি মওলা সূফী সাধক হিসেবে দিল্লীবাসীর কাছে

www.pathagar.com

পরিচিত হয়ে উঠেন। গুজব রটে যে সিদ্দি মওলা জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজিকে পছন্দ করেন না বিধায় তার বিরুদ্ধে সুলতানের কিছু সহচরদের নিয়ে জালালউদ্দিনকে হত্যা করে অপসারণের ষড়যন্ত্র করছেন এই দরবেশ সিদ্দি মওলা। সুলতান সিদ্দি মওলাকে গ্রেফতারের হুকুম দিয়ে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা উদ্ঘাটন করতে কোতওয়ালকে নির্দেশ দিলেও কোতয়াল দরবেশ এবং তার সহচরদের কাছ হতে কোন তথ্য বের করতে পারেননি। এ সংবাদে সুলতান প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে সিদ্দি মওলাকে সুলতানের দরবারে নিয়ে আসতে বলেন।

দরবারে সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করতে সুলতান নিজে হুকুম দিলে সিদ্দি মওলা নিশ্চুপ নিথর দাঁড়িয়ে থাকেন। কোতওয়ালের হাতে ইতোপূর্বেই দরবেশ মওলা ব্যাপকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। সুলতানের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাতে জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি নিজে উঠে গিয়ে দরবেশকে প্রহার করে অকথ্য ভাষায় ভর্ৎসনা করলে দরবেশ সিদ্দি মওলা এবার উচ্চস্বরে এমনভাবে উত্তর দিলেন যাতে উপস্থিত পারিষদ পরিষ্কারভাবে শুনতে পান। দরবেশ বললেন, "জালালউদ্দিন, শুনুন। আমার অপরাধ যদি মানুষকে ভালোবাসা হয়, সে অপরাধের শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব। আপনি জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজি এবার সিদ্দি মওলা, আল্লাহ্‌র প্রেমিক দরবেশের কথা শুনুন। আপনার কৃতকর্মের জন্য আপনি দায়ী থাকবেন। আল্লাহ্‌র একজন প্রেমিক বান্দার গায়ে যেভাবে হাত তুলেছেন, অত্যাচার করেছেন তার মাসুল ইহজগতেই আপনাকে দিয়ে যেতে হবে। আপনি আপনার নিকটজনের হাতে মৃত্যুবরণ করবেন আর আপনি দোজখের আগুনে আপনার কৃতকর্মের জন্য জ্বলবেন।"

সিদ্দি মওলার কথা শুনে সুলতান তার দেহরক্ষীদের দরবেশকে 'শহরে ই-নও'-এর সুলতানের দরবারেই হত্যা করবার হুকুম দিলেন। সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজির সম্মুখে সিদ্দি মওলাকে তরবারির আঘাতে অর্ধমৃত অবস্থায় দরবারের বাইরে জনসম্মুখে হাতির পায়ের নিচে পিষ্ট করে হত্যা করা হয়। দিল্লীর ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে যে, সিদ্দি মওলার হত্যার পর পরই দিল্লীর আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ধুলির ঝড় উঠে, ওই ঝড় কয়েকদিন দিল্লীর রাস্তায় শহরবাসীদের বাড়ির বাইরে যেতে দেয়নি। ঝড়ের পরপরই পঙ্গপালের আক্রমণে শস্যের ক্ষতি আর গাছপালা উজাড় হয়। ঐ বছর দিল্লীতে কোন বৃষ্টি হয়নি। গরমে বহু লোক মারা যায়। শস্যহানি হওয়াতে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থায় পরে দিল্লীবাসী। চারদিকে গুঞ্জন উঠে সুলতানের অবিচারে একজন দরবেশের নির্মম হত্যার কারণে এ বিপর্যয়।[২]

সিদ্দি মওলার হত্যার বছরের মাথায় জালালউদ্দিন খিলজিকে তার ভ্রাতৃষ্পুত্র ও জামাতা আলাউদ্দিন খিলজি শুধু হত্যাই করেনি, সুলতানের মাথা ধর থেকে আলাদা করে

২। *www.amritworld.com/Muslim Rule in India section, Kushwant singh, ibid p. 662, William Dalrymple. 'City of Djinns' Perguin Books, Dellhi*

www.pathagar.com

বর্শার মাথায় গেঁথে কারা, মানিকপুর আর অযোধ্যা প্রদেশের রাস্তায় রাস্তায় জনগণকে প্রদর্শন করা হয়।

জালালউদ্দিন ফিরোজ খিলজিকে হত্যা করে আলাউদ্দিন খিলজি বিশ বছর দিল্লীর সালতানাত শাসন করেন। আলাউদ্দিন খিলজিও দুরারোগ্য রোগে মারা গিয়েছিলেন। ওই সময় থেকে আজ পর্যন্ত অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, জালালউদ্দিন ফিরোজ শাহ এবং খিলজি বংশের উপর দরবেশ সিদ্দি মওলার বদ্‌দোয়া লেগেছিল।

এমনি বহু ঘটনা দিল্লীর ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিচিত্র ইতিহাস দিল্লীর। দিল্লীর ইতিহাসের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বিচিত্র আর অবিশ্বাস্য ঘটনায় ভরা উপমহাদেশের ইতিহাস।

দিল্লী হাট-এ বসে দিল্লী সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে দেখলাম ইতোমধ্যেই লক্ষ্মৌ-এর নবাবদের মত পোশাক পরা ওয়েটার আমাদের টেবিলে 'উত্তর প্রদেশ' এর ঐতিহ্যবাহী খাবার পরিবেশন করে গেল। রাতের খাবারের পাট চুকিয়ে যখন বিছানায় শুতে গেলাম তখন মধ্যরাত। পরের দিন তুঘলকাবাদ আর শাহজাহানবাদ-এর (পুরাতন দিল্লী) 'চাঁদনী চক' দেখার মধ্য দিয়েই শেষ হবে ভারতে আমার-এ সংক্ষিপ্ত সফর।

www.pathagar.com

সতের

শাহজাহানাবাদ-চাঁদনী চক

আজ মে ১৩, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ। সকাল নয়টার দিকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম পুরাতন দিল্লীর শহর ঐতিহাসিক শাহজাহানাবাদ-এর এককালের উচ্চমার্গের ব্যবসায়িক কেন্দ্র বর্তমানে দিল্লীর পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ 'চাঁদনী চক'-এর উদ্দেশ্যে। 'চাঁদনী চক'-এ যাবার আরেকটি উদ্দেশ্যে ছিল কিছু টুকিটাকি বাজার করা। অবশ্য ওই কাজটি আমি সহধর্মিণীর হাতেই ছেড়ে দিয়ে আগেই নির্ধারণ করলাম যে মিনহাজ তাঁর সাথে থাকবেন আর আমি সুযোগ পেলে 'চাঁদনী চক'-এর কিছু সুবিখ্যাত অলিগলি ঘুরে দেখব। যাবার পথে অথবা ফিরবার পথে ইন্ডিয়া গেট আর রাষ্ট্রপতি ভবন দেখে যাব।

শম্পার বাসা থেকে বের হতেই মিনহাজ বললেন, প্রথমে "রাষ্ট্রপতি ভবন" এবং জনপথ দেখে যাওয়াই সহজ হবে। ওই রাস্তায় গেলে কাছেই পড়বে পুরাতন দিল্লী আর 'চাঁদনী চক'। আমি তার প্রস্তাব সমর্থন করলাম। ভাবলাম হাতে কিছুটা সময় নিয়েই লুটিয়েন্স-এর দিল্লী দেখাটাই ভাল হবে। আমরা প্রথমেই নতুন দিল্লীর অতি বিখ্যাত লুটিয়েন্স-এর রাজপথ, বর্তমানের জনপথ, ধরে 'নয়া দিল্লী'র (নতুন দিল্লীর) দিকে রওয়ানা হলাম।

জনপথ পশ্চিমে শেষ হয় উত্তর দক্ষিণের রফি আহমেদ কিদওয়ী মার্গ-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে। এরপরে পশ্চিমে রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে পর্যন্ত রাস্তার নাম বিজয় চক রোড। বিজয় চক রোডের মাঝপথে একটি গেটের দু'টি স্তম্ভের সামনেই শেষ হয় ডুয়েল ক্যারেজ রোড। এরপরের অংশ সিঙ্গেল ক্যারেজ। বিজয় চক রোডের এ অংশের দক্ষিণে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সাউথ ব্লক, সাথে আরও অন্যান্য মন্ত্রণালয়। উত্তরে নর্থ ব্লক সেক্রেটারিয়েট। নর্থ ব্লকের দক্ষিণ-পূর্বে ভারতের পার্লামেন্ট হাউজ যেখানে রাজ্যসভা আর লোকসভার চেম্বার। পার্লামেন্ট হাউজের দক্ষিণে রাজ্যসভা মার্গ, উত্তরে লোকসভা মার্গ। লোকসভা মার্গের সাথে লাগোয়া বিশাল আকারের পার্লামেন্ট হাউজ লাইব্রেরি। দিল্লীর এ অংশ অত্যন্ত পরিকল্পিত। পরিকল্পনার বাইরে যেমন কোন দালান কোঠা নেই, তেমনি নেই কোন রাস্তা বা গলি। জনপথ-এর দু'পাশে সুদৃশ্য বাগান যার রক্ষণাবেক্ষণ চোখে পড়বার মত। জনপথ-এর দু'পাশের বাগানের পেছনে সমান্তরাল দু'টি নহর (কৃত্রিম খাল)। এ নহর শুরু হয়েছে ইন্ডিয়া গেটের দু'পাশ হতে। ইন্ডিয়া

www.pathagar.com

গেট হতে রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত যেতে আরও দু'টি রোড পার হতে হয়। এছাড়াও পার হতে হয় জসওয়ান্ত সিং রোড।

নতুন দিল্লীর এ অংশকে লুটিয়েন্স দিল্লীও বলা হয়। কারণ কনাট প্লেস্সহ এই সম্পূর্ণ অংশটি, পার্লামেন্ট ভবন আর নর্থ-সাউথ ব্লক ছাড়া, পরিকল্পনা ও নির্দেশনা দিয়েছিলেন ব্রিটিশ স্থপতি স্যার এডউইন ল্যান্ডসিয়ার লুটিয়েন্স (Sir Edwin Landseer Lutyens)। অপর স্থাপনাগুলো নর্থ সাউথ ব্লক এবং পার্লামেন্ট হাউস কমপ্লেক্সের স্থপতি ছিলেন আরেক ব্রিটিশ স্থপতি লুটিয়েন্স-এর বন্ধু স্যার হারবার্ট বেকার (Sir Herbart Baker)। এ দুই স্থপতি ওই সময়ে বৃটেনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং সবচাইতে উচ্চস্তরের স্থপতিদের মধ্যে ছিলেন। এ দু'জন দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী কেপটাউন সানসিটিসহ অন্যান্য শহর পরিকল্পনাতেও একসাথে কাজ করেছেন। লুটিয়েন্সের অন্যান্য স্থাপনাও বিশ্ব খ্যাতি অর্জন করেছে।

কোলকাতা হতে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের কাজ শুরু হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের পরে যখন বৃটেনের তৎকালীন রাজা পঞ্চম জর্জ রাণী মেরীর সাথে দিল্লী সফরের সময় দরবার হলে ডিসেম্বর ১২, ১৯১১-এ রাজধানী স্থানান্তরের ঘোষণা দেন। নতুন দিল্লী বা 'লুটিয়েন্স' দিল্লীর নির্মাণ (তৎকালীন সময়ে) শেষ হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। নতুন দিল্লীর উদ্বোধন করেন ব্রিটিশ রাজের গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিংডন (Lord Willeingdon)।

আমরা এতক্ষণে আকবর রোড হয়ে, সম্রাট আকবরের নামে নামকরণকৃত মতিলাল নেহরু প্লেস; বিশাল গোল চত্বর ঘুরে এগুলাম। গোল চক্করের কাছেই ত্রিমূর্তী ভবন যেটি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর বাসস্থান ছিল। এ বাড়িটি ছিল ব্রিটিশ ভারতের কমান্ডার-ইন-চীফের এককালের সরকারি বাসভবন। জনপথ-এ বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নিবাস আর আকবর রোডে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির ভবন। জনপথ-এর দক্ষিণের গোল চত্বরে এসে যুক্ত হয় পূর্বমুখী দুটি বিশাল এ্যাভিনিউ–আরঙ্গজেব রোড এবং ঠিক এর পাশে পৃথ্বীরাজ চৌহান রোড। জনপথ-এর সমান্তরাল আরও দু'টি রাস্তা রয়েছে। দক্ষিণে মওলানা আবুল কালাম আজাদ রোড, যেটি পেরিয়ে জনপথ হয়ে আমরা রাষ্ট্রপতি ভবন দেখতে চলেছি– আর উত্তর দিকে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ রোড।

আমি নয়াদিল্লীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এ এলাকার এতগুলো পরিপাটি করে সংরক্ষিত বৃহৎ রাস্তাগুলোর নাম এ কারণে উল্লেখ করলাম যে স্বাধীন ভারতের রাজধানীতে ইতিহাস যে বর্তমানের সাথে সহাবস্থান করছে, সে চিত্র ফুটিয়ে তুলতে। ইতিহাসের এমনি সহাবস্থান রয়েছে সমগ্র দিল্লী শহরে।

আমরা জনপথ ধরে প্রথমে ইন্ডিয়া গেট দেখতে গেলাম। ক্রমেই গরম বাড়ছিল

www.pathagar.com

বলে আমি একাই গাড়ি থেকে নেমে ইন্ডিয়া গেট দেখে গাড়িতে ফিরে জনপথ ধরে রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে রওয়ানা হলাম।

বস্তুতপক্ষে ইন্ডিয়া গেট হতে জনপথ-এর শুরু। ইন্ডিয়া গেট হতে জনপথ-এর দৃশ্য অদ্ভুত সুন্দর, নয়নাভিরাম। বিশাল চওড়া এভেনিউ যার দু'পাশে বেশ চওড়া অথচ অত্যন্ত পরিপাটি সবুজ বাগান। বাগানের দু'পাশে অদ্ভুত সুন্দর 'ইউক্যালিপটাস' আর 'কেজুয়াতরিনা'সহ কয়েক প্রকারের গাছের সারি। সমস্ত জনপথের দু'ধারে নয়ন জুড়ানো সবুজের সমারোহ। সবুজ বাগানের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে অসংখ্য ফোয়ারা। বাগানের দু'পাশের পানির ক্যানালে কৃত্রিম খালে পরিষ্কার কাঁচের মত চিকচিক করছে পানি। যার মধ্যে জনপথ-এর প্রতিবিম্ব দেখা যায়। দু'ধারে অসংখ্য সোডিয়াম আর সার্চ বাতি। এসব বাতি রাতের দৃশ্যকে আরও নয়নাভিরাম করে তোলে। এই জনপথ-এ অনুষ্ঠিত হয় ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের সামরিক কুচকাওয়াজ, বেসামরিক মন্ত্রণালয়গুলোর এবং বিভিন্ন রাজ্য হতে যোগদানকারী ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী ।

নতুন দিল্লীর জনপথই বিশ্বের সবচাইতে প্রশস্ত আর দীর্ঘতম আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের স্থান। এটা অনেকটা প্যারিসের 'এভেনিউ ডি চ্যাম্পস্ এলিসি'-এর (Avenue des Champs Elysees) মত। প্যারিসের এই এভেনিউর নির্মাণের উদ্যোক্তা ছিলেন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। এরই সাথে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে ওই এভেনিউর মাঝ প্রান্তে তৈরি হয়েছিল 'আর্ক ডি ট্রম্পেই (Arc de Tromphe)। এর স্থপতি ছিলেন জেন সালগ্রীন (Jean Chalgrin)। আমি প্যারিসে এ জায়গাগুলো দেখেছি তবে লুটিয়েন্সের রাজপথ, বর্তমানে জনপথ এবং ইন্ডিয়া গেট প্যারিসের 'চ্যাম্পস্ এলিসি-এর চাইতে প্রশস্ত এবং অধিক নয়নাভিরাম। আমার মনে হয়েছে এখানেই নতুন দিল্লীর প্রধান স্থপতি লুটিয়েন্স-এর সার্থকতা। ফরাসীদের টেক্কা দেবার অহমিকা কাজ করে থাকতে পারে বর্ণবাদী এই ব্রিটিশ স্থপতির মধ্যে।

ইন্ডিয়া গেট হতে সোজা সামনের দিকের অপর প্রান্তে 'রেইসিয়ানা' পাহাড়ের এক প্রান্তে রাষ্ট্রপতি এবং এর ডানে-বামে সেক্রেটারিয়েট ভবন এনমভাবে তৈরি যা ইন্ডিয়াগেট থেকে দৃশ্যামান হয় না। কিন্তু ইন্ডিয়া গেট হতে জনপথ ধরে রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে যতই এগুনো যায় ক্রমেই দৃশ্যমান হতে থাকে বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্র-প্রধানের বাসভবন। প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয় ভবনের, পেঁয়াজের আকারের বিশাল গম্বুজ আর ক্রমেই পশ্চিম দিগন্তে উদয় হবার মত দৃশ্যমান হতে থাকে দুই রংয়ের স্যান্ডস্টোনের তৈরি বিশাল রাজকীয় প্রাসাদ, এক সময়কার ব্রিটিশ-ভারতের ভাইসরয় হাউজ, বর্তমানের রাষ্ট্রপতির ভবন। আর দৃশ্যমান হতে থাকে দু'পাশের দু'টি সচিবালয়।

দিনের শেষে পশ্চিম প্রান্তে অস্তগামী সূর্য যখন লাল আভা ছড়িয়ে রাষ্ট্রপতির

www.pathagar.com

ভবনের পেছনে লুকোয় ওই সময় ভবনকে সামনে রেখে পেছনে পরিষ্কার আকাশে রচিত হয় বিশাল ক্যানভাসের উপর এক অপূর্ব চিত্র। রক্তিম ক্যানভাসের উপর ধূসর বর্ণের এক রাজ- প্রাসাদ সম অট্টালিকা আর দু'পাশে দণ্ডায়মান অতন্দ্র প্রহরীর মত স্থপতি বেকার-এর সচিবালয় দু'টি, নর্থ এবং সাউথ ব্লক। এই অপূর্ব দৃশ্য দেখতেই ছুটে আসে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পর্যটক।

নতুন দিল্লীর অন্যান্য স্থাপনায় লুটিয়েন্স-এর মুন্সিয়ানার ছাপ থাকলেও জনপথ আর রাষ্ট্রপতি ভবন কমপ্লেক্সেই লুটিয়েন্স্ জীবন্ত। তাঁর কীর্তি যতদিন থাকবে লুটিয়েন্সও তাঁর এ স্থাপনার মাধ্যমে জীবিত থাকবেন। যদিও ভারতীয়রা লুটিয়েন্স্ অথবা ব্রিটিশ-ভারতের শাসনকাল নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায় বলে আমার মনে হয় না। না ঘামানোই উচিত। ভারতীয় সংস্কৃতিই এখন খোদ বৃটেনকে মোহাচ্ছন্ন করছে। এমন কি রাজকীয় ইংরেজি ভাষা এখন 'ইন্ডয়ানাইজড ইংরেজিতে' রূপান্তরিত হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে শাহজাহানাবাদ-এর অতি সন্নিকটে নির্মিত এই 'জনপথ' দিল্লীর ইতিহাসে দু'ধারার এবং দু'সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। লুটিয়েন্স-এর নতুন দিল্লীকে অনেক লেখক, গবেষক আর ঐতিহাসিকরা দিল্লীর অষ্টম শহর বলে চিহ্নিত করেন। লুটিয়েন্স-এর নতুন দিল্লী রাজকীয় পরিচয় আর ব্রিটিশ দখলদারিত্বকে যেমন মনে করায় পুরাতন দিল্লী তেমনি স্বর্ণযুগের হিন্দুস্থানের কথা মনে করিয়ে দেয়।

অনেকে বিশ্বাস করেন যে, দিল্লীতে যে সাম্রাজ্যই নতুন শহর গড়েছে তাদের সাম্রাজ্য, শহর পত্তনের পর বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। শাহজাহানাবাদ তৈরি শেষ হবার পর আওরঙ্গজেবের সময় হতেই মোগল ভিত নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই মোগলদের সাম্রাজ্যের ক্ষয় হতে শুরু করে। সম্রাট ফররুখাশিয়ার ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য করতে বাংলায় ঘাঁটি গড়তে দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি হয়ত জানতেনও না খাল কেটে যে কুমীর তিনি এনেছিলেন সে কুমীর একদিন তার বংশের উত্তরাধিকারীদের নির্মমভাবে হত্যা করবে- করবে দেশান্তরী।

লুটিয়েন্স, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা হতে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী স্থানান্তরের পর নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন দিল্লীতে ব্রিটিশ রাজের নতুন রাজধানীর। শেষ করেছিলেন ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। তখন ব্রিটিশ রাজের প্রায় শেষ সময়। এরপর মাত্র ষোল বছরের মাথায় ব্রিটিশ রাজের মুকুটের সবচাইতে মূল্যবান অলংকার উপমহাদেশ ছাড়তে হয়েছিল। ১৯৩১ খৃস্টাব্দে যখন রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় তখন ব্রিটিশরাজের সূর্য অস্তগামী।

স্থপতি লুটিয়েন্স ব্রিটিশ ভারতের নতুন রাজধানী ইন্দো-ইউরোপিয়ান স্থাপত্যের অনুসরণে পরিকল্পনা করলেও তার মধ্যে বর্ণবাদী মনমানসিকতা কাজ করেছিল। শুধু

www.pathagar.com

স্থানীয়দের অপছন্দই নয় মোগলদের স্থাপত্যজ্ঞানকে ব্যাপকভাবে অবজ্ঞা করতেন স্থপতি লুটিয়েন্স। ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী তৈরি করতে গিয়ে এবং ফতেহপুর সিক্রির স্থাপত্য দেখে তিনি বলেছিলেন, "মোগলদের স্থাপত্য অত্যন্ত স্থূল এবং নেটিভ ভারতীয়রা, (তার মতে), সর্বক্ষেত্রে নির্বোধ আর পশ্চাৎগামী।" তিনি মনে করতেন যে নেটিভরা সৌভাগ্যবান যে, ইউরোপীয়রা এখানকার মাটিতে পা রেখেছিল। তাদেরকে (নেটিভ) আধুনিকতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ওই সময়ে সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতে যে স্থাপনাটির প্রশংসা লুটিয়েন্স করেছিলেন সেটি ছিল আগ্রার তাজমহল। তবে তিনি তাজমহল-এর অসামান্য স্থাপত্যের জন্য ইতালীয় এক স্থপতির কথা তার নথিপত্রে উল্লেখ করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি কখনই স্বীকার করেননি যে, এ স্থাপনার কৃতিত্ব তৎকালীন হিন্দুস্থানীদের। অবশ্য লুটিয়েন্স-এর এ মতামত বহু ব্রিটিশ ইতিহাসবিদরা সমর্থন করেছিলেন। এমনই ঔদ্ধত্য আর আহমিকা ছিল স্থপতি লুটিয়েন্স-এর! সে ঔদ্ধত্যের ছাপ রয়েছে তৎকালীন রাজকীয় দিল্লীর আর স্বাধীন ভারতের রাজধানীর নতুন অংশে। লুটিয়েন্স যেমন তাজমহলের কৃতিত্ব হিন্দুস্থানীদের দিতে চাননি, তেমনি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীও নতুন দিল্লীকে তেমন পছন্দ করেননি।

নতুন দিল্লী সম্বন্ধে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, "এটি ব্রিটিশ রাজের শক্তি আর ক্ষমতা অহেতুক বাগাড়ম্বর প্রদর্শনে অযথা অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।" ক্ষমতার প্রদর্শন করতেই ইন্ডিয়া গেটের সামনের চত্বরে স্থাপন করা হয়েছিল রাজদণ্ড হাতে দণ্ডায়মান ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জের বিশাল ব্রোঞ্জের মূর্তি। ওই মূর্তি ভারতের স্বাধীনতার পর পরই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। মূর্তিটি আজও পুরাতন যমুনা নদীর কোন এক অজানা স্থানে রক্ষিত রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতার পর 'রাজপথ'-এর (Kingsway) নামই শুধু পরিবর্তিত হয়ে 'জনপথ' হয়নি বরং ওই এলাকার প্রত্যেকটি রাস্তার নাম পরিবর্তিত হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা সেনানীদের নামে। তবে সেখানে নেই নেহেরু অথবা গান্ধীর নাম। তবে লুটিয়েন্স-এর দিল্লীর অভিজাত অংশের নাম 'কনাট প্লেস' এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে।

আমরা রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পুনরায় জনপথ ধরে বাহাদুর শাহ জাফর রোড পার হয়ে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র রোড হয়ে 'চাঁদনী চক' এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। পথে ভাবছিলাম উনিশ শতকের তৈরি রাজপ্রাসাদ সমতুল্য ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবনের কথা।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবন, ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় হাউজ, বর্তমানে বিশ্বের রাষ্ট্রের কর্ণধারদের সরকারি বাসভবনের মধ্যে সর্ববৃহৎ। এ ভবনের উদ্বোধন করা হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে। ওই সময়ে এর নির্মাণ খরচ হয়েছিল ৪,৭৭,০০০ ব্রিটিশ পাউন্ড

www.pathagar.com

(বর্তমান মূল্যমান ৩৫,০০,০০০ পাউন্ড)। প্রথম নির্মাণের পর এ প্রাসাদের মোট কক্ষ ছিল ৩৫৫টি। বর্তমানে ১৯০০০ ঘন মিটার ফ্লোর স্পেসে রয়েছে ৩৪০টি কক্ষ। এ প্রাসাদের প্রধান স্থপতি ছিলেন স্যার এডউইন ল্যান্ডসিয়ার লুটিয়েন্স।

ব্রিটিশ ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় ভবন তৈরিতে কোন ধরনের স্টিল ব্যবহার করা হয়নি। ব্যবহার করা হয়েছিল ৭০০ মিলিয়ন ইট আর ৩.৫ মিলিয়ন ঘন মিটার পাথর। এ ভবন তৈরি হয়েছিল মোগল সম্রাট আকবরের আমলে তৈরি করা বিশাল পার্কের পূর্বপ্রান্তে। পশ্চিম প্রান্তের বাগান এখনও রাষ্ট্রপতি ভবনের একাংশে রয়েছে আর এ বাগান সমেত সম্পূর্ণ ভাইসরয় হাউসের জন্য বরাদ্দ ছিল ৪১৮ জন মালী।

এডমিরাল লুই মাউন্টব্যাটেন ছিলেন ব্রিটিশ-ভারতের শেষ ভাইসরয় এবং ১৯৪৭-এর পর ডোমিনিয়ন ইন্ডিয়ার প্রথম গভর্নর জেনারেল। দ্বিতীয় এবং শেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন একজন ভারতীয় মিঃ সি রাজা গোপালাচারি (C. Rajagopalacheri)। তিনি মাউন্টব্যাটনের পর জুন ১, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ হতে ভারত রাজতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা পর্যন্ত, (জানুয়ারি ২৫, ১৯৫০) গভর্নর জেনারেল পদে বহাল থাকেন। রাজা গোপালাচারি ছিলেন ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। পেশায় আইনজীবী। তিনি একাধারে ভারতের স্বাধীনতা সেনানী, রাজনীতিবিদ, লেখক এবং একজন সফল স্টেটসম্যান ছিলেন।

ভাইসরয়ের জন্য নির্মিত হয়েছিল বিশাল এক শয়ন কক্ষ যা বর্তমানে আশোকা হল (রুম) নামে পরিচিত। যখন সি রাজা গোপালাচারি গভর্নর জেনারেল হয়ে এ ভবনে উঠেন তিনি তার সাধাসিধা জীবন বাদ দিতে চান নাই বলে তিনি বিশাল আকারের প্রধান শয়ন কক্ষকে আমন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় অতিথিদের ব্যাঙ্কোয়েট হল হিসেবে ব্যবহারের জন্য রেখে ছোট একটি রুমকে নিজের শয়নকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় রাষ্ট্রপতিরা অশোকা হলকে শয়ন কক্ষ হিসেবে কখনই ব্যবহার করেননি।

আগেই যেমন বলেছি ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবন দেখতে যাবার পূর্বে ইন্ডিয়া গেট হয়ে এসেছিলাম। ইন্ডিয়া গেট ভাইসরয় হাউজ নির্মাণের সময়কালে একই স্থপতি লুটিয়েন্স-এর নক্সায় নির্মিত হয়েছিল। এটি নির্মিত হয়েছিল ব্রিটিশ-ভারতের সময়ে আফগান যুদ্ধ হতে পরবর্তী অন্যান্য যুদ্ধে বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধসহ, প্রায় ৯০,০০০ মৃত সৈনিকদের স্মরণে। এর পূর্ব নাম ছিল Unknown Soldeirs' Tomb, বর্তমানে এর হিন্দি নাম 'অমর জোয়ান জ্যোতি'। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এই গেটের মাঝামাঝি জায়গায় বসানো হয়েছে 'শিখা চিরন্তন'। ইন্ডিয়া গেটে সর্বসময়ের জন্য নিযুক্ত থাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রহরী। ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারি সফরে আগত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা ফুলের অর্ঘ

www.pathagar.com

প্রদান করেন এই 'অমর জোয়ান জ্যোতি'তে। ৪২ মিটার উঁচু ইন্ডিয়াগেট দিল্লীর দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম।

আমরা 'লুটিয়েন্স-এর দিল্লী ছেড়ে অল্প সময়ের মধ্যেই নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস রোড থেকে বাঁয়ে মোড় নিয়ে 'চাঁদনী চক'-এর প্রধান সড়কে প্রবেশ করলাম। প্রচুর মানুষ আর গাড়ির ভিড়। দু'পাশে অগণিত দোকানপাট, চারদিকে হাঁকডাক আর ব্যস্ততা। এ যেন এক অন্য জগত। নতুন দিল্লী বলে পরিচিত পরিপাটি গোছানো শহর থেকে যারা প্রথমবার এখানে আসবেন এবং উপমহাদেশের কয়েক শত বছরের পুরাতন শহরের সাথে যাদের পরিচয় নেই তাদের জন্য এটা 'কালচারাল শক' (Cultural Shock) হতে পারে। অনেকটা আমাদের ঢাকার পুরাতন শহরের মত। এখানের গলিগুলোতে প্যাডেল রিক্সা আর টেম্পো চলে। ছোট ছোট অগণিত গলির মধ্যে বড় ট্রাকের প্রবেশের কোন সুযোগ নেই বললেই বলা যায়। আধুনিক ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ির জায়গা নেই। রয়েছে হাতে টানা গাড়িসহ অন্যান্য অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা। আগেই বহু বর্ণনায় যেমন বলেছি যে চাঁদনী চক' শাহজাহানাবাদ-এর প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল। এখনও পুরাতন দিল্লীর প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র 'চাঁদনী চক'।

এক সময় এই প্রধান সড়কের দু'পাশ দিয়ে ছিল সমান্তরাল দু'টি নহর (খাল), যেমনটা লুটিয়েন্স-এর দিল্লীর রাজপথ-এর দু'পাশে এখন দেখা যায়। সেগুলো রাস্তা চওড়া করতে গিয়ে ভরাট করা হয়। দুই নহরের মাঝখানে ছিল বিশাল 'তালাব' (বা পুকুর) তাও আজ নেই। পানি প্রবাহিত হত যমুনা নদী থেকে। পুকুরের উপর চাঁদনী রাতে চাঁদের আলো চিক চিক করে চোখ ঠিকরাতো বলে এর নাম রাখা হয়েছিল 'চাঁদনী চক'। এখন চাঁদের আলো নয়, শয়তানের পিঙ্গল চোখের মত জ্বলে পিঙ্গল রংয়ের সোডিয়াম বাতি।

এখনও দিল্লীর পাইকারি বাজারগুলোর অন্যতম বাজার এই 'চাঁদনী চক'। এমন কোন দ্রব্য নেই যা এ বাজারে পাওয়া যায় না। তবে প্রত্যেকটি দ্রব্যের রকম ভেদে নির্ধারিত রয়েছে এক একটি বাজার এলাকা। 'চাঁদনী চক' বহুবাজারের সমষ্টিগত বাণিজ্যিক এলাকা।

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা দোকান পাট ছাড়াও এখানে অসংখ্য মানুষের বাস। এসব বাসস্থান এ এলাকার গোড়াপত্তনের সময় হতেই তৈরি হয়েছে। এখানে রয়েছে বহু ঐতিহাসিক মহল যেগুলোর বেশির ভাগেই থাকতেন তৎকালীন সময়ের সমাজের উঁচু স্তরের ব্যক্তি এবং রাজ দরবারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হতে সাধারণ কর্মচারীরা পর্যন্ত। গলির ভেতরে বাসস্থান বা দালানগুলোর চেহারাই বলে দেয় এদের বয়স। তবে অনেক ঐতিহাসিক দালান বা ভবন এখন শুধু অতীতের সুখময় সে স্মৃতি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। 'চাঁদনী চক'-এ রয়েছে বেশ কয়েকটি মসজিদ, মন্দির আর গুরুদুয়ারা। বেশির

www.pathagar.com

ভাগই ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কিছু কিছু নতুন স্থাপনা রয়েছে তবে যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে রাখবার প্রচেষ্টায় এখানের ভবন আর পুরাতন ইমারত রক্ষায় বিশেষ আইন করে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে ভারত সরকার।

'চাঁদনী চক' বিভক্ত ছিল তিনটি ভাগে। এক : লাল কেল্লা -এর লাহোরী দরওয়াজা থেকে চক কোতোয়ালি, এ ভাগটিতেই ছিল সাধারণত ওই সময়কার উচ্চবিত্তদের বাজার। এখানেই বিখ্যাত উর্দু বাজার অবস্থিত। এখান হতে উর্দু ভাষার ব্যাপক প্রসার হয়েছে বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। কবি-সাহিত্যিক আর সংস্কৃতি সেবীদের আস্তানার নিদর্শন এখনও এখানে রয়েছে। মীর্জ গালীবের বাসস্থানও এখানেই ছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে চাঁদনী চক-এর অংশটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। এখানে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে স্বাধীনতাকামী বহু সিপাহীকে। প্রকাশ্যে ফাঁসিতে লটকানো হয়েছে স্বাধীনতাকামীদের। এসব লোকের বীরগাঁথা আজো এখানকার বাসিন্দাদের মুখে শোনা যায়।

দুই : চক কোতয়ালী; (পুলিশ থানা) কোতয়ালী হতে চাঁদনী চক-স্কয়ার, এখানে প্রধান নহর (কৃত্রিম খাল)-এর মাঝে বড় ধরনের পুকুরসম পানির আধার ছিল। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের জোৎস্নায় জীবন্ত হয়ে থাকত এ অঞ্চল। পরে এখানে তৈরি হয় একটি ঘণ্টাঘর; একটি মিনারে বড় ঘড়ি ছিল যা ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। এই জায়গার নাম ছিল 'জোহরী বাজার'; আজও ঐ নামে পরিচিত। এর কিছু দূরেই পাশের বাজারে কৃত্রিম বা ইমিটেশনের গহনা হতে সোনার গয়নার পাইকারি ও খুচরা বাজার রয়েছে।

তিন : 'চাঁদনী চক' হতে ফতেহপুরী মসজিদ। এখানে রয়েছে ঐতিহাসিক ফতেহপুরী মসজিদ। আর এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম মসলার পাইকারি বাজার খারি বাউলি।

চাঁদনী চক-এর আবাসনগুলো তিন স্তরে বিভক্ত ছিল। আজও ওই বিভক্তির নামেই পরিচিত।

প্রথম স্তর, হাভেলী (Haveli)—এগুলো দেয়ালে ঘেরা বড় আঙ্গিনাসহ ছোটখাটো প্রাসাদ। এ সবের মালিকরা ছিলেন উচ্চস্তরের নবাব অথবা সমাজপতি। বর্তমানে সবচাইতে বড় সংরক্ষিত হাভেলীটির নাম চুনিমল হাভেলী। এ রকম দু'একটি হাভেলী আমিও দেখতে গিয়েছিলাম।

দ্বিতীয় স্তর কুচা—এগুলো এক একটি মহল্লা যেখানে প্রায় একই পেশার মানুষ বাস করত।

তৃতীয় স্তর হল, 'কাটরা'। এখানে একই পেশার মানুষের বাস আর কর্মক্ষেত্র এই

www.pathagar.com

সাথে ছিল।

এটাই ছিল বস্তুত 'চাঁদনী চক' এখনও আছে-এর বিন্যাস যা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরলাম। আজও এগুলো এ নামেই পরিচিত।

আমরা এখন চাঁদনী চক-এর মাঝামাঝি জায়গায়। বাইরে তাপ যে বাড়ছে তা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ির ভিতর হতে বোঝা যাচ্ছিল। আমাদের গাড়ির চালক অতি সন্তর্পণে এগুতে এগুতে জানালেন যে চক-এর মাঝামাঝি কোথাও গাড়ি রাখতে হবে। আমি দু'পাশে দেখছিলাম হরেক রকমের হরেক বাহারের ছোট ছোট দোকান। রাস্তার দু'পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষগুলো, চলনে বলনে ব্যাপক ব্যস্ত বলে মনে হল। মূল রাস্তার দু'পাশে বহু গলি শাহজাহানাবাদ-এর বিভিন্ন মহল্লা বা কুচাতে চলে গেছে। সেসব গলিতে প্যাডেল রিকশা, বেবি ট্যাক্সি, ঠেলাগাড়ি, আর সাইকেলে ভর্তি। তবে কোথাও জ্যাম হতে দেখিনি। সার্বিকভাবে মনে হল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ভাবে তৈরি হয়েছিল শাহজাহানাবাদ। দিল্লীর প্রধান রেলস্টেশন এই পুরাতন দিল্লীতেই।

আমাদের আজকের চালক বিহারের বাসিন্দা জগদীশ কুমার যাদব। আমি তাকে হেসে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিহারের যাদবদের সাথে তার কি সম্পর্ক। হেসে জগদীশ জানালো যে, এক গোত্রের হলেও কোন আত্মীয়তা নেই। বিয়ে করেছে নয়া দিল্লীর অদূরে সারদানাতে। স্ত্রীও বিহারের কিন্তু প্রায় ৩০ বছর দিল্লীতেই কাটে। 'চাঁদনী চক' জগদীশের নখদর্পণে; অবশ্য তেমনটা আমার কাছে মনে হয়নি। সে জানালো গাড়ি রাখার উত্তম স্থান টাউন হলের সামনে। কারণ, অন্য কোন গলিতে গাড়ি ঢোকানো সম্ভব হবে না—আটকা পড়তে পারে। বর্তমানে টাউন হলের জায়গায় একসময় শাহাজাদী জাহানারার নির্মিত কারওয়া সরাই ছিল।

জগদীশের উপদেশ গলিতে রিকশাই হচ্ছে সবচাইতে নিরাপদ এবং দ্রুত বাহন। যেহেতু বেশির ভাগ রিকশাওয়ালাই স্থানীয় এবং বংশপরমম্পরায় এখানকার বাসিন্দা, সে কারণে তারা চাঁদনী চক-এর সব বাজার, হাভেলী, গলি 'কুচার' সাথে একান্তভাবে পরিচিত। আমাদের হাতের সময়ের মধ্যে ঘুরতে হলে রিকশা ছাড়া উপায় নেই। সময় তখন প্রায় এগারটা। দুপুরের খাবার পর্যন্ত আমরা এখানে কাটাবো। 'চাঁদনী চক' মোগলাই খাবারের জন্য ভারত বিখ্যাত। কাজেই দুপুরের খাবারটা এখানেই সেরে ফেলা যাবে। এ পরিকল্পনা মাথায় রেখে আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

আমরা আগেই সাব্যস্ত করেছিলাম যে, আমি আলাদাভাবে 'চাঁদনী চক', যতটুকু সম্ভব, দেখতে বের হব। তবে যে যেখানে থাকি না কেন বেলা ২টার মধ্যে টাউন হলে গাড়ির কাছে চলে আসব। আর তা ছাড়া মোবাইলের যুগে যোগাযোগ কোন বিরাট বিষয় নয়।

www.pathagar.com

আমি 'জোহরী বাজার'-এর গলির কিছু দূরে মিনহাজ আর আমার সহধর্মিণীকে এগিয়ে দিয়ে একটি রিকশা নিতে যে গলির সামনে দাঁড়ালাম সেটার নাম 'চিতলি কবর'। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গলির আশপাশে কোন খালি রিকশা পাচ্ছিলাম না। সমস্ত গলিতে যেমন মানুষের ঢল তেমনি রিকশা আর টেম্পুর আনাগোনা। রিকশাগুলো ঢাকার রিকশার মত তবে পিছনে প্রায় সোজা, কিছুটা খাড়া। ব্যালেন্সের জন্য পেছনে একটু বাড়ানো। এক সময় এখানে মানুষ টানা রিকশা ছিল এখন আর সেগুলো দেখা যায় না। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর একটা রিকশা পেলাম। হাতে ইশারা করতে দাঁড়াল। রিকশা চালকের বয়স আনুমানিক মধ্য তিরিশে, খোঁচা-খোঁচা দাড়ী আর মুখে পানের রেশ দেখা যাচ্ছে। বেশভুষায় কিছুটা কেতাদুরস্ত মনে হল। গায়ে একটি হাফ শার্ট, পরনে সুতির ট্রাউজার আর পায়ে পুরাতন একটি কেটস্। রিকশার হ্যান্ডেলের সামনে পানির বোতল রাখার দু'টি জায়গায় একটিতে ভরা এবং আরেকটিতে আধা বোতল পানি রাখা। আমার হাতেও একটা পানির বোতল, গলিতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কিনে নিয়েছিলাম।

রিকশা চালক আমার সামনে দাঁড়িয়ে শুদ্ধ উর্দুতে জিজ্ঞাসা করলেন, "জনাব কাহা জাইয়েগা"? তার উর্দু শুনে আমার মনে হল স্থানীয় একজন মুসলমান হবেন। কারণ, এখানকার মুসলমানরাই উর্দুর চর্চা করেন বেশি। পুরাতন দিল্লীতে, বিশেষ করে চাঁদনী চক-এ, বেশিরভাগ বাসিন্দাই মুসলমান তা আমার জানাই ছিল। আমার উর্দুটা একটু ঝালাই করে বললাম, "কোয়ি পারটিকুলার জায়গা নেহি এহি কুছ দেখনে লায়েক জাগা মে ঘুমনা চাহতে হ্যায়"। আমার উর্দু শুনে জিজ্ঞাসা করল আমি কোথা থেকে এসেছি। জানালাম বাংলাদেশ থেকে এসেছি। এবার লম্বা সালাম দিয়ে বলল, (উর্দুতে) "আসুন আপনি বলবেন আমি নিয়ে যাব আর না হয় আমি বলব এবং নিয়েও যাব তবে রিকশায় বসেই দেখে নিতে হবে। নামতে গেলে সময় লাগবে"। জিজ্ঞাসা করলাম কত নেবে? একগাল হেসে বললেন "যা আপনার মর্জি"। তারপরেও পীড়াপীড়ি করাতে বলল, "এক ঘণ্টার অধিক সময়ের জন্য ১০০ রূপী"। দরকষাকষির ছলে বললাম যে কমানো যায় কিনা? হেসে বললেন "৮০ রূপী দেবেন উঠে পড়ুন। উঠতেই বললেন; "আমি আপনার গাইড রিকশাওয়ালা"। পরিচিত হতে নাম জিজ্ঞাসা করলাম। জানালেন তার নাম আহমেদ গিয়াস উদ্দিন। প্রায় দশপুরুষ ধরে মোরীগেট এলাকায় তাদের বাস। বেশ কয়েকটি রিকশা আর ভ্যান গাড়ি আছে। তিন ভাই মিলে এ ব্যবসা করেন। মাঝে মধ্যে তিনি নিজে রিকশা চালান তবে যাত্রী তার মনমত না হলে নিতে চান না। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছেন আর অগ্রসর হননি। দু'ছেলে স্কুলে পড়ে; যথেষ্ট ইচ্ছা আছে তাদেরকে উচ্চ শিক্ষিত করবার। তবে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে সরকারি চাকরি পাবে কিনা তা নিয়ে তাঁর সন্দেহ রয়েছে। তাঁর তথ্য, এখানে বেশির ভাগ রিকশা আর ভ্যান চালক,

www.pathagar.com

রেস্তোরাঁর মালিক আর প্রায় তিরিশ ভাগ বড় দোকানের মালিক মুসলমান। বেশির ভাগ মুসলমান ছেলেরা পড়ালেখায় তেমন মনোযোগ দেয় না; ফটকাবাজারী ছাড়া বিশেষ কিছু করবারও নেই। তিনি আমাকে আরও বললেন যে' তাঁর বুজুর্গ (মুরুব্বী)-দের মুখে শুনেছেন এখানকার আদি মুসলমানদের অবস্থা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর হতে খারাপ হওয়া শুরু হয়ে তা দেড়শত বছর পরেও অব্যাহত রয়েছে। এখানকার বড় বড় হাভেলীর মালিকরা, যারা টিকে ছিল, তারা তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে বহু আগেই পাকিস্তানে চলে গেছেন। গিয়াসউদ্দিন বললেন,"মুসলমানদের এ অবস্থা হবে না কেন? যেদিন বাহাদুর শাহ জাফরকে শিখ পল্টন ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেদিন এখানকার ধনাঢ্য মুসলমানরা ইংরেজদের বাহবা দিয়েছিলেন। এমন কি মির্জা গালীবও ইংরেজদের সাথে মদ খেয়েছিলেন।'' তাঁর দাদার মুখে তিনি শৈশবে এসব শুনেছেন। তাঁর কথা শুনে আমি ভাবলাম তাঁর ১০০ রূপী চাইবার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে।

বহুদিন পরে রিকশায় চড়েছি। হাত দিয়ে দু'পাশ ধরেছিলাম যাতে ঝাঁকিতে পড়ে না যাই। পিছন ফিরে তাকিয়ে গিয়াসউদ্দিন আমাকে দু'পা রাখার জায়গা দেখিয়ে বললেন যে ওখানে পা রাখলে কোনভাবে পড়বার ভয় থাকে না। আমি আমাদের আলোচনা অব্যাহত রাখতে বললাম,"শিখ সৈনিকদের সহায়তার কারণেই সিপাহীরা মার খেয়েছিল। আর তা ছাড়া আওরঙ্গজেব তথা মোগলদের উপরে শিখদের আক্রোশ থাকার কারণেই দিল্লীর মসনদে মোগলরা থাকুক তা তারা তখন মনে প্রাণে চায়নি।'' তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন যে 'হয়ত আমি ঠিকই বলছি। কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার বললেন, "তবে গোড়াদের সাথে অনেক মুসলমান হাত মিলিয়েছিল, বিশেষ করে নওয়াব আর পয়সাওলারা।''

আমি গিয়াস উদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "শিখদের গুরুদুয়ারা শিসগঞ্জ সাহিব কত দূরে?'' গিয়াসউদ্দিন উত্তরে জানালেন যে চাঁদনী চক-এর প্রধান রাস্তার পাশে এবং ওখান দিয়ে আমি এসেছি। মনে পড়লো প্রধান রাস্তায় ঢুকতেই ওখানে একটা গুরুদুয়ারা চোখে পড়েছিল এবং বেশ কয়েকজন শিখকেও গুরুদোয়ার পাশে দেখেছি। আমি গিয়াস উদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ওই গুরুদুয়ারার ইতিহাস তিনি সে জানেন কিনা? মাথা নেড়ে বললেন "বহুত আচ্ছা তরা" (খুব ভালোভাবে)।

আওরঙ্গজেব শিখদের নবম গুরু তেগ সিং এবং তার কয়েকজন অনুসারীদের শিখ ধর্ম প্রচার এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের, বিশেষ করে নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের, শিখধর্ম অনুসরণ করতে উৎসাহিত করবার অভিযোগে আগ্রাতে গ্রেফতার করে দিল্লীতে প্রধান কাজীর কাছে বিচারের জন্য পাঠান। কাজী আব্দুল ওয়াহাব গুরু তেগ সিং এবং তার অনুসারীদের তওবা করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের শর্ত দিলে শিখ গুরু রাজি হননি। তাকে এবং তার অনুসারীদের সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে মৃত্যু দণ্ড দেয়া হয়। নির্দেশ দেয়া

www.pathagar.com

হয় যে শিরশ্ছেদ করবার পর তিনদিন কোতওয়ালীর সামনে মৃতদেহ জনগণের দেখবার জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে।

১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে গুরুর শিরশ্ছেদ করে তার এবং তার কয়েকজন অনুসারীদের মরদেহ কোতওয়ালীর আঙ্গিনায় ফেলে রাখা হয়। পরে রাতের অন্ধকারে আঙ্গিনা পরিষ্কার করবার বাহানায় নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে শিখ ধর্মে দীক্ষিত হওয়া অনুসারীরা গুরুর বিচ্ছিন্ন মাথা আর শরীরের অংশ সরিয়ে, শরীরের বাকি অংশ এক অনুসারীর বাড়িতে নিয়ে এসে পুরো বাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে গুরু তেগ সিং-এর বিচ্ছিন্ন মাথা আরেক অনুসারী, ভাই জাইটা (Bhai Jaita), আনন্দপুরা সাহেব নামক স্থানে গুরুর ছেলের হাতে তুলে দিলে তার মাথা আলাদাভাবে পুড়িয়ে সৎকার করা হয়। গুরুর ছেলে, গোবিন্দ রাম পাল, গুরু গোবিন্দ সিং নামে শিখদের দশম গুরু নির্বাচিত হয়েছিলেন। যেখানে গুরু তেগ সিংকে হত্যা করা হয়েছিল 'শাহজাহানাবাদ'-এর ওই জায়গাতেই একটি গুরুদুয়ারা তৈরি করা হয়। আর যেখানে মাথার সৎকার করা হয়েছিল সেখানে আরেকটি গুরুদুয়ারাও তৈরি করা হয়েছিল। সেটি গুরুদুয়ারা রিকাব সঞ্জও সাহিব নামে পরিচিত। যেখানে শরীরসহ বাড়ি পোড়ানো হয়েছিল সেটি গুরুদুয়ারা শিসগঞ্জ সাহিব। আমি গিয়াস উদ্দিনকে বললাম, "গুরু তেগ সিং-এর এ ধরনের অমানবিক শাস্তির পর ওই সময়ের এবং পরের সময়ের শিখদের মনে ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক কিনা?" তিনি পিছনে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়েস স্যার' কিন্তু আমি নবাবদের আর হাভেলীওয়ালাদের কখনই মাফ করতে পারব না।" আমি আর কথা বাড়ালাম না।'

গিয়াস উদ্দিনকে 'লালকুয়া বাজার' (Lal Kuan) এবং তুর্গমানগেট এরিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি দু'হাতে কান ধরে বললেন, "স্যার আমাকে ওদিকে যেতে বলবেন না।" আমি আশ্বস্ত করে বললাম যে আমার সেখানে যাবার ইচ্ছা নেই তবে তাঁর কাছে জানতে চাইলাম যে কেন তিনি যাবেন না? তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি ওই জায়গা সম্পর্কে কতটুকু জানি। তেমন কিছু নয়– যতটুকু আমি খুসবন্ত সিং-এর বই পড়ে আন্দাজ করেছি বলে উত্তর দিলাম। খুসবন্ত সিং-এর নাম শুনে তিনি একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন যে তার বই উর্দুতেও ভাষান্তরিত হয়েছে। তিনি শুনেছেন যে ওই বইতে মুসলমানদের নিচু দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি তাকে শান্ত করতে বললাম "কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোত সত্য"। "হ্যাঁ, সত্য তবে ভাল দিকও আছে"। তার যুক্তি আমি খণ্ডন করতে যাইনি। সংক্ষেপে বললাম যে লেখকের কলম স্বাধীনতা আছে সেটা যেদিকেই যাক না কেন।" আর একটু যোগ করে বললাম, "লেখকের মতামত দেয়ার অধিকারও আছে।"

লাল কুয়া বাজার হিজড়া সম্প্রদায়ের বাস বলে খ্যাত। এদের এ বসতি আজকের

www.pathagar.com

নয়। হিন্দুস্থানের মুসলিম রাজত্বকালে হিজড়াদের যত প্রাধান্য দেয়া হয়েছে তত প্রাধান্য আর কখনও দেয়া হয়নি। সালতানাত আর মোগল হারেমের গার্ড হিসেবে এদের নিয়োগ করা হত। এদের অনেকেই অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। বিভিন্ন সময়ে এঁদের অনেকের সাথে হেরেমের, এমনকি শাসকদেরও অবৈধ অনৈতিক সম্পর্কের কথা জানা যায়। আমরা মালিক কাফুর সম্পর্কে আগেই জেনেছি। সেই দিন আর এখন নেই। রাস্তায় রাস্তায় বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে টাকা পয়সা চাওয়া আর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচ গান করে জীবিকা উপার্জনই এখন এঁদের প্রধান ব্যবসা। অনেকে অনৈতিক পথেও অর্থ উপার্জন করেন। উপমহাদেশে কত হিজড়া রয়েছে তার পরিসংখ্যান হয়ত নেই। তবে স্বীকার্য যে হিজড়ারা বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতেও সবচাইতে অবহেলিত। মানবাধিকার বোধ হয় এঁদের জন্য প্রযোজ্য নয়। বর্তমানে হিজড়াদের সবাই এড়িয়ে যেতে চায়—যে কারণে রিকশা চালক গিয়াসউদ্দিনও অমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন।

ভারতে অসংখ্য হিজড়া সম্প্রদায়ের বাস। বোধ করি বিশ্বের কোন দেশে এত হিজড়া নেই। এরা কারা কীই বা এদের অতীত এ সম্বন্ধে আমি তেমন একটা জানতে পারিনি; তবে হিজড়া সম্প্রদায় প্রাচীন গ্রীসেও ছিল। ছিল মধ্য এশিয়াতেও। অনেক হিজড়া মঙ্গোল এবং তুর্কিদের সাথে হিন্দুস্থানে এসে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। হিন্দুস্থানে হিন্দুরা হিজড়াদের মোটেও ভাল চোখে দেখতেন না এখনও দেখেননা। তবে হিন্দুস্থানে মুসলিম শাসন প্রবর্তনের পর এদের বেশির ভাগ ধর্মান্তর করে ক্রমেই জায়গা করে নেন সুলতান, সম্রাট এবং বেগমদের প্রাসাদ রক্ষী এমনকি দেহরক্ষী ও ব্যক্তিগত খেদমতগার হিসেবে। ওই সময়ে বেশির ভাগ হিজড়াই পুরুষের পোশাক, এমনকি দাড়ি গোঁফও রাখতেন। এঁদের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহসী ভূমিকা রেখেছেন। সম্রাট আকবরের দেহরক্ষীদের বেশির ভাগই ছিলেন হিজড়া। আলাউদ্দিন খিলজির অন্যতম সেনাপতির পদে মালিক কাফুর রীতিমত ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন। মালিক কাফুরের সাথে খিলজির ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছাড়াও বহু যুদ্ধে তিনি সার্থক নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। ইতিহাসে তাঁর কীর্তি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

বর্তমানে হিজড়াদের বেশভুষা আগের মত নেই। কারণ, সামাজিক পরিবর্তন। এখন হিজড়ারা অপাংক্তেয়। এঁরা এখন মহিলাদের সাজেই থাকতে ভালবাসেন এবং আগ্রহী। এ সাজেই তাদের অনেকে নানা ধরনের অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন। গালি-গালাজ আর অশ্রাব্য ভাষার ভয়ে রাস্তাঘাটে টাকা পয়সা দাবি করলে ভদ্রলোকেরা কিছু দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। ভারতের বড় বড় শহরে রাস্তার ট্রাফিক বাতির ধারে কাছেই এদের দেখা মেলে। আমি দিল্লীর রাস্তায় দেখেছি কিভাবে এঁরা মানুষজনকে উত্যক্ত করে অর্থ আদায় করে। তারপরেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মধ্যবিত্ত হতে

www.pathagar.com

উচ্চবিত্তদের বিয়ে অথবা সন্তানদের জন্মের খবর পেলেই মোটা অংক আদায়ের বিনিময়ে এরা নাচ আর গানে ওই বাড়িকে মুখরিত করে তোলেন। অনেকে কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে নবজাতকের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য এদের দ্বারা ঝাড় ফুঁকও করিয়ে থাকেন। এমনি বর্তমানে হিজড়াদের জীবন। এঁদের মধ্যে অনেকে ইচ্ছা করেই হিজড়ার দলে যোগ দেন বলে শোনা যায়। যোগ দিতে গোপন অংগ হানিও করতে হয়। হিজড়াদের জীবন নিয়ে একবার চিন্তা করলে মন ভারাক্রান্ত হওয়া ছাড়া আর কিছু করবার থাকে না।

গিয়াসউদ্দিন খুসবন্ত সিং-এর প্রসঙ্গ বেশিদূর না টেনে তুর্কমান গেট এরিয়াতে আমাকে নিয়ে যেতে অনাগ্রহের প্রধান কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি আমাকে বললেন, "স্যার আমি আপনাকে নিয়ে যেতে চাইনি। কারণ জায়গাটা বেশ দূরে এবং আপনাকে নিয়ে গেলে আপনিই অস্বস্তির মধ্যে পড়তেন। ওখানে গেলে টাকা পয়সার জন্যে হিজড়ারা এমনভাবে পীড়াপীড়ি করে যে বিব্রত হতে হয়। এ সব আমার একেবারেই অপছন্দনীয়।" আমি তাকে হিজড়াদের জন্মোৎস সম্বন্ধে কতখানি ওয়াকেবহাল জানতে চাইলে সে বলল "শুনেছি পুরানো দিনে রাজা বাদশাহদের উপপত্নী বা বাঈজীদের ঘরে জন্ম নেয়া পুরুষ সন্তানদের নপুংশক করে হিজড়া তৈরি করা হতো। এখন অবশ্য বহুবিধ কারণে হিজড়াদের দলে যোগ দিয়ে থাকে।" বিষয়টি বিতর্কিত এবং আমার জন্যে একেবারে অজানা তাই চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

যাই হোক আমি সময়ের অভাবে আর জনাব গিয়াসউদ্দিনের অনাগ্রহের কারণে শাহজাহানাবাদ-এর হিজড়া প্রধান অঞ্চল তুর্কমান গেট, হাউজ কাজী আর লাল কুয়ার এলাকা পর্যন্ত যেতে পারি নাই। সে দুঃখ থেকে গেল।

গিয়াসউদ্দিন দূরে জামে মসজিদ দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে মসজিদটি আমি দেখেছি কিনা? আমি সেখানে নামাজ পড়ছি তাও জানালাম। আগেই তিনি আমার নাম জেনেছেন তবে আমার পরিচয় মাত্র একজন পর্যটক। জিজ্ঞাসা করলেন আমি ফতেহপুরী মসজিদ দেখেছি কিনা? আমি দেখিনি তবে নাম শুনেছি বলে তাঁকে জানালাম। গিয়াসউদ্দিন আমাকে ফতেহপুরী মসজিদ দেখাবার জন্য কয়েকটি অলিগলি ঘুরে চার্চ মিশন মার্গ হয়ে চাঁদনী চক আর খারি বাউলি রোডের মাথায় নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে বললেন যে, খারি বাউলি বাজার তার মতে, এশিয়ার বৃহত্তম মসলা বাজার আজকের থেকে নয় শাহজাহানাবাদ পত্তন হবার সময় হতে। এখানে 'বানিয়া' এবং মাড়ওয়াড়ি সম্প্রদায় এ বাজারের সবচাইতে বড় ব্যবসায়ী গোত্রদ্বয়। আমি চুক্তি ভঙ্গ করে নামতে চাইলে তিনি স্মিত হেসে তাড়াতাড়ি ফিরতে বললেন। ফতেহপুরী মসজিদের ইতিহাস গিয়াসউদ্দিন আমাকে এখানে আনার পথে কয়েক মিনিটে বলেছিলেন যদিও আমি আগে শুনেছি তবুও চুপচাপ শুনেছিলাম। আমি এখান থেকে

www.pathagar.com

কিছু শুকনা ফল আর বাদাম কিনব বলেই নেমেছিলাম। একটু সামনে যেতে বহু মসলার দোকান আর তার পাশে শুকনো ফলের দোকান পেলাম। বাজারের মধ্যে একটি গেট। গেটটি ফতেহপুরী মসজিদের।

ফতেহপুরী মসজিদের অবস্থান এই বাজারের মধ্যেই। ভিতরে বেশ বড় মসজিদ। চারপাশে এখন প্রচুর দোকান। মসজিদে নামাজ পড়বার জায়গাটির সামনে বড় ধরনের চত্বর এবং অজু করবার জায়গা রয়েছে। এ মসজিদটি ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে স্বউদ্যোগে নিজের জায়গায় বানিয়েছিলেন সম্রাট শাহজাহানের হেরমের এক রক্ষিতা (কানিজ) যার নাম ছিল ফতেহপুরী বেগম। পরে তাঁকে বেগমের মর্যাদা দেয়া হয়।[১]

এ মহিলার বাড়ি ছিল ফতেহপুর। তাজমহল-এর নিকট এ নামে আরেকটি মসজিদ রয়েছে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এ মসজিদটি সিপাহীরা অস্ত্র গোলা-বারুদ লুকাবার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করেছিল বলে 'চাদনী চক'-এর আরও কয়েকটি মসজিদের মত এটিকেও কোম্পানি ভেঙে ফেলবার পরিকল্পনা করেছিল। পরে মসজিদসহ জায়গাটি লালারাই চুনিমল নামক এক বেনিয়ার নিকট, ওই সময়কার ১৯,০০০ রুপীতে বিক্রি করে।[২] চুনিমল মসজিদটি অক্ষত রেখেছিলেন। পরে ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশরাজ সরকার চুনিমলকে দিল্লীর অদূরে চারটি গ্রামের বদলে মসজিদটি পুনঃগ্রহণ করে মুসলমানদের ফিরিয়ে দেয়।[৩] এখন এখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজসহ জুমার ও ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এমনি আরেকটি বড় মসজিদ ছিল আকবরাবাদী বেগম মসজিদ যেটি ওই সময়েই ভেঙে ফেলা হয়েছিল।

আকবরাবাদী বেগমও পরে শাহজাহানের তৃতীয় বেগমের মর্যাদা পান। আমি রিকশায় ফিরে গিয়ে লালা রাই চুনিমলের কথা জিজ্ঞেস করলে গিয়াসউদ্দিন জানালেন আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে 'হাভেলী' দূরে আছে; তবে ওই হাভেলীটি এখনও খুবই ভালভাবে রক্ষিত আছে। কারণ, 'চাদনী চক' এ চুনিমলের বংশধরদের প্রচুর ব্যবসা রয়েছে। এখন তারা ভারতের অন্যতম ধনী। অবশ্য চুনিমল তখনও ধনী ছিলেন।[৪]

চুনিমলের হাভেলী এখান থেকে একটু দূরেই ছিল। তার প্রধান ব্যবসা ছিল ব্রোকেড-এর। এক সময় মহিলাদের প্রথম পছন্দ ছিল ব্রোকেড-এর কাপড়। ১৮৫৭

---

১. *Shoma Mukharjee, "Royal Mughul Ladies and their Contributions; Syan Books, Delhi.*
২. *R. Nath, 'History of Mughul Archtiecture, Avinab Publications*
৩. *Ibid*
৪. *Vijay goel, Delhi; the Emberor's city; Resdiscovering Chadni Chawk and its Environment. Delhi*

www.pathagar.com

খ্রিস্টাব্দে চুনিমল সুযোগ নিয়েছিল ইংরেজদের সহযোগিতা করে। ১৮৫৭ তে যখন সিপাহী বাহিনী দিল্লী দখল করে প্রথমে মির্জা মোগল এবং পরে বখত খাঁ-এর নেতৃত্বে কোম্পানির বাহিনীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছিল তখন লালা রাই চুনিমল সহ ওই সময়কার ধনী বানিয়া, মাড়ওয়াড়িসহ অন্যান্যরা সিপাহী বাহিনী তথা বাহাদুর শাহ জাফরকে কোনভাবেই সহযোগিতা করেন নি। এর মধ্যে চুনিমল ছিলেন ওই সময়কার সবচাইতে ধনী ব্যক্তি যিনি প্রথম পর্যায়ে সিপাহীদের হাতে নিগৃহীতও হয়েছিলেন। সে কারণেই তিনি বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিলেন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর পৌরসভা গঠিত হলে তাকে প্রথম কমিশনার পদ দেয়া হয়। চুনিমল দিল্লীর প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি প্রথম মটরকারের মালিক হয়েছিলেন এবং প্রথম টেলিফোন ব্যবহার করেন। চুনিমলের হাভেলী তৈরি হয় ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমানে তাঁর দশম প্রজন্মের প্রধান, অনীল প্রসাদ, হাভেলীর একাংশ উৎসুক পর্যটকদের জন্য খুলে দিয়েছেন। এ হাভেলীর পাশে প্রায় ১৪০টি বড় দোকানের মালিক চুনিমলের বংশধরেরা। এখনও ব্রোকেড এবং জরির ব্যবসার প্রধান প্রাণকেন্দ্র ওই অঞ্চল।

আমি এতক্ষণ পরে হাতের ঘড়ির দিকে তাকালাম। বেলা প্রায় একটার কাছাকাছি; হাতে এখনও সময় আছে। আমি হাতের পোটলাগুলো রিকশায় রেখে মোবাইলে মিনহাজ-এর অবস্থান জেনে নিলাম। তারা জোহরী বাজার ছেড়ে পাশের শাড়ি আর লেহেঙ্গার গলিতে দোকানের পসরা দেখতে ব্যস্ত।

আমি খারিবাউলিতে বাজার শেষ করে রিকশায় উঠে গিয়াসউদ্দিনকে 'চাওড়া বাজারের' কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বেশ কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাকে দেখে বললেন, "স্যার এটা তো বড় রাস্তার ধারে বড় বাজারে; তবে বাদশাহী আর নবাবী আমলের ওই জৌলুস আর রূপের হাট এখন নেই। এখন এ এলাকায় কিছু কিছু ঘর পতিতা পল্লী থাকলেও ইতিহাস বিখ্যাত বাঈজীরা আর নেই। তবে এখনও রাতে গান বাজনা হয়।" আমি হেসে বললাম, "মোগলদের সময় এখান থেকে বাঈজীরা দরবারে, রংমহলে এবং শীষমহলে নাচ আর গান পরিবেশনা করতো। এদের অনেকেই পিতৃ-পরিচয়হীনা হয়েও ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছিলেন।" এ কথা শেষ করে আমি তাকে বেগম সমরু বা বেগম সোম্বার (Begum Sombre)-এর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বেশ কিছুটা জানে। বেগম সমরুর হাভেলী এখন খুবই দৈন্য অবস্থায়; প্রায় না থাকার মতই বলে জানালো। ওই হাভেলী এখনও দেখার মত আছে কি নাই সে বলতে পারে না, তবে সেখানে ইলেক্ট্রনিক্সের বাজার এবং কেল্লার ধারে তা তিনি আমাকে জানালেন। গিয়াস জানেন যে বেগম সমরুর মা এ অঞ্চলের ওই সময়ের মোগল হারেমের নামকরা বাঈজী ছিলেন। তার মেয়ে জেবুন্নেছা বা ফারজানা প্রথমে মুসলমান ছিলেন পরে ফিরিঙ্গি বিয়ে করেছিলেন।

www.pathagar.com

বেগম সমরুর বা সোম্বার-এর রঙ্গিন এবং ঐতিহাসিক উপাখ্যানের পটভূমি 'চাঁদনী চক' এবং ইংরেজদের বাংলা-বিহার উড়িষ্যা দখল করবার পূর্বে দিল্লীর মোগল সম্রাট শাহ আলম-এর শাসনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত।

বেগম সমরু ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি কত ধনী ছিলেন তা নির্ণয় করা কঠিন ছিল। ১৯২৩ খৃস্টাব্দে তাঁর বংশধরদের কাছে বেগম সমরুর যে সম্পত্তি ছিল তার মূল্যমান ছিল ৫৫.৫ মিলিয়ন ডয়েস মার্ক; তা বেড়ে গিয়ে ১৯৫৩ তে দাঁড়িয়েছিল ১৮ বিলিয়ন ডয়েস মার্ক। তবে তার এ সম্পত্তি নিয়ে বংশধরদের মধ্যে এখনও বিবাদ আর মামলা অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। সমরুর উপাখ্যান যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি মোহময়ী।

বেগম সমরু, আসল পরিচিতি বেগম রেইনহার্ড সোম্বার। সোম্বার নামটিই ছোট হয়ে সমরু হয়েছে। বেগম সমরুর উত্থান বেশ নাটকীয়। নাবালিকা অবস্থায় তাঁর মা মারা যান। তাঁর পিতৃপরিচয় কুয়াশাচ্ছন্ন। অনেকে মনে করেন তার গায়ে মোগলদের রক্ত রয়েছে, আরো অনেকে আরব ব্যবসায়ী লতিফ খানকে বেগম সমরু ওরফে জেবুন্নেছা ওরফে ফারজানা ওরফে জোয়ান্না-এর পিতা বলে উল্লেখ করেন। পিতৃ পরিচয় যাই থাকুক না কেন এই ছোটখাটো অথচ অপরূপ সুন্দরী মহিলা ওই সময়ে দিল্লীর আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন।

মাকে হারানো ছয় বছরের মেয়ে জেবুন্নেছা ওরফে ফরজানাকে ক্রীতদাসী হিসেবে বাজার থেকে কিনে নেন এক জার্মান-ফ্রেঞ্চ নেভির কর্মকর্তা, ওয়ালটার রেইনহার্ড। রেইনহার্ড পরে ফ্রেঞ্চ নেভি থেকে পালিয়ে গিয়ে হিন্দুস্থানে ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে পরিচিত হন। তিনি ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রেঞ্চ নেভির সাথে পন্ডিচেরীতে এসেছিলেন। ওয়ালটার রেইনহার্ড নিজের বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন এবং ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে কর্নাটকের নবাব, ওই সময়কার বাংলার নবাব এবং শিখ, জাঠ ও মারাঠা প্রত্যেকের জন্য যুদ্ধ করেন।

ওয়ালটার রেইনহার্ড ওই সময়ে রোহিলাদের বিরুদ্ধে মোগল বাদশাহ শাহ আলমকে সহযোগিতা করেছিলেন বলে সম্রাট শাহ আলম তাকে মোজাফফর নগর হতে যমুনার পূর্ব পাড়ে সারদানা পর্যন্ত জমিদারি দিয়েছিলেন। এই জমিদারি পাবার পর হতে ওয়ালটার রেইনহার্ড ছোটখাট রাজত্ব গড়ে তোলেন। দিল্লীর সন্নিকটে হওয়ায় শাহজাহানবাদ-এ অনেক জায়গাও কিনে নেন। ওয়ালটার রেইনহার্ডের হেরেমে বড় হয়ে উঠা বেগম সমরুকে বিয়ে করেছিলেন কিনা তাও খুব পরিষ্কার নয়। কারণ, ওয়ালটার পূর্বেই একজন মুসলিম রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। রেইনহার্ড ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে মে, ৪, ১৭৭৪ এ মারা গেলে বেগম সমরু জোয়ান্না নামে ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হন এবং তথাকথিত স্বামীর ভাড়াটে সৈনিকদের নেতৃত্ব নিজ হাতে

www.pathagar.com

নিয়ে নেন। নিজে ভারতীয় হবার সুবাদে ভারতীয় সৈনিক সদস্যদের আনুগত্য পেতে কোন অসুবিধে হয়নি। বেগম সাহেবা শুধু সৈনিক পরিচালনাই করেননি তিনি নিজেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। পরে তিনি অল্প সময়ের জন্য একজন ফ্রেঞ্চ কর্মকর্তাকে বিয়েও করেছিলেন। একটি ছেলে সন্তানকে, ডেভিড ওচারলোনি ডাইস সোম্বার নামে, দত্তক নিয়েছিলেন। তার এ সন্তান ইংরেজ বিবি রেখে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে মারা গেলে তার সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। এই সন্তানই বেগম সমরুর সম্পত্তির দাবিদার ছিলেন।

যাই হোক, বেগম সমরু-জোয়ান্না বহু সময়ে সম্রাট শাহ আলমের পক্ষ হয়ে অনেক জায়গায় বিদ্রোহ দমনে সম্রাটকে সাহায্য করেছেন। রহিলা বিদ্রোহী গোলাম কাদিরের বিরুদ্ধে তিনি নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। শাহ আলমকে বিপদ থেকে রক্ষা করায় সম্রাট শাহ আলম তাকে নিজের মেয়ে হিসেবে আখ্যায়িত করে 'জেবুন্নেছা' উপাধিতে ভূষিত করেন। রেইনহার্ডের জাগির বা জমিদারি বেগমের নামে পুনঃবরাদ্দ দেয়া হয়। সারদানাতে বেগম জোয়ান্না-জেবুন্নেছা নির্মিত একটি গীর্জা এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। এ গীর্জার সামনেই বেগম সমরুকে সমাধিস্থ করা হয়েছে এবং সারদানার মহলটিতে এখন একটি কলেজ স্থাপিত রয়েছে। এই মহিলা ৯০ বছর বয়সে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড, জার্মানী আর হিন্দুস্থানে প্রচুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রেখে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উত্তরসূরীদের বর্তমান সম্পত্তির হিসাব আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি।

বর্তমানে ধ্বংসপ্রায় অযত্নে রক্ষিত 'চাদনী চক'-এর 'সমরু হাভেলী' ভাগিরথ প্যালেস নাম পরিচিত এশিয়ার বৃহত্তম বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের বাজারের ভেতরে রয়েছে। জায়গাটি দিল্লীর লাল কেল্লার বিপরীতে। ইতিহাসের কোন কোন সন্ধিক্ষণ বহু সাধারণ মানুষকে অসাধারণ হতে সুযোগ এনে দেয়। অনেকে সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারে আবার অনেকে পারে না। অখ্যাত এক বাঈজীর অখ্যাত এক ছোট মেয়ে ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের সুযোগের ব্যবহারে শুধু ইতিহাসেই নয়, বহু জনহিতকর কাজে নাম লিখিয়েছিলেন।

শুধু ওয়াল্টার রেইনহার্ড-ই নয় ষোড়শ' সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু ইউরোপিয়ান কোম্পানির কর্মকর্তা, কর্মচারী আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাদা চামড়ার সৈনিকেরা দল ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মোগল এবং দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তারা প্রত্যেকেই খৎনা করে পুরোপুরি ইসলামি কায়দায় জীবন-যাপন করেছেন। এদের অনেকেই মোগল এবং সুলতানদের দরবারে বেশ উচ্চ পদে আসীনও হয়েছিলেন। যারাই ধর্মান্তর করেছেন তাদের বেশির ভাগই তৎকালীন হিন্দুস্থানের অর্থবৈভব আর ঐশ্বর্যের মোহে তা করেছেন আবার অনেকে স্থানীয় মুসলমান মহিলাদের প্রেম ও বিয়ে

www.pathagar.com

করবার কারণে ধর্মান্তরিত হয়ে স্বগোত্র এবং স্বদেশ ত্যাগ করে হিন্দুস্থানে রয়ে গিয়েছিলেন।

শুধু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা, কর্মচারী অথবা সৈনিকরাই নয় এদের কাতারে যোগ দিয়েছিলেন ফরাসি, ওলন্দাজ এবং পতুগীজসহ অন্যান্য বহু ইউরোপীয় দেশের নাগরিক। উল্লেখ্য যে, এসব দেশ ওই সময়ে প্রাথমিকভাবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করে হিন্দুস্থানের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলে উপনিবেশ গড়বার প্রয়াসে ছিল। বহু সংখ্যক ইউরোপিয়ান সৈনিক ধর্মান্তরিত হয়ে মোগল বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন যাদের জন্য তৎকালীন দিল্লীর শহরতলীতে 'ফিরিঙ্গি পুরা' (Firingi Pura) নামে বসত তৈরি করে দেয়া হয়েছিল। এসব সৈনিকের এক সময়ের কমান্ডারই ছিলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ফরাসি সৈনিক ফরাসিস্ খান।[৫] ফরাসিস্ খান শুধু ইতিহাসে জায়গা করে নেননি বরং তিনি হয়ে উঠেন মোগল সাম্রাজ্যের অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। সময়টি ছিল মোগলদের স্বর্ণযুগ বলে কথিত সম্রাট শাহজাহান-এর এবং তাঁর পিতা সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর শাসনকাল। ফরাসিস্ খান মোগল বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন ১৬৪০-৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এসব কাহিনী সাধারণ ইতিহাসে তেমন উল্লেখিত না হলেও ইদানিং বহু ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক এসব তথ্য উদঘাটন করে ইতিহাস এমনকি বহু রোমান্টিক উপন্যাসও রচনা করেছেন।

ওই সময় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং সুরাটসহ হিন্দুস্থানের অন্যান্য জায়গায় কোম্পানির ব্রিটিশ নাগরিকদের স্বপক্ষ ত্যাগের খবর লন্ডনে রাজা দ্বিতীয় চালর্সকে এমনই উদ্বিগ্ন করেছিল যে, তিনি ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে রাজকীয় ফরমান জারি করে এসব স্বপক্ষ ত্যাগীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে নিজ দেশে ফিরে আসতে আদেশ দিয়েও কোন ফল পাননি। যারা স্বপক্ষ ত্যাগ করে হিন্দুস্থানের সমাজের সাথে মিশে গিয়ে নিজের দেশের মায়া ত্যাগ করে থেকে গিয়েছিলেন তাদের বংশধররা পরে অনেকেই ইংল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশেও ফিরে গিয়েছিলেন, তবে বেশিরভাগ বংশধরেরা এখনও উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশে অথবা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন এরাই এঙ্গলো-ইন্ডিয়ান বলে পরিচিত। এর বিশদ বিবরণ হালে গবেষণাকৃত বহু বইতে লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৬] আমি যে ভাড়াটে সৈনিক ওয়াল্টার রেইনহার্ডের আলোচনা করেছি তাকে ধর্মান্তরিত হতে হয়নি। কারণ, ওই সময়ে এক দিকে যেমন মোগলদের শক্তি ক্ষয় হয়ে আসছিল অন্যদিকে হিন্দুস্থানে ইউরোপীয় শক্তি বাড়ছিল। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলস্লি এঙ্গলো-

---

৫। *S.Inayat A. Zaidi, 'French Mercenaries in the Armies of south Asian states 1499-1803' p.p 51-78 (Delhi-1990)*

৬। *William Dalrymple "White Mughals," pp.14-16, Penguin Books India (Pvt) Ltd.*

www.pathagar.com

ইন্ডিয়ানদের সামাজিক স্বীকৃতি দেবার উপরে যে কঠিন বাধ্য-বাধকতা প্রবর্তন করেছিলেন, তারই প্রেক্ষিতে উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের স্বপক্ষ ত্যাগ, হিন্দুস্থানী নারীদের পাণি গ্রহণ এবং ধর্মান্তর কমে আসে।

আমি আমার রিকশাচালক বন্ধু, শাহজাহানের আমলের কোতওয়ালের রোজনামচা লেখকের দশম অথবা বারতম বংশধর, আহমেদ গিয়াসউদ্দিনকে সংক্ষেপে বেগম সমরুর উপাখ্যান শুনানো শেষ করে যখন 'চারখাওয়ালা গলি' আর 'চাঁদনী চক'-এর প্রধান সড়কের সংযোগস্থলে তখন মিনহাজ মোবাইলে জানালো যে তাঁরা গাড়িতে বসে আমার অপেক্ষায়। এখানেই কোন রেস্তোরাঁতে খেতে যাবেন। আমি মোড়ে নামলাম। বাকি পথটুকু হেঁটে যেতে হবে; কারণ প্রধান সড়কে রিকশা নিষিদ্ধ। নেমে ১০০ রুপীর সাথে আর ২০ রুপী আহমেদ গিয়াসউদ্দিনকে দিলে কিছুটা ইতস্তত করে বাড়তি টাকাগুলো পকেটস্থ করে বললেন, "আপনার সময় থাকলে আমি এ টাকাতেই আপনাকে ৫৬ রাস্তা, অগণিত গলি আর ৩৬ বাজার ঘুরাতাম। এ জায়গা, শাহজাহানাবাদ-এর এক একটি গলির আর বাজারের বিচিত্র ইতিহাস রয়েছে স্যার।" আমি বললাম "জনাব ফির কভি"। গিয়াসউদ্দিন লম্বা ছালাম দিয়ে চলে গেলেন।

আমি প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে হেঁটেই টাউন হলের গাড়ির পার্কের দিকে অগ্রসর হলাম। আমার ঘড়িতে তখন বেলা আড়াইটা। দিল্লীর তাপমাত্রা ৪৪°।

আমরা দুপুরের খাবার কোথায় খাব তা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ গবেষণা করলাম। করিমস্-এ দু'দিন খেয়েছি। নিযামউদ্দিন ইস্ট-এ একদিন খেয়েছি, যদিও করিমস্ একটু ঘুরে যেতে হবে তবুও একই জায়গায় না খেয়ে আজ অন্য জায়গায় খাবার কথা ভাবছিলাম। তার উপরে আমাদের চালক মিঃ যাদব জামে মসজিদের ভিড়ের মধ্য যেতে চাইছিলেন না। আমিও সময় বাঁচাতে ধারে কাছেই কোথাও খাবার পক্ষে ছিলাম। 'চাঁদনী চক'-এর পরাটা খুব বিখ্যাত বলে শুনেছি। এখানে একটি গলির নামই 'পরাটাওয়ালি গলি'। যারা হালের 'বলিউডের' অক্ষয় কুমার আর দিপীকা পদকুর্নী অভিনীত 'চাঁদনী চক টু চায়না' নামক ছবিটি দেখেছেন তাদের কাছে এ নামটি অপরিচিত হবার কথা নয়। অক্ষয় কুমার ওই ছবিতে 'পরাটাওয়ালি গলির' কোন এক রেস্তোরাঁর সবজি কাটার কাজে নিয়োজিত এমন চরিত্রেই অভিনয় করেছিলেন। ছবিটি 'ব্লক বাস্টার' না হলেও নির্মল বিনোদনের ছিল। আমরা ওই গলিতেই দুপুরের আহার সারব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের চালক মিঃ যাদবকে অনুরোধ করলাম 'পরাটাওয়ালি গলিতে' যাবার জন্য।

টাউন হল থেকে বের হবার পথে একজন দোকানিকে জিজ্ঞাসা করতে ওই দোকানি বলেছিলেন যে টাউন হল হতে সোজা পূর্ব দিকে, মানে লালকেল্লার দিকে যেতে প্রথমে বায়ে পড়বে মতিবাজার রোড। ওই রোড পার হয়ে ডান দিকের প্রথম

www.pathagar.com

গলিটিই 'পরাটাওয়ালি গলি'। দোকানীর বিবরণ মতই সামনে গিয়ে 'পরাটাওয়ালি গলি' পেলাম। গলি বেশ সরু। দু'পাশে অনেক খাবারের দোকান। হেঁটে একটু সামনে গিয়েই প্রথম রেস্তোরাঁর হাঁক ডাকে ওখানেই বসে পড়লাম। উপরে ছোট্ট বেলকনির মত করা। ওইখানে জায়গা করে আমাদের বসালেন পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই করছে এমন একজন ব্যক্তি। পরনে সালোয়ার কামিজ, কিছুটা ময়লা ধরনের।

প্রচণ্ড গরম। এসি নামের এয়ারকুলার জাতীয় কিছু একটা ঘর ঘর শব্দে চলছে। এটাকে ডেজার্ট কুলার বলে। তবে এখানে এসি রেস্তোরাঁ যে নাই তেমন নয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডেজার্টকুলার ব্যবহার হয়। নাকে আসছিল ঘি দিয়ে ভাজা পরাটার খিদে জাগানো সুগন্ধ। বসতে বসতে ওয়েটারসদৃশ্য ব্যক্তিটির নাম জিজ্ঞাসা করলাম। নাম তার ইকবাল আলী। চৌদ্দ পুরুষের ছোট একটি বাড়ি রয়েছে চাঁদনী চক-এর মলিওয়ারা এলাকায়। কাঁচাপাকা চুল। পানের রসে মুখলাল হয়ে আছে। মনে হল বেশ হাসি খুশি মেজাজের আমুদে লোক। কথোপকথনে জানলাম রেস্তোরাঁটি তাদের পারিবারিক। দুই ভাই পালা করে চালান। প্রায় সময় নিজেরাই খদ্দেরদের দেখাশুনা করেন তাও যদি তাদের মনপূত হয়। ইকবাল আলীর দু'ছেলে এক মেয়ে। মেয়েটিকে বিয়ে দিয়েছেন মিরাটে। ছেলে একটি দুবাইতে, অপরটি নয়াদিল্লীতে কোন এক সওদাগরী কোম্পানিতে মোটামুটি ভাল চাকুরিতে আছেন। চৌদ্দ পুরুষের বাস এই চাঁদনী চক-এ। দেশ বিভাগের সময় বেশ দাঙ্গা হলেও এলাকার বহু মুসলমানেরা তাঁদের জায়গা ছেড়ে খুব কমই পাকিস্তানে গিয়েছেন। তাঁর কয়েকজন আত্মীয় চলে গেলেও তার বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের ভিটা ছেড়ে যাননি। সে জন্য তাঁদের মাশুল দিতে হয়েছিল অনেক।

আমি পানি চেয়ে খাবারের বিষয়টি তার উপরই ছেড়ে দিয়ে বললাম, "পিওর ঘি বাদ দিয়ে 'পরাটা পাওয়া যাবে কিনা?" হেসে বললেন "স্যার একদিন খাও চাঁদনী চক কা পরাটা আউর ভূনা ইয়া সবজি, ইয়াদ করোগে"। কথার ফাঁকে তাকে জানাতে ভুললাম না যে আমরা বাংলাদেশি। শুনতেই আন্তরিক হাসি দিয়ে ধরেই নিলেন আমরা মুসলমান। নিচে গিয়ে পানি এনে একটি ছোকরা বয়েসি একজনকে ডেকে আমাদের জন্য খাস্তা পরাটা আর গোস্ত ভূনা আনতে বলে সাথে তার তরফ থেকে সবজি দিতেও বললেন। পরে জানতে পারলাম যে যে কোন অর্ডারের সাথে সবজিটা এমনিতেই আসে। তবে খদ্দেরদের সে তথ্য দেন না বরং ওটা স্পেশাল খাতির বলে চালিয়ে দেন। তবুও তার বদন্যতায় আমি বেশ খুশি হলাম। ইকবাল আলী জানালেন যে বাংলাদেশের অনেকের সাথে তাঁর এখানে দেখা হয়। ঈদ পার্বণের আগে পাইকারি বাজার থেকে যাবতীয় দ্রব্যাদি, যার মধ্যে জরির কাজ করা মহিলাদের পরিধেয়, বিশেষ করে আজকালকার ক্রেজ লেহঙ্গা জাতীয় পোশাক, আর 'খারিবাওলী রোডের' মসলা

www.pathagar.com

মার্কেটের মসলাই বেশি কিনতে আসা বাংলাদেশিরা এখানে মাঝে মধ্যে খেতে আসেন। তাদের মুখে ঢাকার 'চাঁদনী চক' আর পুরাতন ঢাকার কথা শুনেছেন। শুনেছেন ঢাকার ঈদের বাজারের কথা আর ভারতীয় দ্রব্যাদি, বিশেষ করে কাপড়-চোপরের ব্যাপক চাহিদার কথা।

ইকবাল আলীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বেগম আকবরাবাদী মসজিদের কথা। ইকবাল আলী আমাকে জানালেন ওই মসজিদ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বাহিনীর পরাজয়ের পর গুঁড়িয়ে দেবার কাহিনী। ছোটখাটো ঐতিহাসিক বিবরণ। ব্যাখ্যা দিল কি কারণে গোড়া পল্টনের এত গোস্বা ছিল ঐ মসজিদের উপর। এখন সেখানে দোকান তৈরি হয়েছে। ইকবাল আলী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন 'বেগম ফতেহপুরী মসজিদ' দেখেছি কিনা। বললাম দেখেছি। ইকবাল আলী জানালেন ঠিক ওই ধরনের ছিল বেগম আকবরাবাদী মসিজদ। সম্রাট শাহজাহানের দুই বেগমের নামেই তাদের অর্থেই নির্মিত হয়েছিল এই দুই মসজিদ।

ইকবাল আলী আলাপ করতে করতে সামনের খালি চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করলেন এর আগে আমি দিল্লী এসেছি কিনা? আমি না বলতে তিনি অনেকটা আশ্চর্য হয়ে বললেন যে আমার কথা শুনে তিনি ভেবেছিলেন আমি এসব জায়গার সাথে অতি পরিচিত। আমি তাঁকে বুঝাতে চাইনি যে আজকাল সেটেলাইট ইমেজে দিল্লীর গলি, কুচা আর হাভেলীসহ তার বাড়িটিও দেখা সম্ভব। আমি তাঁকে 'শিস্‌গঞ্জ গুরুদুয়ারা সাহিব'-এর কাহিনীর কতখানি ধারণা রাখেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তার মতামত জানিয়ে বললেন যে, এ কাহিনী অনেকখানি অতিরঞ্জিত। তাঁর মতে ইংরেজরা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর হতে শিখদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাড় করাতে এ ধরনের কাহিনী ইতিহাসে স্থান দিয়েছে। আমি এ নিয়ে তাঁর সাথে তর্ক করতে চাই নি। তবে ইকবাল আলীর কথার কিছু বিষয়ে সত্যতা রয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে বিশেষ করে ইংরেজদের divide and rule নীতির আলোকে। 'শিস্‌গঞ্জ গুরুদুয়ারা সাহিব'-এর ইতিহাস সত্য হলেও এখানকার পুরাতন অধিবাসীরা অনেকেই এই গল্প বিশ্বাস করেন না।

এক পর্যায়ে ইকবাল আলী যথেষ্ট আবেগের সাথে বললেন যে, চাঁদনী চকের বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রায় শত বছর আগে 'গদরের' (বিদ্রোহ) সময় হতেই এখানকার মুসলমানদের হাতছাড়া হয়েছে। আজ দু'একটা মাত্র রয়েছে মুসলমানদের হাতে। ইকবাল আলী বর্ণনা করলেন এক সময় বর্তমানের টাউন হলের, ইতিহাসের কারওয়া সরাইয়ে বিভিন্ন দেশ বা অঞ্চল থেকে আসা কাফেলা (কারওয়া)-এর মালিকদের থাকবার ব্যবস্থা ছিল, সে ইতিহাস। এ সরাইয়ের একাংশে উর্দু সাহিত্য চর্চা হত। জউক, মীর তাকি মীর, আরজু, গালীব এমন কি জাহানারাসহ বাদশাহ বাহাদুর শাহ

www.pathagar.com

জাফরের গজল আর 'নজম'-এর মেহফিল-এ-শামা বসত ওই সরাইসহ অনেক হাভেলীতে। এখান থেকেই উর্দু সাহিত্যের চর্চা ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র উত্তর হিন্দুস্থানে। এখনও দিল্লীর উর্দু বলতে 'চাঁদনী' চক-এর কথ্য ভাষা উর্দুকেই বুঝায়। দিল্লীতে এখন আর তেমন উর্দু চর্চা হয় না। যতটুকু হয় তার বেশির ভাগই পুরনো উর্দু কবিতা হিন্দিতে লেখা।

আমি ইকবাল আলীকে মীর তাকি মীরের এক সময়কার অভিভাবক নবাব সমাসুদ্দৌলার দিল্লীর ছোট হাভেলীর কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন যে ওই হাভেলী আর নেই। ওই হাভেলী ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহের দিল্লী লুণ্ঠনের সময়েই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নাদির শাহ চাঁদনী চক দিয়ে যাবার পথে ওই অঞ্চল থেকে তাকে লক্ষ্য করে কোন এক আততায়ী গুলি ছোঁড়ে। তারই জের হিসেবে নাদির শাহের বাহিনী দিল্লীতে যে হত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল তাতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় চাঁদনী চক, শাহজানাবাদ এবং মেহেরুলীসহ অন্যান্য শহর । ওই সময়ে দিল্লী ভুতুড়ে নগরীতে পরিণত হলে 'চাঁদনী চক'-এর সাহিত্যের আসর বন্ধ হয়ে যায় এবং মীর তাকি মীর সহ ওই সময়কার বিখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক আর কবিরা লক্ষ্মৌতে চলে যান। ক্রমেই দিল্লী উর্দু ভাষার কেন্দ্রের মর্যাদা হারালে লক্ষ্মৌতে চলে যান মীর তাকি মীর এবং লক্ষ্মৌ হয়ে উঠে উর্দু সাহিত্যের প্রধান পীঠস্থান। লক্ষ্মৌ-এর নবাবরা পৃষ্ঠপোষকতা করেন উর্দু সাহিত্য চর্চার। মীর তাকি মীর পরে লক্ষ্মৌ-এর নবাব আসাফউদ্দৌলার দরবারের প্রধান কবি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার পরেও পঞ্চদশ শতাব্দী হতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত 'চাঁদনী চক' আর 'উর্দু বাজার' উর্দু ভাষার কবি সাহিত্যিকদের মিলন স্থান হিসেবে গণ্য হয়ে আসছিল যদিও লক্ষ্মৌ তখন থেকে এখন পর্যন্ত ভারতের উর্দু ভাষার আর সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রই থেকে গিয়েছে। 'চাঁদনী চক' এলাকার মোগল সেনাদের ক্যাম্প হতে উদ্ভূত 'হিন্দাভ' ভাষার রূপান্তর, উর্দু, বর্তমানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।[৭]

১৯৪৭-এ এখান থেকে যারা পাকিস্তানে চলে গিয়েছেন তাদের প্রায় নব্বই ভাগই পাকিস্তানের করাচী শহরে নতুন আবাসস্থল খুঁজে পেয়েছেন। আমি আমার স্কুলের প্রায় অর্ধেক, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির বেশির ভাগ সময় করাচি শহরে পিতার চাকুরির সুবাদে কাটিয়েছি। তখন ভারত থেকে আগত মোহাজেররা করাচীতে নতুন জীবন শুরু করেছেন মাত্র। এদের বেশির ভাগ দিল্লীসহ উত্তর ভারতের লক্ষ্মৌ, মিরাট, এলাহাবাদ আর আগ্রা অঞ্চলের এক সময়কার বাসিন্দা ছিলেন। এরাই শুদ্ধ উর্দুকে পাকিস্তানে নিয়ে এসেছেন। এদের অনেকেই তখনও ভারতে তাদের পূর্ব পুরুষদের রমরমা সময়ের কথা ভুলতে পারেননি। করাচীর নতুন আবাদী তিন হাট্টি, নাজিমাবাদ আর কোরাঙ্গীতে এঁরা

৭। *ফারুকী সামসুর রহমান "ই" Long history of Urdu Language" Pollock (2003).*

www.pathagar.com

হিন্দুস্থানের মুসলমানদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। শাহজাহানাবাদ-এর মতই বংশপরম্পরায় কবুতরবাজী, মোশাহেরা আর গজল সন্ধ্যার যে সংস্কৃতি এসব মোহাজেররা গড়ে তুলেছিলেন তার মাধ্যমেই করাচীকে বাস্তবেই দিল্লীর ঐতিহ্যের কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। দিল্লীর শাহজাহানাবাদ থেকে যেসব মুসলমান দেশ বিভাগের পর অন্যান্য জায়গা থেকে করাচীতে চলে এসেছিলেন তাদের বেশির ভাগই ওই সমাজের উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত বিত্তশালী লোকই ছিলেন। ভারতে এদের জায়গা দখল করেছিলেন পাকিস্তানের পাঞ্জাব থেকে দেশ বিভাগের পর রিফিউজি হয়ে দিল্লীতে আগত শিখ সম্প্রদায়ের পরিবারেরা। বর্তমানে 'চাঁদনী চক' 'শাহজাহানাবাদ' পুরাতন দিল্লীসহ লুটিয়েন্স-এর নতুন শহর, নতুন দিল্লীর, বেশিরভাগ শিখ সম্প্রদায় এক সময়ের পাকিস্তানের উদ্বাস্তু। এ কারণেও ইকবাল আলী শিস্‌গঞ্জ গুরুদুয়ারা সাহিব এর কথায় কিছুটা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বলে আমার মনে হয়েছে।

আমি ইকবাল আলীকে জিজ্ঞাসা করলাম, শাহজাহানাবাদ-এ দেশ বিভাগের পরেও এত মুসলমান কিভাবে রয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, "জনাব লড়কে" (মানে লড়াই করে)। তিনি আরও বললেন, "আমি সে সময়টি দেখিনি তবে আমার এক চাচা এখনও জীবিত। বয়স প্রায় নব্বইয়ের কাছাকাছি। তার মুখেই শুনেছি যে এখানকার বিত্তশালীরা ঘর ছেড়ে গেলেও অন্যান্যরা দেয়াল শহরের মধ্যেই অলিতে গলিতে মেশিনগান আর বন্দুক যুদ্ধ করেই ১৯৪৬,৪৭ আর ৪৮-এর কঠিন সময়গুলো পার করেছিলেন। ১৯৪৭-এ যে দাঙ্গা হয়েছে সে দাঙ্গায় আমাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আমার চাচার শ্বশুরের দিকের অনেকেই শহীদ হয়েছিলেন। কয়েকজন এখন পাকিস্তানের করাচি শহরের লালুক্ষেত এরিয়াতে বসবাস করছেন" তিনি দুঃখ করে বললেন, "এত কষ্ট করে পাকিস্তানে গিয়ে মোহাজেররা শান্তিতে নেই।' উহ্ লোগ অভিনা ঘরকা না ঘাটকা।" ইকবাল আলীর খেদ।

আমি তাকে আমার করাচীর অভিজ্ঞতার কথা জানালাম। জিজ্ঞাসা করলাম যে তিনি কখনও পাকিস্তানে গিয়েছেন কিনা? উত্তরে ইকবাল বললেন, "আমি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিকে পছন্দ করি না। এদের বর্তমান কর্মকাণ্ড এমনই যে এখানে (ভারত) আমাদের বর্তমানকেও নষ্ট করছে। ওখানকার সন্ত্রাসীদের কারণে এ দেশের মুসলমানদের জীবনও দুর্বিষহ হয়ে উঠে।" কিছুটা ক্ষোভের সুরে বললেন, "জানিনা কেন তারা তাদের দেশ নিয়ে খুশি নয়?'' এটা আমার বুঝের বাইরে। পাকিস্তানীরা কথায় কথায় 'দিল্লী-লে লেয়েঙ্গে' বলে। দিল্লী এতনা সস্তা নেহী হ্যায়।" এবার ইকবাল আলী কিছুটা চটে গিয়েই বললেন,"জনাব পাকিস্তানের মুসলমানেরা দূর্মুখ। তাঁরা অত্যন্ত স্বার্থপর। তাঁদের বুঝা উচিত ভারতের প্রায় ষোল থেকে বিশ কোটি মুসলমান তাদের কারণে সমস্যায় পড়ে। আমরা কখনই আমাদের বাপ-দাদার ভিটা ছেড়ে যাব

www.pathagar.com

না। ভারত আমাদের দেশ। এ দেশে আমাদের শিকড় হাজার বছরের। দিল্লী নিয়ে আমরা গর্ব করি। গর্ব করি আগ্রা নিয়ে, লক্ষ্ণৌ নিয়ে। পাকিস্তানের কি নিয়ে গর্ব করব"? আমার বুঝতে বাকি রইল না যে ভারতে মুসলমানদের অবস্থা যতই নাজুক হোক না কেন তাদের হাজার বছরের শিকড় এতই শক্ত যে সহজে এদের মনোবলকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করা সম্ভব নয়। কথায় কথায় খিদেটা বাড়ছিল। হয়ত আমার মুখ চেয়ে ইকবাল বললেন "মাফ কিজিয়েগা আপনে বাতায়া নেহী আপ কেয়া খানা পছন্দ করেঙ্গে।" আমি আমার উর্দুটা ঝালাই করতে বললাম, আপকা পছন্দ। জনাবে ইকবাল বললেন "বহুত খুব জনাব"। (আমি বলেছিলাম খাবরের পছন্দ তাকেই করতে হবে। সে উত্তর দিল ঠিক আছে)। আমরা দুজনেই ভুলে গিয়েছিলাম যে ইতিপূর্বে খাবারের বিষয়টি নিস্পন্ন হয়েই ছিল।

কিছুক্ষণ পর ছোকরা গোছের ওয়েটার একটি স্টেইনলেস স্টিলের থালীতে দুটো পরাটা, এক ভাগে ভুনা মাংস, অপরভাগে বিখ্যাত 'আলু ভাজি' পরিবেশন করল। সাথে স্টেইনলেস স্টিলের জগে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আসল। ইকবাল আলী বললেন "পানি ফিলটার কা হ্যায়"। থালির ঘ্রাণে মনে হল অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার এবং অত্যন্ত পরিপাটিভাবে পরিবেশিত। ইকবাল আলী জানালেন যে, এ জায়গায় কয়েকশ' বছর ধরেই এ ধরনের খাবার তৈরি এবং পরিবেশিত হয়ে আসছে। দিল্লীতে পর্যটকদের 'পরাটাওয়ালি গলির' খাবার এক প্রকার অত্যাবশ্যকীয় বলে তাঁর ধারণা। পর্যটন মৌসুমে 'পরাটাওয়ালি গলি'তে জায়গা সংকুলান হয় না। তবে এখানকার খাবারও যথেষ্ট সুলভ। এর বিবরণ করিমস্-এর অভিজ্ঞতা থেকে আগেও উল্লেখ করেছি।

এতক্ষণে ইকবাল আলীর সাথে আমার বেশ একটা ভাল ভাব হয়েছে বলতে হবে। লেখাপড়ায় ততখানি উচ্চশিক্ষিত না হলেও এখানকার আদিবাসী অনেকের মতই ইকবাল তাঁর নিজের শিকড়ের এবং ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। আমার মনে হল এর কারণ হয়ত উপমহাদেশের ইতিহাসের সাথে বংশপরম্পরায় উত্তর ভারতের এই সাধারণ মুসলমানদের, যাদের পূর্ব পুরুষরা মুসলমান সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের সাক্ষী ছিলেন, জ্ঞান বাস্তবভিত্তিক। ইতিহাস শুনে আসছে মুখে মুখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম। আমি আবার তাকে শিস্‌গঞ্জ-এর কথায় ফিরিয়ে আনলাম।

শিস্‌গঞ্জ গুরুদ্ধায়ারা সাহিব-এর কাহিনীর জের ধরেই ইকবাল আলী বললেন, "শিখেরা দাবি করে আওরঙ্গজেব তাদের নবম গুরুকে হত্যা করেছেন। কথাটা সত্য ধরে নিলেও শিখ-মুসলমান বিরোধের সেটাই একমাত্র কারণ হতে পারে না। শিখেরা ইংরেজদের তল্পিবাহক হয়ে প্রায় একশ' বছর মুসলমান নিধনে সর্বতোভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাজনকালে শাহজাহানাবাদ আক্রমণ, খুনি দরওয়াজার সামনে অসহায় উদ্বাস্তুদের নিধনে হিন্দুদের চাইতে বেশি

www.pathagar.com

শিখেরাই নেতৃত্ব দিয়েছে। অথচ ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীকে তারই এক যুগের পুরাতন বিশ্বস্ত শিখ দেহরক্ষীরা হত্যা করেছিল। ওই ঘটনার পরে দিল্লীতে যে হত্যাযজ্ঞ হয়েছে, হিন্দুদের হাতে শিখ নিধন, সে ধরনের বর্বরতার শিকার কখনও হয়েছিল বলে আমরা শিখদের ইতিহাসে পড়িনি।" আমি জয়পুরে কারতার সিং-এর মুখে এ দাঙ্গর বিবরণ কিছুটা শুনেছিলাম।

অক্টোবর ৩১, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের ভোর ৯.১৫ মিনিটে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী একটি বিদেশি চ্যানেলকে সাক্ষাতকার দিতে বাসভবন থেকে বের হয়ে সামনের সবুজ চত্বর পার হয়ে ভেতরের রাস্তা ধরে একটি বড় গাছের নিচ দিয়ে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছাবার আগেই মৃত্যুর মুখোমুখি হন। সামনে তার অতি পরিচিত প্রায় চৌদ্দ বছরের পুরাতন সাব ইন্সপেক্টর বিয়ান্ত সিং-এর দিকে স্মিত হাসি দিয়ে তাকালে বিয়ান্ত সিং তার উত্তরে কোমরে রাখা সার্ভিস রিভলবার বের করে ইন্দিরার পেটে গুলি করেন। পাশেই দাঁড়ানো আরেক দেহরক্ষী, বিয়ান্ত সিং-এর সহযোগী, কনস্টেবল সাতওয়ান্ত সিং তার হাতের সাব-মেশিনগানের অটোমেটিক নবে চাপ দিয়ে আরও কয়েক রাউন্ড গুলি করলে ইন্দিরা গান্ধীর রক্তাক্ত দেহ সেখানেই লুটিয়ে পড়ে। ইন্দিরা গান্ধী তখনও জীবিত! কিন্তু বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত এম্বুলেন্সের ড্রাইভারকে খুঁজে না পেয়ে সাদা এম্বেসেডর গাড়ির পেছনের সীটে শাশুড়ির রক্তাক্ত দেহ কোলে নিয়ে পুত্রবধূ মিসেস সোনিয়া গান্ধী প্রায় পনের কিলোমিটার দূরে 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সাইন্সেস' হাসপাতালে নিয়ে গেলে ইন্দিরা মৃত বলে কর্তব্যরত ডাক্তাররা জানালেও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হতে পারে মনে করে ১০.৫০ পর্যন্ত বিষয়টি জনগণকে জানাতে দেয়া হয়নি।

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর সংবাদ অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ঘোষণা হয় সকাল ১১ টায়। ততক্ষণে দিল্লীতে ইন্দিরার হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় দিল্লী থমকে গিয়েছিল। পুরো ঘটনাটি দৈবক্রমে টিভির জন্য ধারণ করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা ও টিভি ব্যক্তিত্ব প্রয়াত পিটার উস্তিনভ। পিটার উস্তিনভের ধারণকৃত দৃশ্য তাৎক্ষণিকভাবে সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হয়। ওই দিনই বিকেল ৪টায় ইন্দিরা গান্ধীর জ্যৈষ্ঠপুত্র রাজীব গান্ধী, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যিনি তারও পরে নিজেও তামিল আত্মঘাতী হামলায় নিহত হয়েছিলেন, কোলকাতা হতে দিল্লীতে ফিরে আসেন।

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর সংবাদের পর পরই হিন্দু কংগ্রেস কর্মীরা হাসপাতালের আশে পাশের শিখদের বাড়িতে হামলা শুরু করে। বিকেল ৫.৩০ মিনিটে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, যিনি নিজেও একজন শিখ ছিলেন, জ্ঞানী জৈল সিং, ওই হাসপাতাল হতে ফেরবার পথে উত্তেজিত জনতার ইট-পাটকেলের শিকার হন। পুলিশ বা অন্য নিরাপত্তা কর্মীরা ছিল নিষ্ক্রিয়। সে দিন অনেকটা নির্ঝঞ্ঝাট কেটে গেলেও পরের দিন, পহেলা

www.pathagar.com

নভেম্বর, একদিকে রাজীব গান্ধীকে যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ পড়ানো হচ্ছিল, অন্যদিকে তখন নতুন দিল্লীসহ পূর্বদিল্লীতে শিখদের বাড়ি ঘর, গুরুদায়ারা এবং সম্পত্তি লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ হচ্ছিল। প্রথমে পূর্ব দিল্লীতে শুরু হয় এ হত্যাযজ্ঞ। গায়ে কেরোসিন ঢেলে জীবন্ত পোড়ানো হয় আবাল-বৃদ্ধ বনিতাদের। ক্রমেই হত্যাযজ্ঞ লুণ্ঠন, ধর্ষণ আর অগ্নিসংযোগ ছড়িয়ে পরে যমুনার পূর্বতীরের নিম্নমধ্যবিত্ত অঞ্চল ত্রিলোকপুরী, মঙ্গলপুরী, সুলতানপুরী, ফরাশ বাজার এবং পশ্চিম তীরের ক্যারোলবাগ অঞ্চলে। অভিযোগ করা হয় পুলিশ এসব হত্যাযজ্ঞ থামাতে যথেষ্ট প্রয়াস নেয়নি। প্রায় চারদিন চলে হত্যাযজ্ঞ লুটপাট। সরকারি হিসাব মতো ৩১০০ শিখ হত্যা করা হয়। ১৯৪৭ এর পর স্বাধীন ভারতে এ ধরনের হত্যাযজ্ঞ আর সংঘটিত হয়নি- অবশ্য পরে গুজরাট ঘটনা এর চাইতে লোমহর্ষক ছিল। তবে হিন্দুদের হাতে শিখ নিধন এমনটা বোধহয় আর হয়নি যেমনটা হয়েছিল ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে।

২০০২ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটে গোদরা যাত্রীবাহী ট্রেনে হিন্দু সাধুদের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে মুসলমানদের উপর আক্রমণে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধে। এ দাঙ্গার ভয়াবহতা নিয়ে বিশ্বব্যাপী চর্চা এবং নিন্দার ঝড় উঠে। গুজরাটের হিন্দুবাদী মূখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তার সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে এ দাঙ্গায় সরকারি হিসাব মোতাবেক ৭৯০ মুসলিম এবং ২৫৪ হিন্দু মারা যান ও ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির। প্রায় ১,০০,০০০ মুসলমান এবং ৪০,০০০ হিন্দু অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতে পরিণত হন। এর সাথে আরও জড়িত ছিল কট্টর হিন্দুবাদী সংঘ পরিবার। এ দাঙ্গা ছিল পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ-মুসলিম নিধন।

এ পরিকল্পিত দাঙ্গায় গুজরাটের ১৫১টি শহর এবং ৯৯৩ গ্রাম ছাড়াও ভারতের ১৫ থেকে ১৬ টি রাজ্যেও এ দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এ দাঙ্গায় আহ্মেদাবাদের সূফী সাধক কবি ওয়ালী গুজরাতীর মাজার ইশানপুরের ষোড়শ শতাব্দীর গুমতি মসজিদ বিধ্বস্ত এবং মাহফুজখানা মসজিদ তছনছ করা হয়। পুলিশের রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, ২৯৮টি দরগাহ, ২০৫টি মসজিদ, ১৭টি মন্দির এবং ৩ টি চার্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দাঙ্গার রেশ চলে কয়েক মাস।[৮]

যাই হোক, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দের শিখ হত্যাযজ্ঞের জের চলেছিল অনেক দিন। প্রায় এক বছর পর কংগ্রেস (আই) এর দুই জন সংসদ সদস্য ললিত মাখন এবং অর্জুন দাস শিখ নিধনে জড়িত থাকার অভিযোগে খালিস্থান কমান্ডো ফোর্সের হাতে নিহত হন। এদের নাম নানাভাতি কমিশনে উচ্চারিত হয়েছিল। জুন ২৩, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে আরও দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট ১৮২ কানাডার মনট্রিয়াল হতে লন্ডন

৮। *htt:# wikipedia. org/wiki/Gujrat-riots.*

www.pathagar.com

যাবার পথে শিখ চরমপন্থীরা বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। ওই ফ্লাইটের কোন যাত্রীই মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পাননি। ওই দাঙ্গার জের এখনও চলছে যদিও কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৮৪-এর হত্যাযজ্ঞের জন্যে ক্ষমা চেয়েছিলেন। অনেকেই মনে করেন কংগ্রেসের ওই সময়কার কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতেই ভারতে একজন শিখকে প্রধানমন্ত্রী পদে কংগ্রেস উপর্যুপরি দুদফা নিয়োগ দিয়েছে। হালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুব কংগ্রেসের ওই সময়কার নেতা জগদীশ টাইটলারকে হত্যাযজ্ঞে জড়িত থাকবার অভিযোগে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী তার পরিবারের অতি ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মনোনয়ন দেন নি।

ইকবাল আলী ১৯৮৪-এর ঘটনাটির কথাই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি এ ঘটনা জানি কিনা? আমি বলেছিলাম, "হ্যাঁ, আমি টেলিভিশনে দাঙ্গার খবর এবং পরবর্তী বিষয়গুলো দেখেছি।" ইকবাল আমাকে মাঝ পথে থামিয়ে বললেন "দাঙ্গা নয় হত্যাযজ্ঞ।" আমি মাথা নেড়ে তার এ পর্যবেক্ষণের সাথে একমত হলাম। ওটা দাঙ্গা নয়, ছিল হত্যাযজ্ঞ।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর বহুদিনের পরিচিত দু'জন শিখ নিরাপত্তা রক্ষীদের গুলিতে তাঁর নিহত হওয়া ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ 'অপারেশন ব্লু স্টার'-এর পর হতে নিবিড় নিরাপত্তায় নিয়োজিত শিখ সম্প্রদায়ের সদস্যদের সরিয়ে দিয়েছিল ভারতীয় শীর্ষ গোয়েন্দা সংগঠন 'র' (RAW)। 'র' (RAW)-এর সুপারিশে বিদেশেও ভারতীয় দূতাবাসগুলো হতে অত্যন্ত স্পর্শকাতর কাজে নিযুক্ত শিখ কর্মকর্তাদের সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীদের সরাতে সক্ষম হয়নি ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপের কারণে। 'র'-এর সুপারিশে শিখ কর্মকর্তাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিযুক্তি থেকে সরানোর কথা শুনে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করে এ সব প্রত্যাহারের কাজ বন্ধ করে ইতোপূর্বে অপসারিত শিখ কর্মকর্তাদের পুনঃ নিয়োগ করতে নির্দেশ দেন। এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীদের (শিখ) পরিবর্তন করতে পারেনি 'র' বরং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন হতে প্রত্যাহারকৃত শিখ কর্মচারীদেরকেও পুনঃ বহাল করতে হয়েছে।[৯] 'র'-এর সুপারিশ ইন্দিরা গান্ধী মোটেও আমলে নেন নি। উদার নীতিতে বিশ্বাসী ইন্দিরা গান্ধী নিরাপত্তা সংস্থার সুপারিশ উপক্ষো করে শুধু নিজের জীবনই দেন নি বরং তাঁর হত্যার জের হিসেবে প্রাণ দিতে হয়েছে অগনিত নিরীহ মানুষকে।

আমরা প্রায় ঘণ্টা খানেক খাবার আর ইকবাল আলীর বর্ণনায় চাঁদনী চক আর

৯. বি. রমন, (অনুবাদ) 'র' -এর কাওবয়েরা-স্মৃতির সিঁড়িতে আরোহণ পৃ. ৯৫; প্রভাতী প্রকাশনা, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

উর্দু ভাষার সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যৎসামান্য শুনে প্রায় তিন শ' বছরের ঐতিহ্যবাহী "পরাটাওয়ালি গলি" ছেড়ে দক্ষিণ দিল্লীর মেহেরুলীর তুঘলকাবাদ দেখতে যাবার জন্য রওয়ানা হলাম। পথে দেখতে পাব 'দিল্লী দরওয়াজা' (গেট), ফিরোজশাহ কোটলা আর 'খুনি দরওয়াজা' (লাল দরওয়াজা)। প্রতিটি দর্শনীয় স্থানগুলো কালের বিবর্তন আর ইতিহাসের বহু অধ্যায়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে মনে করিয়ে দেয় দিল্লীর স্বর্ণযুগের কথা।

'চাঁদনী চক'-এর অভিজ্ঞতা যতটুকু অর্জন করতে পারলাম তা অতি সামান্য। আমার মনে হয় এখানে এখনও বহু বাসিন্দা রয়েছেন যারা বংশ পরম্পরায় এখানে বসবাস করে আসছেন। এদের প্রত্যেকের কাছ থেকে দিল্লীর ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলোতে শুনতে পাওয়া যায়। এদের প্রত্যেকের কিছু না কিছু বলার আছে ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বহু জানা-অজানা ঘটনা সম্বন্ধে।

পরাটাওয়ালি গলি থেকে অতীব সুস্বাদু খাবার খেয়ে দিল্লীতে এই অল্প কয়েক দিনের খাবারের কথা ভাবতে গিয়ে মনে হল হিন্দুস্থানে মুসলমানদের, বিশেষ করে মোগলরা তাদের কীর্তির দৃশ্যমান নিদর্শনের সাথে সাথে রেখে গেছেন রসালো খাবারের এক বিশাল উপাদান। যা কিছু সুস্বাদু তাই 'শাহী' আর 'মোগলাই'। মোগলরা হিন্দুস্থানের যুগ-যুগের প্রজন্মের জন্য যে ধরনের খাবারের স্বাদ রেখে গেছেন তা না থাকলে আজ বিরিয়ানী, পরাটা, কিমা, কাবাব এমনকি তন্দুরী রুটিও হয়ত খেতে পেতাম না। মোগল পাচন সমগ্র উপমহাদেশে সমাদৃত। দিল্লীর এসব খাবারের জায়গার নাম এবং ঠিকানা বাংলাদেশের বহুজনের কাছে আমি শুনেছি বলেই আমার প্রথম দিল্লী সফরে এসে এসব জায়গা খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হয় নি।

আমি গাড়ি পর্যন্ত যেতে যেতে ইকবাল আলীর মর্মকথা বুঝতে চেষ্টা করলাম। শাহজাহানবাদ নিয়ে তার মর্মবেদনার কথা ভাবছিলাম যে একদা প্রাচ্যের গর্ব বলে মোগলেরা যে শহরের গোড়াপত্তন করেছিল প্রায় চার শ' বছরের সে শাহজাহানাবাদ এখন মৃত নগরী। নেই কোন জৌলুস। একদা নবাব আর মোগল বংশের উচ্চ বিত্তদের বাসস্থান, গজল আর উর্দু ভাষার পীঠস্থান আজ ধ্বংসের নগরী। বহু হাভেলী ধ্বংসপ্রায়। ছোট ছোট দোকান আর পাইকারী বাজার গুদাম ঘরে পরিণত হয়েছে এসব নামকরা হাভেলী, এমন কি কাশ্মীরী পণ্ডিতদের 'আসকার হাভেলী' যেখানে আজ থেকে প্রায় শত বছর পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আর কমলা দেবীর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেটাও ধ্বংসের মুখে প্রায়। জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে ভারতের অন্যতম মুসলিম রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দীন আলী আহমেদ এর হাভেলীটিও। এক সময়ের দিল্লীর প্রধান আকর্ষণ, শাহজাহানবাদ এবং-এর প্রাণকেন্দ্র চাঁদনী চক, আজ অতীতের স্বর্ণালী দিনগুলো মনে করিয়ে দেবার মত অবস্থায় নেই। যারা এ জায়গার বর্ণাঢ্য ইতিহাস

www.pathagar.com

জানেন না তাদের জন্য এ জায়গা কেবলমাত্র কারখানা আর বৃহৎ সস্তা, খুচরা আর পাইকারী বাজার মাত্র। এখানকার মূল বাসিন্দারা অত্যন্ত কঠিন জীবন যাপন করেছেন।

এই শাহজাহানাবাদ এর সেই জৌলুস ক্রমেই হারাতে হারাতে এখন বাকি আর কিছু নেই। তবুও এখানকার অনেকেই পুরাতন স্মৃতি রোমন্থন করেন। বংশ পরম্পরায় ধরে রাখা কিছু কিছু সংস্কৃতির খুব সামান্য রয়ে গেছে। আজও শাহজাহানাবাদ-এর পুরাতন হাভেলীগুলোর ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের মধ্যে কিছু কিছু সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা রয়েছে। এসব সংস্কৃতির অনেক কিছু রিফিউজিদের সাথে পাকিস্তানের করাচীতে গৃহীত হয়েছে।

এখনও শাহজাহাবাদ-এ বিকেলে চলে কবুতরবাজি; তবে এখন আর এ খেলা নবাবদের আঙ্গিনায় সীমাবদ্ধ নেই। চলে আসছে সাধারণ মানুষের আঙ্গিনায়। এখনও বিকেল হলেই শাহজাহানাবাদ-এর আকাশে উড়তে দেখা যায় শত শত কবুতরের ঝাঁক। নানা ধরনের কসরত করে পালকের বিভিন্ন ইশারা অথবা তীক্ষ্ণ শীষের আওয়াজে। এখনও উড়তে দেখা যায় সিরাজী, লাল খাল, আজাদী, গোলে এবং কাবুলী কবুতরের ঝাঁক। এখনও কবুতরের ঝাঁকে ঝাঁকে প্রতিযোগিতা হয়। এখনও অন্য ঝাঁক হতে ছিনিয়ে আনবার কৌশল শিখানো হয়। ছাদের উপর হতে কবুতরের উদ্দেশ্যে ডাক শোনা যায় "আও আও"। কিন্তু যা দেখা যায় না তা হল নবাবদের চাকচিক্য আর কবুতরবাজিতে শাহজাহানাবাদকে মাতিয়ে রাখা।

মোগল সম্রাট আর তাদের কবুতরবাজি। এক সময়ে মোগল সম্রাট শাহজাহান-এর শখ এবং সময় কাটাবার অন্যতম খেলা ছিল এই কবুতরবাজি। আইন-ই-আকবরীতে সম্রাট আকবর-এর ছেলেবেলার এবং পরিণত বয়সের শখ হিসেবে 'কবুতর বাজি' এর বিশেষ বিবরণ রয়েছে।✦ আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে এক পর্যায় সম্রাট আকবর কবুতর বিশারদই হয়ে গিয়েছিলেন। সম্রাট নিজে কবুতরের প্রকারভেদ করে অনেকগুলোর বিভিন্ন নাম দিয়েছিলেন। এ সব নামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গুলজার, দুমগাজা, এক রং, হালকুম সাফেদ (সাদা গলা), পরসফেদ (সাদাপর), কল্লা (বড় মাথা); ঘাজ মাঝা; বাবরী, মাধুম এবং অন্যান্য। এদের মধ্যে বর্তমানে যে নামগুলো পাওয়া যায় সেগুলোও ছিল। যেমন লোটন, সিরাজি, নিশাডয়ারী, কোখা, বালা লাক্কান আরও অনেক। আকবরের দরবারে কবুতর প্রশিক্ষক হিসেবে যাদের নিয়োগ দেয়া

✦ *সম্রাট আকবর কবুতরবাজির নাম রেখেছিলেন 'ইসক্‌বাজি'। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় যে, ওই সময় সম্রাটের দরবারে প্রায় বিশ হাজার বিভিন্ন প্রজাতির কবুতর ছিল। এর মধ্যে প্রায় পাঁচ শ' ছিল বিশেষ ধরনের কবুতর যাদের ছিল আলাদা মর্যাদা। এ সব কবুতর বিভিন্ন কৌশল এবং উড়ন্ত অবস্থায় বিভিন্ন খেলা দেখাতে পারদর্শী ছিল। এ সব কবুতরের রং নির্ধারণ করে বিভিন্ন নামও দিয়েছিলেন আকবর।* The Ain-i-Akbri Vol-I; Abul Fazal Allami; New Taj office, Urdu Bazar, Delhi, India.

www.pathagar.com

হয়েছিল তাদের বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। এদের অনেকেই দরবারে নিযুক্ত হয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। যেমন বুখারার কুলসী আলী, সমরখন্দ-এর মস্তি, মুল্লাজাদ, আহমেদ চাঁদ, মুকবিল খান চেলা, খাজা সান্দেল চেলা আরও অনেকে। আবুল ফজল আরও লিখেছেন যে, এদের বেতন-ভাতা ওই সময়কার সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদের সদস্যদের সমপর্যায়ে ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর হাজার হাজার কবুতরের খোরাকের বিবরণ একই সাথে কবুতর প্রশিক্ষণ এবং দরবারে তাদের মর্যাদার কথাও সবিস্তারে আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় দিল্লীসহ ভারতের অন্যান্য শহরেও আজও কবুতরবাজি অত্যন্ত জনপ্রিয়। তীতর-পাখি আর কবুতরবাজিসহ সংস্কৃতির অনেক উপাদান এখনও বিদ্যমান। মোগল সম্রাটদের মধ্যে আকবর-এর মত অন্যদের কবুতরবাজির প্রতি এতটা আগ্রহ ছিল না তবে মোগলদের দরবারের শখ বলেই সমগ্র হিন্দুসস্থানে ছড়িয়ে পড়ে এ বিদ্যা।

এখনও হুক্কার চলন থাকলেও নাকে আসেনা বিশেষ ধরনের তামাকের সুগন্ধ। নবাব আর সম্রাটদের হেরেমের হুক্কা এখন নেমে এসেছে রেস্তোরাঁয়। হুক্কার জায়গা নিয়েছে সস্তা সিগারেট।

এখনও শাহ্জাহানাবাদ-এর ঈদগাহের আশেপাশে জমে উঠে 'তীতর' নামক পাখির বাজিধরা খেলা কিন্তু নেই নবাব আর খানদানী ব্যক্তিদের উপস্থিতি আর স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রার ঝন-ঝনানি। রাস্তায় শোনা যায় না নবাবদের ঘোড়ার গাড়ির ছন্দ তোলা ঘোড়ার খুরের নালের আওয়াজ। সেখানে শোনা যায় গাড়ী আর অটোরিক্সার হর্ণের বিদীর্ণ কান ফাটানো শব্দ। আরও যা কানে আসে তাহল দোকানিদের বিকিকিনির হাকডাক। নাকে আসে অলিতে গলিতে বহুদিনের পচে যাওয়া অথবা সুয়ারেজের উপচে পড়া পচা পানির অসহনীয় দুর্গন্ধ। আজকের শাহজাহানবাদ-এর 'চাঁদনী চক'-এর মধ্যপ্রান্তে যেখানে ছিল জাহানারার নির্দেশে নির্মিত কারওয়া সরাই, যেখানে দিল্লীর তথা হিন্দুস্থানের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিড় জমাত কবি আর সাহিত্যিকরা, সেখানে কারওয়ান সরাইয়ের চিহ্নমাত্র নেই। সেখানে যা নির্মিত হয়েছে সেটি কিম্ভূতকিমাকার প্রাণহীন অট্টালিকা—পুরাতন দিল্লীর টাউন হল।

'শাহজাহানাবাদ' আর এর প্রান 'চাঁদনী চক' ক্রমেই ইতিহাসের গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে। হয়ত আর কয়েক দশক পর 'শাহজাহানাবাদ'-এর নাম ইতিহাসের পাতাতেও সহজে পাওয়া যাবে না। পুরাতন দিল্লী নাও থাকতে পারে। পুরাতনের উপরেই গজিয়ে উঠতে পারে আরেক নতুন শহর। সে শহরের তলে হয়ত হারিয়ে যাবে মোগলদের জৌলুস ভরা কাহিনী আর খণ্ড খণ্ড কাহিনী শুনবার জন্যে ইকবাল আলীদের মত ব্যক্তিরা।

www.pathagar.com

যাই হোক খাবার খেতে যে রেস্তোরাঁয় বসেছিলাম দপুরের খাবার খেয়ে 'চাঁদনী চক' হতে পুনরায় নেতাজী সুভাষ রোড হয়ে দিল্লী গেট পার হয়ে 'আমেদকার স্টেডিয়াম' পূর্ব পাশে রেখে উপমহাদেশখ্যাত ফিরোজ শাহ কোটলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম হয়ে বাহাদুর শাহ জাফর রোড দিয়ে ফিরতি যাত্রা করলাম। হাতে সময় ছিল বলে তুঘলাকাবাদ, ফিরোজ শাহ কোটলা আর খুনি দরওয়াজা বা লাল দরওয়াজা হয়ে বাসায় যাব বলে মিনহাজকে অনুরোধ করলাম। মিনহাজ অতি উৎসাহে সে অনুরোধ রেখে বললেন, "ভালই হল আমি বহুবার দিল্লীতে এসেছি কিন্তু তুঘলকাবাদের নাম শুনেছি মাত্র। তুঘলকাবাদ দিল্লীর এত কাছে তা ধারণা করি নি।" আমি চাঁদনী চক-এর অভিজ্ঞতার কথা মনে মনে ধারণ করতে করতে তুঘলকাবাদের দিকে যেতে যেতে নতুন দিল্লীর বহু জায়গা পার হলাম।

www.pathagar.com

আঠারো

কত জনপদ কত ইতিহাস

তুঘলাকাবাদ যাবার পথে আমরা দিল্লীগেট বা দিল্লী-দরওয়াজা পার হয়ে এসেছিলাম। দিল্লী গেট এক সময়ের দিল্লীর, যা আজকের পুরাতন দিল্লী নামে পরিচিত প্রবেশের প্রধান দরওয়াজা ছিল। আমরা আগেই জেনেছি দিল্লী ছিল চারদিকে দেয়ালবেষ্টিত শাহজাহান-এর শহর। শহরটি ছিল অর্ধ চক্রাকারের। ১৫০০ একরের এ শহরটি ছিল দেয়ালে ঘেরা, এখন সে দেয়ালগুলো নেই। শহরের ঘেরা দেয়া দেয়ালের প্রস্থ ছিল ১২ ফুট আর উচ্চতা ছিল ২৬ ফুট। প্রথমদিকে এটি ছিল মাটির দেয়াল। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে মাটির বদলে লাল পাথর বা রেড স্যান্ডস্টোন দিয়ে সংস্কার করা হয় 'শাহজাহানবাদ'-এর দেয়াল।

এই দেয়ালঘেরা শহরটি নিয়ন্ত্রিত হতো প্রধানত ৮টি গেটের মাধ্যমে। 'নগর কোতওয়াল' (পুলিশ প্রধান)-এর অন্যতম কাজ ছিল গেটের অবস্থান নির্ণয় করা। এসব গেটের একটির পাশে দিয়ে আমরা এসেছি। এর অনেকগুলো বর্তমানে বড় বড় এভিনিউগুলোর গোলচত্বর হিসেবে সংরক্ষিত আছে। দিল্লীগেট ছাড়া অন্যান্য গেটগুলো হল, নিগাম্বুদ ঘাট গেট (যমুনা নদীর ধারে), উত্তরে কাশ্মীরী এবং মোরি গেট; পশ্চিমে কাবুলী এবং লাহোরী গেট; দক্ষিণ পূর্বে আজমীরী এবং তুর্কমান গেট। দক্ষিণে লাহোর গেট।

আজমীরী এবং তুর্কমান গেটের কাছেই রয়েছে অন্যতম সূফী সাধক হযরত শাহ তুর্কমান বায়াবানীর মাজার।

দক্ষিণে লাহোর গেট সেটা পার হয়েই আমরা চাঁদনী চক থেকে বের হয়ে দক্ষিণে তুঘলকাবাদের দিকে যাচ্ছিলাম।

পুরাতন দিল্লী বা শাহজাহানাবাদ-এর এ গেটগুলোর প্রতিটির সাথেই বহু ইতিহাস জড়িত। বহু ঘটনা অঘটনের সাক্ষী এসব গেট। পুরাতন দিল্লীতে✦ মোট তেরটি গেট✦✦ ছিল। এখন কয়েকটি কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে। এ সব গেটের প্রায়গুলোর প্রতিরক্ষা করতে গিয়ে কোম্পানির পল্টনের দ্বারা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপক

✦ *পুরাতন দিল্লী-এক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় সাতটি শহরের সমষ্টি।*

✦✦ *কারও কারও মতে মোট চৌদ্দ (১৪)টি গেট ছিল মধ্যযুগীয় শহরগুলোতে।*

www.pathagar.com

ক্ষতি হলেও পরবর্তীতে ব্রিটিশ রাজের সময় কয়েকটির সংস্কার করা হয়েছিল। এর অনেকগুলো ভারত স্বাধীন হবার পর সংস্কার করে পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয় করা হয়েছে।

আমরা ঘুরে এসেছিলাম দরিয়াগঞ্জ হয়ে। দরিয়াগঞ্জ দেয়াল শহরের বাইরে যমুনা নদীর সন্নিকটে গড়ে উঠেছিল। এক সময় দরিয়াগঞ্জে বুদ্ধিজীবীদের বাস ছিল। বর্তমানে দরিয়াগঞ্জে ভারতের বিখ্যাত বই পাবলিশারদের অফিস এবং পাবলিশিং হাউস রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বর্তমানের দরিয়াগঞ্জে প্রতি রবিবার পুরাতন বইয়ের হাট বসে। এ হাট শুধু ভারতেরই নয় বোধকরি এশিয়ার বৃহত্তম এবং একমাত্র পুরানো বইয়ের হাট। এ হাটের স্থানীয় নাম 'কিতাব বাজার'। বলা হয়ে থাকে বিশ্বে যে কোন জায়গা থেকে প্রকাশিত হিন্দি এবং ইংরেজি যে কোন বই এখানে রবিবারের হাটে পাওয়া যায়। আমি দিল্লী থাকাকালীন কোন রবিবার পাইনি বলে এ হাট দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি এবং সে কারণেই বিখ্যাত দরিয়াগঞ্জ জায়গাটি দেখতে একটু ঘুরে আসতে হল। এটাকে বলা যায় দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো।

দেখতে গিয়েছিলাম কনাট প্লেস (Connaught Place)। এটি তৈরি হয়েছিল নতুন দিল্লীর অন্যান্য স্থাপনার সাথে। নতুন দিল্লীর প্রধান স্থপতি এডউইন লুটিয়েন্স (Edwin Lutyens) এর নক্সা মোতাবেক নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়েছিল ১৯৩৩-এ। এ জায়গা নির্মিত হয়েছিল উচ্চমার্গের ব্যবসায়িক ও মার্কেট সেন্টার হিসেবে। এখানে আসতেন সাহেব মেমসাহেবরা মোটরগাড়ি অথবা ফিটনে চড়ে শৌখিন বাজার করতে। বিকেলে ভিড় জমাতেন রেস্তোরাঁ আর পানশালায়। এখনও 'কনাট প্লেস' অভিজাত মার্কেট, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং আভিজাত্য ভরা। এ ব্যবসায়িক কেন্দ্রটির নামকরণ করা হয়েছিল তৎকালীন ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সদস্য 'ডিউক অব কন্‌নাট' এর নামে। স্বাধীন ভারতে এ নাম অপরিবর্তিত থেকেছে। কনাট প্লেস-এর 'কনাট সার্কাস' নামের বিরাট এক গোল চত্বরের একাংশ 'কনাট প্লেস'। দু'টি গোলাকার চওড়া সড়ক দিয়ে চত্বর বানানো। কন্‌নাট প্লেস এর এ গোলচত্বর থেকে আটটি আলাদা রাস্তা বের হয়। যার মধ্যে পার্লামেন্টের রাস্তা অন্যতম। আর বাইরের (Outer) গোল চত্বর থেকে বের হয় বারটি রাস্তা এরই একটি জনপথ যার বিবরণ আমি আমার বর্ণনায় দিয়েছি। দিল্লীর নক্সায় অথবা সেটেলাইট ম্যাপে দেখলে এ জায়গাকে, কন্‌নাট প্লেসকে, সাইকেলের চাকার মত মনে হবে।

দিল্লী গেট দিয়ে বের হবার পথে বিখ্যাত ক্রিকেট স্টেডিয়াম 'ফিরোজ শাহ কোটলা' আমাদের পথে পড়বে সে কথা বলেছিলাম। স্টেডিয়ামটির ভেতরে গিয়ে দেখা সম্ভব হয়নি। তাই বাহির থেকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। যেমনটি দেখেছিলাম ইংল্যান্ডের বিশ্বখ্যাত ফুটবল ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের স্টেডিয়াম ম্যানচেস্টার

www.pathagar.com

শহরে। তেমনি দেখলাম ফিরোজ শাহ কোটলা। এ স্টেডিয়ামে বহু বিশ্ব রেকর্ড গড়া হয়েছিল। এ গ্রাউন্ডে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয়েছিল নভেম্বর ১০, ১৯৪৮ এ। এখানেই ১৯৯৯তে ভারতীয় কিংবদন্তি স্পীন বোলার, অনিল কুম্বলে, এক ইনিংসে ১০টি উইকেট নিয়েছিলেন। এমনি আরও অনেক রেকর্ডই আছে।

'ফিরোজ শাহ কোটলা' স্টেডিয়ামটি নামকরণ করা হয়েছে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের নামে। নামকরণের কারণ হল স্টেডিয়ামটি যে জায়গায় তৈরি সে স্থানটি ফিরোজ শাহ চিহ্নিত করেছিলেন ফিরোজাবাদ নামে দিল্লীতে আরেকটি শহর নির্মাণ করবার পরিকল্পনায়। ফিরোজ শাহ পাঞ্জাব হতে সম্রাট অশোকের সময়ে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে, নির্মিত একটি স্তম্ভ এনে ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে পুনঃস্থাপন করেছিলেন। এ স্তম্ভটি স্টেডিয়াম হতে দক্ষিণ-পূর্বে ফিরোজ শাহ কোটলার অর্ধনির্মিত দুর্গের মাঝামাঝি জায়গায়। ফিরোজ শাহ কোটলা বলে চিহ্নিত জায়গার সন্নিকটে, দক্ষিণপূর্ব পাশে। ফিরোজ শাহের শাসনের সময় কাল ছিল ১৩৫১ হতে ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দ। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ব্রিটিশ রাজ সরকার ফিরোজ শাহ কোটলা নামে খেলার মাঠ তৈরি করেছিল। এখানে ওই সময় ক্রিকেটই প্রধান খেলা হিসেবে অনুষ্ঠিত হত।

আমি ফিরোজ শাহ তুঘলকের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করলাম কারণ স্বাধীন ভারতে ইতিহাসের সহাবস্থানের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে এটি অন্যতম দৃষ্টান্ত মনে হয়েছে বলে। ফিরোজ শাহ-এর শাসন আমলে হিন্দুদের উপর 'জিজিয়া কর' ধার্য করা ছাড়াও ব্রাহ্মণদের, শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে, হত্যা করবার ইতিহাসও রয়েছে। ফিরোজ শাহ-এর সময়ে লিখিত এ দলিলে সব বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে।[১]

যাই হোক ইতিহাসে একজন মুসলিম শাসকের এ ধরনের সঙ্কীর্ণতার দালিলিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা পূর্বে এবং স্বাধীনতা-উত্তর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্থাপনা ক্রিকেট স্টেডিয়ামের নাম ওই শাসকের নামে রেখে ভারতের অতীত রাজনীতিবিদরা ইতিহাসের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন তা উপমহাদেশে নজির হয়ে রয়েছে।

ফিরোজ শাহ্ কোটলার কাছাকাছিই খুনি দরওয়াজা বা লাল দরওয়াজা। দরওয়াজাটি দেখব বলে মিনহাজকে আগেই বলে রেখেছিলাম; তবে সময়ের অভাবে নেমে বিস্তারিত দেখা যাবে না। তাছাড়া ওটা এখনও পর্যটকদের জন্যে পুনঃ উন্মুক্ত হয়েছে কিনা সঠিক কেউ বলতে পারেননা বলে গাড়িতে বসে যতটুকু দেখা যায় তাই

১. Banarjee, Jamini "History of Feroz Shah Tuglug" Munshiram Manoharlal Publications.

www.pathagar.com

দেখতে হবে। মনে হল তবুও চাক্ষুস দেখা হবে!

ফিরোজ শাহ কোটলা স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে আমরা বাহাদুর শাহ জাফর রোড ধরে দক্ষিণ দিল্লীর মেহেরুলীর দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখলাম। আমার ধারণা ছিল কিছু দক্ষিণে মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মেডিকেল কলেজের পূর্ব পাশে, পুরাতন দিল্লীর ১৩টি বা ১২টি দরওয়াজার অন্যতম 'খুনি দরওয়াজা', আদি নাম 'লাল দরওয়াজা' (গেট), দেখতে পাব। ঐতিহাসিক এ দরওয়াজা অনেক হৃদয় বিদারক ঘটনার ও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে মনে করেন এটি একটি অভিশপ্ত দরওয়াজা। আমি এ দরওয়াজা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের 'সিপাহী বিদ্রোহ' এবং এর পরিণতিতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বিস্তারিত তথ্য পাঠের মাধ্যমে। তাছাড়াও ডিসেম্বর ২০০২-এ দরওয়াজার নির্জন এক প্রকোষ্ঠে ঘটে যায় এক নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। এ। ঘটনাটি ভারতীয় তথা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে ভারতীয় পার্লামেন্টে ব্যাপক হট্টগোলও হয়েছিল। ওই ঘটনার পর বহু বছর 'খুনি দরওয়াজা' পর্যটকসহ অন্যান্য দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়ে হয়েছিল। মাত্র বছর দু'য়েক আগে পুনরায় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছে বলে শুনেছিলাম।

ডিসেম্বর ২০০২ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা আজাদ মেডিকেল কলেজের এক ছাত্রীকে তিন যুবক এ দরওয়াজার উপরের প্রকোষ্ঠে নিয়ে উপর্যুপরি পাশবিক অত্যাচার করে। পরে নির্যাতিত এই তরুণী দুই পুলিশ কনস্টেবল দ্বারাও লাঞ্ছিত হয়। এর পরে ওই তরুণীর মৃতদেহ এখান হতে উদ্ধার করা হয়। অভিযোগ ছিল যে ওই হত্যাকাণ্ডের সাথে এখানে ওই সময় টহলরত ওই দুই পুলিশ সদস্য জড়িত ছিল। অনেকেই এ ঘটনাকে 'খুনি দরওয়াজার' ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বলে মনে করেন।

১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ সূরীর সময়ের নির্মিত এ দরওয়াজা এ ধরনের বহু বর্বর ঘটনার সাক্ষী। এখানে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া বাহিনীর মেজর হাডসনের আহ্বানে আত্মসমর্পণ করবার পরেও বাহাদুর শাহ জাফরের দুই পুত্র, মির্জা মোগল, মির্জা খিজির সুলতান এবং এক পৌত্র মির্জা আবু বকরকে উলঙ্গ করে হাডসন স্বহস্তে গুলি করে হত্যা করেন। হত্যার পর তিন জনের মৃতদেহ ওই অবস্থায় 'চাঁদনী চক'-এর কোতওয়ালীর সামনে প্রায় চারদিন ফেলে রেখেছিলেন। ঘটনাটি ঘটে সেপ্টেম্বর ২২,১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। মেজর হাডসন পরের বছর লক্ষ্মৌতে সিপাহীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাই প্রথম নয়। ইতিপূর্বে সম্রাট জাহাঙ্গীর, পিতা সম্রাট আকবরের রাজকীয় অভিভাবক এবং সেনাপতি বৈরম খান এর পৌত্রদ্বয়, সম্রাট আকবরের নবরত্নের অন্যতম আব্দুর রহিম খান-ই-খানার পুত্রদের এখানে হত্যা

www.pathagar.com

করেন। জাহাঙ্গীরের নির্দেশে শুধু হত্যাই করা হয়নি খান-ই খানার পুত্রদের মরদেহ এখানে ফেলে রাখা হয়েছিল চিল আর শকুনের খাদ্য হিসেবে। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে আবদুর রহিম জাহাঙ্গীর ওরফে সেলিম-এর স্থলে তাঁর (জাহাঙ্গীরের) পুত্র শাহজাহান ওরফে খুররমকে আকবরের উত্তরসূরি হিসেবে জোরালো সমর্থন দিয়েছিলেন। শুধু আব্দুর রহিম-এর পুত্ররাই নন এখানে জাহাঙ্গীরের নির্দেশে নিগৃহীত হয়েছিলেন রাজা মান সিং এবং সম্রাট আকবরের এক দুধ ভাই, জি জি আনগার পুত্র, মির্জা আজিজ কোকলাতাশ। জাহাঙ্গীর পিতা আকবরের বিরুদ্ধে বহুবার বিদ্রোহ করেছিলেন।

আওরঙ্গজেব দারাশিকোকে পরাজিত করবার পর এই খুনি দরওয়াজায় তার ধড় থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে পিতার কাছে পাঠাবার পূর্বে জনসম্মুখে প্রদর্শন করবার জন্য কয়েক দিন ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এর পরে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের লগ্নে দিল্লীতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় শাহজাহানবাদ-এর মুসলমান উদ্বাস্তুদের, 'পুরানা কেল্লায় আশ্রয় নিতে যাবার পথে, নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। এ সব ঐতিহাসিক নৃসংশতার কারণে কবে 'সূরী' শাসনের সময় নির্মিত এ বহুতল ও দুই কপাট বিশিষ্ট 'লাল দরওয়াজা' 'খুনি দরওয়াজা'-র নাম ধারণ করে তা নির্দিষ্ট করে কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। এ দরওয়াজাটি এখন নতুন দিল্লীর মধ্যে পড়েছে। চারদিকে বহু স্থাপনা গড়ে উঠায় এবং কালের অযত্নে এ দরওয়াজার চাকচিক্য ম্লান হয়ে পড়েছে। তবুও বহু পর্যটক এখানে ভিড় জমান এ অভিশপ্ত ঐতিহাসিক "লাল দরওয়াজা' অথবা 'খুনি দরওয়াজা' দেখতে।

আমি গাড়ির স্পিড কমিয়ে একেবারে পাশ ঘেঁসে যেতে যেতে দরওয়াজাটি দেখলাম। পুরাতন ইট-সুড়কির লাল রংয়ের এ দরওয়াজা দিল্লীর ইতিহাসের জঘন্যতম অধ্যায়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এ স্থানটিকে সংরক্ষিত স্থাপনা বলে ঘোষণা দিয়েছে। অল্প সময়ের জন্য হলেও দেখলাম 'খুনি দরওয়াজা'- বা এক সময়কার 'লাল দরওয়াজা' রাস্তার একেবারে সাথে লাগানো অসাধারণ এক পুরাতন চুনসুড়কির ইমারত। অনেকে হয়ত ফিরেও তাকায় না। অথচ এর ইতিহাসে রয়েছে হৃদয় বিদারক নৃশংসতার কাহিনী। রয়েছে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কাহিনী। মসনদে বসতে গিয়ে আপনজন হত্যার কাহিনী। ব্রিটিশ দখলদারিত্ব পোক্ত করতে মোগলদের বংশ শেষ করবার প্রচেষ্টার কাহিনী। রয়েছে ধর্মের নামে বিভাজিত হিন্দুস্থানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কাহিনী। সংক্ষেপে 'খুনি দরওয়াজা' দিল্লীর ইতিহাসের অনেক নৃশংসতার সাক্ষী– বহু ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে অন্যতম এই 'খুনি দরওয়াজা'। স্থানীয় সাধারণ জনগণের মতে এখনও কখনও কখনও গভীর রাতে খুনি দরওয়াজার ভেতর হতে অশ্বারোহীর, বন্দুকের আওয়াজ আর চাপা আর্তনাদ কানে আসে। এর কতটুকু সত্য অথবা গুজব তা উদ্ঘাটন করতে হলে কয়েক মিনিট নয় কয়েক মাসের

www.pathagar.com

প্রয়োজন হবে।

খুনি দরওয়াজা পার হয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর আমরা মেহেরুলী বদরপুর রোডের জংশনে তুঘলকাবাদের পরিত্যক্ত দুর্গ শহরটি দেখতে পৌঁছলাম। রাস্তার পশ্চিমে দুর্গ শহরের পরিকল্পনাকারী সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সমাধি। এখানে কোন পর্যটক দেখিনি। তবুও আমি মিনহাজকে নিয়ে টিকেট কেটে ধ্বংসপ্রায় বড় বড় পাথরের সাহায্যে নির্মিত বিশাল এলাকা জুড়ে স্থিত তুঘলকাবাদের ভেতরে গিয়ে চারদিকে ধ্বংসস্তূপ আর ধ্বংসপ্রায় কিছু স্থাপনা দেখলাম। সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বড় বড় পাথর আর থোকা থোকা ঘন কাঁটাবন।

এই তুঘলকাবাদ সম্বন্ধে আমি হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার জিয়ারত নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কিছুটা উল্লেখ করেছি। এ সূফী সাধক তুঘলকাবাদে সংঘটিত নৃশংসতার কথা শুনে ভবিষ্যদ্বাণী করে যা বলেছিলেন তা আবার উল্লেখ করছি। হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া বলেছিলেন, "ইয়ারহে উজার ইয়া বছে গুজার (হয় পরিত্যক্ত থাকবে আর না হয় গুজাররা থাকবে)। তুঘলকাবাদ দেখে আমার মনে হল এ জায়গাটি পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে যেখানে এখন আশেপাশের গ্রামের গরু-ছাগল আর উট চরে। উল্লেখ্য যে, ভারতের 'গুজর' সম্প্রদায়ের অন্যতম পেশা গবাদি পশু চারণ।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় না যে তুঘলকাবাদ দেখতে আজকের সাধারণ পর্যটকরা উৎসাহী। প্রমাণ, যত জায়গায় গিয়েছি তার মধ্যে তুঘলকাবাদের প্রবেশ মূল্য সবচাইতে কম, সকল শ্রেণীর পর্যটকদের জন্য মাত্র পাঁচ রুপী। আমরা তুঘলকাবাদ ছেড়ে বসন্ত বিহারে চলে আসলাম। সন্ধ্যা তখন হয় হয়। আজকেই আমাদের দিল্লীর সংক্ষিপ্ত সফরের শেষ দিন। আগামীকাল সকাল এগারোটায় দিল্লী ছেড়ে দেশে ফিরব। তারই প্রস্তুতি নিতে সুটকেস এবং ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম।

রাতে টেলিভিশনের খবরে আজকের দিনের, মে ১৩,২০০৯ এ, অনুষ্ঠিত ১৫তম লোকসভার নির্বাচনের বিস্তারিত খবর শুনলাম। এই দিন মোট ৯টি রাজ্য এবং ইউনিয়ন টেরিটোরিতে মোট ৮৬টি লোকসভার আসনে নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। কোথাও তেমন গোলযোগের খবর পাওয়া যায়নি, শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলা বাদে। পশ্চিম বাংলায় ক্ষমতাসীন দল বামফ্রন্টের সাথে মিস্ মমতা ব্যানার্জীর তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া আর মারপিটের খবর টেলিভিশনের পর্দায় ঢালাওভাবে প্রচারিত হয়েছিল। IBN-CNN এ ভারতের বহুল পরিচিত সাংবাদিক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং সফল শো হোস্ট, মিঃ রাজদ্বীপ সারদেশাই-এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ভোটের হার এবং ভোটার উপস্থিতির উপর বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে তার মতে এবারও কংগ্রেস ইউপিএ শরিকদের নিয়ে সরকার গঠন করবে। ওই সময়ে

www.pathagar.com

বিশ্লেষণে বলেছিলেন, "আঞ্চলিক শরিক দলগুলো এবার হয়ত আরও বেশি আসন পেতে পারে এবং কয়েকটি দল, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের মায়াবতীর দল, কংগ্রেসের সাথে দর কষাকষিতে এগিয়ে থাকবে।" এমনটাই ওই দিনের প্রায় সব ভাষ্যকারের মতামত ছিল। এ মতামতের প্রেক্ষাপট হয়ত বিগত দু'টি নির্বাচন হতে এবারের নির্বাচনে ভোট প্রদানের সংখ্যা সামান্য বাড়বার কারণ হয়ে থাকতে পারে। অবশ্য পরে এ বিশ্লেষণ পুরোপুরি সত্য হয়নি।

কংগ্রেস ১৫তম লোক সভায় নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত হলেও সরকার গঠনের জন্যে আগের তুলনায় অল্প সংখ্যক দলের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল যা কংগ্রেস খুব বেশি ছাড় না দিয়েই পেয়েছিল। নির্বাচন পূর্বে ধারণা করা হয়েছিল কংগ্রেস হয়ত এতগুলো আসন পাবে না এবং সে ক্ষেত্রে যে কোন আঞ্চলিক দল কংগ্রেসকে প্রধানমন্ত্রীর দাবি ছাড়বার প্রেক্ষিতে সমর্থন দেবে। সে ক্ষেত্রে উত্তর প্রদেশের বিএসপি-এর প্রধান বর্তমান (২০০৯) মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী দেবীর সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হবার বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়া যথেষ্ট প্রচার করেছিল। এমন কি News week-এর মত পত্রিকা মায়াবতীকে পরবর্তি প্রধানমন্ত্রী আখ্যায়িত করে প্রচ্ছদে ছবি দিয়ে বিরাট প্রতিবেদন ছেপেছিল। মিডিয়ার বদৌলতে মায়াবতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 'দলিত'-দের ত্রাণকর্তা হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন।

টেলিভিশনে শহরের ভোটারদের মধ্যে বেশির ভাগ আলোচনা হয়েছিল 'না' ভোটকে কেন্দ্র করে। অনেকে ভারতে সরাসরি None of the above (না) ভোটের সপক্ষে মতামত দিয়ে বললেন যে ভোট কেন্দ্রে ভোট দেবার সমঅধিকার নিশ্চিত করতে এটি অত্যন্ত প্রয়োজন। যদিও নেতিবাচক ভোট ভারতীয় নির্বাচনী বিধি মোতাবেক এখনও বিদ্যমান তবে তার প্রক্রিয়া বেশ জটিল। ভারতীয় নির্বাচনী বিধান ৪৯(১) মোতাবেক একজন ভোটারকে নেতিবাচক ভোট দিতে হলে কেন্দ্রে প্রাপ্ত ফরম নং ১৭ পূরণ করে প্রিজাইডিং অফিসারকে দিতে হয়। সমস্যা হল এ ধরনের প্রক্রিয়ায় নিজের মতামত প্রকাশ করা অশিক্ষিত অথবা কম শিক্ষিত ভোটারদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি জয়পুরের কয়েকটি কেন্দ্রে এ ফরম দেখেছি। আমার কাছে এ প্রক্রিয়া মনঃপূত মনে হয়নি।

বর্তমানে ভারতীয় নির্বাচনে 'না' ভোটের বিষয়টি সুপ্রীমকোর্টের রায়ের অপেক্ষায় রয়েছে। ভারতীয় সুপ্রীমকোর্ট পাঁচজন বিচারকের একটি বেঞ্চ গঠন করেছেন 'না' ভোটের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপরে মতামত প্রদানের জন্য। আমাদের দেশে নবম সংসদ নির্বাচনে এ বিধান চালু করা হলেও নির্বাচনের পর সংসদ কর্তৃক নির্বাচনী আইন পাস করবার সময় এ বিধান বাতিল করা হয়েছে।

রাতের খবর দেখা শেষ করে সকলে মিলে কিছুক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে গল্প গুজব করে

www.pathagar.com

যখন শুতে গেলাম তখন প্রায় মধ্য রাত। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই ভারতে আমার পর্যটনের গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল (সোনালী ত্রিভুজ) বলে পরিচিত দিল্লী-আগ্রা-জয়পুর, সফর শেষ হবে।

মে ১৪, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ। ভারতে প্রায় দশ দিনের সফরের শেষ দিন। হাতে তিন ঘণ্টা সময় রেখে বিমান বন্দরের উদ্দেশে রওনা হতে হবে। যথারীতি সকালের নাস্তা শেষে প্রস্তুতি নিয়ে জনাব দোহা সাহেবের কাছে দোয়া চেয়ে আমরা বিদায় নিলাম। শম্পা আর মিনহাজ আমাদেরকে বিমানবন্দরের বিদায় জানাতে সাথে আসছে জানালে আমি তাঁকে বারণ করেও নিবৃত করতে পারলাম না।

প্রায় তিনঘণ্টা হাতে রেখেই আমরা 'ইন্দিরা গান্ধী' আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌছলাম। আগেই বলেছি বিমান বন্দরটির আগের নাম ছিল পালাম; এটি ইন্দিরার মৃত্যুর পর তার নামে নামকরণ করা হয়। ভারতে কোন জীবিত ব্যক্তির নামে নামকরণ করা কোন সরকারি স্থাপনা আছে বলে আমার জানা নেই।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর, কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিত সম্প্রদায়ের সদস্য বলে তিনি পণ্ডিত উপাধি ব্যবহার করতেন, তনয়া একমাত্র সন্তান প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নাম আমাদের দেশের ইতিহাসে গেঁথে থাকবে। ইন্দিরা গান্ধীর নাম উচ্চারিত হলেই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের উল্লেখ আসবেই। এ নাম বাংলাদেশিদের কাছে মোটেই অপরিচিত নয়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু আর তদীয় পত্নী কমলাকাউল নেহেরুর একমাত্র সন্তান, জন্মসূত্রে নাম 'ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী নেহেরু' কংগ্রেসের এক পারসী নেতা ফিরোজ গান্ধীর✦ (মহাত্মা গান্ধীর সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না) সাথে বিবাহের মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী নামে রাজনৈতিক অঙ্গনসহ বিশ্বে পরিচিত হয়ে উঠেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে আল্লাহবাদে জন্মগ্রহণ করেন ফিরোজ গান্ধী এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ইন্দিরা গান্ধী অল্প বয়স থেকেই বাবার হাত ধরে রাজনীতিতে হাতে খড়ি নেন। এক সময়ে তিনি যুবা কংগ্রেসের সদস্যা হিসেবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথেও জড়িত ছিলেন। কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজের দলের একাধিক ভাঙন দেখেছেন। ভারতের দু'বারের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের সব চাইতে বড় ঘটনা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানের বিশাল বাহিনীর পরাজয় এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়। ১৯৭১-এর পর ভারতকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্দিরা গান্ধী পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করলেন পোখরায়

✦ *ফিরোজ গান্ধীর পূর্ব নাম ফিরোজ 'গান্ধে' (Gandy)। ইন্দিরা এবং ফিরোজ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন। ইন্দিরা-ফিরোজের বিবাহে অমত ছিলেন পণ্ডিত নেহেরু। এ বিয়ে ঠেকাতে পণ্ডিত নেহেরু মহাত্মাগান্ধীর শরণাপর্ন্ন হয়েও ঠেকাতে পারেননি। ১৯৪২ খৃঃ হিন্দু শাস্ত্র মতে ফিরোজ এবং ইন্দিরার বিবাহ সম্পন্ন হয়।*

www.pathagar.com

উপমহাদেশের প্রথম পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক বিপর্যয় হয় তার দু'পুত্রের এক পুত্র, সঞ্জয় গান্ধীর, অকাল মৃত্যুর পর হতে। ইন্দিরা গান্ধীর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অপ্রত্যাশিত ইতি হয় অক্টোবর ৩১, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবে "অপারেশন ব্লু স্টার'-এর শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে অভিযানে শিখদের সবচেয়ে পবিত্র স্থান 'আকাল তখত'-এ আক্রমণ ও 'শিখ নিধনের' প্রতিশোধ হিসেবে তারই শিখ দেহরক্ষী বিয়ান্ত সিং-কর্তৃক হত্যার মাধ্যমে। পরে নেহেরু পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম ইন্দিরার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁকেও আত্মঘাতী হামলায় নিহত হতে হয়েছে তামিল টাইগারদের প্ররোচনায়। বর্তমানে নেহেরুর চতুর্থ প্রজন্ম আর ইন্দিরা গান্ধীর তৃতীয় প্রজন্ম ভারতের রাজনীতির উদীয়মান সূর্য বলে বিবেচিত হচ্ছে।

আমরা আন্তর্জাতিক টার্মিনালের বাইরে পৌঁছে শম্পা আর মিনহাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টার্মিনালের ভেতর প্রবেশ করলাম। এ কয়টা দিন শম্পা আর তার পিতা, শ্রদ্ধেয় দোহা সাহেব, যেভাবে আমাদের দেখাশোনা করেছেন তার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা ছিল না বলে শম্পাকে শুধু 'দোয়া রইল' বলে বিদায় নিয়েছিলাম।

আজকাল বিমানে সফর করাও বেশ জটিল হয়ে পড়েছে। নিরাপত্তা চেকিং-এর মধ্য দিয়ে কাস্টম শেষ করে বিমানে আরোহনের প্রায় আধা ঘণ্টা পর বিমান দিল্লী বিমান বন্দর থেকে আকাশে উড়াল দিল। নির্ধারিত সময়ের কিছুক্ষণ পরেই বিমান যাত্রা শুরু করেছিল। জানালার পাশে বসে নিচে তাকিয়ে দেখলাম এককালের হিন্দুস্থানের, শহরের সমষ্টি, বর্তমানে ভারতের রাজধানী আটশত বছর পুরনো, প্রকারান্তরে কয়েক হাজার বছরের কত জনপদ কত ইতিহাসের দিল্লীর দ্রুত অপসৃয়মান দৃশ্য। বর্তমান দিল্লীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হাজার বছরের এক সময়ের প্রমত্তা যমুনা নদী, এখন মৃতপ্রায়, ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। দুপুরের সূর্যের প্রখর রশ্মিতে চিকচিক করছে যমুনায় বয়ে যাওয়া পানি। কত জনপদ আর কত ইতিহাস-এর সাক্ষী এ যমুনা নদী।

ক্রমেই আমাদের বিমান উপরে উঠছিল আর নিচের দৃশ্যপট ত্বরিত পরিবর্তিত হচ্ছিল। দিল্লী থেকে ঢাকার দূরত্ব প্রায় ১৪০০ মাইল আর দিল্লী থেকে গৌড়ের দূরত্ব ছিল প্রায় ১২০০ মাইল। ভাবতে অবাক লাগে দিল্লী থেকে কথিত আঠারো জন অশ্বারোহী নিয়ে কিভাবে কুতুবউদ্দিনের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি ১২০১ হতে ১২০৪ এর মধ্যে প্রথমে বিহার ও পরে গৌড় (তৎকালীন বাংলা) জয় করলেন! ওই সময়ে গৌড়ের শাসক লক্ষণ সেন ইখতিয়ার উদ্দিনকে না দেখেই এবং কোন ধরনের প্রতিরোধ না করেই কেনই বা গৌড় ত্যাগ করলেন! মধ্যযুগে অশ্বকে সম্বল করে কিভাবে এত শত মাইল অজানা পথে এসব সেনাপতিরা বাংলাদেশে, তৎকালীন বাংলায়, উপর্যুপরি আক্রমণ করতেন ভাবতে অবাক হতে হয়। যেমন

www.pathagar.com

এখনও অবাক হতে হয় কিভাবে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে আগ্রার দুর্গে জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হওয়া ব্রিটিশ রাজদূত স্যার টমাস রো-এর উত্তরসূরিরা হিন্দু স্থানের মত শক্তিশালী বিশাল জনপদ দখল করে দুইশ' বছর শাসন করেছিল? ইতিহাস অত্যন্ত নির্মম কিন্তু সত্য! কিন্তু এগুলোই ইতিহাসের সত্য। পছন্দ হোক বা নাই হোক ইতিহাসের সত্য বিকৃত করা সম্ভব নয়।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর বিমানবালা সুরেলা কণ্ঠে প্রথমে হিন্দিতে পরে ইংরেজিতে ঘোষণা করলেন, 'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ঢাকার জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করব।' আমার এ পর্বের ইতিহাসে বাস শেষ হল। দিল্লী বহু দূরে রেখে এসেছি। ভাবছিলাম চার পাঁচদিন অথবা সপ্তাহে দিল্লী দেখা সম্ভব নয় বিশেষ করে এমন একটা শহর যেখানে ইতিহাস আর বর্তমান অবস্থান করে। সুযোগ পেলে হয়ত আরেক জনপদ আর ইতিহাসের আরেক অধ্যায় সফর করবার আশা রাখি।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জি

Abul Fazal, *'Ain-i-Akbari'* New Taj Office, New Delhi

Alexender Rogers (Translated) *'Tuzuk –i-Jahangiri or Memoir of Jahangir'* Low Price Publication New Delhi

Ali, Moher, *'Requiem for a freedom Fighter'*,

August Rudolf Hernie, Herbert Aleik Stark, *'A History of India'*

Annette Susannal Beveridge, (translated) 'Babarnama', Munshiram Monoharla Publications Pvt Ltd, New Delhi

Banarjee Jamini, *'History of Feroz Shah Tugluk'* Munshiram Monohorlal Publications Pvt Ltd New Delhi

Brigg John, *'History of the Rise of Mohomedan Power in India'* Atlantic Publishers & Distributors, Daryaganj, Delhi

Buyers, Christopher, *'The Rathor Dynasty Genology'*

Carroll, David (1971), *'The Taj Mahal'* Newsweek books

Chaghtai, Muhammad Abdullah *Le Tadj Mahal d'Agra (Inde).* Histoire et description (Brussels: Editions de la Connaissance) 1938.

Ebba Kotch, 'The Complete– *Tajmahal and River front garden of Agra'* Thames & Hudson Ltd, Uk

Farooqi Shasur Rahman, *'Long History of Urdu Language' Pollok Ltd, Delhi*

Fergus Nicoll *Shah Jahan: The Rise and Fall of The Mughal Emperor* Penguin Books, Pvt, Ltd, New Delhi 110017

Geral James Larson, *'India's Agony Over religion'*, Sunny Press Delhi

Gibbs HAR, (translated) *'Travels of Ibn Batuta'* VolII, Munshiram Monoharlal Publications Pvt Ltd

Goel Vijay, *'The Emperor's City : Rediscovering Chadni Chowak and Environment'*

Hastings James, *'Encyclopedia of Religion and Ethics'* Delhi

Inayet S. Zaidi A, *'French Mercenaries in the South Asian State : 1499-1803'* Delhi

Kher MD, *'Malwa through the Ages'* Bhoopal Directorate of Archeology and Museum

Larry Collins and Dominique Lapierre, *'Freedom at Midnight'* Vikas Publications, New Delhi

www.pathagar.com

Lahawri, 'Abd al-Hamid *Badshah Namah* Ed. Maulawis Kabir al-Din Ahmad and 'Abd al-Rahim under the superintendence of Major W.N. Lees. (Calcutta: College Press) Vol. I 1867 Vol. II 1868.
Majumdar RC (ed), *'The Mughul Empire' Bhartya Bhaban, Mumbai*
Mookarji Radha kumud, *'Chandragupta Maurya and his Times'* Motilal Banaridas Publication, India
Nath R, *'History of Mughul Architect' Avinab Publications, Delhi*
Rai Raghunath, *'History'* V k Publication, Delhi
Sharma Sri ram, *'Out Line of Indian History'*
Shoma Mukharjee, *'Royal Mughul Ladies and their Contribution' Gyan Books, Delhi*
Singh Ganapati, *'Gujar Verangamen' New Embassy Press, Delhi*
Singh, Khushwant, *'Delhi'* Penguin Books, New Delhi
Sita Ram, *'Sepoy to Subedar'* Vikas Publications, New Delhi
Stenley A. Wolpart, *'A New History of India'* ISBN0-19-516678-1
Trautmann R Tomas, *'Kutilya Arthashastra'*
William Dalrymple, 'City of Djinns', *'White Mughul', 'Last Mughul* Penguin Books, New Delhi
বি. রমন (অনুবাদ), 'র'-এর কাউবয়েরা- *স্মৃতির সিঁড়িতে আরোহন* প্রভাতী প্রকাশনা- ঢাকা-১১০০।
News Papers/Magazines
'Times of India,' Dec 05
'Time,' July 28, 1967
'The Statement' September 5,1944
'The Tribune- Chandigarh' March 17, 2006
Documents/Film
Encyclopedia Britannica (Eleventh Edition)
The State Emblem of India
(prohibition of Improper use) act 2005
Maharastra Watch (Kerala) Report-2008
'Imperial Gazette' India *'Vernacular Literature'*
'Jaipur Guide Book Data and Expo India' Pvt. Ltd
'Shaheed Bhagat Singh' Film, 2002
Web Sites
http # locsabha.nic.in
http # en.wkipidie.org/wk/pritiviraj-chauhan
http# India-defence.com
http # delhigovt.nic.in/dept/prj/visitor/city-asp?opt-2
http # judes.nic/supremecourt/qrydisp.asp?tfnm-27098
http # en.wikipedia.org/wiki/khusru- Khan
http# wikipedia.org/wiki/gujrat-riots

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কত জনপদ
কত ইতিহাস